চিঠিপত্র

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথনাথ চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত

চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত

চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ৯। হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রীকে লিখিত

চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেন এবং তাঁর পুত্র অরুণচন্দ্র সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ১১। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর মাতা অনিন্দিতা দেবী এবং অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত

চিঠিপত্র ১২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৩। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবী, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণলাল ঘোষকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৫। যদুনাথ সরকার ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৬। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সমর সেনকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৭। দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও মীরা চৌধুরীকে লিখিত

চিঠিপত্র ১৮। রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়), ফণিভূষণ অধিকারী, সরযূবালা অধিকারী, যাদুমতি মুখোপাধ্যায়, আশা অধিকারী ও ভক্তি অধিকারীকে লিখিত

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরাদেবীকে লিখিত

ছিন্নপত্রাবলী। ইন্দিরাদেবীকে লিখিত, পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ

পথে ও পথের প্রান্তে। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী। রাণু দেবীকে লিখিত

অষ্টাদশ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
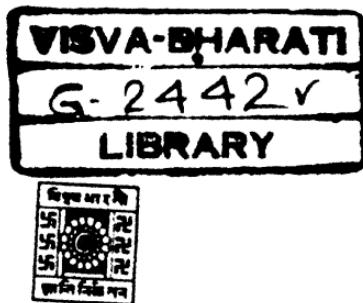
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

চিঠিপত্র ।। অষ্টাদশ খণ্ড

রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়), ফণিভূষণ অধিকারী
সরযূবালা অধিকারী, যাদুমতি মুখোপাধ্যায়, আশা অধিকারী
ও ভক্তি অধিকারীকে লিখিত পত্রাবলী

প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ ১৪০৯

সম্পাদনা : শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল

ISBN-81-7522-222-0 (V.18)
ISBN-81-7522-025-2 (Set)

প্রকাশক অধ্যাপক সুধেন্দু মণ্ডল
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

অক্ষর বিন্যাস বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা ১৭

মুদ্রক দি নিউ অরোরা প্রেস
১৫/১ মহেন্দ্র শ্রীমাণী স্ট্রীট। কলকাতা ৯

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)-কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির জবাব দেব বলে চিঠিখানি যত্ন করে রেখেছিলুম কিন্তু কোথায় রেখেছিলুম সে কথা ভুলে যাওয়াতে এত দিন দেরি হয়ে গেল। আজ হঠাৎ না খুঁজতেই ডেস্কের ভিতর হতে আপনিই বেরিয়ে পড়ল।

তোমার রানু নামটি খুব মিষ্টি — আমার একটি মেয়ে ছিল, তাকে রানু বলে ডাকতুম, কিন্তু সে এখন নেই। যাই হোক [illegible] নাম দিয়ে তোমার ঘরের লোকের কথা শুনে ভাল লাগে

রাণু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের
প্রথম পত্রের একটি পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিচিত্র

১
১৯ অগাস্ট ১৯১৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির[১] জবাব দেব বলে চিঠিখানি যত্ন করে রেখেছিলুম কিন্তু কোথায় রেখেছিলুম সে কথা ভুলে যাওয়াতে এত দিন দেরি হয়ে গেল। আজ হঠাৎ না খুঁজ্‌তেই ডেস্কের ভিতর হতে আপনিই বেরিয়ে পড়ল।

তোমার রাণু নামটি খুব মিষ্টি— আমার একটি মেয়ে ছিল, তাকে রাণু বলে ডাক্‌তুম, কিন্তু সে এখন নেই।[২] যাই হোক্ ওটুকু নাম নিয়ে তোমার ঘরের লোকের বেশ কাজ চলে যায় কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে চিঠিপত্রের ঠিকানা লিখ্‌তে মুস্কিল ঘটে। অতএব লেফাফার উপরে তোমাকে কেবলমাত্র রাণু বলে অভিহিত করাতে যদি অসম্মান ঘটে থাকে তবে আমাকে দোষ দিতে পারবেনা। বাড়ীর ডাক নামে এবং ডাকঘরের ডাক নামে তফাৎ আছে যদি ভবিষ্যতে চিঠি লেখো তবে সে কথাটা মনে রেখো।

শেখরের[৩] কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেচ। রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয়ই তার বিয়ে হত কিন্তু তার পূর্ব্বেই সে মরে গিয়েছিল। মরাটা তার ভুল হয়েছিল কিন্তু সে আর তার শোধরাবার উপায় নেই। যে খরচে রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম করে তার অন্ত্যেষ্টি সংকার হয়েছিল।

ক্ষুধিত পাষাণে[৪] ইরাণী বাঁদির কথা জানবার জন্যে আমারও খুব ইচ্ছে আছে কিন্তু যে লোকটা বল্‌তে পারত আজ পর্য্যন্ত তার ঠিকানা পাওয়া গেলনা।

তোমার নিমন্ত্রণ আমি ভুলবনা— হয়ত তোমাদের বাড়িতে একদিন যাব— কিন্তু তার আগে তুমি যদি আর-কোনো বাড়িতে চলে যাও? সংসারে এই রকম করেই গল্প ঠিক জায়গায় সম্পূর্ণ হয় না।

এই দেখ না কেন, খুব শীঘ্রই তোমার চিঠির জবাব দেব বলে ইচ্ছা করেছিলুম কিন্তু এমন হতে পারত তোমার চিঠি আমার ডেস্কের কোণেই লুকিয়ে থাকত এবং কোনোদিনই তোমার ঠিকানা খুঁজে পেতুম না।

যেদিন বড় হয়ে তুমি আমার সব বই পড়ে বুঝতে পারবে তার আগেই তোমার নিমন্ত্রণ সেরে আস্‌তে চাই। কেননা যখন সব বুঝবে তখন হয় ত সব ভাল লাগ্‌বে না— তখন যে-ঘরে তোমার ভাঙা পুতুল থাকে সেই ঘরে রবিবাবুকে শুতে দেবে।

ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। ইতি ৩রা ভাদ্র ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৭

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, আমার একদিন ছিল যখন আমি ছোট ছিলুম— তখন আমি ঘন ঘন এবং বড় বড় চিঠি লিখ্‌তুম। তুমি যদি তার আগে জন্মাতে— যদি অনর্থক এত দেরী না করতে, তাহলে আমার চিঠির উত্তরের জন্যে একদিনও

সবুর করতে হতনা। আজ আর চিঠি লেখবার সময় পাই নে— সময় আমার একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। কি করে হল বলি। মানুষের বদনাম হলেই শাস্তি পায়, কিন্তু আমার হল তার উল্টো। হঠাৎ বিলেতে আমার সুনাম বেরল[১]। বোধ হয় খবরের কাগজে পড়েছ আজকাল এমন সব বড় বড় কামান বেরিয়েচে যার গোলা অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়। সমুদ্রপার থেকে সেই রকম সব গোলা আমার সময়ের উপর এসে পড়চে। এই গোলাগুলি আসে চিঠির বেশ ধরে— কত যে তার ঠিকানা নেই। তাই আমার অবকাশ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। তোমার বয়স আমার যখন ছিল তখন নিজের ইচ্ছেয় চিঠি লিখতুম, এখন অন্যের ইচ্ছেয় এত বেশি লিখ্‌তে হয় যে, নিজের ইচ্ছেটা মারাই গেল। তার পরে আবার ভয়ানক কুঁড়ে হয়ে গেছি। যত বেশি কাজ করতে হচ্চে ততই কুঁড়েমি আরো বেড়ে যাচ্চে। তুমি যদি আমাদের কাছাকাছি কোথাও থাক্‌তে তাহলে গাড়িভাড়া করে ছুটে গিয়ে মোকাবিলায় তোমাকে জবাব দিয়ে আসতুম তবু কলম ধরতুম না। যখন আমার বয়স সাত, তখন থেকে কেবলি কলম চালিয়ে আসচি এখন ষাট বছরে পড়বার উদ্যোগ করচি, এখনও সেই কলম চলচে। এই জন্যে ঐ কলমটার উপরে আমার অত্যন্ত বিরক্ত ধরে গেছে। এখন লিখে যাওয়ার চেয়ে বকে যাওয়া ঢের বেশি সহজ মনে হয়। যদি তেমন সুবিধে হত ত দেখিয়ে দিতুম বকুনিতে তুমি কখনো আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌তে না। সেটা তোমার ভাল লাগত কিনা বল্‌তে পারি নে। কেননা তোমার যতগুলি পুতুল আছে তারা কেউ তোমার কথার জবাব করেনা, তুমি যা বল তাই তারা চুপ করে শুনে যায়— আমার দ্বারা কিন্তু সেটা হবার জো নেই— অন্যের কথা শোনার চেয়ে অন্যকে কথা শোনানো আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আমার বড় মেয়ে[২] যখন ছোট ছিল তখন বকুনিতে তার সঙ্গে পারতুম না কিন্তু এখন সে বড় হয়ে শ্বশুর বাড়িতে চলে গেছে তার পর থেকে আমার সমকক্ষ কাউকে পাইনি। তোমাকে পরীক্ষা করে দেখ্‌তে

আমার খুব ইচ্ছা রইল্। একদিন হয়ত তোমাদের সহরে যাব। তুমি লিখেচ আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু আগে থাক্তে বলে রাখি আমাকে দেখ্তে নারদ মুনির মত— মস্ত বড় পাকা দাড়ি। কিন্তু ভয় কোরো না, আমি তার মতই ঝগড়াটেও বটে কিন্তু ছোট মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়। তোমার কাছে খুব ভালমানুষটির মত থাকবার আমি খুব চেষ্টা করব— এমন কি, কবিশেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়েতে যদি তোমার মত থাকে আমি স্বয়ং তার ঘটকালি করে দেব। ইতি ২১শে ভাদ্র, ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

[সেপ্টেম্বর ১৯১৭]

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, তোমার সঙ্গে আমার খুব ভাব হবে আমি বেশ বুঝতে পারচি। আমাকে তুমি সুন্দর বলেচ, এতে আমার খুব জাঁক হয়েচে।[১] কিন্তু আমাকে না দেখেই বলেচ বলে ভাবনাও হয়েচে। হয়ত যখন দেখ্বে তখন তোমার মত বদ্‌লে যাবে। না হয় বদ্‌লেই যাবে, কিন্তু বাড়িতে যে নিমন্ত্রণ করেচ সে ত আর ফিরিয়ে নিতে পারবেনা। এমন কি, যদি দেরি করেও যাই তাহলেও তুমি অস্বীকার করতে পারবেনা— তোমার চিঠিতে পাকা করে লেখা আছে— সে চিঠি আমি হারাচ্চি নে।

কিন্তু তোমার সঙ্গে চিঠি লিখে জিততে পারব না এ আমি আগে থাক্‌তে বলে রাখচি। তোমার মত বাসন্তী রঙের কাগজ আমি খুঁজে পেলুম না। সামান্য সাদা কাগজই সব সময়ে খুঁজে পাই নে। তোমাকে ত আগেই বলেচি, আমি কুঁড়ে, তার পরে, আমি ভারি এলোমেলো— কোথায় কি রাখি তার কোনো ঠিকানা পাই নে। এমন আমার আরো অনেক দোষ আছে। কেউ আমার দেখবার লোক নেই বলেই আমার এই বিপদ ঘটেচে। এই ত গেল চিঠির কাগজের কথা। তার পরে ভেবেছিলুম ছবি এঁকে তোমার সচিত্র চিঠির উপযুক্ত জবাব দেব— চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলুম অহঙ্কার বজায় থাক্‌বেনা। এ বয়সে নতুন করে হাঁস আঁক্‌তে বসা আমার পক্ষে চল্‌বে না— প অক্ষরের পেটের নীচে খণ্ড ত জুড়েও সুবিধে করতে পারলুম না— সেটা এই রকম বিশ্রী দেখ্‌তে হল।

অনেক সময় পদ্মার চরে কাটিয়েচি সেখানে হাঁসের দল ছাড়া আমার আর সঙ্গী ছিল না— তাদের প্রতি আমার মনের কৃতজ্ঞতা থাকাতেই আমাকে থেমে যেতে হল— এবারকার মত তোমার হাঁসেরই জিৎ রইল। এই ত গেল ছবি, তার পরে সময়। তাতেও তোমার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। তাই ভয় হচ্চে শেষ কালে তুমি রাগ করে আর কোনো গল্প লিখিয়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে ভাব করবে— কিন্তু নিমন্ত্রণ আমার পাকা রইল।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

২৩ অক্টোবর ১৯১৭

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

তুমি দেরি করে আমার চিঠির উত্তর দিয়েছিলে এতে আমার রাগ করাই উচিত ছিল কিন্তু রাগ করতে সাহস হয় না— কেননা আমার স্বভাবে অনেক দোষ আছে, দেরী করে চিঠির উত্তর দেওয়া তার মধ্যে একটি। আমি জানি তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি অনেক সহ্য করতে পার, আমার কুঁড়েমি, আমার ভোলা স্বভাব, আমার এই সাতান্ন বছর বয়সের যতরকম শৈথিল্য সব তোমাকে সহ্য করতে হবে। আমার মত অন্যমনস্ক অকেজো মানুষের সঙ্গে ভাব রাখ্‌তে হলে খুব সহিষ্ণুতা থাকা চাই— চিঠির উত্তর যত পাবে তার চেয়ে বেশি চিঠি লেখবার মত শক্তি যদি তোমার না থাকে, দেনাপাওনা সম্বন্ধে তোমার হিসাব যদি খুব বেশি কড়াক্কড় হয় তাহলে একদিন আমার সঙ্গে হয়ত বা তোমার ঝগড়া হতেও পারে— সেই কথা মনে করে ভয়ে ভয়ে আছি। কিন্তু একথা আমি জোর করে বলচি যে, ঝগড়া যদি কোনোদিন বাধে তার অপরাধটা আমার দিকে ঘট্‌তে পারে কিন্তু রাগটা তোমার দিকেই হবে। আর যাই হোক আমি রাগী নই। তার কারণ এ নয় যে আমি খুব ভাল মানুষ, তার কারণ এই যে, আমার স্মরণশক্তি ভারি কম, রাগ করবার কারণ কি ঘটেচে সে আমি কিছুতে মনে রাখ্‌তে পারি নে। তুমি মনে কোরোনা কেবল পরের সম্বন্ধেই আমার এই দশা, নিজের দোষের কথা আমি আরো বেশি ভুলি। চিঠির জবাব দিতে যখন ভুলে যাই তখন মনেও থাকে না যে ভুলে গেচি। কর্ত্তব্য করতেও ভুলি, ভুল সংশোধন করতেও ভুলি, সংশোধন করতে ভুলেচি তাও ভুলি। এমন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব কর এবং সে

বন্ধুত্ব যদি স্থায়ী রাখতে চাও তাহলে তোমাকেও অনেক ভুলতে হবে, বিশেষত চিঠির হিসাবটা। কিন্তু একটা কারণে আমার বিস্মরণশক্তি সম্বন্ধে তোমার অবিশ্বাস হতে পারে— তোমার ঠিকানা[১] আমি ভুলি নি। না ভোলবার একটা কারণ এই যে, দুই তিনে যে পাঁচ (২+৩=৫) হয় এ কথাটা গুরুমশায়ের অনেক মার খেয়ে মনের মধ্যে বসে গেছে। আমার বিশ্বাস আর দশ বছর বাদে আমার বয়স যখন ৬৭ হবে তখনো ওটা ভুলবনা। আর অগস্ত্যকুণ্ড মনে রাখা খুব সহজ। কেননা পুরাণে পড়েচি অগস্ত্য এক গণ্ডুষে সমুদ্র শুষে খেয়েছিলেন, সেই অগস্ত্য যে আজ কুণ্ড নিয়েই সন্তুষ্ট আছেন সেটা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে খুব মেলে। ওর মধ্যে একটু সান্ত্বনার কথা হচ্চে এই যে তোমাদের নম্বরটা নিতান্ত ছোট নয়।

পদ্মার ধারের হাঁসেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল কি করে জিজ্ঞাসা করেচ। বোধহয় তার কারণ এই যে বোবার শত্রু নেই। ওরা যখন খুব দল বেঁধে চেঁচামেচি করে আমি চুপ করে শুনি, একটিও জবাব দিই নে। আমি এত বেশি শান্ত হয়ে থাকি যে, ওরা আমাকে মানুষ বলে গণ্যই করে না— আমাকে বোধহয় পাখীর অধম বলেই জানে— কেন না আমার দুই পা আছে বটে কিন্তু ডানা নেই। আর যাই হোক্ ওদের সঙ্গে আমার চিঠিপত্র চলে না— যদি চল্‌ত তা হলে আমাকেই হার মানতে হত— কেননা ওদের ডানাভরা কলম আছে, আর ওদের সময়ের টানাটানি খুব কম।

তোমাকে যে এত বড় চিঠি লিখ্‌লুম আমার ভয় হচ্চে পাছে বিশ্বাস না কর যে আমার সময় কম। অনেক কাজ পড়ে আছে— কাজ ফাঁকি দিয়েই তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি— কাজ যদি না থাক্‌ত তাহলে কাজ ফাঁকি দেওয়াও চল্‌ত না। তোমার কাছে আমার অনেক দোষ ধরা পড়চে— আমি যে কাজ ফাঁকি দিয়ে থাকি এ কথাটাও ফাঁস হয়ে গেল। এ জন্য

তুমি যদি আমাকে তিরস্কার কর তাহলে ভবিষ্যতে তোমাকে খুব ছোট ছোট চিঠি লিখ্‌তে হবে, হয় ত তারও সময় পাবনা। অতএব আমাকে যদি শাসন করতে হয় তাহলে বুঝে সুঝে কোরো।

বেলা অনেক হয়ে গেচে— অনেক আগে স্নান করতে যাওয়া উচিত ছিল— হাঁসেদের কথায় হঠাৎ স্নানের কথাটা মনে পড়ে গেল— তাহলে আজ চল্লুম। আজ রাত্রে বোলপুর যেতে হবে। ইতি ৬ [৫] কার্ত্তিক ১৩২৪[১]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

১৮ নভেম্বর ১৯১৭

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

শরীরটা অনেকদিনের পুরাণো হয়ে গেচে বলে তাকে খাটাতে আর সাহস হয় না। এখনো সে চল্‌চে কিন্তু পুরাণো গরুর গাড়ির চাকা যেমন চল্‌তে চল্‌তে ক্যাঁ কোঁ করে কাঁদতে থাকে এরও সেই দশা। এ দেহটা কাজ করতে করতে অ্যাঁ ওঁ করচেই আর আমি তাকে ছুটি দিই নে বলে আমার উপর রাগ করচে। এই সকল কারণে, মন যখন চিঠির জবাব দিতে চায় মগজ তখন সাড়া দেয় না। কিন্তু তোমার মত ছোট মেয়ের সঙ্গে চিঠি লেখায় হার মান্‌ব এটা আমার সহ্য হয় না বলেই এখনো চিঠির জবাব পাচ্চ— কিন্তু মাঝে মাঝে লম্বা ফাঁক পড়ে যাচ্চে। তুমি জিজ্ঞাসা করেচ আমার এত কি কাজ। আমি তার একটা ফর্দ্দ দিই।

১। চিঠি
২। চিঠি
৩। চিঠি
৪। চিঠি
৫। চিঠি
৬। চিঠি
৭। চিঠি
৮। চিঠি
৯। চিঠি
১০। জানালার কাছে বসে থাকা
১১। জানালার কাছে বসে থাকা
১২। জানালার কাছে বসে থাকা
১৩। জানালার কাছে বসে থাকা
১৪। জানালার কাছে বসে থাকা
১৫। ছাতের উপর বসে থাকা
১৬। ছাতের উপর বসে থাকা
১৭। ছাতের উপর বসে থাকা
১৮। ছাতের উপর বসে থাকা
১৯। চিঠি ছাড়া অন্য কিছু লেখা
২০। সেই লেখা সংশোধন
২১। সেই লেখা পড়ে শোনানো
২২। সেই লেখা কাগজে মোড়া
২৩। সেই লেখা ডাকে পাঠানো
২৪। সেই লেখা ছাপার অক্ষরে পড়া
২৫। সেই লেখার সমালোচনা পড়া
২৬। আরো সমালোচনা পড়া
২৭। সেই লেখা সম্বন্ধে অনুতাপ করা

এই ত সাতাশ দফা ফর্দ্দ দিলুম।[1] শুনেচি তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে অঙ্ক কষ্‌তে পার। তুমি হয়ত হিসাব মিলিয়ে ঐ ২৭ থেকে ২টা রেখে ৭টা বাদ দিয়ে বল্‌বে আমি কেবল লিখি আর কুঁড়েমি করি। অর্থাৎ কাজ আর অকাজ এই দুটি মাত্র ভাগে আমার দিন বিভক্ত। আর এটাও তুমি নিশ্চয় সন্দেহ করবে, কাজের চেয়ে অকাজের অংশই বেশি— পৃথিবীতে যেমন স্থলের চেয়ে জল। কিন্তু আমার কুঁড়েমিটাকে তুমি যে তুচ্ছ বলে কাজের চেয়ে ছোট করে দেখ্‌বে এটা আমার সহ্য হবে না। রাত্রিতে পৃথিবী দেখা যায় না কিন্তু তবু পৃথিবীটা থাকে তেমনি আমার কুঁড়েমির মধ্যে আমার কাজটা অদৃশ্য হয়ে যায় কিন্তু তবু সে থাকে। যা হোক্‌ এ সব কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কেননা তর্ক করার চেয়ে তর্ক না করাতে অনেক পরিশ্রম বাঁচে— এই পরিশ্রম বাঁচানোর উপায় বের করাই আমার এখনকার সর্ব্বপ্রধান ভাবনা।

আজ এই পর্য্যন্ত। নীচের ঘরে বিস্তর লোক এসে জমেচে— তাদের প্রধান কাজ হচ্চে আমাকে কাজ করতে না দেওয়া এবং কুঁড়েমি করতেও বাধা দেওয়া। ইতি ২রা অগ্রহায়ণ ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

এত অল্পেতেই তুমি আড়ি করতে প্রস্তুত, এটা ত বড় ভয়ের কথা। বিশেষত আমার মত অক্ষম এবং কুঁড়ে এবং ঢিলে লোকের পক্ষে। আমার যদি তোমার বয়স থাক্‌ত তা হলে দেখ্‌তুম চিঠি লেখায় তুমি কেমন আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌তে। তা হলে উল্টে আমিই বেশ পেট ভরে মনের সুখে তোমার সঙ্গে আড়ি করতে পারতুম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের কথাটা একবার শোনো— তুমি জন্মাবার কয়েক বৎসর পরেই আমি পঞ্চাশ বছর পার হলুম— তাতেও একরকম চলে যাচ্ছিল, তারপরে তুমি আমাকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করবার কয়েক মাস পরেই আমার শরীর গেল বিগ্‌ড়ে। শরীরকে দোষ দিই নে— অনেকদিন ওকে অনেক খাটিয়েচি— যত বেতন দিয়েচি তার চেয়ে কাজ আদায় করেচি ঢের বেশি— সুতরাং আজ ও যখন কাজে জবাব দিতে চায় তখন ওকে দোষ দিই নে। দোষ আসলে তোমার। তুমি সেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেইচ তখন না হয় আর ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেই জন্মাতে। ঢিলেমি করে তুমিই করলে দেরি অথচ আড়ি করবার বেলায় তোমারই উৎসাহ। যাই হোক তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না, তোমার আড়ি বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করব। আড়িকে বড় ভয় করি।

ডাক্তার আমাকে বলেচে খুব ভাল মানুষের মত চুপচাপ করে পড়ে থাক্‌তে। কিন্তু মন যে দুরন্ত। কে আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে চুপ করিয়ে রাখ্‌বে বল দেখি? তোমার বয়সী এবং তোমার চেয়ে ছোট বয়সের বন্ধু যারা আমার আছে, যারা আমাকে গল্প করে শান্ত করিয়ে রাখ্‌তে পারত

তাদের কাউকে ত হাতের কাছে পাই নে। তুমি ত আছ কাশিতে— আবার, আর কেউ কেউ আছে একেবারে সমুদ্রের ও পারে। তোমার চেয়ে বড় বয়সের বন্ধু যারা আমার আছে তারা নিজেরা বিশেষ কিছু বল্‌তে চায় না, আমাকেই বলাতে চায়, আমার ডাক্তার এইসব লোকেদের সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করে দিয়েচে। বলেচে ওরা যে দেশে আছে সে দেশ থেকে যেন বাসা উঠিয়ে চলে যাই। কোথায় যাই বল দেখি? তোমার ওখানে যাব মনে করি— কিন্তু যেতে হলে, শুধু কেবল মনে করা ছাড়াও আরো অনেক কিছু করতে হয়— এই জন্যেই পৃথিবীতে যেটুকু করা হয় তার চেয়ে করা হয় না অনেক বেশি। তোমার কাছে বসে গল্প শুন্‌ব সেটাও হয়ত আমার জীবনে সেই অসংখ্য না-হওয়ার ফর্দ্দের মধ্যে পড়ল। কিন্তু বলা যায় না— কোন্‌দিন হয়ত তোমাদের বাড়ির দরজায় দমাদ্দম ঘা মেরে চীৎকার করে বল্‌ব— "রাণু, রাণু, রবিবাবু এসেচে।" ইতি
৮ ফাল্গুন ১৩২৪

তোমার প্রাচীন বন্ধু
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭
১৫ এপ্রিল ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোমাদের বইয়ে বোধহয় পড়ে থাক্‌বে, পাখীরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যায়। আমি হচ্চি সেই জাতের পাখী। মাঝে মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড়

করে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেব বলে আয়োজন করচি।[১] যদি কোনো বাধা না ঘটে তাহলে বেরিয়ে পড়ব। পশ্চিম দিকের সমুদ্র পথ আজকাল সকল সময়ে পারের দিকে পৌঁছিয়ে দেয় না তলার দিকেই টানে[২]— পূর্ব্ব দিকের সমুদ্র পথ এখনো খোলা আছে— কোন্‌দিন হয়ত দেখ্‌ব সেখানেও যুদ্ধের ঝড় এসে পৌঁচেছে। যাই হোক তোমার কাশীর নিমন্ত্রণ যে ভুলেচি তা মনে কোরো না; তুমি আয়োজন ঠিক করে রেখো, আমি কেবল একবার পথের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া জাপান আমেরিকা প্রভৃতি দুটো চারটে জায়গায় নিমন্ত্রণ চট্‌ করে সেরে নিয়ে তারপরে তোমার ওখানে গিয়ে বেশ আরাম করে বস্‌ব— আমার জন্যে কিন্তু ছাতু কিম্বা রুটি, অড়রের ডাল এবং চাট্‌নির বন্দোবস্ত করলে চল্‌বে না, তোমাদের মহারাজ নিশ্চয়ই খুব ভাল রাঁধে কিন্তু তুমি নিজে স্বহস্তে শুক্‌তনি থেকে আরম্ভ করে পায়স পর্য্যন্ত যদি রেঁধে না খাওয়াও তাহলে সেই মুহূর্ত্তেই আমি— কি করব এখনো তা ঠিক করিনি— ভাব্‌ছিলুম না খেয়েই সেই মুহূর্ত্তেই আবার অষ্ট্রেলিয়ায় চলে যাব— কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখ্‌তে পার্‌ব কিনা একটু একটু সন্দেহ আছে সেই জন্যে এখন কিছু বল্লুম না। কিন্তু রান্না অভ্যাস হয় নি বুঝি? তাই বল! কেবলি পড়া মুখস্থ করেচ? আচ্ছা অন্তত এক বছর সময় দিলুম— এর মধ্যেই মার কাছে শিখে নিয়ো। তাহলে সেই কথা রইল। আপাতত আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। বাক্সগুলো গুছিয়ে ফেলা চাই। আমি খুব ভাল গোছাতে পারি। কেবল আমার একটু যৎসামান্য দোষ আছে— প্রধান প্রধান দরকারী জিনিসগুলো প্যাক করতে প্রায়ই ভুলে যাই— যখন তাদের দরকার হয় ঠিক সেই সময়ে দেখি তাদের আনা হয় নি। এতে বিষম অসুবিধা হয় বটে কিন্তু গোছাবার ভারি সুবিধে হয়— কেন না বাক্সর মধ্যে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়— আর বোঝা কম হওয়াতে রেলভাড়া জাহাজভাড়া অনেক কম লাগে। দরকারী জিনিস না নিয়ে অদরকারী জিনিস

সঙ্গে নেবার আর একটা মস্ত সুবিধে হচ্চে এই যে, সেগুলো বারবার বের করাকরির দরকার হয় না— বেশ গোছানোই থেকে যায়— আর যদি হারিয়ে যায় কিম্বা চুরি যায় তাহলেও কাজের বিশেষ ব্যাঘাত কিম্বা মনের অশান্তি ঘটে না। আজ আর বেশি লেখবার সময় নেই— কেননা আজ তিনটের গাড়িতেই রওনা হতে হবে। গাড়ি ফেল্ করবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আমার আছে— কিন্তু সে ক্ষমতাটা আজকে আমার পক্ষে সুবিধার হবে না। অতএব তোমাকে নববর্ষের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে আমি টিকিট্ কিন্‌তে দৌড়লুম। ইতি ২ বৈশাখ ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

১০ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

ইষ্টেশন থেকে ফিরে এসেচি।[১] স্নান হয়ে গেছে, খাওয়াও হয়ে গেছে। একটা বেজে গেল। তুমি আমাকে খাওয়ার পর শুতে বলে গেছ— বিছানা তৈরি আছে। শুতে যাবার আগে সেই আমার কোণের ডেস্কের সাম্‌নে বসে তোমাকে দু লাইন লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হয়েচি। ছেলেরা কে আমার ডেস্কের উপর দুটো কেয়াফুল রেখে গিয়েচে— আর, একটি ফুলের তোড়া দিয়ে গেচে হরিশ মালী।[২] আজ তাকে বারণ করে দিয়েছিলুম বলে সেই সাদা পাতা দিয়ে তোড়া সাজায় নি। লাল জবা এবং সাদা টগর ফুলে বেশ দেখ্‌তে হয়েচে। তোমরা গেছ চলে, আর এখান থেকে আমাদের হাওয়া নিয়ে গেছ— গাছের একটি পাতা নড়চে না— গরমে সমস্ত আকাশটা

যেন পৃথিবীর উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে ধুঁকচে। অথচ রোদ্দুর নেই, আকাশ মেঘে ঢাকা,— জগৎটাকে মনে হচ্চে যেন জ্বরের রোগী, কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। তার পরে যেমন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে তেমনি হয়ত বিকেলের দিকে বৃষ্টিবাদল হয়ে গরম কেটে যাবে। আমি কোথায় আছি কি করচি তা তুমি অনায়াসে কল্পনা করতে পারবে— কিন্তু এতক্ষণে গাড়ির মধ্যে তুমি যে কি করচ তা ঠিক চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চি নে— তোমার চিঠি পেলে জান্‌তে পাব।[৩] আশা করচি লক্ষ্মী মেয়েটি হয়ে, খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে, গল্প করে, গাড়ির জান্‌লা থেকে পাহাড়গুলো দেখে তোমার দিন কেটে যাচ্চে। দেখ, তুমি আমাকে বলে দিয়েচ বলে আমি যথাসাধ্য খেয়েচি, শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করব কিন্তু ঘুম হবেনা, বিকেলে আজ কোনোমতেই চেঁচিয়ে বক্তৃতা করবনা— রাত্রে সকাল সকাল শুতে যাব। কিন্তু তুমি যদি বেশ করে খেয়ে দেয়ে মোটাসোটা হয়ে না ওঠ, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে। যাবার আগে তোমাকে একটু গান শুনিয়ে দিয়ে শুতে যাই—

ওদের সাথে মেলাও যারা চরায় তোমার ধেনু—
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।"

ইতি ২৬ আষাঢ় ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেয়াফুলের কেশর চিঠির মধ্যে একটু একটু পাবে।

৯

১৪ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

মনে করেছিলুম কাল তোমার চিঠি পাব। কালই পাওয়া উচিত ছিল। পোষ্ট্ আপিসে কালই নিশ্চয় এসেছিল, কিন্তু পোষ্ট্‌মাষ্টারের অসুখ করেচে বলে পশ্চিমের ডাক কাল আমাদের দেয় নি আজ সকালে দিয়ে গেছে। তোমাদের পথের খবর জানবার জন্যে আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল। আজ সকালে তোমার চিঠি[১] পেয়েই বুঝেছিলুম কার চিঠি। তখন কি করছিলুম সেই কথাটা আগে বলি। কাল রাত্তির যখন আড়াইটা তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে— তার পরে বরাবর বৃষ্টি চল্‌চেই— চারদিকের মাঠে জল বয়ে যাচ্চে, আকাশ জলে ঝাপ্‌সা, মেঘের কোথাও বিচ্ছেদ নেই। এমন ঘোর বাদলায় ক্লাস হওয়া অসম্ভব, তাই এই সুযোগে এণ্ড্রুজ সাহেব[২] তার খাতা নিয়ে সকালেই আমার কাছে হাজির, তাকে "ঘরে বাইরে" তর্জ্জমা করে যাচ্চি সে লিখে নিচ্চে।[৩] আমি যে-কোণে বসে লিখে থাকি সে-কোণ আজ অন্ধকার, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাঁট আস্‌চে, তাই আমার শোবার ঘরের পূব দিকের জান্‌লার কাছে বসে বকে যাচ্চি আর এণ্ড্রুজ একটা তাকিয়ার উপরে চড়ে বসে লিখ্‌চে এমন সময় ডাকের চিঠি এল। কাল তোমার চিঠি না পেয়ে ভাবছিলুম আজ সকালে চিঠি পাবনা, দুপুরের ডাকে পাব— তাই চিঠিগুলো না দেখেই পাশে ফেলে রেখে কাজ করতে লাগলুম,— কিন্তু একটু বাদেই মনটা উতলা হল— একবার লেফাফার উপর চোখ বুলিয়ে দেখ্‌তেই তোমার হাতের অক্ষর চোখে ঠেক্‌ল। এণ্ড্রুজকে বল্লুম, "একটু রোস, আমার চিঠি পড়ে নিই।" তোমার চিঠিখানি পড়লুম। রেলের পথে তোমার মন যে খারাপ হয়ে ছিল সেই পড়ে আমার বড় কষ্ট হল।

তুমি মনে কোরো না আমি বুঝতে পারি নি। সেই বুধবারের দিন[৪] যখন তোমার গাড়ি চল্‌ছিল, আর আমি যখন চুপটি করে আমার কোণে, এবং সন্ধ্যাবেলায় আমার ছাদে বসে ছিলুম তখন তোমার কষ্ট আমাকে বাজ্‌ছিল। আমি মনে মনে কেবল এই কামনা করছিলুম, যে বাদলের উপরে সূর্য্যের আলো পড়ে যেমন ইন্দ্রধনু তৈরি হয়, তেম্‌নি করে তোমার অশ্রুভরা কোমল হৃদয়ের উপরে স্বর্গের পবিত্র আলো পড়ুক, সৌন্দর্য্যের ছটায় তোমার জীবনের এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পূর্ণ হয়ে উঠুক্। যাঁর আশীর্ব্বাদে আমাদের জীবনের সমস্ত সুখ ফুলের মত বিকশিত হয় এবং সমস্ত দুঃখ ফলের মত কল্যাণপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাঁরই আশীর্ব্বাদ তোমার জীবনের সকল সুখ দুঃখকেই সৌন্দর্য্যে এবং মঙ্গলে সার্থক করে তুলুক্। আমি আমার জীবনকে তাঁরই কাজে উৎসর্গ করেছি— সেই উৎসর্গকে তিনি যে গ্রহণ করেচেন তাই মাঝে মাঝে তিনি আমাকে নানা ইসারায় জানিয়ে দেন— হঠাৎ তুমি তাঁরই দূত হয়ে আমার কাছে এসেচ, তোমার উপরে আমার গভীর স্নেহ তাঁর সেই ইসারা। এই আমার পুরস্কার। এতে আমার কাজে দ্বিগুণ উৎসাহ হয়, আমার ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, আমার মনের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভগবান তাঁর সেবককে খুসি হয়ে মাঝে মাঝে দেবতার অমৃত পান করিয়ে দেন— তাতে আমাদের শক্তি বেড়ে যায়, অবসাদ দূর হয়। সেই অমৃত তিনি তোমাকে দান করুন— তুমি নূতন শক্তিতে জীবনকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাও— তোমার চারিদিককে আনন্দময় কর।

এন্ড্রুজকে বল্লুম, আজ আর লেখা চল্‌বে না। তাকে বিদায় করে দিয়ে আমার সেই কোণ্‌টিতে ফিরে এসে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসেছিলুম। ইতিমধ্যে বৃষ্টি ধরে গেল। তখন মনে পড়ল, কাল এক দল গুজরাটি অতিথি আমাদের এখানে আশ্রয় নিয়েচেন। সঙ্গে তাঁদের মেয়েরা আছেন, ছোট ছোট ছেলেও অনেকগুলি। তার মধ্যে চারটি ছেলেকে তাঁরা এখানে

ভর্ত্তি করে দিয়ে যাবেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তাঁরা বেণুকুঞ্জ* পরিপূর্ণ করে আছেন। আমাকে তাঁদের সঙ্গে হিন্দী ভাষায় আলোচনা করতে হয়েছিল। ভাগ্যে, তুমি কিম্বা শান্তি* সেখানে উপস্থিত ছিলেনা তাই "কে" এবং "কো" এবং "নে" এবং হুয়ী হৈ ও হুয়া হৈএর উপর দিয়ে নির্ম্মমভাবে আমার জাপানী চটিসমেত হু হু করে চলে গেলুম— ওঁরাও দেখলুম প্রসন্ন মনে সয়ে গেলেন, পুলিসে খবর দিতে ছুটলেন না। বোধ হয় ক'দিন তোমাদের কাছে সেইসব হিন্দী দোঁহা শুনে শুনে আমার অনেকটা উন্নতি হয়েছে— সেইজন্যে আজ এইসব ভারী ভারি [য] জোয়ান মাড়োয়ারীদের সঙ্গে আধঘণ্টাকাল অনর্গল হিন্দী বলেও একটা ফৌজদারী বাধ্‌ল না, শান্তিনিকেতনের শান্তি এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। এমনি করে হিন্দী ভাষার উপরে ঘোরতর দৌরাত্ম্য করে যখন ফিরে আসচি এমন সময় এণ্ড্রুজ সাহেব আবার তার "ঘরে বাইরে" এবং খাতাপত্র হাতে আমার পিছন পিছন আমার ঘরে এসে হাজির হল। বেলা দুপুর পর্যন্ত তাকে সেই "ঘরে বাইরে" মুখে মুখে তর্জ্জমা করে যেতে হল। তার পরেও তার যাবার ইচ্ছা ছিলনা— আমি নেহাৎ জোর করে উঠে নাইতে চলে গেলুম। আজ নাইতে তাই অনেক বেলা হয়ে গেল। কিন্তু আজ যে রকম বাদলা, আজকের দিনে বেলার ঠিক পাওয়া যায় না। আকাশের ঘড়িতে সূর্য্যদেব কাঁটার মত পূব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সময় ভাগ করে চলেন— কিন্তু আজ সেই আকাশ-ঘড়ির ডালা বন্ধ— সেইজন্যে মনে হচ্চে যেন সময় চল্‌চেনা। আজ খাওয়ার পরে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। এই চিঠি লেখা শেষ না করে আমি শুতে যাবনা— এতে তুমি যদি রাগও কর তাহলেও আমি মানবনা। আমি তোমার নিয়ম প্রায় সবই মেনে চল্‌চি। সেই অবধি আমি সভা করিনি— সকাল সকাল শুতে যাই। বিকেলে oat meal এর সঙ্গে মিলিয়ে একটু করে দুধও খেতে আরম্ভ করেচি। চুল নিজে নিজে যতটা পারি আঁচড়াই কিন্তু সে ভাল হয় না। এর মধ্যে একদিন কেবল ছেলেরা

আমার কাছে আমার কবিতার ব্যাখ্যা শুন্‌তে এসেছিল, তোমার কথা মনে করে আমি কেবল একটা কবিতা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলুম, সেও জোরে নয়; তারা আর একটা যখন শুন্‌তে চাইলে আমি তাদের কথা শুন্‌লুম না; তাই ত সেদিন আমি শ্রান্ত হইনি। আমি যেমন তোমার কথা শুনেচি, তোমাকেও তেমনি আমার কথা শুন্‌তে হবে। ভাল করে দুধ খেয়ে বিশ্রাম করে আগামী পূজোর ছুটির মধ্যে বেশ মোটা সোটা হয়ে (দিনুবাবুর[৮] মত অতটা নয়) আস্‌তে হবে। তোমাকে শ্রীমতী রাণু যাতে না বলি এই তোমার ইচ্ছে— কিন্তু আমাকে যদি "প্রিয় রবিবাবু" বলে চিঠি লেখ তাহলে আমি তোমাকে শ্রীমতী রাণু দেবী পর্য্যন্ত বল্‌তে ছাড়ব না। তুমি আমাকে যদি রবিদাদা বল তাহলে আমার নালিশ থাক্‌বে না। তুমি তোমার এক সন্ন্যাসী দাদাকে বশ করেছিলে, এখন তাঁর পদটা তিনি আমার উপর দিয়ে গেছেন— তোমার সম্ভাষণে তুমি সে কথা যদি বিস্মৃত হও তাহলে চল্‌বে না। তুমি আমাকে বেশ বড় চিঠি লিখেচ, আমিও বড় চিঠি লিখ্‌লুম। তোমার কাছে অঙ্কে এবং ভূগোলে আমি পারব না, কিন্তু তাই বলে লেখায় তোমার কাছে যদি হার মানি তাহলে আমার নোবেল প্রাইজ ফিরিয়ে নেবে। আশাকে[৮] শান্তিকে ভক্তিকে[৯] আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ো। তোমার বাব্‌জাকে[১০] বোলো তাঁর শরীর কেমন থাকে আমাকে যেন জানান্ এবং পূজোর ছুটিতে কিম্বা তার পূর্ব্বেই আমাকে যেন দর্শন দেন, শুধু একলা নয় সে কথা তাঁকে না বল্লেও বুঝবেন। তুমি যেমন বৌমার[১১] উপরে আমার ভার দিয়ে গেছ তেমনি ছুটি পর্য্যন্ত আমি তোমার মা'র[১২] উপর তোমার ভার দিলুম, সেটা তিনি যেন মনে রাখেন; এবার যখন তিনি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বেন তখন তোমাকে এবং আমাকে ওজন ক'রে পরীক্ষায় বৌমা প্রথম হন কি তোমার মা প্রথম হন তার বিচার হবে। এই পরীক্ষায় বাংলাদেশের গৌরব বেশি কিম্বা কাশীর গৌরব বেশি আমাদের উভয়ের গুরুত্ব অনুসারে সেইটে স্থির হয়ে যাবে। এত

বড় দায়িত্ব যখন তোমার উপরে আছে তখন যত পার দুধ খেতে ছেড়ো না। আমার এমন অবস্থা হবে কে দিনবাবু কে রবিবাবু হঠাৎ চেনা শক্ত হবে। ইতি ৩০ আষাঢ় রবিবার। ১৩২৫

তোমার

রবিদাদা

১০

১৫ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

একটা রঙীন কাগজ জোগাড় করেচি। মনে কোরোনা বৌমা দিয়েচেন। তাঁকে যখন বলি, "মনে আছে ত রাণু তোমাকে রঙীন চিঠির কাগজ আনিয়ে দিতে বলে দিয়েচে," তিনি কেবল হাসেন। তুমি ত জানই এই রকম সব গম্ভীর কথা বল্‌তে গেলে তিনি কোনোমতেই গম্ভীরভাবে নেন না। ঐ জন্যে তাঁর আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েচি। যাই হোক্ এই কাগজের রং যদি তোমার পছন্দ হয় তা হলে কিছুদিন চালাতে পারব। কিন্তু তোমার চিঠির কাগজের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না।

আমার জন্যে মন কেমন করতে দিয়োনা রাণু। আমি তোমার কথা কত ভাবি। তুমি সুখে থাক্‌বে, সকল রকমে তোমার কল্যাণ হবে এই ইচ্ছা আমার মনে জেগে আছে। আমার মন ত তোমার কাছেই আছে। আমার মধ্যে যা ভাল তাই তোমার ভাল কামনা করচে। যিনি অন্তর্যামী হয়ে নিয়ত তোমার অন্তরে আছেন— তিনিই আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদকে

এবং আনন্দকে তোমার মধ্যে পৌঁছিয়ে দিচ্চেন।

পথের থেকে যে চিঠি লিখেছিলে সেটা কাল পেয়েছিলুম। তার উত্তর দিয়েচি। আজ যেটা কাশী থেকে লিখেচ[1] সেটাতে ছোট বউ গাবলোর বউ[2] প্রভৃতির মঙ্গল সংবাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েচি। তোমাদের কাশীতে গরম; এখানেও মন্দ গরম না। যদিও কাল খুব ঘন মেঘ করে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ রৌদ্রে সব শুকিয়ে গেছে।

এতক্ষণ দুপুর বেলায় তোমার পরামর্শমত খাবার পর অনেকক্ষণ বিছানায় পড়ে কাটিয়েচি। খানিকটা ঘুমিয়েচি খানিকটা বই পড়েচি। এমন সময় আমার ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজ্‌ল। অমনি ধড়ফড় উঠে পড়ে আমার সেই কোণে এসে তোমার চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। আজ আমার ডেস্কের উপরকার ফুলদানীতে কেবল কদম ফুল সাজিয়ে দিয়ে গেচে— আমি চেষ্টা করব তোমাকে তার একটা ছবি এঁকে দিতে। এর আগের চিঠিতে তুমি আমাকে যে সব ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলে তার জবাব দেওয়া হয়নি— ভাল হোক্ আর মন্দ হোক্ এবার তার জবাব দিতে হবে।

একটা কথা তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিই। তুমি বলেচ কেউ আমাকে বয়েস জিজ্ঞাসা করলে সাতাশ বল্‌তে।[3] আমার ভয় হয় পাছে লোকে সাতাশ শুন্‌তে সাতাশি শুনে বসে, আর সেইটেই সহজে বিশ্বাস করে বসে। সেইজন্যে, তুমি যদি রাজি থাক তাহলে আমি আর একটা বছর কমিয়ে বল্‌তে পারি। কেন না ছাব্বিশ বয়েসে ওর থেকে আর কিছু ভুল করবার ভাবনা থাকেনা।

এইবার আমার বই লেখবার সময় এল। সেই সুভাকে[4] নিয়ে পড়তে হবে। পিগ্‌মিদের গল্পটার থেকে লেখা শেষ করেচি।[5] আমার সেই পঞ্চম ক্লাস মনে আছে ত? কেমন মজা? সেই সমরেশ[6] জ্যোতিষ[7] আভাসরা[8] তেমনি করেই সবাই মিলে চীৎকার করে— রাস্তা থেকে তাদের গলা শুন্‌তে পাওয়া যায়। ঐ ক্লাসটা আমার বেশ লাগে। থার্ড ক্লাসের ছেলেরাও

ক্রমে ক্রমে একটু উন্নতি করচে। ইতি ৩১ আষাঢ় ১৩২৫

শুভানুধ্যায়ী

রবিদাদা

১১

১৭ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

আজ সকালে বুধবারের উপাসনা ছিল। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেই তোমার চিঠি পেলুম। আমি ছোট চিঠি লিখেচি বলে তুমি নালিশ করেচ। কিন্তু একটা কথা তোমার ভেবে দেখা উচিত— তুমি বোলপুর ষ্টেশন থেকে বরাবর কাশী পর্য্যন্ত প্রায় চব্বিশ ঘন্টা ধরে নতুন নতুন দৃশ্যের ভিতর দিয়ে নানা কথায় তোমার চিঠি ভরেচ— আর আমি বেচারা চুপ করে সেই একটি কোণে বসে এমন কি লিখ্‌তে পারি যা তুমি জাননা। আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত হচ্চে, শোবার ঘর থেকে কোণের ডেস্ক, কোণের ডেস্ক থেকে ক্লাস, ক্লাস থেকে নাবার ঘর, নাবার ঘর থেকে খাবার ঘর, খাবার ঘর থেকে শোবার ঘর, শোবার ঘর থেকে কোণ, কোণ থেকে ছাদ, ছাদ থেকে আবার শোবার ঘর। এ সমস্তই তোমার জানা। আজ এখন সকাল নটা বেজেচে। আমার সাম্‌নে ফুলদানীতে বেলফুল, জবাফুল এবং একরকম বিলিতি হল্‌দে ফুলে তোড়া বেঁধে দিয়েচে। লাল সাদা এবং হল্‌দেতে মিলে বেশ দেখতে হয়েচে। আমার ডান পাশের শেল্ফের উপর ছেলেরা একটা কেয়া ফুল রেখে দিয়েচে তারই গন্ধে আমার কোণ ভরে গিয়েচে।

আর লাবু[১], লাবুকে মনে আছে?— লাবু একটা ছোট রজনীগন্ধার মালা গেঁথে এনে দিয়েছে— সেটাও আমার ডেস্কের উপরে পড়ে আছে। পিঠের কাছে পশ্চিমের জান্‌লা খোলা আছে, সেইখান থেকে ঝুর ঝুর করে হাওয়া আস্‌চে। এই পশ্চিমের হাওয়া কোথা থেকে আস্‌চে বল ত রাণু? কাশী থেকে কি? কাশীতে এখন তোমাদের খুব গরম এবং গুমট— বোধ হয় কিচ্ছু হাওয়া নেই। কিন্তু তুমি যে মাঝে মাঝে আমার কথা ভাবচ তোমার সেই ভাবনার হাওয়া বোধ হয় আমার পশ্চিমের জান্‌লা দিয়ে ঢুকে আমাকে পাখা করচে।

তুমি এখন অল্প অল্প করে পড়চ, তিনবার করে দুধ খাচ্চ শুনে খুসি হলুম। বৌমার মত মোটা হওয়া চাই। আর যাই কর, হিন্দী দোঁহা মুখস্থ করা একেবারে ছেড়ে দিয়ো— সেই তোমাদের "ছল ছল ছৈল সুছাম" এম্‌নি শুক্‌নো, যে ওর পরে তিন বাটি দুধ খেয়েও কিছু সুবিধে হবেনা। বরঞ্চ তোমার লটিকে তোমার হিন্দী গুরুজির কাছে ভর্ত্তি করে দিয়ো। ওর গাল দুটো এত ফুলো, যে, দোঁহা আওড়াতে আওড়াতে যদি একটুখানি রোগা হয় তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। ভক্তিকে বোলো তার বন্ধুর দল মোটের উপর ভালই আছে, কেবল দিনু বাবুর কাল জ্বর হয়েছিল আজ কুইনীন্‌ খেয়ে চুপ করে বিছানায় শুয়ে আছে। হাঁ, একটা কথা মনে রেখো— সন্ধ্যাবেলায় রোজ তোমাকে গান কিম্বা সেতার কিম্বা বীণা কিম্বা ঐ রকম কিছু একটা শিখ্‌তে হবে। বাব্‌জাকে বোলো একটা উপায় করে দিতে।[২]

ইতি ১লা শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

১২

২১ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

আজ একদিনে তোমার দুখানি চিঠি পেলুম। আজ অন্য অনেক দরকারী চিঠি জমেছিল, তার কতকগুলো লিখেচি আরও কতকগুলো লিখ্‌তে হবে— তারই মাঝখানে তোমাকে লিখে নিচ্চি, নইলে হয় ত আজকের ডাকে চিঠি যাবে না। তোমাদের ওখানে এবং এখানে ডাকওয়ালাদের সকলের প্রায় অসুখ হয়েচে, তাই ডাক যেতে আস্‌তে এত দেরি হয়। আমাদের ইস্কুলেও সেই জ্বর[১] এসে পড়েচে। কিন্তু অন্য জায়গার মত তেমন প্রবল নয়। অনেক ছেলেই এখন হাঁসপাতালে গেছে। আজ দুপুর বেলায় আর শুতে গেলুমনা— গেলে তুমি আজ আর আমার চিঠি পেতে না— কাজেই তোমার আর রাগ করবার জো নেই। কিন্তু একটা সুবিধে এই যে আজ তেমন গরম নয়। কাল সন্ধ্যাবেলায় স্তরে স্তরে গাঢ় নীল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল— তখন নীচের সেই পূবদিকের বারান্দায় সাহেবে আমাতে মিলে খাচ্ছিলুম— আমার আর সব খাওয়া হয়ে গিয়ে যখন চিঁড়ে ভাজা খেতে আরম্ভ করেছি এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে সোঁ সোঁ করে হাওয়া এসে সমস্ত কালো মেঘ আকাশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিছিয়ে দিলে। কতদিন পরে এই সজল মেঘ দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল— যদি আমি তোমাদের কাশীর কোনো হিন্দুস্থানী মেয়ে হতুম (সেই যার কুঁজ আছে আর যে নাইয়ের নীচে কাপড় পরে তার মত নয়) তাহলে কজরী গাইতে গাইতে সেই শিরীষ গাছের দোলাটাতে দুল্‌তে যেতুম। কিন্তু এণ্ড্রুজ কিম্বা আমি, আমাদের দুজনের কারো, হিন্দুস্থানী মেয়ের মত আকৃতি প্রকৃতি কিম্বা চালচলন নয়, তা ছাড়া সে কজরী গান জানে না,

আমিও যা জান্‌তুম ভুলে গেছি। তাই দুজনে মিলে উপরে আমার ছাদের সাম্‌নেকার বারান্দায় এসে বস্‌লুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘন বৃষ্টি নেমে এল— জলে বাতাসে মিলে আকাশময় তোলপাড় করে বেড়াতে লাগ্‌ল— আমার ছাতের সাম্‌নেকার পেঁপে গাছটার লম্বা পাতাগুলোকে ধরে ঠিক যেন কানমলা দিতে লাগ্‌ল। শেষকালে বৃষ্টি প্রবল হয়ে গায়ে যখন ছাঁট লাগ্‌তে আরম্ভ হল, তখন আমার সেই কোণটাতে এসে আশ্রয় নিলুম। এমন সময় চোখ ধাঁদিয়ে কড়কড় শব্দে প্রকাণ্ড একটা বাজ পড়ল। আমার মনে হল বাগানের মধ্যেই কোথাও পড়েচে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে দেখি হরিচরণ পণ্ডিতের[২] বাসার দিকে ছেলেরা ছুট্‌চে। সেই বাড়িতেই বাজ পড়েছিল। তখন তাঁর বড় মেয়ে উনানে দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ছেলেরা দূর থেকে দেখ্‌তে পেলে চালের উপর থেকে ধোঁয়া উড়তে আরম্ভ হয়েচে। তারা ত সব চালের উপর চড়ে জল জল করে চীৎকার করতে লাগ্‌ল। ছেলেরা কুয়ো থেকে জল ভরে ভরে এনে চালের আগুন নিবিয়ে ফেল্লে। ভাগ্যে, হরিচরণের বাড়ির কাউকে আঘাত লাগে নি। কেবল হরিচরণের মেয়ের হাত একটু পুড়ে ফোসকা পড়েছিল। কিন্তু সব চেয়ে ভাল লেগেছিল আমার ছেলেদের উদ্যোগ দেখে। তাদের না আছে ভয় না আছে ক্লান্তি। নির্ভয়ে হাতে করে করে চালের খড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতে লাগল, আর দূরের কূয়ো থেকে দৌড়ে দৌড়ে সার বেঁধে জল ভরা ঘড়া এনে উপস্থিত করতে লাগল। ওরা যদি না দেখ্‌ত এবং না এসে জুট্‌ত তা হলে মস্ত একটা অগ্নিকাণ্ড হত। এম্‌নি করে কাল অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত ঝড়বাদল হয়ে আজ অনেকটা ঠাণ্ডা আছে। আকাশ এখনো মেঘে লেপে আছে— হয়তো আজও বিকেলে একচোট বৃষ্টি সুরু হবে। যাই হোক্ আজ তেমন গরম নেই বলে আজ দুপুর বেলায় বিশ্রাম না করলেও তেমন ক্লান্তি হবে না। বৌমা এখনো আমাকে রঙীন কাগজ আনিয়ে দেন নি তাই আমার সেই ছোট কাগজেই লিখ্‌চি। কিন্তু যাই বল

এঁকে তাই বলে ছোট কাগজ বলে না— এ ত লম্বায় প্রায় আমার সমান, আবার আমার অক্ষরগুলো ছোট ছোট, প্রায় ভক্তির মত। এ কাগজে আর জায়গা নেই অতএব আর একটা কাগজে একটা ছবি এঁকে দিই। আমার এ ছবির দাম কিন্তু পাঁচ ডলারের চেয়ে অনেক বেশি, তা আগে থাক্‌তে বলে রেখে দিলুম। ইতি ৫ শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

১৩

[২৩ জুলাই ১৯১৮]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

আজ সকালে তোমার একখানি চিঠি পেলুম। তখনও আমি পড়াতে যাই নি। আমার সেই কোণে বসে বসে পাঠ তৈরি করছিলুম। তার আগেই আমার সকালের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। কি কি খেয়েছিলুম, শুন্‌বে? একটা বড় ফজ্‌লি আম— সেটা একটা ছোটখাটো কুম্‌ড়ো বল্লেই হয়। তার পরে একটা ডিম এবং রুটি টোস্‌ট্‌। তার পরে তিনটে কলার সঙ্গে মেখে দু চামচ স্যানাটোজেন— তার পরে এক পেয়ালা দুধ। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি আমার এই খাওয়ার সঙ্গে তোমার সকালের খাওয়ার তুলনা হয়? তুমি ত পাঁচটার সময় উঠেই স্কুলে দৌড়ও— কি খাও, কখন্‌ খাও, এবং কতটুকুই বা খাও? তবু আমার খাওয়া নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া কর? দেখ্‌চি তোমার ঝগড়াটে স্বভাব।[১] আমার ভারি ভয় হচ্চে পাছে আমার লটি[২] তোমার সঙ্গে থেকে তোমার মত মেজাজ পেয়ে বসে। এখন ত সে বেচারা ভালমানুষ, মুখে কথাটি নেই— হয় ত কোন্‌ দিন,

আমি তার মত গাল রং করি নে বলে আমার সঙ্গে আড়ি করতে যাবে। আমি নিতান্ত ভালোমানুষ, তোমাদের সঙ্গে দুধ খাওয়া নিয়ে ঝগড়া করে আমি কোনোদিন পেরে উঠবনা। বিশেষত তুমি আবার বেশ একটি দলের লোক পেয়েচ। আচ্ছা বৌমাকে জিজ্ঞাসা কোরো দেখি তিনি ক'সের করে দুধ রোজ খেয়ে থাকেন। তিনি যে আমার নামে তোমার কাছে লাগালাগি করেন, তিনি বলুন দেখি, তিনি কি আমাকে রঙীন চিঠির কাগজ আনিয়ে দিয়েচেন? চুল আঁচড়ানোর নিন্দা করা সহজ কিন্তু নিজে নিজে কি ভাল করে চুল আঁচড়ানো যায় সে কথাটাও ভেবে দেখা উচিত। যাক্ এই সব সামান্য কথা নিয়ে মাথা গরম করব না। তুমি আমাকে ছবি আঁকা শিখ্‌তে বলেচ কিন্তু বৌমা কি সহজে শেখাবেন? তাঁর নিজের বিদ্যা অত সহজে কি দিয়ে ফেল্‌বেন? তবু তুমি তাঁকে একবার চিঠিতে অনুরোধ করে দেখো, যদি তোমার কথা শোনেন। দেবল[৩] তোমার সেই মূর্ত্তি একটু আরম্ভ করেই মাদ্রাজে চলে গিয়েছিল। বেচারা তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দেখে, তার সেই মাটির তালটা পড়ে আছে কিন্তু সজীব মানুষটি কোথায় পালিয়েচে। দেবল ভেবেছিল, তুমি থাক্‌বে, তোমার মূর্ত্তি শেষ করে দিয়ে কোনো একটা মন্দিরে তার প্রতিষ্ঠা করবে— এখন হতাশ হয়ে আবার মাদ্রাজে ফিরে যাবার উদ্যোগ করচে।— কাল সন্ধ্যাবেলায় এখানে ছোটখাট একটু ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টি যত হয়েচে তার চেয়ে বাতাসের দমকা বেশি প্রবল ছিল। আজ দুপুর বেলা আবার খুব রৌদ্র প্রখর হয়ে উঠেচে। এই একটু আগেই ভাত খেয়ে উঠে এসেচি। এখনো শুতে যাই নি। তোমার বর্ষশেষ[৪] কবিতা ভাল লাগে লিখেচ, ওটা আমারো ভাল লাগে— ওটা তুমি সমস্তটা মুখস্ত বলতে পারলে বেশ হবে। সেদিন এখানকার ছেলেরা ছাতে আমার কাছে পুরীতে "সমুদ্রের প্রতি"[৫], আর "জীবনদেবতা"[৬] এই দুটো কবিতার মানে বুঝিয়ে নিয়ে গেচে। জীবন দেবতার মানে বোঝাতে অনেকক্ষণ লেগেছিল— ঠিক বুঝেচে কি না জানিনে। ছবি আর একটা

আঁকতে হবে? আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু খারাপ হলে হেসো না। ইতি ৭ই শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

১৪

২৫ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

পর্শু তোমাকে ঝগড়াটে বলে নিন্দে করে চিঠি লিখেচি আর তুমি আজকের চিঠিতে তার প্রমাণ দিয়েচ। আমি যদি তোমার মত হতুম তাহলে শ্রীমতী রাণু সুন্দরী দেবী বলে তোমাকে আজ সম্ভাষণ করতে পারতুম, তাহলে তুমি জব্দ হতে। কিন্তু নিতান্ত ভালমানুষ বলে আমি তোমার পাল্‌টা জবাব দেবার চেষ্টা করি নি। একে ত সময় খুবই কম, তার পরে আমার বয়স হয়ে গেল— কিছু না হোক্ ত সাতাশের কম হবে না— আমার কি ঝগড়া করে সময় খরচ করার মত অবকাশ আছে। তোমার মত বয়স হলে কি জানি কি করতুম, হয় ত বা ভীষণ রাগের মাথায় শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীমতী বলে তোমার নামের গোড়ায় একেবারে পাঁচটা শ্রী বসিয়ে দিতুম— রাণুর বদলে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া নাম দিতুম— কিন্তু যতই রাগ করি নে কেন কখনই তোমার নামে ভুলেও চারটে শ্রী বসাতুম না। যাই হোক্ সকল কথাতেই দিনুবাবুর মত কিম্বা বৌমার মত হাস্‌লে চল্‌বে না, মাঝে মাঝে দুই একটা গম্ভীর কথাও বল্‌তে হবে। কেননা আমার

সঙ্গে তুমি ভাবই কর আর আড়িই কর আমি মানুষটা যা তা তোমাকে পুরোপুরি চিনে নিতে হবে। এটুকু জেনো আমার মধ্যে একটা জায়গা আছে যেখানটা খুবই গম্ভীর— তাকে যদি তোমার পছন্দ না হয় তা হলে আমি যেখানে সত্য সেখানে তুমি আমাকে জান্‌তেই পারবেনা. আমি যে কেবল মাত্র ভাল করে চুল আঁচড়িয়ে লাল কাপড় পরিয়ে, তিন বাটি দুধ খাইয়ে, সকাল সকাল ঘুম পাড়িয়ে দেবার মানুষ, তা ঠিক নয়। তা যদি হত তাহলে বৌমা আমাকে এতদিনে সাজিয়ে গুজিয়ে তাঁর ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে হাওয়া খাইয়ে বেড়াতেন। কিন্তু বৌমা যে তা করেন না তার একটি মাত্র কারণ, তিনি আমাকে কেবল বাইরের দিক থেকে দেখেন নি— তিনি জানেন আমার মধ্যে একটি গম্ভীর মানুষ আছে। আমাকে আমার যে ঠাকুর এই পৃথিবীতে পাঠিয়েচেন— আমি তাকে অন্তরের সঙ্গে মানি, সব চেয়ে বড় বলে মানি— আমি জানি তিনি আমাকে তাঁরই কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েচেন— আমার সমস্ত হাসি ঠাট্টা গল্প গান সুখ দুঃখের মধ্যে এই কথাটি আমি ভুলি নে। যখনি ভুলি তখনি ছোট হয়ে যাই, তখনি দুঃখ পাই। তাঁকে প্রণাম করে তাঁর হাত থেকে আমি আমার জীবনের সমস্ত দান গ্রহণ করতে চাই। আমি যে এখানে শিশুদের সেবা করি, তার কারণ, এদের সেবা করে আমি আমার ঠাকুরের যথার্থ পূজো করতে পারি— নইলে শুধু মন্ত্র পড়ে পূজো হয় না। এই যে আমার ঠাকুরঘরের আমি, এই যে পূজারি আমি, এই আমিই সত্য আমি। আমার এই ভিতরকার আমির সঙ্গে সংসারে যাদের সম্বন্ধ না হয় তারা আমার যত আত্মীয় হোক্ সে সম্বন্ধ সত্য হয় না— সেই জন্যে সে সম্বন্ধ দুদিনেই ভেঙ্গে যায়। তুমি ছেলেমানুষ, তুমি আমার এই দিকের কথা হয় ত সম্পূর্ণ বুঝবে না, কিন্তু যখন তুমি আমার এত কাছে এসেছ তখন এই কথাটিকে তোমার বুঝতে চেষ্টা করতে হবে— নইলে আমাকে নিয়ে কেবল দুঃখ পেতে থাক্‌বে। আমি তোমাকে অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি, সেই স্নেহ যদি

কেবলমাত্র তোমাকে আদর করে মিষ্টি কথা বলে পরিতৃপ্ত হয় তাহলে তোমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। আমার কাছ থেকে তোমাকে বড় কথা সত্য কথা শুন্‌তে হবে, ভাবতে হবে— আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ এত সত্য হবে যে, আমার ঠাকুরের উপাসনা আমার ঠাকুরের কাজ তোমার চিন্তায় বাক্যে এবং আচরণে সার্থক হবে। তুমি যে অধীর হবে, অসহিষ্ণু হবে, তুমি যে কেবল নিজের চিন্তা নিয়ে থাক্‌বে, তোমার চারদিকের লোককে প্রাণপণে খুসি করবার চেষ্টা না করবে এ হলে আমার মনের সুরের সঙ্গে তোমার মনের সুরের মিল হবে না। তুমি যদি সবল চিত্ত নিয়ে নিঃস্বার্থ ভাবে প্রসন্ন মুখে সংসারের কল্যাণের দ্বারা আমার ঠাকুরকে প্রত্যহ প্রণাম না করতে পার তাহলে সেটা আমাকে খুব কষ্ট দেবে এবং লজ্জা দেবে। ভালবেসে আমার কাছে যারা এসেচে আমি যদি তাদের সব দিক থেকে ভাল করে তুল্‌তে না পারি, তারা যদি মনে জোর না পায়, তারা যদি পবিত্র হয়ে আপনাকে ভুলে সকলের কল্যাণ করতে না শেখে তাহলে আমি নিজেকে অপরাধী বলে মনে করি— ভয় হয় আমার ভিতরে বুঝি এমন কিছু অভাব ত্রুটি আছে যে জন্যে আমার কাছে এসে কেউ কোনো সত্যকার উপকার পায় না। আমি বড় আশা করে আছি যে, আমার মধ্যে যা কিছু ভালো এবং সত্য তাই দিয়ে আমি তোমার জীবনকে উন্নত উজ্জ্বল সুন্দর পবিত্র এবং সেবাপরায়ণ করে তুল্‌ব। যদি তোমার জীবনে কিছুমাত্র ভার, বা দুঃখ, বা ক্ষুদ্রতা বা ব্যর্থতা আনি তাহলে আমার অনুতাপের সীমা থাক্‌বে না। অবশ্য সংসারে দুঃখ পেতেই হবে, এবং দুঃখের আগুনে আমাদের মনের পাপ পুড়ে গিয়ে আমরা বড় হই অতএব তুমি কখনো দুঃখ পাবে না এমন কথা মনে করতে পারি নে— কিন্তু সেই দুঃখকে খুব উদারভাবে বহন করতে পার, সেই দুঃখকে মাণিকের মত তোমার বুকের হার করে রাখ্‌তে পার সেই শক্তি ঈশ্বর তোমাকে দিন্। সেই শক্তি মানুষ কি করে পায়? যত নিজেকে ভুল্‌তে পারে, যত সবাইকে

আপন করতে পারে, যত ক্ষুদ্র ঈর্ষা বিদ্বেষ থেকে তার মন মুক্ত হয়— যতই সকলের সঙ্গে আপন আনন্দ ও ঐশ্বর্য্য ভাগ করে ভোগ করতে শেখে। তা যে না করতে পারে দুঃখ তাকে পুড়িয়ে মারে— সে সোনার মত উজ্জ্বল হয় না, তৃণের মত দগ্ধ হয়। পৃথিবীতে মানব জীবন নিয়ে এসেছি— কিছুদিনের মেয়াদ— সেই কয়েকটি বছরকে সুন্দর করে শুভ্র করে ঠাকুরের পায়ে নির্ম্মল ফুলের মত দিয়ে যেতে পারি এই কামনাকেই সব চেয়ে বড় করে রাখ। রাণু, তুমি যদি আমাকে যথার্থ ভালবাস তাহলে আমার ভাল কাজে তোমার আনন্দ যেন হয়, আমি সকলকেই ভালবাসি এতেই যেন তোমার মন প্রসন্ন হয়, যারা আমার কাছে আস্‌বে তারা আমার কাছ থেকে যেন প্রীতির দান ও পূজার নির্ম্মাল্য নিয়ে যেতে পারে এই তোমার যেন কামনা হয়। আমাকে ছোট করে দেখো না, ছোট করতে চেয়ো না— তাহলেই, আমার সঙ্গ পেয়ে আমার স্নেহে আমার আশীর্ব্বাদে তুমিও বড় হয়ে উঠ্‌বে, তোমার মন তাহলে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হবে। আমি ভিতরের সৌন্দর্য্যকে সব চেয়ে ভালবাসি— যাদের স্নেহ করি তাদের মধ্যে সেই সৌন্দর্য্যটি দেখবার জন্যে আমার সমস্ত মনের তৃষ্ণা। মেয়েদের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যটি যখন দেখা যায় তখন তার আর তুলনা কোথাও থাকে না। কিন্তু মেয়েরা যখন কেবল সংসারে জড়িয়ে থাকে, সব তা'তেই কেবল আমার করে, নিজের ছোট ছোট সুখ দুঃখকে নিয়ে পৃথিবীর সব মহৎলক্ষ্যকে আড়াল করে রাখে, যখন তারা বড় চেষ্টার বাধা, বড় তপস্যার বিঘ্ন হয়ে কেবল মাত্র লোকের মন ভোলানোকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে রাখে তখন বাইরে তাদের যতই সৌন্দর্য্য থাক্ সে সৌন্দর্য্য মায়া মাত্র, সে সৌন্দর্য্য সত্য নয়। আমি এই আশা করে আছি আমার কাছ থেকে তুমি এই কথাটি অন্তরের সঙ্গে বুঝে নেবে— তাহলেই তুমি আমাকে সত্য করে বুঝ্‌তে পারবে। আমাকে যদি সত্য করে বুঝতে না পার তাহলে আমাকে সত্য করে ভালবাস্‌তেও পারবে না— তাহলে

আমাকে তুমি তোমার খেলার পুতুল করে রাখ্‌তে চাইবে। কিন্তু আমার বিধাতা ত আমাকে পুতুল করে পাঠান নি— আমার কণ্ঠে তিনি গান দিয়েচেন, আমার হৃদয়ে তিনি প্রেম দিয়েচেন, আমার জীবনে তাঁর আদেশ আছে, আমার ললাটে তাঁর আশীর্ব্বাদ আছে, আমাকে তিনি সংসারের খেলায় ভুলিয়ে রাখ্‌তে দিলেন না— আমাকে তিনি তাঁর কাজে ডেকেচেন— পৃথিবীময় তাঁর কাজে আমাকে ফিরতে হবে— সেইসব কাজে যারা আমার সহায় তারাই আমার আত্মীয় তারাই আমার বন্ধু, আমার ঠাকুর তাদেরই কাছে আমাকে চিরদিন রাখবেন। ইতি ৯ শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

১৫

২৭ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

তোমার শেষ চিঠিটাতে তুমি ভয়ঙ্কর রাগ করেছিলে তাই আমি ঠিক করেছিলুম আমার সময় থাক্ আর না থাক্, তোমার চিঠি পাই আর না পাই তোমাকে আজ চিঠি লিখ্‌ব। কিন্তু রাগ করলে কি মানুষকে পুরস্কার দিতে হয়? পর্শু দিন আমি তোমাকে মস্ত বড় একটা গম্ভীর চিঠি লিখেচি— চার পাতা ভরিয়ে— কেননা তুমি আমাকে সকল রকমে যদি না জান তা হলে আমার সঙ্গে তোমার ব্যবহার ঠিক হবে কেন? আমাকে ভাল করে সত্য করে বুঝতে চেষ্টা কোরো, রাণু— যেখানে আমি সকল লোকের,

যেখানে আমি সংসারের কাজ করবার ক্ষেত্রে, সেখানে আমাকে যদি না চিন্‌তে পার তাহলে আমার কাছে এসেও আমার আসল কাছে আসা হবেনা। আবার আমি খুব ছোটও বটে, তোমাদের সমান বয়স; এমন কি তোমাদের চেয়ে ছোট,— তুমি আমাকে দেখ্‌বে শুন্‌বে খাওয়াবে পরাবে সাজাবে আমার সে বয়সও আছে। তাই সন্ধ্যাবেলায় মোড়ায় বসে তুমি যখন আমার কাছে নানা বিষয়ে গল্প বলে যাও সে আমার খুব মিষ্টি লাগে। সন্ধ্যা আকাশের তারা ঈশ্বরের খুব বড় সৃষ্টি, কিন্তু সন্ধ্যায় ছাদে রাণুর মুখের কথাগুলি তার চেয়ে কম বড় নয়— ঐ তারার আলো যেমন কোটি কোটি যোজন দূরের থেকে আস্‌চে— তেমনি তোমার হাসি গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হয় যেন কত জন্ম জন্মান্তর থেকে তার ধারা সুধাস্রোতের মত বয়ে এসে আমার হৃদয়ের মধ্যে এসে জম্‌চে। কিন্তু রাণু, ঈশ্বরের যে সব দান, খুব বড়, খুব সুন্দর, তার সম্বন্ধে আমাদের যেন কৃপণতা না থাকে— সামান্য টাকাকড়ি তালা বন্ধ করে পাহারা দিয়ে রাখবার কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আলোর মত, তা একজায়গায় জ্বাললে সে জায়গাকে ছাড়িয়ে চলে যায়। মাধুর্য্যের উৎস যখন আমাদের মনে একবার উৎসারিত হয় তখন আমাদের চারিদিককে তা মধুময় করে তোলে। তখন সেই ভালবাসায় আমরা সকলকেই বেশি করে ভালবাসি; তাতে আমাদের সহ্য করবার শক্তি বাড়ে, ত্যাগের শক্তি বাড়ে, কাজের শক্তি বাড়ে। আমার খুব দুঃখের সময়েই তুমি আমার কাছে এসেছিলে;— আমার যে মেয়েটি সংসার থেকে চলে গেছে সে আমার বড় মেয়ে, শিশু কালে তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি ; তার মত সুন্দর দেখ্‌তে মেয়ে পৃথিবীতে খুব অল্প দেখা যায়। কিন্তু সে যে মুহূর্ত্তে আমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল সেই মুহূর্ত্তেই তুমি আমার কাছে এলে— আমার মনে হল যেন এক স্নেহের আলো নেবার সময় আর এক স্নেহের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।[১] আমার কেবল নয়, সেদিন যে তোমাকে আমার

ঘরে আমার কোলের কাছে দেখেচে তারই ঐ কথা মনে হয়েচে। তাকে আমরা বেলা বলে ডাক্‌তুম, তার চেয়ে ছোট আর এক মেয়ে আমার ছিল তার নাম ছিল রাণু, সে অনেকদিন হল গেছে।[২] কিন্তু দুঃখের আঘাতে যে অবসাদ আসে তা নিয়ে ম্লান হতাশ্বাস হয়ে দিন কাটালে ত আমার চল্‌বে না। কেননা আমার উপরে যে কাজের ভার আছে ; তাই আমাকে দুঃখ ভোগ করে দুঃখের উপরে উঠ্‌তেই হবে। নিজের শোকের মধ্যে বদ্ধ হয়ে এক মুহূর্ত্ত বৃথা কাটাবার হুকুম আমার নেই। সেই জন্যেই খুব বেদনার সময় তুমি যখন তোমার সরল এবং সরস জীবনটি নিয়ে খুব সহজে আমার কাছে এলে এবং এক মুহূর্ত্তে আমার স্নেহ অধিকার করলে তখন আমার জীবন আপন কাজে বল পেলে— আমি প্রসন্ন চিত্তে আমার ঠাকুরের সেবায় লেগে গেলুম। কিন্তু তোমার প্রতি এই স্নেহে যদি আমাকে বল না দিয়ে দুর্ব্বল করত, আমাকে মুক্ত না করে বদ্ধ করত তাহলে আমার প্রভুর কাছে আমি তার কি জবাব দিতুম? আমি এই বিদ্যালয়ে যে সেবার মধ্যে তাঁর সেবার ভার নিয়েচি সে এবার আমার পক্ষে আগেকার চেয়ে আরো অনেক সহজ হয়েচে— আমার হৃদয়ের গ্রন্থি আরো অনেক আল্‌গা হয়েচে— তাই আমি দ্বিগুণ স্নেহে এবং আনন্দে এবার আমার বিদ্যালয়ের কাজে লেগেছি। তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে আমার ঠাকুর আমাকে আরো বেশি বল দিয়েচেন। তুমিও তেমনি বল পাও আমি কেবল এই কামনা করচি।— তোমার ভালবাসা তোমার চারদিকে সুন্দর হয়ে বাধামুক্ত হয়ে ছড়িয়ে যাক্‌— তোমার মন ফুলের মত মাধুর্য্যে পবিত্রতায় পূর্ণ বিকশিত হয়ে তোমার চতুর্দ্দিককে আনন্দিত করে তুলুক্‌। নিজেকে অকারণে পীড়িত করো না এবং অন্যকে পীড়িত কোরোনা— নিজেকে নম্রতার রসে পরিপূর্ণ করে সেবার কাজে সুমধুর করে তোলো। আমি তোমাকে যখন পারব চিঠি লিখ্‌ব— কিন্তু চিঠি যদি লিখ্‌তে দেরি হয়, লিখ্‌তে যদি নাও পারি তাতেই বা এমন কি দুঃখ। তোমাকে যখন স্নেহ

করি তখন চিঠির চেয়েও আমার মন তোমার ঢের বেশি কাছে আছে— আমার আশীর্ব্বাদ তোমাকে নিয়ত সঙ্গ দিচ্চে। তোমাকে স্নেহ করি বলে আশা শান্তি ভক্তিকে যদি আমি স্নেহ করতে না পারতুম তাহলে তোমার প্রতি স্নেহ আমার পক্ষে বড় লজ্জার কারণ হত। তাদের আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। আজও কথায় কথায় চিঠিটা বড় হয়ে উঠল। কিন্তু আর সময় নেই, কাগজে জায়গাও বেশি নেই, তাই এইখানে শেষ করি। আজ ছবি আঁকব ভেবেছিলুম কিন্তু চিঠি লিখতে লিখতে সময় ফুরিয়ে এল। ইতি ১১ই শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

১৬

২৮ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু,

যদিও তোমার চিঠি পাই নি তবু লিখ্‌চি, যখন দেনা পাওনার হিসাব করবে তখন এ কথাটা মনে রেখো। তুমি আজ কাল খুব পড়ায় লেগে গেছ কিন্তু আমি যে চুপচাপ করে বসে থাকি তা মনে কোরো না। আমার কাজ চল্‌চে। সকালে তুমি ত জানো সেই আমার তিন ক্লাসের পড়ানো আছে তার পরে স্নান করে খেয়ে, যে দিন চিঠি লেখবার থাকে চিঠি লিখি, তারপরে বিকেলে খাবার খবর দেবার আগে পর্য্যন্ত ছেলেদের যা পড়াতে হয় তাই তৈরি করে রাখি। তারপরে সন্ধ্যার সময় ছাতে চুপচাপ বসে থাকি— কিন্তু এক একদিন ছেলেরা আমার কাছে কবিতা শুন্‌তে

আসে। তার পরে অন্ধকার হয়ে আসে— তারাগুলিতে আকাশ ছেয়ে যায়— দিনুর ঘর থেকে ছেলেদের গলা শুন্‌তে পাই— তারা গান শেখে— তারপরে গান বন্ধ হয়ে যায়— তখন আদ্যবিভাগের[১] ছেলেদের ঘর থেকে হার্ম্মোনিয়ম এবং বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গানের ধ্বনি উঠ্‌তে থাকে। —ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হয় তখন ছেলেদের ঘরের গানও বন্ধ হয়ে যায়, কেবল ঝিঁঝির ডাক আর ব্যাঙের ডাক শোনা যায়— আর সমস্ত নিস্তব্ধ; রামানন্দ বাবুদের[২] ঘরের বারান্দা থেকে একটি লণ্ঠনের আলো দেখা যায়, আর দূরে গ্রামের রাস্তার ভিতর দিয়ে দুই একটা আলো চল্‌চে দেখ্‌তে পাই। তারপরে সে আলোও থাকে না— কেবলমাত্র আকাশ জোড়া তারার আলো। তারপরে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে ঘুম পেয়ে আসে তখন আস্তে আস্তে উঠে শুতে যাই। তারপরে কখন এক সময়ে আমার পূর্ব্বদিকের দরজার সমুখে আকাশের অন্ধকার অল্প অল্প ফিকে হয়ে আসে— দুটো একটা শালিখ পাখী উস্‌খুস্‌ করে ওঠে, মেঘের গায়ে গায়ে সোনালি আভা ফুটে ওঠে, খানিক বাদেই সাড়ে চারটের সময় আদ্য বিভাগে ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজ্‌তে থাকে— অমনি আমি উঠে পড়ি। মুখ ধুয়ে এসে আমার সেই পূর্ব্বদিকের বারান্দায় পাথরের চৌকির উপর আসন পেতে উপাসনায় বসি— সূর্য্য ধীরে ধীরে উঠে তার আলোকের স্পর্শে আমাকে আশীর্ব্বাদ করে। আজকাল সকাল সকাল খেতে যেতে হয়— কেননা সাড়ে ছটার সময় আশ্রমের সমস্ত বালকবৃন্দ আমরা বিদ্যালয়ের সাম্‌নের মাঠে একত্র হই— একটি কোন গান হয়ে তারপরে আমাদের স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়। ঠিক প্রথম ঘন্টায় আমার ক্লাস নেই। কিন্তু সেই সময়ে আমি আমার কোণটাতে এসে একবার পড়াবার বই ও খাতাপত্র দেখে শুনে ঠিক করে নিই— তারপরে আমার কাজ। এই আমার দিনরাতের হিসাব তোমার কাছে দিলুম। কেমন শান্তিতে দিন চলে যায়। এই ছেলেদের কাজ করতে আমার খুব ভাল লাগে। কেননা ওরা জানেনা যে, আমরা

ওদের জন্য যে কাজ করি তার কোনো মূল্য আছে। ওরা যেমন অনায়াসে সূর্য্যের কাছ থেকে তার আলো নেয় আমাদের হাত থেকে তেমনি অনায়াসে সেবা নেয়। হাটে দোকানদারের কাছ থেকে যেমন করে দরদস্তুর করে জিনিস কিন্‌তে হয় তেমন করে নয়। এরা যখন বড় হবে, যখন সংসারের কাজে প্রবেশ করবে তখন হয়ত মনে পড়বে— এই আশ্রমের প্রান্তর, এখানকার শালের বীথিকা, এখানকার আকাশের উদার আলো এবং উন্মুক্ত সমীরণ এবং প্রতিদিন সকালে বিকালে এখানে আকাশতলে নীরবে বসে ঠাকুরকে প্রণাম। আর সেই সঙ্গে আমাদের কথাও মনে পড়বে। যদি এই স্মৃতিতে ওদের মনকে উদার করে, চরিত্রকে সবল করে, ওরা যদি এই বিশ্বজগৎকে এবং নিজের জীবনকে বড় করে দেখ্‌তে পারে তাহলেই আমার পুরস্কার হল— তাহলে ওদের সার্থক জীবনের মধ্যে আমার জীবনও সার্থক হল, ওদের পূজার মধ্যে আমার পূজা, ওদের প্রণামের মধ্যে আমার প্রণাম রয়ে গেল। ইতি ১২ শ্রাবণ ১৩২৫।

তোমার রবিদাদা

১৭

৩১ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

রাণু

আজ বুধবার। আজ সকালে মন্দিরের কাজ শেষ করে যখন আমার সেই কোণের বিছানায় এসে বসেচি এমন সময় তোমার চিঠিখানি পেলুম। আমার মনে হল ঠিক সময়ই যেন তোমার চিঠি এল। এ চিঠি কাল এসে পৌঁছবার কথা ছিল বোধহয় পোষ্টমাষ্টারের কুঁড়েমিতে কাল পাইনি—

আজ উপাসনার পরে পেলুম, তাই আমার সেই সকাল বেলাকার উপাসনার সুরের সঙ্গে মিলিয়ে তোমার চিঠিখানি পড়লুম। তোমার চিঠি আমার ভারি মিষ্টি লাগ্‌ল। আমার ভয় ছিল পাছে আমার বড় চিঠিটা ঠিক বুঝতে না পেরে তোমার মনে আঘাত লাগে। কিন্তু তুমি যে ঠিক বুঝতে পেরেচ এবং আমার সব কথা মনের মধ্যে নিতে পেরেচ এতে আমার খুব আনন্দ হয়েচে। তোমার জীবনটি প্রতিদিন মধুর হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে— তোমার জীবনের উপর তোমার ঠাকুরের আশীর্ব্বাদের অমৃত বর্ষিত হয়ে প্রতিদিন তোমাকে সুধাপূর্ণ করতে থাক্‌বে— সংসারকে তুমি সুন্দর করবে, সকলের তুমি কল্যাণ করবে, অপরাধীকে ক্ষমা করবে, দুর্ব্বলকে দয়া করবে, দুঃখ তাপ নৈরাশ্য সহ্য করবার শক্তি লাভ করবে এবং সমস্ত জীবন মনকে নম্র করে ঠাকুরকে প্রণাম করতে পারবে আমি একান্ত মনে এই কামনা করচি। তোমাকে আমি খুব ভালবাসি— তোমার পক্ষে সেই ভালবাসা যেন সম্পূর্ণরূপে ভাল হয়, যেন সকল দিক দিয়ে ভাল করে, নইলে আমার দুঃখের আর অন্ত থাক্‌বে না। আমার মধ্যে যেটুকু ভাল, যেটুকু সত্য সেইটুকু যদি তোমাকে দিতে পারি তাহলে সে আমারই লাভ— কেননা তাতে আমার ভাল আমার সত্য তোমার মধ্যে গিয়ে আরো বড় হয়ে যাবে তাতে তুমি আমাকে আমার ঠাকুরের সেবা করার কাজে সাহায্য করতে পারবে— আমার মধ্যে যা ছোট আছে, যা মন্দ আছে তা এম্‌নি করেই ক্ষয় হতে থাক্‌বে।

কাল আমার পঞ্চমবর্গের[১] ছেলেরা দুপুর বেলায় এসে ধরে পড়ল, তাদের খাওয়াতে হবে। দেখেচ আমার এই বাঁদরগুলো কি লোভী! তোমার কাশীর বাঁদরের চেয়ে এদের লোভ। সমরেশ হচ্চে ওদের সর্দ্দার। সেই আমার কাছে এসে দরখাস্ত করলে। আমি বল্লুম আচ্ছা বেশ। তাই সন্ধ্যাবেলায় আমার নীচের দক্ষিণের বারান্দায় বসে ওদের ভোজ হয়ে গেছে। ওদের ফরমাস ছিল লুচির। লুচি ডাল ছোকা চাট্‌নি যেমনি পাতে

পড়া অমনি কোথায় যে অদৃশ্য হতে লাগ্‌ল তার ঠিকানা পাওয়া গেল না— তার উপরে আম ছিল রসগোল্লা ছিল। ভাগিস্‌ সব শেষে বৃষ্টি এসে পড়ল, নইলে ওদের খাওয়া ফুরত না অথচ আমার খাবার ফুরিয়ে যেত। এই লোভী বাঁদরগুলোকে আমি খুব ভালবাসি। এরা ক্লাসে কি রকম চেঁচায় জান ত— এখনো সেই রকম চেঁচামেচি করে, সমস্ত শান্তিনিকেতন অশান্ত হয়ে ওঠে— আমার ক্লাসে ওরা মনে করে খেলা— এ ত পড়া নয়— আমি যেন ওদের খেলার সর্দ্দার। সত্যি আমি তাই— মনের ভিতরের দিকে আমার আর বয়স হল না— আমি সাতাশের চেয়েও কম— আমি জানি তাই তোমার ইচ্ছে করে আমাকে ছোট ছেলের মত সাজাতে, এবং যত্ন করতে, আদর করতে। ইতি ১৫ই শ্রাবণ ১৩২৫

শান্তিনিকেতন

তোমার রবিদাদা।

১৮

৩ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন,

কল্যাণীয়াসু

আজ দুপুর বেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে খানিকটা ঘুমচ্চি— খানিকটা জেগে আছি, খানিকটা চেয়ে চেয়ে আকাশ দেখ্‌চি এমন সময় তোমার চিঠি পেলুম। দিনগুলো আজকাল শরৎকালের মত সুন্দর হয়ে উঠেচে— আকাশে ছিন্ন মেঘগুলো উদাসীন সন্যাসীর [য] মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে,

আমলকীগাছের পাতাগুলিকে ঝরঝরিয়ে দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্চে, তার মধ্যে একটা আলস্যের সুর বাজ্‌চে, আর বৃষ্টিতে ধোওয়া রোদ্দুরটি যেন সরস্বতীর বীণার তারগুলি থেকে বেজে ওঠা গানের মত সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেচে। আমার ঠিক চোখের উপরেই সন্তোষ বাবুর[১] বাড়ীর সাম্‌নেকার সবুজক্ষেত রৌদ্রে ঝল্‌মল্‌ করে উঠেচে, আর তারই একপাশ দিয়ে বোলপুর যাবার রাঙা রাস্তাটা চলে গেছে ঠিক যেন একটি সোনালী সবুজ সাড়ির রাঙা পাড়ের মত। তোমরা যে অগস্ত্যকুণ্ডের মধ্যে রয়েচ সেখানে প্রকৃতিকে এত বড় করে বিচিত্র করে সুন্দর করে দেখ্‌তে পাও না। খুব ছেলেবেলা থেকেই এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার গলাগলি ভাব— তাই আমার জীবনের কতকালই নদীর নির্জ্জন চরে কাটিয়েচি। তারপরে কতদিন গেছে এখানকার নির্জ্জন প্রান্তরে। তখন এখানে বিদ্যালয় ছিল না, তখন শান্তিনিকেতনের বাড়ির গাড়ি বারান্দায় বসে খুব বৃহৎ একটি নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যেতে পারতুম,— রাত্রে ঐ বারান্দায় যখন শুয়ে থাক্‌তুম তখন আকাশের সমস্ত তারা যেন আমার পাড়াপড়সির মত তাদের জানলা থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি বল্‌ত, তাদের কথা শোনা যেত না কিন্তু তাদের মুখ চোখের হাসি আমাকে এসে স্পর্শ করত। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ভাব করার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সে আনন্দ দেয় কিন্তু কিছু দাবী করে না; সে তার বন্ধুত্বকে ফাঁসের মত করে বেঁধে ফেল্‌তে চেষ্টা করে না, সে মানুষকে মুক্তি দেয়, তাকে দখল করে নিতে চায় না। মানুষের লোভ আছে, আসক্তি আছে, নানারকম প্রবৃত্তি আছে, এই সেজন্য সে কেবলি অধিকার স্থাপন করতে ব্যস্ত; অন্য মানুষকে সে নিজের ভোগের জন্যে প্রয়োজনের জন্যে বশ করে বাধ্য করে বন্দী করে রেখে দিতে চায়। এই জন্যে অধিকাংশ স্থলেই তার ভালবাসা মোহের ভিতর দিয়ে দুঃখের সৃষ্টি করে এবং দুঃখ পায়— কেবলি সে আপনার অংশের হিসাব করে, এবং চোখে চোখে আগ্‌লে রাখ্‌তে চায়, এতে

কল্যাণ হয় না— এতে মানুষের ভয়ানক ক্ষতি হয়, বিপদ ঘটে এবং শোক দুঃখের কারণ জন্মে। সকলের চেয়ে বড় ভালবাসা হচ্চে সেই, যাতে মানুষ মানুষকে নিজের দিকেই টানে না, বড়র দিকে অগ্রসর করে, মুক্তির দিকে সাহায্য করে, ভালোর দিকে প্রেরণ করে আনন্দিত হয়। এই ভালবাসা দূরে থেকেও নিকটে থাকে এবং নিকটে থেকেও আচ্ছন্ন করে না। এই ভালবাসাই ঈশ্বরের দয়ারূপে মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের কাছে আসে— এবং স্পর্শমণির মত আমাদের মধ্যে যা কিছু মন্দ আছে মলিন আছে তাকে উজ্জ্বল করে নির্ম্মল করে তোলে— এতে সংশয় নেই, ক্লান্তি নেই, গ্লানি নেই। সংসারের কল্যাণের জন্যে এই প্রেম তোমার মধ্যে বিকশিত হোক্ এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ১৮ই শ্রাবণ, ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

১৯

৬ অগাস্ট ১৯১৮

ঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু,

আজ তোমার চিঠি পাব ঠিক মনে করি নি। কিন্তু যখন ডেস্কে বসে লিখ্‌চি এমন সময় ডাক হরকরা সেই হিন্দী কাগজ, (যাতে বিজ্ঞাপন সুদ্ধ পদ্যে লেখা হয়) আর তোমার চিঠি দিয়ে গেল। শান্তি যদি কাছে থাক্‌ত তাহলে কাগজটা তার হাতে দিয়ে ফেলতুম। তাছাড়া, এই সঙ্গে একটা হিন্দী চিঠিও পেয়েচি সেটাও তাকে দেখিয়ে নেওয়া যেত। ইন্দোরে কে

একজন মহিলাশ্রম স্থাপন করেচে সেই সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চেয়েচে— একে ত মহিলাশ্রম, তাতে হিন্দীতে পরামর্শ— কি করা যায় বল দেখি? আজ সকাল থেকে ঘন ঘোর মেঘ করে প্রবল বেগে বর্ষণ চল্‌চে, সকালে কোনো মাষ্টার তাই ক্লাস নেননি। কিন্তু থার্ড ক্লাসের[১] ছেলেদের আমি ছুটি দিতে পারলুম না— তাদের পড়া খুব শক্ত, মাঝে মাঝে ফাঁক পড়লে সমস্ত আল্‌গা হয়ে যাবে, তাই সেই বৃষ্টির মধ্যেও তাদের সংগ্রহ করে আনা গেল। পড়াতে পড়াতে বৃষ্টির বেগ বেড়ে উঠতে লাগ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়— আমার শোবার ঘরে ক্লাস হয়— ঘরে ছাঁট আস্‌তে লাগ্‌ল। সাসি বন্ধ করে পড়াতে লাগলুম— পাঠ শেষ হয়ে গেল কিন্তু বৃষ্টি শেষ হয় না— এই বৃষ্টিতে ওদের ত ছেড়ে দিতেও পারিনে। শেষকালে ওরা আমাকে ধরে পড়ল, মুখে মুখে একটা গল্প বানিয়ে ওদের শোনাতে। কিন্তু ভেবে দেখ আমার বয়স এখন সাতাশ বছর হয়েচে, এখন কি আমি ইচ্ছা করলেই অনর্গল গল্প বল্‌তে পারি? শেষ কালে আমি করলুম কি, একটা গল্পের কেবল গোড়া ধরিয়ে দিয়ে ওদের বল্লুম সেইটে একসপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ করে লিখে আন্‌তে। ওরা ত উৎসাহের সঙ্গে রাজি হল— কিন্তু ওদের গল্প যে কি রকম হবে তা কল্পনা করে আমার মনে কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ হচ্চে না। যাক্‌গে, ওরা ত সেই গল্প মাথায় নিয়ে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে চেঁচাতে চেঁচাতে ওদের ঘরে চলে গেল— আমি গেলুম স্নান করতে। স্নান করে খেয়ে এসে আজ তাকিয়ায় একটু হেলান দিয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু সমস্ত দিন ত কুঁড়েমি করে কাটাতে পারিনে। অন্যদিন হলে উঠে আমার তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ক্লাসের জন্যে পড়ার বই লিখ্‌তে বস্‌তুম— কিন্তু আজ বাদলার দিনে সেটা ভাল লাগল না, তাই 'বিদায়-অভিশাপ' টা[২] ইংরেজিতে তর্জ্জমা[৩] করতে বসে গিয়েছিলুম। বেশ ভালই লাগছিল। পাতা দুয়েক যখন শেষ হয়ে গেছে এমন সময় চিঠি হাতে করে ডাক হরকরার প্রবেশ। কাজেই এখন কিছুক্ষণের জন্যে দেবযানীকে অপেক্ষা করতে হচ্চে। একটা সুবিধা

হয়েচে, "ঘরে বাইরে" প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এখন যেটুকু বাকি আছে তাতে বেশি কিছু লেখবার নেই— কাজেই এখন বুধবারে আমি পূরো ছুটি পাব। কিন্তু এভুজের হাত থেকে ছুটি পেলেই কি আমার ছুটি আছে? বুধবারে আমার ক্লাস পড়ানো নেই বটে কিন্তু ক্লাসের পড়া তৈরি করা আছে, সুতরাং আমাকে আমার খাতাপত্র খুলে বস্‌তেই হবে। এক বৎসরের মত লেখা হয়ে গেলে তবে আমি ছুটি পাব। সে হতে অনেক দেরি— তত দিনে আমার বয়স অন্তত আটাশ হবেই— যদি না কোনোমতে, আমার সাতাশ্‌টাকে দম-না-দেওয়া ঘড়ির মত, একেবারে থামিয়ে রেখে দিতে পারি এখন বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু জলভারাবনত মেঘে আকাশ ভরে রয়েচে। এতদিন শ্রাবণের দেখা ছিল না, যেই বিশে একুশে হয়েচে অম্‌নি যেন কোনমতে ছুটতে ছুটতে শেষ ট্রেণটা ধরে হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। কম হাঁপাচ্চে না,— আর হাঁপানির বেগে আমাদের শালবন বিচলিত, আমলকিবন কম্পান্বিত, তালবন মর্ম্মরিত, বাঁধের জল কল্লোলিত, কচি ধানের ক্ষেত হিল্লোলিত, আর আমার জানলার খড়্‌খড়িগুলো ক্ষণে ক্ষণে খড়্‌খড়ায়িত। ইতি ২১ শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২০

[অগাস্ট ১৯১৮]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু,

তোমার চিঠি আজ এইমাত্র পেলুম। এই মাত্র বল্‌তে কি বোঝায় বলি। দুপুর বেলাকার খাওয়া হয়ে গেছে। সেই কোণ্‌টাতে তাকিয়া ঠেসান

দিয়ে বসেছিলেম। আর খানিকবাদে কাজে বস্‌তে হবে তাই রীতিমত বিছানায় শুইনি। আকাশ ঘন মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে— পশ্চিম দিক থেকে মাঝে মাঝে সোঁ সোঁ করে ঝোড়ো বাতাস বইচে। ইন্দ্রের ঐরাবতের বাচ্ছাগুলোর মত মোটা মোটা কালো কালো মেঘ আকাশময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে— মাঝে মাঝে গুরু গুরু গর্জ্জন শোনা যাচ্চে। সাম্‌নে সবুজ মাঠের উপরে মেঘলা দিনের ছায়া পড়েচে, নিবিড় স্নিগ্ধতার মধ্যে চোখ ডুবে গেছে। তোমাকে লিখ্‌তে লিখ্‌তে বৃষ্টি নেমে এল— বৃষ্টি একটুমাত্র দেখা দিলেই আমার এই বারান্দায় তার পায়ের শব্দ তখনি শোনা যায়। দূরে ভুবনডাঙার দিকে বাঁধের কাছে যে ঘন বনশ্রেণী দেখা যায় বৃষ্টির ধারায় সেটা একটু ঝাপ্‌সা হয়ে এসেচে— বনলক্ষ্মী যেন তার পাৎলা ওড়নাটাকে মুখের উপর ঘোমটা টেনে দিয়েচে। কটা বেজেচে ঠিক বল্‌তে পারিনে। আমার সাম্‌নের দেয়ালে যে ঘড়িটা ছিল, তাকে নির্ব্বাসিত করে দিয়েচি— ইদানীং তার ব্যবহার এমন হয়ে এসেছিল যে তাকে বিশ্বাস করবার জো ছিল না— সে চলতেও ভুল, বলতেও ভুল, তার পরামর্শ মত খেতে শুতে গিয়ে অনেকবার আমি ঠকেচি। তবু উপযুক্ত উপায়ে তাকে যে সংশোধন করা যেত না তা বল্‌তে পারিনে— কিন্তু সময়ের জন্য ঘড়ি; ঘড়ির জন্যে সময় নষ্ট করা আমার পোষায় না। যাই হোক আন্দাজে মনে হচ্চে একটা দেড়টা হয়ে গেছে, আর একটু বাদেই আমাকে একটা ক্লাস পড়াতে হবে। আজকাল প্রায় জন পনেরো গুজরাটি ছেলে এসেচে, কি করে তাদের বাংলা পড়াতে হবে সেইটে আজ আমি দেখিয়ে দেব— বৌমা আর শৈল[১], ওদের দুপুর বেলা একঘন্টা করে বাংলা পড়াতে রাজি হয়েচে।

ইতিমধ্যে এণ্ড্রুজ সাহেবের খুব অসুখ করেছিল। আমাদের ভাবনা হয়েছিল। একদিন ত রাত্রে তাঁর নিজের মনে হল তাঁর ওলাউঠো হয়েচে। সেই রাত্রি একটার সময় বর্দ্ধমানে ডাক্তার ডাক্‌তে লোক পাঠিয়ে দিলুম।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ওষুধ খেয়ে এতটা ভাল হয়ে উঠ্‌লেন, যে ভোরের বেলায় আবার টেলিগ্রাফ করে ডাক্তার আসা বন্ধ করে দিলুম। তুমি ত জানই আমার হাতের রেখায় লেখা আছে আমি ডাক্তারি করতে পারি। যাই হোক্ এখন সাহেব আবার সেরে উঠে পূর্ব্বের মতই চারিদিকে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্চেন। কিন্তু তিনি সেই যে জাপানি ঝোলা কাপড়টা পরতেন সেটা আজকাল আর দেখ্‌তে পাইনে।

বৃষ্টি একটুখানি হয়েই থেমে গেল। বাতাসটাও বন্ধ হয়েচে। কিন্তু পূবের দিকে খুব একটা ঘননীল মেঘ ভ্রূকুটি করে থম্‌কে দাঁড়িয়ে রয়েচে— এখনি বোধহয় বরুণ বাণ বর্ষণ করতে লেগে যাবে। আমরা আশ্রমে চারিদিকে অনেক নতুন গাছ্ লাগিয়েচি ভাল করে বৃষ্টি হলে ভালই হয়। কিন্তু আজকাল শরৎকালের মত হয়েচে— রৌদ্রে বৃষ্টিতে মিলে ক্ষণে ক্ষণে খেলা সুরু হয়ে গেছে। তোমরা গান বাজ্‌না শিখ্‌তে সুরু করেচ শুনে খুব খুসি হলুম। আজ আমার আর সময়ও নেই; কাগজও ফুরোলো, পাড়া জুড়োলো, বর্গি এলে ক্লাসে। [শ্রাবণ ১৩২৫]

তোমার রবিদাদা

২১

৯ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু,

তোমার চিঠিখানা কাল পাওয়া উচিত ছিল— কিন্তু ডাকঘরের বিভ্রাটে আজ সকালে পেলুম। পশ্চিম থেকে যে সব চিঠি আসে সে আমরা দুপুর

বেলায় পাই— তাই বোধ হচ্চে ডাকঘর কাল আমারি মত দুপুর বেলায় তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দুপুর বেলায় চিঠি পেলে সুবিধে হয় চিঠির জবাব দেওয়ার অনেকটা সময় পাওয়া যায়।

আজ সকালে আর একটু পরেই আমার ক্লাস বস্‌বে। কিন্তু আকাশ মেঘে অন্ধ হয়ে আছে। ছেলেরা প্রাণপণে প্রার্থনা করচে এখনি খুব যেন চেপে বৃষ্টি হয়, তাহলেই তাদের ক্লাস বন্ধ থাকে। কিন্তু বোধ হচ্চে বিধাতা আজ তাদের সঙ্গে কৌতুক করবেন, অর্থাৎ যেই তাদের ক্লাস হয়ে যাবে অম্‌নি খুব ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি আরম্ভ হবে। গেল চিঠিতে তোমাকে বিশ্বপ্রকৃতির কথা লিখেছিলুম। খুব যখন ছোট ছিলুম তখন থেকেই আমি, ঐ যে মহাকাশে আলোছায়ার রঙ্গ-ভূমিতে সৃষ্টির লীলা চল্‌চে, তাই দেখে দেখে মুগ্ধ হয়েচি। তখন ছেলেবেলায় ঠাকুরকে জানতুম না, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালবাসাতে আমার সুবিধা হয়েছিল। আমি তাই ঠাকুরের নাটমন্দিরের দিকে তাকাতে শিখেছিলুম। আমার আর এক সুবিধা হয়েছিল, আমার সেই ভালবাসার চর্চ্চা হয়েছিল যে ভালবাসায় মন আনন্দ পায় অথচ মুক্ত থাকে। সেই মুক্তি আমার মনকে টানে। আমি তাই বন্ধনে নিজেকে জড়াতে পারিনে। কেননা জড়াতে গেলেই বিশ্বের উপর এবং নিজের জীবনের উপর আমার অধিকার ছোট হয়ে আসে। মানুষকে আমি খুব একান্ত মনে ভালবাসতে পারি কিন্তু সে ভালবাসা যদি বন্ধন হয়, যদি আর সমস্তকে আচ্ছন্ন করে নিজেকেই সর্ব্বপ্রধান করে তোলে তাহলেই সে বন্ধন বারবার আমাকে ছিন্ন করতে হয়। বৃষ্টির জলকে গর্ত্ত কেটে জলাশয়ে ধরে রাখা যায় কিন্তু নদীর জলকে বাঁধ বেঁধে সম্পূর্ণ আট্‌কে ফেল্‌তে গেলে তার নদী-প্রকৃতিকেই ব্যর্থ করে দেওয়া হয়— এই জন্যে সে বাঁধন টেঁকে না— একদিন না একদিন সে বাঁধ প্রবল বেগে বিদীর্ণ হয়ে যায়। এ সংসারে আমার জীবনকে চল্‌তে হবে সাম্‌নের দিকে, সকলের দিকে এবং অনন্ত সাগরের দিকে; আমার উপরে এই হুকুম— এই জন্য

আমার সমুখের পথ খোলা থাক্‌বেই। এই জন্যে পৃথিবীতে অনেক বাঁধন আমার সাম্‌নে এল কিন্তু যেই তারা পথ রোধ করতে চাইল অম্‌নি তারা টিঁকল না— সংসারে আমার কত বন্ধন যে ছিন্ন হয়েছে তার আর সংখ্যা নেই। কেননা, আমার মধ্যে যে স্রোতের বেগ সে ত আমার নিজের বা আর কারো জিনিস নয়, এবং যে পথে আমাকে চল্‌তে হবে সে পথও আমার বা আর কারো নয়— আমার বিধাতার হুকুমকে যে-কেউ রোধ করতে যাবে তাকে হার মান্‌তে হবে। তাই চিরদিন আমার মনটা পথের পথিক— পান্থশালায় কখনো কখনো একরাত্রি দুরাত্রি থাকে আবার তাকে বেরতেই হয়— চুপ করে বসে বসে জিনিসপত্র গুছিয়ে বিছানাপত্র পেতে আদরে যত্নে আরামে নিজেকে বা আমাকে ভোগ করবার ছুটি তার নেই। দুর্ব্বল মন মাঝে মাঝে আরাম করতে চায় কিন্তু প্রবল আদেশ তাকে টেনে বের করে। এই জন্যে ঘর আমার নয়, সুখ আমার নয়, কোনো বিশেষ মানুষ আমার নয়। আমি তাঁরই যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের। এখনো তাঁর উপযুক্ত সঙ্গী হতে পারিনি— এখনো "ঘরে আধা বাইরে আধা"[১]— কিন্তু সে আধা একদিন হয়ত ঘুচ্‌বে। কিন্তু মোটের উপরে আমি মুক্তিকে ভালবাসি, এবং যে ভালবাসা মুক্ত আমি সেই ভালবাসাকে বিধাতার দান বলে গ্রহণ করি। আমার ভালবাসাও যদি মানুষকে মুক্তি না দিয়ে তাকে কেবল আমার মধ্যেই বদ্ধ করে ফেলে তাহলে তাতে আমি দুঃখ পাই, লজ্জা বোধ করি। আমার ভালবাসায় মানুষকে বড় করে দেবে, সকল মানুষের করে তুলবে, সংসারের মঙ্গলকর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করতে নিষ্ঠা দেবে, দুঃখ সহ্য করবার এবং আনন্দ বিতরণ করবার শক্তি দেবে এই আমি প্রার্থনা করি। ইতি ২৪ শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২২

১২ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু,

কাল এখানে খুব ধুমধাম ছিল। কেন বল দেখি। ক্ষিতিমোহনবাবুর[১] বড় মেয়ে রেণুকার[২] কাল বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সভা হয়েছিল সন্তোষবাবুদের বাড়িতে। ছেলেরা কাল খুব করে ওঁদের বাড়ি সাজিয়ে দিয়েছিল। ফুলপাতার ত কথাই ছিল না— তার উপরে ঘরে বারান্দায় নানা রঙের চীনে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিয়েছিল— এইগুলো সব জাপান থেকে এসেছিল। বৌমা কদিন থেকে পিড়িতে আল্‌পনা দিচ্ছিলেন— বেশ দুটো হাঁস এঁকে দিয়েচেন। মেয়েরা সকাল থেকে হুলু দিতে শাঁখ বাজাতে অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু আজকালকার মেয়েদের মুখে হুলুও বেরয় না শাঁখও বাজে না। যে রকম কাণ্ড দেখ্‌চি তাতে বোধ হচ্চে যুদ্ধটা শেষ হয়ে গেলে পর জাপান থেকে হুলু দেবার কল তৈরি করিয়ে আনাতে হবে। তুমি হুলু দিতে পার? এই বেলা সময় থাকতে Miss Edgar এর[৩] কাছে শিখে নিয়ো। বিয়ের আগে রেণুকাকে বোধহয় বৌমা সাজিয়ে দিয়েছিলেন— লাল বেনারসীর শাড়ি পরিয়ে বেশ ভাল করে সাজিয়েছিলেন— সন্ধ্যাবেলায় আমাকে যখন প্রণাম করতে এল আমি ত হঠাৎ চিন্‌তেই পারিনি। রাত্রে মোটর গাড়িতে চড়িয়ে বরকে শান্তিনিকেতন থেকে সন্তোষবাবুর বাড়ি নিয়ে গেল। তার আগে খুব বৃষ্টি হয়ে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল— ভয় হয়েছিল পাছে মোটরের চাকা কাদায় বসে যায়। আমি বিবাহ সভায় যাইনি— কেননা রাত্রি সাড়ে দশটায় বিয়ে আরম্ভ— আর শুন্‌লুম তিনটে রাতে অনুষ্ঠান শেষ হয়েছিল। শুনে আমি বল্লুম— প্রজাপতয়ে নমঃ— এবং খুব দূরের থেকে। আজ বর রেণুকে

নিয়ে তিনটের গাড়িতে চড়ে একেবারে এক নিঃশ্বাসে বরিশালে চলে যাবে। তুমি বোধহয় জান, বরকে সমস্ত রাত্রি মন্ত্র পড়িয়ে উপোষ করিয়েও লোকের মন সন্তুষ্ট হয় না। তার উপরে নানা প্রকার ঠাট্টার উৎপাত আছে। পানের মধ্যে কুইনীন্ দিয়ে কাঁচা শাকে মস্‌লা মাখিয়ে নানারকম উগ্র রসিকতায় হতভাগ্যকে পীড়িত করবার চেষ্টা হয়েছিল। এই সমস্ত নিদারুণ কৌতুকে আমাদের কমল দেবী° সবচেয়ে উৎসাহী। কিন্তু বর সাবধানী— তাকে ঠকাতে পারেনি। তোমাদের জামাই বাবুকে তোমরা বোধহয় জব্দ করেছিলে। কিন্তু শুন্‌তে পাই শান্তিরা থিয়েটার করে তাঁর চিত্তবিনোদন করেছিল— এরকম রসিকতার প্রলোভন থাক্‌লে মানুষ দিনে তিন চার বার করে বিয়ে করতে রাজি হয়।— কালকের দিন পর্য্যন্ত খুব বৃষ্টি হয়ে আজ বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে তাই এখন খুব গুমট করেচে। খেয়ে এসেই তোমাকে লিখ্‌তে বসেছি। এখনি হয়ত বাসি-বিয়ের কোনো একটা সভায় আমার ডাক পড়বে তখন আর লেখবার সময় পাব না। আজ আবার আর এক উপদ্রব আছে। পেরুর (দক্ষিণ আমেরিকার) কন্সাল জেনেরাল আজ বিকেলের গাড়িতে আমাদের বিদ্যালয় দেখ্‌তে আস্‌বে। তাহলে আজ রাত্রে সে আর যাবে না— কাল কতক্ষণ থাক্‌বে কে জানে। কলকাতার মত জায়গায় মানুষ দেখা করতে এসে অল্পক্ষণের মধ্যে চলে যায়— এখানে তা হবার জো নেই। আমি এন্ড্রুজকে বলে দিয়েছি তাঁর ঘরেই তিনি ওকে স্থান দেবেন— কোনো মতে দুজনে ঝগড়া না করে একঘরে দুটো দিন কেটে যাবে। যাই হোক তিনি আসবার আগেই তোমার চিঠি রওনা করে দিয়ে একটু বিছানায় গড়াবার চেষ্টা করা যাবে— কেননা কাল পুরোপুরি ঘুম হয়নি— রাত্রে মাঝে মাঝে ঢাক্ ঢোল এবং ছেলেদের চীৎকার প্রায়ই চল্‌ছিল। ধোবাদের তিনটে গাধা মনে করেছিল তাদেরও বুঝি নিমন্ত্রণ আছে— তাই যথোচিত সমাদর হচ্চে না বলে মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠ্‌ছিল— সেটা ঠিক রসন চৌকির মত শোনাচ্ছিল না।

দুঃখের কথা কি বলব— এতবড় একটা বিয়ে হয়ে গেল কিন্তু রসনচৌকি বাজ্‌ল না— কেবল রাত তিনটা পর্য্যন্ত মন্ত্র পড়াই হল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনচি বোধ হয় ডাক্‌তে আস্‌চে— কিন্তু বড় ঘুম পাচ্চে। ইতি ২৭ শ্রাবণ ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২৩

? ১৪ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

আজ বুধবার। আজ হয়ত দুপুরের ডাকে তোমার চিঠি পেতেও পারি— নাও পেতে পারি। হাতে একটু সময় আছে তাই তোমার না-পাওয়া চিঠির জবাব লিখ্‌তে বসে গেলুম। ক দিন খুব বৃষ্টি বাদলের পর আজ সকালের আকাশে সূর্য্যের আলো নির্ম্মল হয়ে ফুটে উঠেছে— শিশু যেমন দোলায় শুয়ে শুয়ে অকারণ আনন্দে হাত পা ছুঁড়ে', চিং হয়ে শুয়ে', কলহাস্য করতে থাকে, তেমনি করে আশ্রমের গাছপালাগুলি আজ তাদের ডালপালা দুলিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলি ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠ্‌চে। এখন সকাল বেলা— স্নিগ্ধ বাতাস বইচে, পাখীর ডাকে এখানকার শালবন এবং আমবাগান মুখরিত। আমাদের মন্দিরের উপাসনা হয়ে গেছে। তারপরে এতক্ষণ আমার জান্‌লার ধারের সেই কোণ্‌টিতে শুয়ে ছিলুম। প্রতি বুধবারে উপাসনার পরে এণ্ড্রুজ একবার এসে, আমি কি বলেছি, আমার কাছে ইংরেজিতে তাই বুঝিয়ে নেন। বুঝিয়ে নিয়ে খুশী হয়ে তিনি চলে গেছেন।

আমি কি বলেছিলুম জান? এই সৃষ্টির দিকে প্রথম তাকালে দেখ্‌তে পাই এর আগাগোড়া সমস্ত নিয়মে বাঁধা, এর সমস্ত অণু পরমাণুর মধ্যে নিয়মের ফাঁক এতটুকুও নেই। কেমন জান? যেমন একটি সহস্র তার-বাঁধা বীণাযন্ত্র। এই বীণার প্রত্যেক তারটি খাঁটি তার, প্রত্যেকটি খুব খাঁটি হিসাব করে বাঁধা, অর্থাৎ এই বীণাটির তুম্বী থেকে আরম্ভ করে এর সূক্ষ্মতম তারটি পর্য্যন্ত সমস্তই সত্য। কিন্তু না হয় সত্যই হল তাতে আমার কি! বীণার তার-বাঁধার খাঁটি নিয়ম নিয়ে আমি কি করব? তেমনি এই জগতে সূর্য্যচন্দ্রগ্রহ অণু পরমাণু সমস্তই ঠিক সময় রেখে ঠিক নিয়ম রেখে চল্‌চে এই কথাটা যত বড় কথাই হোক্ না কেবল তাতে আমাদের মন ভরে না। আমরা এই কথা বলি, শুধু বীণার নিয়ম চাইনে, বীণার সঙ্গীত চাই। সঙ্গীতটি যখন শুন্‌তে পাই তখনি ঐ বীণাযন্ত্রের শেষ অর্থটি পাই— তা নইলে ও কেবল খানিকটা কাঠ এবং পিতল। জগতের এই বীণাযন্ত্রে আমরা সঙ্গীতও শুনেছি; শুধু কেবল নিয়ম নয়। সকালবেলার আলোতে আমরা শুধু কেবল মাটি জল, শুধু কেবল কতকগুলো জিনিস দেখ্‌তে পাই, তা নয়। সকাল বেলার শান্তি স্নিগ্ধতা সৌন্দর্য্য পবিত্রতা সে ত কেবল বস্তু নয়, সেই হচ্চে সকালের বীণাযন্ত্রের সঙ্গীত। তারই সুরে আমাদের হৃদয়, পাখীর সঙ্গে মিলে, গান গাইতে চায়। যেখানে বীণা শুধু বীণা, সেখানে সে বস্তুমাত্র— কিন্তু যেখানে বীণায় সঙ্গীত ওঠে সেখানে বীণারও পিছনে আমাদের ওস্তাদজি আছেন, সেই ওস্তাদজির আনন্দ গানের ভিতর দিয়ে আমাদের মনে আনন্দ দেয়, সৃষ্টির বীণা ত ওস্তাদজি বাজিয়ে চলেচেন কিন্তু আমাদের নিজের চিত্তের বীণাও যদি সুরে না বাজে, তাহলে আমাদের হৃদয় বীণার ওস্তাদজিকে চিন্‌ব কি করে? তাঁর আনন্দরূপ দেখ্‌ব কি করে? না যদি দেখি তা হলে কেবল বেসুর, কেবল ঝগড়া বিবাদ, ঈর্ষা বিদ্বেষ, কেবল কৃপণতা স্বার্থপরতা, কেবল লোভ এবং ভোগের লালসা। আমাদের জীবনের মধ্যে যখন সঙ্গীত বাজে তখন নিজেকে ভুলে যাই,

আমাদের জীবনযন্ত্রের ওস্তাদজিকেই দেখতে পাই। তখন দুঃখ আমাদের অভিভূত করে না, ক্ষতি আমাদের দরিদ্র করে দেয় না। তখন ওস্তাদজির আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবনের শেষ অর্থটি দেখতে পাই। সেইটি দেখতে পাওয়াই মুক্তি। সেই জন্যই ত চিত্তবীণায় সত্যসুরে তার বাঁধতে চাই— সেই জন্যে কঠিন চেষ্টায় মনকে বশ করতে চাই, চৈতন্যকে নির্ম্মল করে তুলতে চাই— সেই জন্যে নিজের স্বার্থ নিজের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা ভুলে হৃদয়কে স্তব্ধ করতে চাই— তা হলেই আমার সুর বাঁধা যন্ত্র ওস্তাদের হাতে বেজে উঠ্‌বে। আমাদের প্রার্থনা হচ্চে এই:— "তব অমল পরশরস অন্তরে দাও।"[১] তাঁর সেই স্পর্শের রসই হচ্চে আমাদের অন্তরের সঙ্গীত। তুমি ত জান আমি সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই গান করি—

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে, দুখে, বিপদে,
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে।[২]

দুপুর বেলা খেতে গিয়ে দেখি খাবার টেবিলে তোমার চিঠি আর সেই হিন্দী খবরের কাগজ রয়েচে। তোমরা আলমোড়ায় যাচ্চ?[৩] ওখানে আমি অনেকদিন ছিলুম।[৪] তোমাদের ঠিকানা পেলে সেই ঠিকানায় লিখব। আমি ভেবেছিলুম তোমাদের স্কুলের ছুটির আগে তোমরা কোথাও যাবে না। কিন্তু দেখ্‌চি আমার ছেলেবেলাকার হাওয়া তোমাদের লেগেচে— তখন আমি কেবলি ইস্কুল পালিয়েচি। কিন্তু সাবধান, আমার মত মূর্খ হলে চলবে না— নাম্‌তা মনে থাকা চাই, আর সাইবীরিয়ার রাস্তা ভুললে কষ্ট পাবে— আমার এমন দুর্দ্দশা হয়েচে যে আমি, হাজার চেষ্টা করলেও কখনই একলা শান্তিনিকেতন থেকে Irkutok এ[৫] ঠিক পথ চিনে যেতে পারিনে। অতএব ছুটি ফুরোবার আগেই ইস্কুল ছেড়ে কোথাও যেতে হলে আমার শোচনীয় দৃষ্টান্ত মনে রেখো। আলমোড়ায় যদি যাও ওখানে বস্ত্রিসা[৬] বলে আমাদের জানা লোক আছে, তাঁদের সঙ্গে হয় ত আলাপ হবে—

সেদিন তিনি আমাকে একটিন ভাল পাহাড়ে মধু পাঠিয়ে দিয়েচেন— এঁদের একটা বাড়ি ভাড়া করে আমরা ছিলুম— কিন্তু সে বাড়ি ক্যান্টনমেন্টের সীমানায়— এখন সেখানে বোধহয় সকলকে থাক্‌তে দেয় না। [?২৯ শ্রাবণ ১৩২৫]

তোমার রবিদাদা

২৪

১৮ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

তুমি কাশী থেকে দূরে গেছ সেই জন্যে তোমার চিঠি আসতে অনেক দেরি হবার কথা। কিন্তু তাই বলে তোমাকে দেরিতে চিঠি লিখে শাস্তি দেব কেন? তা ছাড়া, ঠিক হিসাব মিলিয়ে দেনাপাওনা করবার [দরকার] কি? যা পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশি দিতে পারলেই ত জিত। কি বল? অতএব আমার এই চিঠিখানার জিত রইল। তুমি বোধ হয় এই প্রথম হিমালয়ে যাচ্চ। আমিও প্রায় তোমার বয়সে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলুম।[১] তার আগে ভূগোলে পড়েছিলুম পৃথিবীতে হিমালয়ের চেয়ে উঁচু জিনিস আর কিছু নেই, তাই হিমালয় সম্বন্ধে মনে মনে কত কি যে কল্পনা করেছিলুম তার ঠিক নেই। বাড়ি থেকে বেরবার সময় মনটা একেবারে তোলপাড় করছিল। অমৃতসর হয়ে ডাকের গাড়ি চড়ে প্রথমে পাঠানকোটে গিয়ে পড়লুম। সেখানে পাহাড়ের বর্ণ পরিচয়

প্রথম ভাগ। তুমি কাঠগোদাম দিয়ে উপরে উঠেচ— পাঠানকোট সেই রকম কাঠগোদামের মত। সেখানকার ছোট ছোট পাহাড় গুলো, "কর, খল," "জল পড়ে, পাতা নড়ে", এর বেশি আর নয়। তার পরে ক্রমে ক্রমে যখন উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম তখন কেবল এই কথাই মনে হতে লাগ্‌ল হিমালয় যত বড়ই হোক্ না, আমার কল্পনা তার চেয়ে তাকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মানুষের প্রত্যাশার কাছে হিমালয় পাহাড়ই বা লাগে কোথায়? আসল কথা, পাহাড়টা থাকে থাকে উপরে উঠেচে বলে ডাণ্ডি করে চড়তে চড়তে তখন পর্ব্বতরাজের রাজমহিমা ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে সয়ে আসে। যে জিনিসটা খুব বড় আমরা একেবারে তার সমস্তটা ত দেখতে পাই নে— পর্ব্বত ক্রমে ক্রমে দেখি, সমুদ্র ক্রমে ক্রমে দেখি— এমন কি, যে মানুষ আমার চেয়ে বয়সে অনেক বেশি তারও সেই বড় বয়সের সুদীর্ঘ বিস্তারটা একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না। এই জন্যে তফাৎ জিনিসটা কল্পনায় যত বড়, প্রত্যক্ষে তত বড় নয়। অর্থাৎ বড় হলেও বড় দেখায় না। সেইজন্যেই যে বড় তার সঙ্গে ছোটর মিল হওয়া অসম্ভব নয়। আমাদের যে ঠাকুরকে আমরা প্রণাম করি তিনি যত বড় তার সমস্তটা যদি সম্পূর্ণ আমাদের সামনে আসত তাহলে সে আমরা সইতেই পারতুম না। কিন্তু হিমালয় পাহাড়ের মত আমরা তাঁর বুকের উপর দিয়ে ক্রমে ক্রমে উঠি— যতই উঠি না কেন তিনি আমাদের একেবারে ছাড়িয়ে যান না— বরাবর আমাদের সঙ্গী হয়ে আপনার মধ্যে তিনি আমাদের আপনি উঠিয়ে নিতে থাকেন; বুদ্ধিতে বুঝতে পারি তিনি আমাদের ছাড়িয়ে আছেন— কিন্তু ব্যবহারে বরাবর তাঁর সঙ্গে আমাদের সহজ আনাগোনা চল্‌তে থাকে। তাই ত তাঁকে বন্ধু বলতে আমাদের কিছু ঠেকে না— তিনিও তাঁর উপরের থেকে হেসে আমাদের বন্ধু বলেন, এত উপরে চড়ে যান না যে তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া দায় হয়ে ওঠে। তুমি যত জোরের সঙ্গে আমাকে সাতাশ বছরের করে নিয়েচ আমরা তার চেয়ে

ঢের বেশি জোরে তাঁকে সাতও করতে পারি সাতাশও করতে পারি আবার সাতাশ কোটি করলেও চলে— তিনি যে আমাদের জন্যে সবই হতে পারেন তা নইলে তাঁকে নিয়ে আমাদের চল্‌তই না। তোমার পাহাড় কেমন লাগ্‌ল আমাকে লিখো। হিমালয়ে আলমোড়া পাহাড়ের চেয়ে ভাল পাহাড় ঢের আছে। আল্‌মোড়া ভারি নেড়া পাহাড়— ওর গাছপালা নেই— আর ওখানে থেকে হিমালয়ের তুষার দৃশ্য তেমন ভাল করে দেখা যায় না। ইতি ১লা ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২৫

২৫ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

চার পাঁচদিন তোমার চিঠি পাই নি আমিও তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে পারি নি। রাগ করে লিখি নি তা মনে কোরো না। কেননা, তোমার উপরে আমি রাগ করতে পারি নে, দ্বিতীয়ত আমি জানি কাশী থেকে আলমোড়া পর্য্যন্ত পৌঁছে তার পরে সেখান থেকে চিঠি রওনা হয়ে এখানে এসে পৌঁছতে প্রায় দশ দিন দেরি হবার কথা। তোমার চিঠি না পেয়েও তোমাকে আমি লিখেছিলুম, সে এতদিনে তুমি নিশ্চয় পেয়েছ। আরো আমি লিখ্‌তে পারতুম কিন্তু আমার ক্লাসের কাজ এখন অনেক বেড়ে গেছে। সকালে যেমন পড়াতুম তেমনি পড়াই, তার পরে আবার দুপুর বেলায় খাওয়ার পরে এণ্ট্রেন্স ক্লাসের তর্জ্জমা করানোর ভার আমাকে নিতে হয়েচে।[১] তাতে

আমার অনেকটা সময় কেটে যায়— তার পরে আগে যেমন পরদিনের পাঠ আমাকে লিখে তৈরি করে রাখ্‌তে হত, এখন তাও করতে হয়। কাজেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার একটুও সময় নেই বল্‌তে পার। তুমি ভাবচ আমার পক্ষে এতটা কাজ করা কষ্টকর,— তা নয়। এ আমার ভালই লাগে। আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাই এতে ওদের উপকার হয়। মা যেমন ছেলেদের খাইয়ে খুশি হন এ আমার তেমনি— আমি ওদের মনের খোরাক যত পারি যোগাচ্চি, এতে আমাকে খুসি রাখে। বিশেষত দেখি ওরা আমার কাছে এসে পড়তে ভালবাসে— আমি যদি ওদের ক্লাস নেওয়া বন্ধ করে দিই তাহলে ওরা দুঃখিত হয়। এতকাল আমি থার্ড ক্লাসে ইংরেজি পড়িয়েছি ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়াইনি সেইটে ওদের একটা খেদ ছিল— যেমনি শুনলে ওদের আমি পড়াব অমনি ওরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেচে। কিন্তু বরাবর এমন করে সমস্তদিন পড়ালে চল্‌বে না— তাহলে আমার অন্য সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে— তাই ঠিক করেচি আর কোন একটি মাস্টারকে তৈরি করে নিয়ে তাঁর হাতে ক্লাস ছেড়ে দেব। তুমি যখন এম্‌, এ, পাশ করে তৈরি হয়ে উঠ্‌বে তখন তুমি এই কাজের ভার নিতে পারবে— কি বল? সেই দশটা বছর একরকম করে চালিয়ে দিতে পারব। তোমাকে ছেলেরা মান্‌বে ত? তাদের ঠিকমত শাসন করে রাখ্‌তে পার্‌বে? পঞ্চম বর্গের ছেলেরা আমার ক্লাসে কি রকম চেঁচামেচি গোলমাল করে তুমি ত দেখেইচ— তারা আমার ক্লাসে পড়া খেলা বলে মনে করে, আমাকে তাদের খেলার সঙ্গী বলে ঠিক করে রেখেচে। কেন এমন হয় বলত রাণু? ছোটরা কেউ আমাকে একটুও ভয় করে না— তারা আমাকে তাদের সমবয়সী বলে ঠিক করে রেখেচে। আমি যখন তোমাকে লিখেছিলুম যে, আমাকে তুমি নারদমুনির মত মনে করে হয়ত ভয় করবে, তখন আমি কত বড় ভুলই করেছিলুম— আমি যে ছ ফুট লম্বা মানুষ, এত বড় গোঁফ দাড়িওয়ালা কিম্ভূতকিমাকার লোক,

আমাকে দেখে তোমার মুখশ্রী একটুও বিবর্ণ হল না— এসে যখন আমার হাত ধরলে তখন তোমার হাত একটুও কাঁপল না, অনায়াসে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলে, কণ্ঠস্বরে একটুও জড়িমা প্রকাশ হলনা— একি কাণ্ড বল দেখি? আমার নিজেরই এক এক সময় মনে হয় আমি হয় ত ছদ্মবেশী ছেলেমানুষ, তাই আমি বাইরে যতই বেশি বয়সের সাজ করিনা কেন, আমার ভিতরের ছেলেমানুষী ফস্ করে ধরা পড়ে যায়— বিশেষত ছেলেমানুষদের কাছে। আমার ফাল্গুনীতে[১] সেই কথাটাই লিখেচি— পৃথিবীতে বুড়োটাই ফাঁকি, সে একটা মুখস্ মাত্র— জলে স্থলে আকাশে যৌবন আর কিছুতেই মরে না— তাই আকাশের ললাটে বলির চিহ্ন নেই, তাই হাজার লক্ষ বৎসরের সমুদ্র আজো ছেলেমানুষের মত কলরোলে নৃত্য করচে, তাই পৃথিবীর শ্যামলতা চিরনবীন, তাই তারাগুলি সদ্যোজাত জ্যোতিঃশিশুগুলির মত অন্ধকারের কোল জুড়ে নীরবে পড়ে আছে। তুমি যে মনে করচ আজ আমার এই "সাতাশ" বছর বয়স থেকে আর পনেরো ষোলো বছর পরে কোনো একদিন আমি আটাশে পড়ব— আমি তা বিশ্বাস করি নে। আমি দেখ্‌চি বরাবর ঐ সাতাশেই আট্‌কে থাক্‌ব। কিন্তু আমার একটা ভাবনা আছে— তুমি যদি তখন হূহু করে বড় হয়ে উঠ্‌তে থাক তাহলে আমি কি করব? তুমি তখন হয়ত সবেগে আটাশ ঊনত্রিশ ত্রিশ একত্রিশ পেরতে থাকবে, আর আমি কোনমতেই তোমার নাগাল পাব না— ঠিক যেন আমি ইস্টেশনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, আর তুমি রেলগাড়ির মত বাঁশি বাজিয়ে দিয়ে কোথায় ছুটবে ঠিকানাই পাব না।

তোমার নিশ্চয়ই হিমালয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় খুবই ভাল লাগ্‌চে। আমাকে দেখেই যেমন ছুটে এসেছিলে তেমনি করেই বোধহয় হিমালয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে। হিমালয়ের কোলের কাছে ছোট ছোট যে সব ঝরনা কলকল করে ছুটে বেড়াচ্চে, তারা যেমন গিরিরাজের স্নেহের ধন, তুমিও বোধ হয় তেমনি তার আপনার জিনিস হয়ে উঠেচে। ওখানে ঠাণ্ডায়

তোমার শরীর নিশ্চয় ভাল হবে— আগেকার চেয়ে ক্ষিদে বেশি হবে— যতক্ষণ পার বাইরের হাওয়ায় দেবদারুবনের ছায়ায় বসে কাটিয়ে দেবে। ঘরের মধ্যে যত কম থাক্‌বে ততই ভাল। এ বৎসর পশ্চিমে বৃষ্টির অভাব ঘটেছে, অতএব পাহাড়ের উপরে বোধহয় এখনো বর্ষা নামে নি— তাহলে সমস্ত দিন বাইরে কাটাতে কোনো অসুবিধা হবে না। বড় চিঠি লিখেচি— কিন্তু আর সময়ও নেই জায়গাও নেই। ইতি ৮ই ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২৬

২৮ অগাস্ট ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

আজ সকালে তোমার চিঠি পেলুম। তখন ত আমার সময় থাকে না— তাই এখন খাওয়ার পরে লিখ্‌তে বসেচি। আর খানিক পরেই ম্যাট্রিক্‌ ক্লাসের ছেলেরা দল বেঁধে তাদের খাতাপত্র নিয়ে হাজির হবে। তুমি যে নিয়ম করে দিয়ে গিয়েছিলে আজ কাল সে আর পালন করা হয়ে ওঠে না— খাওয়ার পরে দুপুর বেলায় শোওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েচি— সেই ডেস্কের সাম্‌নে সেই চৌকি নিয়ে আমার দিন কাটে। সে জন্যে আমার নালিশ নেই, কাজের দরকার পড়লেই কাজ করতে হবে। পৃথিবীতে ঢের লোক আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে— সেও আবার আপিসের কাজ— অর্থাৎ সেকাজ পেটের দায়ে, মনের আনন্দে নয়। আমি যে

ছেলেদের পড়াই সে ত দায়ে পড়ে নয়, সে নিজের ইচ্ছায়— অতএব এ রকম কাজ করতে পারা ত সৌভাগ্য। কিন্তু তবু এক একবার দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়ে এই সবুজ পৃথিবীর একটা আভাস যখন দেখতে পাই তখন মনটা উতলা হয়ে ওঠে। আমি যে জন্মকুঁড়ে। যেমন বাঁশির ফাঁকের ভিতর থেকে সুর বেরোয় তেমনি আমার কুঁড়েমির ভিতর থেকেই আমার যেটি আসল কাজ সেইটি জেগে ওঠে। আমার সেই আসল কাজই হচ্চে বাণীর কাজ— সময়টাকে কর্ত্তব্য দিয়ে ভরাট করে একেবারে নিরেট করে দিলে বাণী চাপা পড়ে যায়। সেই জন্যেই আমাকে কেবল কাজ থেকে নয়, সংসারের নানা জটিল বন্ধন থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাক্‌তে হয়। কাজই হোক্, আর মানুষই হোক আমাকে একেবারে চাপা দিলে বা বেঁধে ফেল্লে আমার জীবন ব্যর্থ হতে থাকে। আমার মন ওড়বার জন্যে শূন্যকে চায়। তাকে খাঁচায় বাঁধবার আয়োজন যতবার হয়েচে ততবারই সেই আয়োজনের শিকল ছিন্ন হয়ে পড়ে গেছে। হঠাৎ একদিন দেখ্‌তে পাবে আমার কাজকর্ম্মের দাঁড়খানা তার শিকল নিয়ে কোথায় পড়ে আছে, আর আমি অত্যুচ্চ অবকাশের আগ্‌ডালের উপর অসীম ফাঁকার মধ্যে একলা বসে গান জুড়ে দিয়েচি। তাই বল্‌চি দরজা জান্‌লার আড়াল থেকে ঐ নীলে সবুজে সোনালিতে মেশানো ফাঁকার একটা অংশ যেম্‌নি দেখতে পাই অমনি আমার মন এই ডেস্কের ধার থেকে বলে ওঠে ঐখানেই ত আমার জায়গা— ঐ ফাঁকাটাকে যে আমার আনন্দ দিয়ে গান দিয়ে ভরে তুল্‌তে হবে। পুকুর আছে মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা— সেইখানেই তার কাজ— কেউবা স্নান করচে, কেউবা জল তুল্‌চে, কেউবা বাসন মাজ্‌চে— কিন্তু আমি হচ্চি মেঘের মত; আমাকে ত মাটির ঘের দিলে চল্‌বে না— আমাকে বাঁধতে গেলে ত বাঁধা পড়ব না— আমাকে যে ঐ শূন্যের ভিতর দিয়ে বর্ষণ করতে হবে। সব সময়েই যে বৃষ্টি ভরে আসে তা নয়, অনেক সময়ে অলস স্বপ্নের মত সূর্য্যের আলোতে রাঙিয়ে উঠে কিছুই না করে

ঘুরে বেড়াই— কিন্তু এই কুঁড়েমিটুকু, উপর থেকে আমার জন্যে বরাদ্দ হয়ে গেছে— এ জন্যে আমি কারো কাছে দায়িক নই। সবই ত বুঝ্লুম, কিন্তু কুঁড়েমি করি কখন্ বল ত? তুমি ত দেখেই গেছ কাজের আর অন্ত নেই। ঘোড়াকে বিধাতা বাতাসের মত দ্রুতগামী এবং মুক্ত করে সৃষ্টি করেছিলেন— কিন্তু সেই ঘোড়াকেই মানুষ জিনে লাগামে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে— আমারও সেই দশা। বিধাতার ইচ্ছা ছিল আমি ভরপুর কুঁড়েমি করে কাটাই কিন্তু যে গ্রহের হাতে পড়েছি সে আমাকে কষে খাটিয়ে নিচ্চে। বয়স যখন অল্প ছিল তখন খাটুনি এড়িয়ে ইস্কুল পালিয়ে পদ্মার নির্জ্জন চরে বোটের মধ্যে লুকিয়ে বেশ চালাচ্ছিলুম— কিন্তু যখন থেকে তোমার পঞ্জিকা অনুসারে আমার "সাতাশ" বছর বয়স হয়েচে তখন থেকেই কাজের জালে আপনি ধরা দিয়ে কেটে বেরবার আর পথ পাইনে। নইলে আগেকার মত হলে আমার পক্ষে আলমোড়ায় যেতে কতক্ষণ লাগ্‌ত বল। তবু তোমরা সেই পাহাড়ের উপরে মুক্ত হাওয়ায় স্বাস্থ্য এবং আনন্দ ভোগ করচ একথা মনে করে ভাল লাগচে— তোমার চিঠি সেখানকার লাল ফুলের পাপড়িতে রাগ-রক্ত হয়ে আমার হাতে এসে পৌঁচচ্চে।[১] সেখানকার ফুলে যে রক্তিমা দেখতে পাচ্চি— তোমার গালে সেই রক্তিমা সংগ্রহ করে আন্‌বে এই আশা করে আছি। আজ আর সময় নেই— অতএব ইতি। ১১ই ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২৭

২ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

অনেকদিন পরে আজ তোমার চিঠি পেলুম। তাতে ক্ষতি নেই, তুমি বেশ ভাল করে বিশ্রাম কর এবং ভাল করে সুস্থ সবল হয়ে ওঠ, এই আমি চাই। তোমাকে ত একদিন সেক্রেটারির কাজ করতে হবে— এখন থেকে তার জন্য বল সঞ্চয় কর। আমি তোমাদের বয়সে এত বেশি সুস্থ সবল ছিলুম যে নানা রকম চেষ্টা করেও একদিনের জন্যও শরীর খারাপ হত না— তাই রোজ ইস্কুলে যেতে হত। শরীর আমার এত বেশি ভাল ছিল বলেই এত দীর্ঘকাল ধরে আমি এত কাজ করতে পেরেছি। এখনো ত আমার কাজের অন্ত নেই। যাই হোক্, আমার যা সঞ্চয় আছে তাতেই আমার কাজ চলে যাচ্চে— এবং যখন আর পনেরো ষোলো বছর পরে আমার বর্ত্তমান সাতাশ পেরিয়ে আটাশে পড়ব তখনো চলবে— কিন্তু তোমার শরীরে সেই সঞ্চয় নেই। শুধু এম, এ, পাস করলে কি হবে? শরীরে মনে খুব জোর থাকা চাই। অতএব বাইরে দেবদারু বনে বসে খুব হাওয়া খাবে এবং ঘরের মধ্যে এসে খুব দুধ খাবে। আমাকে যেতে বলেচ? কিন্তু আমাকে ত কেউ ছুটি দেবে না। আগেকার চেয়ে আমার বরঞ্চ আরো অনেক কাজ বেড়ে গেছে— সে কথা তোমাকে পূর্ব্বেই লিখেচি। তোমার বাবজা তাঁর কলেজ থেকে ছুটি নিতে পেরেছিলেন— তার একটা মস্ত কারণ ছিল— অন্য লোকের কাছ থেকে তাঁকে ছুটি আদায় করতে হয়েছিল— আমার ছুটির দরবার যে আমার নিজের কাছে করতে হয়। সে যে ভয়ঙ্কর কড়া মনিব। আমি যদি পরের কাজে ভর্ত্তি হতে পারতুম তাহলে আমাকে এত বেশি খাট্‌তে হত না। আমার বোধ হয়, আমি যদি

সাতাশ টাকা মাইনেয় তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারি হতুম তাহলে ছুটির জন্যে আমাকে দরখাস্ত করতেই হত না— কাজ করবার জন্যেই করতে হত। তাই আমি স্থির করে রেখেচি তখন তোমার সেক্রেটারির পদের জন্য এখন থেকে দরবার করে রেখে দেব। তাহলে, আমি নিশ্চয় জানি আমার রঙীন কাপড়ের বরাদ্দ হয়ে যাবে, আর চুলের জন্যে ভাবতে হবেনা— বোধহয় সের পাঁচ ছয় দুধও রোজ বিনি পয়সায় পাব।— আমাদের এখানে প্রায়ই খুব বৃষ্টি হচ্চে। এক একদিন বিষম জোরে বাতাস দেয় আর বৃষ্টির ধারাগুলো বেঁকে একেবারে তীরের মত সীধে [য] ঘরের মধ্যে চলে আসে। এখানে গরম নেই বল্লেই হয়— আর চারিদিকের মাঠ একেবারে ঘন সবুজ হয়ে উঠেচে। বোলপুরকে এত সবুজ আমি আর কখনোই দেখিনি। গাছগুলো নিবিড় পাতার ভারে থাকে থাকে ফুলে উঠেচে— ঠিক যেন সবুজ মেঘের ঘটার মত। আমাদের বিদ্যালয়ের কুয়োগুলো প্রায় কানায় কানায় ভরে উঠেচে। এবারে চারিদিকে অনেক গাছ পুঁতে দিয়েচি। সেগুলো যখন বড় হয়ে উঠ্‌বে তখন আমাদের আশ্রম আরো সুন্দর হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু এখানকার শুক্‌নো বেলেমাটিতে গাছপালা ভারি দেরিতে বেড়ে ওঠে— আমি আটাশ বছরে পড়বার আগে এসব গাছে ফুল ধরা দেখ্‌তেই পাব না। তুমি যদি নবেম্বরে আমাদের আশ্রমে এস তাহলে ততদিনে এখানে অনেক বদল দেখ্‌তে পাবে। এ বৎসরটা আমাদের আশ্রমের পক্ষে খুব তেজের বৎসর— যেমন ঘন ঘন বৃষ্টিতে গাছপালা দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে, তেমনি এখানকার কাজের দিকেও খুব একটা উৎসাহ পড়ে গেছে,— পড়াশুনো কাজকর্ম্ম যেন নতুন জোর পেয়েছে— সেই জন্যে ছেলেদের মধ্যেও খুব একটা আনন্দ জেগে উঠেচে। আমি যে আমেরিকায় যাবার টিকিট কিনেও গেলুম না, এখানে থেকে গেলুম, তার পুরস্কার পেয়েছি। আমাদের আশ্রমলক্ষ্মী বোধ হয় আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার বিদেশে

যাত্রা কাঁচিয়ে দিয়েছেন— খুব ভালই হয়েচে। আমি লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ইংরেজিতে তর্জ্জমা' করেছি তা জান? এন্ড্রুজ সেটা পড়ে খুব হেসেচেন, আর খুব লাফালাফি করেচেন। তোমরা শুনলে তোমাদেরও খুব ভাল লাগত। তাহলে এই ইংরেজি নাটকে তোমাকে একটা কিছু সাজান যেত। ইতি ১৬ ভাদ্র, ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২৮

৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

এই মাত্র যখন বৌমার ইংরেজি লেখা সংশোধন করছিলুম এমন সময় তোমার চিঠি পেলুম। যেমনি তোমার চিঠি পাই অম্‌নি তখনি তার জবাব লিখে দিই। অন্য কাজকর্ম্মকে ততক্ষণ দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখি। কাজ ফাঁকি দেওয়া আমার চিরদিনের স্বভাব কিনা সেই জন্যে ওতে আমার দুঃখ বোধ হয় না। আর তা ছাড়া নিশ্চয় জানি একটি ছোট মেয়ে হিমালয় পর্ব্বতের শিখরে আমার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে— সে কি কম গর্ব্বের কথা। আরো একটা ভরসার কথা আছে— এই চিঠির কাগজের দুটো পাতায় যা লিখব আমার পাঠক এবং সমালোচকটি তার একটুও নিন্দা করবেনা। কাল রাত্রি থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন— মাঝে মাঝে প্রবল জোরে বর্ষণ নেমে আস্‌চে— অমনি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত মাঠ জলে ছল্‌ ছল্‌ করে উঠ্‌চে— থেকে থেকে অশান্ত বাতাস

সোঁ সোঁ করে হূহু করে আমাদের শালবাগানের ডালপালাগুলোর মধ্যে আছ্ড়ে আছ্ড়ে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়চে— ঠিক যেন আকাশের অনেকদিনের একটা চাপা বেদনা কিছুতেই আর চাপা থাক্‌ছে না। ওদিকে দিগন্তের কোণে কোণে রাগী রকমের ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে— আর তার মধ্যে দিয়ে একটা ফ্যাকাশে আলো দারুণ হাসির মত। সব সুদ্ধ জলে স্থলে খুব একটা ক্ষ্যাপাটে রকমের ভাব। মনে হচ্চে যেন ছুটন্ত উচ্চৈশ্রবার [য] উপরে চড়ে ইন্দ্রদেব একটা ঘূর্ণাঝড়ের চক্র পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে মেরেচেন। বাতাসের আর্ত্তনাদ আর তার বেগ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌চে— একটা রীতিমত ঝড়ের আয়োজন বলেই বোধ হচ্চে। আমার এই দোতলার কোণটি ঝড়ের পক্ষে খুব যে ভাল আশ্রয় তা নয়। আধুনিক কালের যুদ্ধক্ষেত্রের trenchএর মত— যথেষ্ট প্রকাশ্যও নয় যথেষ্ট প্রচ্ছন্নও নয়— ভাল করে ঝড়টা দেখ্‌তেও পাচ্চি নে, অথচ ঝড়ের ঝাপট থেকে ভাল করে রক্ষাও পাচ্চিনে। সিঁড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ করতে হয়েচে, ঘরের দরজাও সব বন্ধ— অন্ধকার— কোথা থেকে বেঁকে চুরে একটু বৃষ্টির ঝাপটও আস্‌চে— রুদ্রদেবের তাণ্ডব নৃত্যের এই ডমরুধ্বনির মধ্যে বসে তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি।—

সেদিন তুমি আমাকে লিখেছিলে, যে তুমি আমার অনেক নতুন নতুন নাম ঠিক করে রেখেছ। ক্রমে একে একে বোধ হয় শুন্‌তে পাব— কিন্তু আমার আসল নামটা যেন একেবারে চাপা না পড়ে যায়— কেননা ঐ নামটা নিয়ে এতদিন একরকম কাজ চালিয়ে এসেচি, তা ছাড়া ওর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, কবির সঙ্গে রবির একটা মিল আছে— এরপরে যারা আমার নামে কবিতা লিখ্‌বে তাদের অনেকটা কষ্ট বাঁচবে। এই জন্যে আমার মনে হয় নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে মানুষের একটা কিছু কাজ করা উচিত। মনে কর তুমি যদি খুব গাইয়ে হয়ে উঠ্‌তে পার তাহলে প্রীতির সঙ্গে গীতি বেশ মিলে যাবে। কিন্তু আমি তোমার একটা নাম

ভেবে রেখেচি, পছন্দ হবে কিনা জানিনে। আগে তার একটু ইতিহাস বলে দিই। সার্ ওয়াল্টার স্কটের[১] নাম বোধ হয় শুনেচ। একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। স্কট্‌কে সে ছোট ছেলের মত ইংরেজি দোঁহা শেখাত, আর না পারলে খুব ধম্‌কে দিত— দোঁহার দুটো লাইন তোমাকে লিখে দিচ্চি:—

"Wonery, twoery, tickery, seven;
Alibi, crackaby, ten and eleven;"

প্রায় সেই "ছল ছল ছৈল"র কাছাকাছি যায়। তারপরে সে খুব ভাল কবিতা আবৃত্তি করতে পারত। Scott used to say that he was amazed at her power over him, saying to Mrs. Keith, "She's the most extra ordinary creature I ever met with, and her repeating of Shakespeare overpowers me!"—Mrs Keith হচ্চে ঐ মেয়েটির মা, স্কটের বন্ধু, যখনকার কথা বল্‌চি তখন মেয়েটি তোমার চেয়ে খুব অল্প একটু ছোট ছিল— সে ছিল সাত। তার ছবি দেখে একজন লেখক বর্ণনা করেচেন— "Fearless and full of love, passionate, wild, wilful, fancy's child. One cannot look at it without thinking of Wordsworth's lines:

O blessed vision, happy child!
Thou art so exquisitely wild,
I thought of thee with many fears,
Of what might be thy lot in future years."

স্কটের সঙ্গে তার যে রকম বন্ধুত্ব ছিল তার ইতিহাস সমস্তটা পড়ে আমার তোমাকে মনে পড়ে। তার নাম ছিল Marjorie Fleming। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম, এবারে তোমার সঙ্গে দেখা হলেই তোমাকে মার্জরী বলে ডাক্‌ব— কিন্তু ভয় হল হঠাৎ শুনে পাছে তুমি রাগ করে বস, যদি

ভাব তোমাকে গাল দিচ্চি বা, তাই আগে থাক্‌তে নামের একটু ব্যাখ্যা করে দিলুম। রাণু নামটি যে আমার পছন্দ নয় তা নয়; তবে কি না দুই একটা বাড়তি নাম হাতে রাখা ভাল— কেননা মানুষের মেজাজ ত সব সময়ে এক রকম থাকে না, অথচ নামটা একই থাকে এটা অসঙ্গত কৃপণতা। যখন তুমি শান্ত থাক্‌বে তখন তোমাকে এক নামে ডাক্‌ব, আবার যখন তুমি দুষ্টু হবে তখন তোমাকে আর এক নামে ডাক্‌ব, এইরকম হওয়া উচিত। কি বল? আজ অনেকক্ষণ কাজকর্ম্ম ঠেকিয়ে রেখেচি কিন্তু আর নয়। এইখানে চিঠি বন্ধ করি একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি তুমি যে লাল ফুল পাঠিয়েচ ঐ লাল রং আমার ভাল লাগে। তাই জন্যে বল্‌ছিলুম এমন হিসাব করে দুধ খাবে যে, নভেম্বর মাসের মধ্যে তোমার গালে যেন ঐ রকম লাল ফুল ফুটে ওঠে। ইতি ২০ ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

২৯

১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন,

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, আজ সকালে তোমার চিঠি এই মাত্র পেলুম। আজ আমার চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্গের পুরাতন পড়ার দিন, আজ সন্তোষের হাতে তাদের ভার, এই জন্যে আমার সকালের কাজের প্রথম দুই ভাগে আমার ছুটি। তাই এখনি তোমার চিঠির জবাব দিতে বসবার সময় পেলুম। সেদিন যখন তোমাকে লিখ্‌ছিলুম তখন আকাশ জুড়ে মেঘের হাঁকডাক এবং

মাঠে বনে পাগ্‌লা হাওয়ার দৌরাত্ম্য চলছিল— আজ সকালে তার কোনো চিহ্ন নেই। আজ শরৎকালের প্রসন্নমূর্ত্তি প্রকাশ পেয়েছে— শিবের জটা ছাপিয়ে যেমন গঙ্গা ঝরে পড়চে, আকাশ তেমনি আজ আলোকের নির্ম্মল ধারা ঢেলে দিয়েচে— পৃথিবী আজ যেন মাথা নত করে তার অশ্রু-আর্দ্র হৃদয়খানি মেলে দিয়েচে, আর আকাশের কোন্ তরুণ দেবতা হাসিমুখে তার উপরে এসে দাঁড়িয়েচেন— জলস্থল শূন্যতল আজ একটি জ্যোতির্ম্ময় মহিমায় পূর্ণ হয়ে উঠেচে। সেই পরিপূর্ণতায় চারিদিক শান্ত স্তব্ধ। অথচ গোলমাল যে কিছু নেই তা নয়— জাগ্রত প্রভাতের কাজকর্ম্মের কলধ্বনি উঠেচে— আমার ঠিক সাম্‌নেই দিনুবাবুর ঘরের দোতলায় রাজমিস্ত্রি এবং মজুরের দলে নানা রকম ডাক হাঁক এবং ঠুকঠাক লাগিয়ে দিয়েচে, দূরে থেকে ছেলেদের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্চে, পূব দিকের সদর রাস্তা দিয়ে সার-বাঁধা গোরুর গাড়ি ইঁটের বোঝা নিয়ে আসচে তারই অনিচ্ছুক চাকার আর্ত্তনাদ এবং গাড়োয়ানের তর্জ্জনধ্বনির বিরাম নেই, তার উপরে, ঠিক আমার পিছনের জান্‌লার বাইরে সুধাকান্তর' ঘরের চালের উপরে বসে একদল চড়ুই পাখী কিচিমিচি কিচিমিচি করে কি যে বিষম তর্ক বাধিয়ে দিয়েচে তার এক বর্ণ বোঝবার জো নেই,— প্রায় ন্যায় শাস্ত্রেরই তর্কের মত। কিন্তু তবু আজ আলোকে অভিষিক্ত আকাশের এই অন্তরতর স্তব্ধতা কিছুতেই যেন ভাঙতে পারচে না— গায়ের উপর দিয়ে হাজার হাজার যে সব ঝরনা ঝরে পড়চে তাতে যেমন হিমালয়ের অভ্রভেদী স্তব্ধতাকে বিচলিত করে না এও ঠিক সেই রকম— একটি তপঃপ্রদীপ্ত অপরিমেয় মৌনকে বেষ্টন করে এই সমস্ত ছোট ছোট শব্দের দল খেলা করে চলেচে— তাতে তপস্যার গভীরতা আরো বড় হয়ে প্রকাশ পাচ্চে, নষ্ট হচ্চে না। শরতের বনতল যেমন নিঃশব্দে ঝরে পড়া শিউলি ফুলে আকীর্ণ হয়ে ওঠে, তেম্‌নি করেই আমার মনের মধ্যে আজ শরৎ আকাশের এই আলো শুভ্র শান্তি বর্ষণ করচে।

তুমি লিখেচ, তোমার মা বলেন, আগের চাইতে তুমি ভাল হয়েচ। ভাল হওয়ার আসল মানে কি জান, নিজের চারদিকে আসক্ত হয়ে ঘুরে না বেড়ানো— বড় হওয়ার বড় রাস্তায় সামনের দিকে বেরিয়ে যাওয়া। আমরা যখন নিজের ইচ্ছা নিজের প্রবৃত্তি নিজের ভোগের আয়োজনে নিজেকে বাঁধি তখন অন্য সকলকেও বাঁধতে চেষ্টা করি— সেই নিরন্তর টানাটানিতে দুঃখ পাই দুঃখ দিই। কিন্তু আমাদের জীবনের এই লক্ষ্য হোক্ আমরা মুক্তি পাব, মুক্তি দেব। দেখ, মরুভূমিতে যে সব গাছ জন্মায় তা প্রায়ই কাঁটা গাছ। কেন বল দেখি? তার কারণ হচ্চে এই সেখানকার মাটিতে রস খুব কম— এই জন্য অনেক টানাটানি করে' গাছ যেটুকু খাদ্য পায় সেটুকু সম্বন্ধে তার সতর্কতা উগ্র হয়ে ওঠে। কোনো জন্তু এই গাছের একটুখানি ডালও যদি খেতে চায় তাহলে সেটুকু সে দিতে পারে না, কেননা সেটুকু তার অনেক কষ্টের তৈরি— এইজন্যে সে আগাগোড়া কণ্টকিত হয়ে থাকে। মানুষ সেই রকম নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই যখন নিজে থাকে তখন তার কৃপণতার অন্ত থাকে না, তখন সে ঈর্ষায় দ্বেষে কণ্টকিত হয়ে ওঠে। তখন সে নিজের সমস্ত কিছুকে নিজের মধ্যেই বেঁধে রাখবার জন্যেই রাত্রিদিন উৎকণ্ঠিত এবং উদগ্র হয়ে থাকে— তখনই সে চারদিককে কেবলি খোঁচা দিতে থাকে। কিন্তু যখনি সে জানে বড়র মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা,— এত বড়ই সে, যে, মৃত্যুর মধ্যেও তার অন্ত নেই; এত বড়ই সে, যে, সমস্ত দুঃখ শোক ক্ষতিকে অতিক্রম করে অসীমের দিকে সে চলেচে এবং অসীমের মধ্যেই নিবিষ্ট হয়ে আছে; সেই অনন্তের মধ্যেই তার সমস্ত প্রেমের সমস্ত আনন্দের উৎস,— তখন সে আর আপনার এটা ওটা, আপনার ছোট ছোট তীক্ষ্ণ ইচ্ছা নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়ায় না— সে কাঙালের মত চাই চাই করে না তখন সে আপনাকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে— কেননা, সেই ত্যাগ তার পক্ষে ক্ষতি নয়। যখনি বিরক্ত হই, রাগি, উদ্বিগ্ন হই, ঈর্ষান্বিত হই, দুঃখ পাই— তখনি একবার

আপনাকে আপনার চিরন্তনের মধ্যে অনুভব করতে হবে; জান্‌তে হবে; এই ছোট-আমি সত্য নয়; জান্‌তে হবে আমি বড় এবং বড়র সঙ্গে আমার চিরদিনের মিলন,— আমাকে যে আমার দীনতা, নিজের প্রবৃত্তি কিম্বা বাইরের কোনো উৎপাত পরাভূত করবে এ সত্য হতেই পারে না, এ একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র, এ সমস্ত কোথায় ভেসে চলে যাবে, কিন্তু থাক্‌বে আমার অন্তরে অনন্ত, বাহিরে অনন্ত, সেই পরম জ্যোতি, পরম প্রাণ, পরম প্রেম, পরম আনন্দ— সেই পরমানন্দের উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করে দেখ্‌লে জীবনের সমস্ত দুঃখ সুখ, সংসারের সমস্ত ভাঙাগড়া একটি লীলাসৌন্দর্য্যে মুক্তরূপে দেখা দেয়— তখন তাদের ভার চলে যায় অথচ তাদের রস থাকে। আমি তোমাকে যা বল্‌চি তার সমস্ত মানে হয় ত সম্পূর্ণ না বুঝতে পার কিন্তু তবু এই কথাই আসল বলবার কথা, তাই তোমাকে বল্‌চি, এবং এই কথা বোঝবার দিকে ক্রমে তোমার মন মুক্ত হতে থাক্‌বে, নির্ম্মল হতে থাক্‌বে, আনন্দিত হতে থাক্‌বে এই আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। ইতি ২৪ ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

৩০

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু,

আজ স্নানের পর খাবার টেবিলে এসে দেখি প্লেটের পাশে তোমার হাতের অক্ষরে লেখা চিঠি রয়েচে। আজ সকালে আমার তিন ক্লাসেরই

পড়ানো ছিল। আজকাল তৃতীয় বর্গে আমার ক্লাসের বাইরের বিস্তর ছাত্র জুটেচে, বউমা, হেমলতা[১], ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রী[২], রামানন্দবাবুর মেয়েরা[৩], কালীমোহন[৪], সন্তোষ, নেপালবাবু[৫], এণ্ড্রুজ সাহেব ইত্যাদি। আজকাল ঐ বর্গের পাঠ বেশ একটু শক্ত হয়ে উঠেছে— অনেকটা কলেজ ক্লাসের মত। প্রতিদিনই অনেক বড় বড় ভাব এবং তত্ত্ব নিয়ে আমাকে আলোচনা কর্ত্তে হয়— আজ কাল শুধু কেবল ইংরেজি sentence তৈরি করা নিয়ে ওদের exercise করাই নে। তোমরা যখন ছিলে তার চেয়ে এখন ছেলেদের অনেক বেশি উন্নতি হয়েচে— ওরা ভারি ভারি ইংরেজি বাক্য তৈরি করতে এবং বুঝতে পারে, তাছাড়া অনেক বড় কথা ওরা বুঝতে পারে এবং তাতে আনন্দ পায়। সেইজন্যে ওদের পড়াতে আমার এত আনন্দ বোধ হয়। কোথায় পড়াই বল দেখি? কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবেনা। সেই লাইব্রেরি ঘরের[৬] বারান্দায় পড়ানো অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছি— ছেলেদের গোলমালে শাস্ত্রীমশায়ের[৭] সেখানে লেখাপড়ার অসুবিধা হত। তাই অনেকদিন আমার দোতলার শোবার ঘরে ক্লাস নিতুম। কিন্তু এত বেশি ছাত্রছাত্রীর ভিড় হতে আরম্ভ হল যে, ঘরে বাইরে কোথাও আর ধরছিল না। জগদানন্দ বাবুর[৮] বাসার পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ আছে— এই বটের ছায়াতলে গোল একটি চালা তুলেছি— লাইব্রেরি থেকে সেখানে আমার পাথরের আসন তুলে এনেছি— এখানে দরকার হলে আমার আসন ঘিরে একশো লোক বস্‌তে পারে। এই জায়গাটি বেশ সুন্দর দেখ্‌তে হয়েছে। ছেলেদের বলেচি, তারা নিজের হাতে এখানে আসবার রাস্তা তৈরি করে দেবে— আর চারিদিকে চান্‌কা তৈরি করে ফুলের গাছ লাগিয়ে দিয়ে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে দেবে। তুমি আমার ছাত্রী থাক্‌লে তোমাকেও এই কাজে হাত লাগাতে হত। এতদিন এখানে দিল্লির সেন্ট স্টীফেন কলেজের অধ্যক্ষ রুদ্র সাহেব[৯] ছিলেন, তিনি রোজ আমার ক্লাসে ছাত্রদের সঙ্গে বসে যেতেন— তাঁর খুব উৎসাহ ছিল—

প্রায় একমাস ছিলেন— পশুদিন তিনি চলে গেছেন।

গেল বুধবারে[১০] সকালে আমি মন্দিরে কি বলেছিলুম শুন্‌বে? আমি বলেছিলুম, মানুষের ছোট আর বড়, দুই আছে। সেই ছোট মানুষটি জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে কয়দিনের জন্যে আপনার একটি ছোট সংসার পেতেছে— সেইখানে তার যত খেলার পুতুল সাজানো— সেইখানে তার প্রতিদিনের আহরণ জমা হচ্চে আর ক্ষয় হচ্চে। কিন্তু মানুষের ভিতরকার বড়টি জন্মমৃত্যুর বেড়া ডিঙিয়ে চিরদিনের পথে চলেছে— এই চলবার পথে তার কত সুখ দুঃখ, কত লাভ ক্ষতি ঝরে' পড়ে' মিলিয়ে যাচ্চে। পৃথিবীর দুটি আবর্ত্তন আছে ; একটি আহ্নিক [য], একটি বার্ষিক, একটি আবর্ত্তনে সে আপনাকেই ঘুরচে, আর একটিতে সে নিজের চিরপথের কেন্দ্রস্থিত আলোকের উৎসকে প্রদক্ষিণ করচে। নিজেকে ঘোরবার সময় সূর্য্যের দিকে পিঠ ফেরাতেই দেখ্‌তে পায় যে, তার নিজের কোনো আলো নেই, তার নিজের দিকে অন্ধতা, ভয়, জড়তা। কিন্তু নিজের সেই অন্ধকারটুকুকে না জান্‌লে সূর্য্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধের পূর্ণ পরিচয় সে পেত না। আমরাও আমাদের ছোট আবর্ত্তনে নিজেকে ঘুরি— এ ঘোরাতেই জান্‌তে পারি, আমার দিকে অন্ধকার, বিভীষিকা, মোহ, আমার দিকে ক্ষুদ্রতা— কিন্তু সেই জানার সঙ্গে সঙ্গেই যখন সেই অমৃতের উৎসকে জানি, তখন অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমরা যেতে থাকি— এই জন্যে আপনাকে আর তাঁকে দুইকেই একসঙ্গে জান্‌তে থাক্‌লে তবেই আমরা আমাদের বন্ধনকে নিয়ত অতিক্রম করতে করতে মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে অমৃতের পাথেয় সংগ্রহ করতে করতে চিরদিনের পথে চল্‌তে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিদিন আমাদের বৃহৎ চিরদিনকে প্রণাম করতে করতে চল্‌তে থাক্‌বে— আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিদিন তার সমস্ত আহরণগুলিকে বৃহৎ চিরদিনের চরণে সমর্পণ করতে করতে চল্‌বে। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রতিদিন যদি এমন কথা বলে বসে যে, আমি

যা পাই যা আনি সব আমি নিজে জমাব, তা হলেই বিপদ বাধে। কেন না, তার জমাবার জায়গা কোথায়? তার মধ্যে এত ধরবে কোথায়? তার এমন অক্ষয় পাত্র আছে কোন্‌খানে? পৃথিবী যেমন তার সোনায় ভরা সকালটিকে এবং সোনায় ভরা সন্ধ্যাটিকে নিজে জমিয়ে রেখে দেয় না, পূজার স্বর্ণকমলের মত আপন সূর্য্যপ্রদক্ষিণের পথে প্রত্যহ প্রণাম করে উৎসর্গ করতে করতে চলেচে, আমাদেরও তেমনি এই ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ ভালবাসাকে চিরজীবনের চলবার পথে চিরজীবনের দেবতাকে উৎসর্গ করতে করতে যেতে হবে— তা হলেই ছোট আমির সঙ্গে বড় আমির মিল হবে— তাহলেই আমাদের ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হবে। আপনার দিকে সমস্ত টান্‌তে গেলেই সে টান টেকে না, সে বিদ্রোহে ছোট-আমিকে একদিন পরাস্ত হতেই হয়। এই জন্য ছোট-আমি জোড়ে [য] হাতে প্রার্থনা করচে, নমস্তেহস্তু— বড়কে আমার নমস্কার সত্য হোক্‌, নিজের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাই। ইতি ২৯ ভাদ্র ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

৩১

২১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু,

আজ সকালে তোমার চিঠি পেয়েছিলুম কিন্তু তখনি তার জবাব দেবার সময় পাই নি। দুপুর বেলাতেও খাবার পরে কিছু কাজ ছিল, তাই এখন

বিকেলে তোমাকে তাড়াতাড়ি লিখ্‌তে বসেছি— ডাক যাবার আগে শেষ করে ফেল্‌তে হবে। আজকাল আর বৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই,— আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমার সেই লেখবার কোণটা ত তুমি জান— সেটা হচ্চে পশ্চিমের বারান্দা— সেখানে বিকেলের দিকে হেলে-পড়া সূর্য্যের সমস্ত কিরণ বন্ধ-দরজার উপর ঘা দিতে থাকে— সশরীরে ঢুকতে পায় না বটে কিন্তু তার প্রতাপ অনুভব করতে পারি। তুমি এখন যেখানে আছ সেখান থেকে আমার পিঠের দিকের বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক আন্দাজ করতে পারবে না। কিন্তু আমার আকাশের মিতাটি আমার সঙ্গে যেমনি ব্যবহার করুন তাঁর সঙ্গে আমার কখনই বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয়নি। আমি চিরদিন আলো ভালোবাসি— গাজিপুরে[১] পশ্চিমের গরমেও আমি দুপুর বেলায় আমার ঘরের দরজা বন্ধ করি নি। অনেকদিন বর্ষার আচ্ছাদনের পর সেই আলো পেয়েছি— সেই আলো আজ আমার দেহের মধ্যে মগজের মধ্যে মনের মধ্যে প্রবেশ করচে। আমার সাম্‌নে পূর্ব্বদিকের ঐ খোলা দরজা দিয়ে ঐ আলো নীল আকাশ থেকে আমার ললাটে এসে পড়চে, আর সবুজ ক্ষেত্রের উপর দিয়ে এসে আমার দুই চোখের সঙ্গে যেন কানে কানে কথা বল্‌চে। পৃথিবীর ইতিহাসে কত হানাহানি কাটাকাটি হয়ে গেল, মানুষের ঘরে ঘরে কত সুখ দুঃখ কত মিলন বিচ্ছেদ কত যাওয়া আসার বিচিত্র লীলা প্রতিদিন বিস্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে গেল, কিন্তু এই শরতের নীল আকাশের নির্ম্মল রৌদ্রটি এই শরতের সবুজ পৃথিবীর প্রসারিত অঞ্চলের উপরে যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে আপন আসন অধিকার করেছে— কিছুতেই এই সুগভীর শান্তি সৌন্দর্য্যের পরে এই রসপরিপূর্ণ নির্ম্মলতার উপরে কোনো আঘাত করতে পারে নি। সেই কথা যখন মনে করি তখন সাম্‌নের ঐ আকাশের দিকে চেয়ে যুগ যুগান্তরের সেই শান্তি আমার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ক্ষোভকে আপন অসীমতার মধ্যে মিশিয়ে নেয়।

আমি বুধবারে কি বলি তাই তুমি শুন্‌তে চেয়েচ। যা বলি তা আমার

ভাল মনে থাকে না। এণ্ড্রুজ উপাসনার পরেই আমার কাছে এসে একবার ইংরেজিতে তার ভাবখানা শুনে নেন তাই খানিকটা মনে পড়ে। এবারে বলেছিলুম, জগতে একটা খুব বড় শক্তি হচ্চে প্রাণ— অথচ সেই শক্তি বাইরের দিক থেকে কত ছোট কত সুকুমার, একটু আঘাতেই ম্লান হয়ে যায়। এমন জিনিসটা প্রতি মুহুর্ত্তে বিপুল জড় বিশ্বের ভারাকর্ষণের সঙ্গে প্রতি মুহুর্ত্তে লড়াই করে দাঁড়িয়ে আছে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বালক অভিমন্যু যেমন সপ্তরথীর ব্যূহে ঢুকে লড়াই করেছিল আমাদের সুকুমার প্রাণ তেমনি অসংখ্য মৃত্যুর সৈন্যদলের মধ্যে দিয়ে অহর্নিশি লড়াই করে চলেচে। বস্তুর দিক থেকে দেখ্‌লে দেখা যায় এই প্রাণের উপকরণ অতি তুচ্ছ, খানিকটা জল, খানিকটা কয়লা, খানিকটা ছাই, খানিকটা ঐ রকম সামান্য কিছু, অথচ প্রাণ আপনার এই বস্তুর পরিমাণকে বহু পরিমাণে অতিক্রম করে আছে। মৃতদেহে সজীব দেহে বস্তু পিণ্ডের পরিমাণের তফাৎ নেই অথচ উভয়ের মধ্যকার তফাৎ অপরিসীম। শুধু এই নয়, সজীবের বর্ত্তমান আবরণের মধ্যে তার প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ কি করে যে প্রচ্ছন্ন থাকে তাও ভেবে পাওয়া যায় না। ছোট বীজের মধ্যে মহারণ্য লুকিয়ে আছে। ছোটর মধ্যে এই যে বড়র প্রকাশ এই হচ্চে আশ্চর্য্য। আরেক শক্তি হচ্চে, মনের শক্তি। এই মনটি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় নিয়ে এই অসীম জগতের রহস্য আবিষ্কার করতে বেরিয়েচে। সেই ইন্দ্রিয়গুলি নিতান্ত দুর্ব্বল— চোখ কতটুকুই দেখে, কান কতটুকুই শোনে, স্পর্শ কতটুকুই বোধ করে। কিন্তু মন এই আপন ক্ষুদ্রতাকে কেবলি ছাড়িয়ে যাচ্চে— অর্থাৎ সে যা সে তার চেয়ে অনেক বড়। তার উপকরণ সামান্য হলেও সে অতিক্ষুদ্র এবং অতিবৃহৎ অতিনিকট এবং অতিদূরকে কেবলি অধিকার করচে। তা ছাড়া, তার মধ্যে যে ভবিষ্যৎ প্রচ্ছন্ন সেও অপরিমেয়। একটি ছোট শিশুর মনের মধ্যেই নিউটনের শেকস্পীয়রের মন লুকিয়ে ছিল। বর্ব্বরতার যে মন পাঁচের বেশি গণনা করতে পারত না, তারি মধ্যে

আজকের সভ্যতার মন জ্ঞানের সাধনায় অভাবনীয় সিদ্ধি লাভ করেচে। শুধু তাই নয়, আরো ভবিষ্যতে সে যে আরো কি আশ্চর্য্য চরিতার্থতা লাভ করবে আজ আমরা তা কোনোমতে কল্পনাই করতে পারিনে। তা হলেই দেখা যাচ্চে আমাদের এই যে মন, যা একদিকে খুব ছোট খুব দুর্ব্বল দেখ্‌তে, আর একদিকে তার মধ্যে যে ভূমা আছে হিমালয়ের পর্ব্বতের প্রকাণ্ড আয়তনের মধ্যে তা নেই। তেমনি আমাদের আত্মা ছোট দেহ ছোট মন ছোট সব প্রবৃত্তি দিয়ে ঘেরা— অনেক সময়ে তাকে যেন দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু তার মধ্যেই সেই ভূমা আছেন। সেই জন্যেই ত একদিকে আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা আমাদের রাগ বিরাগ যখন আমাদের কাছে অন্নবস্ত্র ও অন্য হাজার রকম বাসনার জিনিসের জন্যে দরবার করছে, সেই মুহূর্ত্তেই এই প্রবৃত্তির দাস এই বাসনার বন্দী, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ পায়ের নীচে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেচে, অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। যা অসীম একেবারে তাকেই চাই। এত বড় চাওয়ার জোর এতটুকুর মধ্যে আছে কোথায়? সে জোর যদি না থাক্‌ত তবে এত বড় কথা তার মুখ দিয়ে বেরত কেমন করে? এ কথার কোনো মানে সে বুঝত কি করে? আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্চে এই যে মানবের আত্মা যা নিয়ে দেখ্‌চে শুন্‌চে ছুঁচ্চে খাওয়া পরা করচে তাকেই চরম সত্য বল্‌তে চাচ্চে না— যাকে চোখে দেখ্‌ল না, হাতে পেল না তাকেই বল্‌চে সত্য। তার একটি মাত্র কারণ, ছোটর মধ্যেই বড় আছেন। সেই বড়ই ছোটর ভিতর থেকে মানুষের আত্মাকে কেবলি মুক্তির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্চেন— তাই মানুষের আশার আর অন্ত নেই। এখন, প্রত্যেক মানুষের কাজ হচ্চে কি? নিজের কথায় চিন্তায় ব্যবহারে এইটেই যেন প্রকাশ করি যে, আমাদের মধ্যে সেই বড়ই সত্য— তা না করে যদি মানুষের ছোটটার উপরেই ঝোঁক দিই, যে সব বাসনা তার শিকল, তার গণ্ডী, যাতে তাকে খর্ব্ব করে আচ্ছন্ন করে রেখেচে তাকেই যদি কেবল প্রশ্রয় দিই তাহলে

মানুষকে তার সত্য পরিচয় থেকে ভোলাই। আত্মা যে অমর, আত্মা যে অভয়, আত্মা যে সমস্ত সুখ দুঃখ ক্ষতি লাভের চেয়ে বড়, অসীমের মধ্যে যে আত্মার আনন্দনিকেতন এই কথাটি প্রকাশ করাই হচ্চে মানুষের সমস্ত জীবনের অর্থ— এই জন্যেই আমরা এত শক্তি নিয়ে এত বড় জগতে জন্মেছি— আমরা ছোটখাটো এটা ওটা সেটা নিয়ে রেগে ভেবে কেঁদে মরতে আসি নি। ইতি ৪ঠা আশ্বিন পূর্ণিমা ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

৩২

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু,

তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেচ, রবিদাদা না বলে আমাকে আর একটা কোন্ নামে সম্ভাষণ করতে পার? মহাভারতের সময়ে মানুষের এক এক জনের দশ বিশটা করে নাম থাক্‌ত, যার যেটা পছন্দ বেছে নিতে পারত, কিম্বা যে ছন্দে যেটা মেলাবার সুবিধে লাগিয়ে দিলেই চল্‌ত। অর্জ্জুনের কত নাম যে ছিল তা অর্জ্জুনকে রোজ বোধ হয় নাম্‌তা মুখস্থ করার মত মুখস্থ করতে হত। আমার যে আকাশের মিতাটি আছেন তাঁরও নামের অভাব নেই। যদি তাঁর দুটো একটা নাম ধার করে নিতে চাও তাহলে বোধ হয় তাঁর বিশেষ কিছু লোকসান হবে না। কিন্তু যখন নামকরণ করবে তখন আমার সম্মতি নিলে ভাল হয়। প্রথম যখন আমার নামকরণ হয় তখন কেউ আমার সম্মতি নেয় নি— কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্চি নামটা মন্দ

হয় নি— কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার "মার্ত্তণ্ড" নামটাই পছন্দ হয় তাহলে কিন্তু আমি আপত্তি করব। ভানু নামটা যদিচ খুব সুশ্রাব্য নয় তবু ওটা আমি একদা নিজেই গ্রহণ করেছিলুম[১]— ওর আর একটুখানি সুবিধা আছে— ওটা "রাণুর" সঙ্গে মিলে যায়—

এক যে ছিল রাণু
তার দাদা ছিল ভানু।

আর এক হতে পারে, যদি "কবিদাদা" বল। নামটা ঠিক সঙ্গত হোক্ বা না হোক্ ওটা আমার নিজের নামের সঙ্গে মেলে—

এক যে ছিল রবি
সে গুণের মধ্যে কবি।

কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। প্রিয় কবিদাদা বল্‌লে চল্‌বে না। প্রথম কারণ হচ্চে এই যে, তোমার প্রিয় কবি যে কে তা আমি ঠিক জানি নে— খুব সম্ভব যে লোকটা সেই আশ্চর্য্য হিন্দী দোঁহা লিখেছিল সেই হবে— তার সঙ্গে ছ অক্ষরের অনুপ্রাসে আমি যে কোনোদিন পাল্লা দিতে পারব এমন শক্তি বা আশা আমার নেই দ্বিতীয় কারণ হচ্চে এই যে, ইংরেজিতে প্রিয় বলে না এমন মানুষই নেই, সে অমানুষ হলেও তাকে বলে— এমন কি, সে যদি দোঁহা না লিখ্‌তে পারে তবুও। আমার মত হচ্চে এই যে, রাস্তাঘাটের সবাইকেই যদি প্রিয় বল্‌তে হবে এমন নিয়ম থাকে তবে দুই এক জায়গায় সে নিয়মটা বাদ দেওয়া দরকার। অতএব, আমাকে যদি শুধু রবি দাদা বল তাহলে আমি রাগ করব না— এমন কি, যদি মার্ত্তণ্ড নামটাই তোমার পছন্দ হয়, তাহলে "প্রিয় মার্ত্তণ্ড দাদা" লিখো না— তাহলে বরঞ্চ লিখো, মার্ত্তণ্ড দাদা, প্রচণ্ড প্রতাপেষু। যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে রাগারাগি করি তাহলে আমাকে ঐ নামে ডাক্‌লেই হবে।

আমাদের আশ্রমের আকাশে শারদোৎসব আরম্ভ হয়েছে— শিউলি বন সাড়া দিয়েছে— মালতীলতার পাতায় পাতায় শুভ্র ফুলের অসংখ্য

অনুপ্রাস— কিন্তু রাত্রে চাঁদের আলোয় আকাশজোড়া একখানি মাত্র শুভ্রতা— আমাদের লাল রাস্তার দুই ধারে কাশের গুচ্ছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাতাসে মাথা নত করে করে পথিকদের শারদসঙ্গীত শুনিয়ে দিচ্চে। সমস্ত সবুজ মাঠে, সমস্ত শিশির সিক্ত বাতাসে উৎসবের আনন্দ হিল্লোল বয়ে যাচ্চে। অন্তরে বাইরে ছুটি ছুটি ছুটি এই রব উঠেচে। ছুটিরও আর কেবল প্রায় দুই সপ্তাহ বাকি আছে। আমাদের যখন ছুটি আরম্ভ তোমাদের তখন শৈলপ্রবাস বোধহয় সাঙ্গ হবে। পার্ব্বতী যখন হিমালয়ে তাঁর পিতৃভবনে যাবেন তখন তোমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেখানে থাক্‌বে না। কিন্তু হিমালয়ের খবর আমরা রাখি নে— কৈলাসের ত নয়ই— আমরা ত এই স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি স্বর্ণকিরণচ্ছটায় শারদা আমাদেরই ঘর উজ্জ্বল করে দাঁড়িয়েচেন; গোটাকতক মেঘ দিগন্তের কোণে মাঝে মাঝে জটলা করে কিন্তু তাদের নন্দীভৃঙ্গীর মত কালো চেহারা নয়— তারাও শ্বেত কিরণের মালা পরেছে, শ্বেত চন্দনের ছাপ লাগিয়েছে— ললাটে ভ্রূকুটির লেশ নাই। ইতি ৬ই আশ্বিন ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৩৩

১ অক্টোবর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু,

তোমাকে যদি "প্রিয় রাণু" লিখি তা হলে কি রকম শোনায়? তাহলে আমি জানি তুমি নিশ্চয় রাগ করবে— কেন রাগ করবে বল্‌ব? কেন না,

প্রিয় বিশেষণটাকে যদি চিঠি লেখবার একটা পাঠ করে তোলা যায় তা হলেই ওর সত্যকার মানেটা দৌড়ে পালায়। অথচ "প্রিয়" শব্দটার খুব একটা মস্ত মানে— অত বড় মানে যখন পালিয়ে যায় তখন শূন্য কথাটা ভয়ঙ্কর একটা ফাঁকির মত পরিহাস করে। প্রথম যখন তোমার চিঠি পেয়েছিলুম তখন তোমার চিঠিতে "প্রিয় রবিবাবু" পড়ে ভারি মজা লেগেছিল। ভাবলুম রবিবাবু আমার প্রিয় হবে কেমন করে? যদি হত প্রিয় মিস্টার ট্যাগোর, তাহলে তেমন বেমানান হত না। কেননা রবিবাবু প্রিয়ও হতে পারে, অপ্রিয়ও হতে পারে, এবং প্রিয় অপ্রিয় দুইয়ের বাহিরেও হতে পারে। তুমি যখন চিঠি লিখেছিলে তখন রবিবাবু প্রিয়ও ছিল না অপ্রিয়ও ছিল না, নিতান্ত কেবলমাত্র রবিবাবুই ছিল। কিন্তু চিঠির ভাষায় মিস্টার ট্যাগোরের প্রিয় ছাড়া আর কিছু হবার জো নেই, তা আমার সঙ্গে তোমার ঝগড়াই থাক আর ভাবই থাক্। আজকাল রবিবাবু পরীক্ষায় একেবারে দু তিন ক্লাস উঠে "রবিদাদা" হয়েচে, কিন্তু এখনো পত্রে তার প্রিয় খেতাব ঘুচল না। এই "প্রিয়" যদি ইংরেজি কায়দার প্রিয় হয় তাহলে কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে— আমিও আমার চিঠিতে তার শোধ তুলব তবে ছাড়ব। আর যদি বিশুদ্ধ বাংলা মতে হয় তা হলে আপত্তি নেই বটে, তবু, যখন আমি রবিদাদা তখন ওটা বাদ দিলেও চলে— ও যেন সকালবেলায় বাতি জ্বালানো, যেন যার ফাঁসি হয়েচে তাকে কুড়ি বৎসর দ্বীপান্তর দেওয়া। অতএব আমি যেন থানধুতি পরা ঠাকুরদাদা, আমার কোনো পাড় নেই— আমি নিতান্তই সাদা রবিদাদা। কি বল? মাঝে মাঝে আমাকে তোমার সাজাবার সখ যায় বটে কিন্তু আমার কোনো সাজ নেই বলেই তুমি সাজিয়ে সখ মেটাতে পার।

তোমরা মুক্তেশ্বরে[১] গেছ শুনে খুসি হলুম। আমি ভ্রমণ করতে ভালবাসি— কিন্তু ভ্রমণের কল্পনা করতে আরো ভাল লাগে। কেননা, কল্পনার বেলায় রেলগাড়ি ঘটর ঘটর করে না, বেরেলিতে তিন চার ঘন্টা

বসে থাক্‌তে হয় না, ডাণ্ডি অতি অনায়াসে এবং ঠিক সময়েই মেলে।'
তুমি তোমার নবীন দৃষ্টি নিয়ে নতুন নতুন দৃশ্য দেখ্‌চ তোমার সেই আনন্দ আমি মনে মনে অনুভব করচি। আমি আমার এই খোলা ছাদে লম্বা কেদারায় শুয়ে শুয়ে গিরিতটে তোমার দেবদারুবনে ভ্রমণের সুখ মনে মনে সঞ্চয় করি। আমিও প্রায় তোমার বয়সেই হিমালয়ে গিয়েছিলুম— ড্যালহৌসীতে বক্রোটা শিখরের উপরে থাকতুম— এক একদিন, আমাদের বাড়ির খানিক নীচে এক দেবদারুবনে সকালে একলা বেড়াতে যেতুম। আমি ছিলুম ছোট্ট— (তখন লম্বায় ছ ফুট ছিলুম না) তাই গাছগুলোকে এত প্রকাণ্ড বড় মনে হত সে আর কি বল্‌ব। সেই সব গাছের সুদীর্ঘ ছায়ার মধ্যে নিজেকে দৈত্যলোকের অতি ক্ষুদ্র এক অতিথি বলে মনে হত' কিন্তু সেই আমার ছেলেবেলাকার পর্ব্বত, ছেলেবেলাকার বন এখন আর পাব কোথায়? এখন আমার মনটা এই জগতের পথে এত নিজের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চলে, যে নিজের চলার ধূলোয় এবং নিজের রথের ছায়ায় জগৎটাকে বারো আনা ঢাকা পড়ে যায়— বাজে ভাবনার ঝাঁকের মধ্যে দিয়ে জগৎটা আর তেমন করে দেখা যায় না। তাই আজ তুমি যে-পাহাড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চ, মনে হচ্চে সে আমার সেই অল্পবয়সের পৃথিবীর পাহাড়— আমার সেই ৪৫। ৪৬ বৎসরের আগেকার আমি তোমার মনের মধ্যে দিয়ে তোমার চোখ নিয়ে সেই সেকালের গিরিঅরণ্যে আর একবার ঘুরে বেড়াচ্চে। আমরা পুরোণো হয়ে উঠে নিজের হাজার রকম চিন্তায় এই পৃথিবীটাকে যতই জীর্ণ করে দিই না কেন, মানুষ আবার ছেলেমানুষ হয়ে নূতন হয়ে চিরনূতন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। শুধু একদল মানুষ যদি চিরকালই বৃদ্ধ হতে হতে পৃথিবীতে বাস করত তাহলে বিধাতার এই পৃথিবী তাদের নস্যো, তামাকের ধোঁয়ায় তাদের পাকা বুদ্ধির আওতায় একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেত, স্বয়ং বিধাতা তাঁর নিজের সৃষ্ট এই পৃথিবীকে চিন্‌তে পারতেন না। কিন্তু জগতে শিশুর ধারা কেবলি আসচে নবীন

চোখ নবীন স্পর্শ নবীন আনন্দ ফিরে ফিরে মানুষের ঘরে অবতীর্ণ হচ্চে— তাই প্রাচীনদের অসাড়তার আবর্জ্জনা দিনে দিনে বারে বারে ধুয়ে মুছে পৃথিবীর চিররহস্যময় নবীন রূপকে উজ্জ্বল করে রাখ্‌চে। অন্য মানুষদের সঙ্গে কবিদের তফাৎটা কি জান? বিধাতার নিজের হাতের তৈরি শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতে ঘোচে না— কোনোদিন তাদের চোখ বুড়ো হয় না, মন বুড়ো হয় না, তাই চিরনবীন এই পৃথিবীর সঙ্গে তাদের চিরদিনের বন্ধুত্ব থেকে যায়— তাই চিরদিনই তারা ছোটদের সমবয়সী হয়ে থাকে। সংসারে বিষয়ের মধ্যে যারা বুড়ো হয়ে গেছে তারা চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারার চেয়ে বয়সে বড় হয়ে ওঠে— তারা হিমালয়ের চেয়ে বড় বয়সের— কিন্তু কবিরা সূর্য্য চন্দ্র তারার মত চিরদিনই কাঁচাবয়সী— হিমালয়ের মতই তারা সবুজ থাকে ছেলেমানুষীর ঝরনাধারা কোনো দিনই তাদের শুকোয় না। লোকালয়ে বিশ্বজগতের নবীনতার বার্ত্তা এবং সঙ্গীত চিরদিন তাজা রাখবার জন্যেই কবিদের দরকার— নইলে তারা আর সকল বিষয়েই অদরকারী।

উচ্চ হাস্যে সকৌতুকে চিরপ্রাচীন গিরির বুকে
ঝরে পড়ে চির-নূতন ঝর্‌না;
নৃত্য করে তালে তালে প্রবীণ বটের ডালে ডালে
নবীন পাতা ঘন-শ্যামল বর্ণা।
পুরাণো সেই শিবের প্রেমে নূতন হয়ে এল নেমে
দক্ষসুতা ধরি উমার অঙ্গ,
এম্‌নি করে সারাবেলা চল্‌চে লুকাচুরি খেলা
নূতন-পুরাতনের চির-রঙ্গ।

ইতি ১৪ই আশ্বিন ১৩২৫

তোমার রবিদাদা

৩৪

[২ অক্টোবর ১৯১৮][১]

ঔঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, আচ্ছা বেশ, রাজি। ভানুদাদা নামই বহাল হল। এ নামে আজ পর্য্যন্ত আমাকে কেউ ডাকে নি। আর-কেউ যদি ডাকে তবে তার উত্তর দেব না। সিণ্ডারেলার গল্প জান ত? তার এক পাটি জুতো নিয়ে রাজার ছেলে পা মেপে বেড়াতে লাগ্‌ল। আমার ভানু নামটা সেইরকম যদি কেউ ব্যবহার করতে যায় আমি তখনি বল্‌তে পারব— আচ্ছা আগে নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ— যার নাম সুরবালা, সে বল্‌বে সুরো সুরু সুরি কিছুতেই ভানুর সঙ্গে মিল্‌বে না, যার নাম মাতঙ্গিনী সে বল্‌বে মাতু মাতি মাতো কিছুতেই মিল্‌বে না, তিনকড়িরও সেই দশা, কাত্যায়নীরও তাই; জগদম্বা, পীতাম্বরী, গুরুদাসী, শঙ্খেশ্বরী, খগেন্দ্রমোহিনী, কারোই কাছে ঘেঁষবার জো নেই। ভারী সুবিধে হয়েচে। কেবল আমার মনে ভারি ভয় রয়ে গেল, পাছে কারো নাম থাকে "কানু বিলাসিনী।" তবে তাকে কি বলে ঠেকাব? তুমি ভেবে রেখে দিয়ো।

ছুটির দিন এল— পর্শু ছুটি।[২] তার পরে কি করব? তখন কেবল শিউলি বন, শিশির ভেজা ঘাস, আর দিগন্ত প্রসারিত মাঠ আমার মুখ তাকিয়ে থাক্‌বে— তারা ত আমার কাছে ইংরেজি শিখ্‌তে চায় না— তারা চায় আমার মনের মধ্যে যে আনন্দের সোনার কাঠি আছে সেইটে ছুঁইয়ে দিয়ে তাদের জাগিয়ে তুলব এবং আমার চেতনার সঙ্গে তাদের সৌন্দর্য্যকে মিলিয়ে নেব। আমার জাগরণের ছোঁয়াচ না লাগ্‌লে পরে প্রকৃতি জাগ্‌বে কি করে? নীলাকাশের কিরণ কমলের উপরে শারদলক্ষ্মী আসন গ্রহণ করেন— কিন্তু আমার চোখের আনন্দ দৃষ্টি না পড়লে পরে সে পদ্মই ফোটে না।

আজ বুধবার। আজ মন্দিরে ছুটির ঠাকুরের কথা বলেচি। যখন আমরা কাজ করতে থাকি তখন শক্তির সমুদ্র থেকে আমাদের মধ্যে জোয়ার আসে— তখন আমরা মনে করি এ শক্তি আমারই এবং এই শক্তির জোরেই আমরা বিশ্ব জয় করব। কিন্তু শক্তিকে বরাবর খাটাতে ত পারি নে— সন্ধ্যা যখন আসে তখন ত কাজ বন্ধ হয়, তখন ত আর গাণ্ডীব তুল্‌তে পারি নে। তাই জীবনে জোয়ার ভাঁটার ছন্দকে মেনে চলা চাই। একবার আমি, একবার তুমি। সেই তুমিকে বাদ দিয়ে যখন মনে করি আমিই কর্ত্তা— তখনই জগতে মারামারি বেধে যায়— রক্তে ধরণী পঙ্কিল হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তুমিকে মানলেই শান্তি। মা তাঁর মেয়েকে ডেকে বলেন, সংসারের কাজে তুমি আমার সঙ্গে লেগে যাও। মেয়ে তখন কোমর বেঁধে লাগে। কিন্তু সে যখন ভুলে যায় যে, এ কাজ তার মায়ের সংসারেরই কাজ, যখন অহঙ্কার করে ভাবে আমি যেমন ইচ্ছা তাই করব, তখন সে সংসারের ব্যবস্থাকে উলট্ পালট করে জঞ্জাল জমিয়ে তোলে— অবশেষে এমন হয় যে মা ঝাঁটা হাতে নিয়ে সমস্ত আবর্জ্জনা ঝেঁটিয়ে ফেলেন। মেয়ের সেই কাজটুকুর উপরে ঝাঁটা পড়ে না যে-কাজ মায়ের সংসারব্যবস্থার সঙ্গে মেলে। সংসারস্থিতির সঙ্গে এই যে মিলিয়ে কাজ করা এতে আমাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে— অর্থাৎ মিল রেখেও আমরা তার মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র রাখতে পারি— তাতেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য— মেয়ের হাতের কাজটুকু মায়ের অভিপ্রায়কে প্রকাশ করেও নিজেকে বিশিষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে যখন তাই সে করে তখন তার সেই সৃষ্টি মায়ের সৃষ্টির সঙ্গে মিলে স্থিতি লাভ করে। বিশ্বকর্ম্মার কাজে আমরা যখন যোগ দিই তখন যে পরিমাণে তাঁর সঙ্গে মিল রেখে ছন্দ রেখে চলি সেই পরিমাণে আমাদের কাজ অক্ষয়কীর্ত্তি হয়ে ওঠে— যে পরিমাণে বাধা দিই সেই পরিমাণে আমরা প্রলয়কে ডেকে আনি। নিজের জীবনকে এই প্রলয় থেকে যদি বাঁচাতে চাই— তাহলে প্রতিদিনই আমি তুমির ছন্দ মিলিয়ে চল্‌তে

হবে— সেই ছন্দেই মানুষের সৃষ্টি মানুষের ইতিহাস অমরতা লাভ করে। দেখ্‌চ ত, মা আজ পশ্চিমের ঘরে কি রকম প্রলয়ের সম্মার্জ্জনী নিয়ে বেরিয়েচেন। পশ্চিমের সভ্যতা মনে করছিল, তার শক্তি তার নিজেরই ভোগ, নিজেরই সমৃদ্ধির জন্যে— সে আমি তুমির ছন্দকে একেবারে মানে নি— কিছুদূর পর্য্যন্ত সে বেড়ে উঠ্‌ল— মনে করল সে বেড়েই চল্‌বে— এমন সময়ে ছন্দের অমিল ঘোচাবার জন্যে হঠাৎ একমুহূর্ত্তেই মায়ের প্রলয় অনুচর এসে হাজির। এখন কান্না, আর বক্ষে করাঘাত। ইতি ১৬ই আশ্বিন ১৩২৫ [১৫ আশ্বিন ১৩২৫]

তোমার ভানুদাদা

৩৫

৯ অক্টোবর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, "প্রিয় রবিবাবুর" যে ব্যাখ্যা দিয়েছ[১] এর পরে তোমার সঙ্গে আমার আর ঝগড়া চল্‌তেই পারে না। মাঝে মাঝে ঝগড়া করবার একটা উপলক্ষ্য পেলে মনটা খুসি হয়ে ওঠে— কেননা নিশ্চয় জানি সে ঝগড়া বেশ ভাল রকম করেই মিটে যাবে। নইলে যেখানে জানি ঝগড়াটা সত্যিকার ঝগড়া সেখানে আমি বড় ঘেঁষি নে। তাই লোকের কাছ থেকে অনেক সময় অনেক গাল খেয়েচি কিন্তু জবাব দিই নে। কেন না সেখানে জবাব দেওয়াই হার, সেখানে রাগ করাই লজ্জা। কিন্তু রাণুতে ভানুতে যখন ঝগড়া চলবে তখন আমি খুব কসে জবাব দেব, সহজে হার মান্‌ব না।

তখন কণ্ঠে আমাদের আওয়াজ যতই চড়তে থাক্বে মনে মনে রাণুও হাস্বে ভানুও হাস্বে কি বল? হাসাটা আমার স্বভাব— যার সঙ্গে আমার হাসি চলে না তার সঙ্গে আমার কোনো ব্যবহার চলাই শক্ত। যমরাজ যখন সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দূত পাঠাবেন তখনো যেন তার সঙ্গে হেসে নিতে পারি। যিনি আমার আকাশের মিতা তিনিও কম হাসেন না— কিন্তু এক এক সময় তাঁর হাসি বড় প্রখর হয়ে ওঠে— মানুষের সর্দ্দি গর্ম্মি লাগে। আমার যখন বয়স অল্প ছিল তখন মাঝে মাঝে আমার হাসিও কম প্রখর হয়ে উঠ্ত না— সেই খর দাহনের ইতিহাস তখনকার কাগজপত্র ঘাঁট্লে খুঁজে পাবে।[২] কিন্তু এখন আমার সে দিন গেছে। তুমি যে ভানুটিকে পেয়েচ সে সন্ধ্যাবেলাকার ভানু— তার হাসি রঙিন কিন্তু উগ্র নয়, তার হাসি ভূতলকে স্নিগ্ধ চুম্বন করে আনন্দিত— তাকে দিগন্তের বনজঙ্গল আড়াল করে ফেলে, তাদের ডালপালার খোঁচা দিয়ে তার ললাটে আঁচড় কাট্তে চায়— কিন্তু সে ক্ষমা করে বিদায় নিতে চায়— আপনার শান্তির মধ্যে আপনি প্রচ্ছন্ন হওয়াই তার কামনা। একটা কথা তোমার চিঠির মধ্যে লিখেচ সেটা আমার কাছে খুব মজার লাগ্ল। তুমি লিখেচ যখন তুমি আমাকে প্রথম চিঠি লিখেছিলে— যখন তুমি আমাকে চক্ষেও দেখ নি এবং আবিষ্কার কর নি যে আমার বয়স সাতাশ তখনো তুমি আমাকে ভালবাস্তে। কেমন করে হল? বোধহয় পূর্ব্বজন্মে যে সব চিঠি লিখ্তে সে চিঠিটা তারই অনুবৃত্তি— তাই একদম লিখে দিয়েছিলে, প্রিয় রবিবাবু, কিছুই ভাবতে হয় নি। এক জন্মের সঙ্গে আর এক জন্ম দৈবাৎ এক এক সময় ঠিক জোড়া লেগে যায়— তখন এক পরিচ্ছেদের সঙ্গে আর এক পরিচ্ছেদের মিলে যেতে আর বিলম্ব হয় না। আমি হয়ত বা আমার সাতাশ বছর বয়সটাকে সেইখান থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেচি— কিন্তু সে কথাটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। আমার কুষ্ঠিটা আমার মাথা

খারাপ করে দিয়েচে। কিন্তু ইতিহাসে তারিখের ভুল এত আছে যে আমার ইতিহাসের তারিখেও ভুঁল থাকা খুবই সম্ভব।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে গেছে। ছেলেরা সব চলে গেছে— যেখানে ক্লাস নিতুম সেই বটতল একেবারে নিঃশব্দ— কেবল শালিখ পাখীগুলো বোধ হয় আমাকে ঠাট্টা করে' মাঝে মাঝে আমার পঞ্চমবর্গের ছাত্রদের মতই গোলমাল করে আমার ক্লাসের নকল করবার চেষ্টা করে। ভেবেছিলুম এইখানেই আমার সমস্ত ছুটিটা নিস্তব্ধ হয়ে কাটিয়ে দেব। কিন্তু সে হয়ে উঠ্‌লনা। একবার মাদ্রাজের দিকে আমাকে যেতেই হবে। হয়ত কাল পর্শুর মধ্যেই চলে যাব।° শরীরের জন্যে একটু জায়গা বদল করারও দরকার আছে। তা ছাড়া আশ্রমে থাক্‌লে আশ্রমে আসার সুখটা পাওয়া যায় না। আশ্রমে আসবার জন্যে মাঝে মাঝে আশ্রম থেকে যাওয়া দরকার। বেশি দেরী করব না— তোমরা দেওয়ালির সময় আস্‌বে এমন আশা আছে— আমি তার আগেই ফিরব। কিন্তু এই কদিন হয়ত চিঠিপত্র পাবে না। নাইবা পেলে। চিঠি পাওয়া অভ্যাস হয়ে যাওয়াটা কিছু না। চিঠি না পেয়েও তোমার ভানুদাদার সঙ্গে অনায়াসে তোমার কথাবার্তা চল্‌তে পারে। বাইরের জিনিস যারই উপর আমরা বেশি নির্ভর করতে যাই সেই আমাদের কিছু না কিছু দুঃখ এবং ফাঁকি দেয়ই। বাইরের জিনিস বড় বেশি নড়ে চড়ে, ভাঙে চোরে, হারায় ফুরোয়। সে আমাদের এড়াবার আগেই তাকে এড়িয়ে যাওয়াই সুবিধে। "বীণা বাজাও মম অন্তরে।" অন্তরে যখন বীণা বাজে তখন আর ভাবনা নেই— সে বীণা সাথের সাথী— আর সে বীণা বাজাবার যিনি ওস্তাদ তাঁকে তেমন করে ধরে রাখতে পারলে আর কোনো ভাবনা থাকে না। সেই বীণা যাতে সব কোলাহল ঢেকে বাজতে থাকে আমি এইটেই সবচেয়ে কামনা করি— বীণাটিকে যখন বাইরের দিকে খুঁজে বেড়াই তখনি মুস্কিল। তখন তার ছেঁড়ে, তখন তুম্বি ভাঙে তখন সুর ঠিক থাকে না। আমার ওস্তাদজি আমার হৃদয়

থেকে আমার আশীর্বাদ ও আনন্দ নিয়ে তোমার চিত্তবীণাকে বাজিয়ে দিন। কোনো ডাকহরকরার কোনো দরকার না থাকুক্ এই আমি ইচ্ছা করি। ইতি ২২ আশ্বিন ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৩৬

৩ কার্ত্তিক ১৩২৫

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, মাদ্রাজের দিকে যেদিন যাত্রা করেছিলুম সেদিন শনিবার এবং সপ্তমী,[১] অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই মত দিনক্ষণের বিদ্যা আমার জানা নেই। বল্‌তে পারিনে আমার যাত্রার সময়, লক্ষকোটি যোজন দূরে গ্রহনক্ষত্রদের বিরাট সভায় আমার এই ক্ষুদ্র মাদ্রাজ ভ্রমণ সম্বন্ধে কি রকম আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু তার ফলের থেকে বোঝা যাচ্চে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে ঘোরতর মতভেদ হয়েছিল। সেইজন্যে আমার ভ্রমণপথের হাজার মাইলের মধ্যে ৬০০ মাইল পর্য্যন্ত আমি সবেগে সগর্ব্বে এগতে পেরেছিলুম কিন্তু বিরুদ্ধ জ্যোতিষ্কের দল কোমর বেঁধে এম্‌নি অ্যাজিটেশন করতে লাগ্‌লেন যে বাকি চারশো মাইলটুকু আর পেরতে পারা গেল না। জ্যোতিষ্ক সভায় কেবলমাত্র আমার যাত্রা সম্বন্ধেই যে বিচার হয়েছিল তা নয়— বেঙ্গল নাগপুর রেলোয়ে লাইনের যে এঞ্জিনটা আমার গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে, মঙ্গল শনি এবং অন্যান্য ঝগড়াটে গ্রহেরা তার সম্বন্ধেও প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করেছিল। যদি বল সে সভায় ত আমাদের খবরের কাগজের

কোনো রিপোর্টার উপস্থিত ছিল না তবে আমি খবর পেলুম কোথা থেকে, তবে তার উত্তর হচ্চে এই যে, আইনকর্ত্তারা তাঁদের মন্ত্রণা সভায় কি আইন পাস করেচেন তা তাদের পেয়াদার গুঁতো খেলেই সব চেয়ে পরিষ্কার বোঝা যায়। যে মুহূর্ত্তে হাওড়া ষ্টেশনে আমার রেলের এঞ্জিন বাঁশি বাজালে, সে বাঁশির আওয়াজে কত তেজ, কত দর্প। আর রবীন্দ্রনাথ ওরফে ভানুদাদা নামক যে ব্যক্তি তোরঙ্গ বাক্স ব্যাগ বিছানা গাড়িতে বোঝাই করে তাঁর তক্তর উপরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইলেক্‌ট্রিক পাখার চলচক্রগুঞ্জনমুখর রথকক্ষে একাধিপত্য বিস্তার করলেন তাঁরই বা কত আশ্বস্ততা। তার পরে কত গড়্‌গড়্‌, থড়্‌থড়্‌, ঝর্‌ঝর্‌, ভোঁ ভোঁ, ঢং ঢং, স্টেশনে স্টেশনে কত হাঁক ডাক, হাঁস ফাঁস, হন্‌ হন্‌, হট্‌ হট্‌— আমাদের গাড়ীর দক্ষিণে বামে কত মাঠ বাট বনজঙ্গল নদীনালা গ্রাম সহর মন্দির মসজিদ কুটীর ইমারত যেন বাঘে তাড়া করা গোরুর পালের মত উর্দ্ধশ্বাসে আমাদের বিপরীত দিকে ছুটে পালাতে লাগল। এমনি ভাবে চল্‌তে চল্‌তে যখন পিঠাপুরমে পৌঁছতে মাঝে কেবল একটা স্টেশনমাত্র আছে এমন সময় এঞ্জিনটার উপরে নক্ষত্রসভার অদৃশ্য পেয়াদা তার অদৃশ্য পরোয়ানা হাতে নিয়ে নেবে পড়ল আর অমনি কোথায় গেল তার চাকার ঘুরনি, তার বাঁশির ডাক, তার ধূমোদগার, তার পাথুরে কয়লার ভোজ! পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, বিশ মিনিট যায়, এক ঘণ্টা যায়, স্টেশন থেকে গাড়ি আর নড়েই না। সাড়ে পাঁচটায় পিঠাপুরমে পৌঁছবার কথা কিন্তু সাড়ে ছটা, সাড়ে সাতটা বাজে তবু এমনি সমস্ত স্থির হয়ে রইল যে, "চরাচর মিদং সর্ব্বং" যে চঞ্চল এ কথাটা মিথ্যা বলে বোধ হল। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ধক্‌ ধক্‌ ধুক্‌ ধুক্‌ করতে করতে আর একটা এঞ্জিন এসে হাজির, তারপরে রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমি যখন পিঠাপুরমে রাজবাড়িতে গিয়ে উঠ্‌লুম তখন আমার মনের অবস্থাটা দেখি ঠিক সেই এঞ্জিনেরই মত। মনকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কেমন হে মাদ্রাজে যাচ্চ ত? সেখান

থেকে কাঞ্চি মদ্র অন্ধ্র পৌণ্ড্র প্রভৃতি কত দেশ দেশান্তর দেখবার আছে, কত মন্দির কত গুহা, কত তীর্থ ইত্যাদি ইত্যাদি," আমার মন সেই এঞ্জিনটার মত চুপ করে গম্ভীর হয়ে রইল, সাড়াই দেয় না। স্পষ্ট বোঝা গেল দক্ষিণের দিকে সে আর এক পাও বাড়াবে না। মনের সঙ্গে বেঙ্গল নাগপুরের এঞ্জিনের একটা মস্ত প্রভেদ এই, এঞ্জিন বিগড়ে গেলে আর একটা এঞ্জিন টেলিফোন করে আনিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু মন বিগড়লে সুবিধামত আর একটা মন পাই কোথা থেকে? সুতরাং মাদ্রাজ চারশো মাইল দূরে পড়ে রইল আর আমি গতকল্য শনিবার মধ্যাহ্নে' সেই হাবড়ায় ফিরে এলুম। যে-শনিবার একদা তার কৌতুকহাস্য গোপন করে আমাকে মাদ্রাজের গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিল, সেই শনিবারই আর একদিন আমাকে হাওড়ায় নামিয়ে দিয়ে তার নিঃশব্দ অট্টহাস্যে মধ্যাহ্ন আকাশ প্রতপ্ত করে তুললে। এই ত গেল আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত। কিন্তু তুমি যখন হিমালয় যাত্রায় বেরিয়েছিলে তখন নক্ষত্র সভায় তোমার সম্বন্ধেও ত ভাল রেজোল্যুশন পাস হয়নি। আমরা সবাই নিশ্চয় স্থির করলুম গিরিরাজের শুশ্রূষায় তুমি সেরে আসবে কিন্তু তারাগুলো কেন কুমন্ত্রণা করতে লাগল। আমার বিশ্বাস কি জান, অনেকগুলো ঈর্ষাপরায়ণ তারা আছে, তারা তোমার ভানুদাদাকে একেবারেই পছন্দ করে না। প্রথমত আমার নামটাই তাদের অসহ্য বোধ হয়, এই জন্যে বদনাম করবার সুবিধা পেলে ছাড়ে না। তারপরে দেখেচে আমার সঙ্গে আমার আকাশের মিতার খুব ভাব আছে সেইজন্যে নক্ষত্রগুলো আমাকে তাদের শত্রুপক্ষ বলে ঠিক করেছে। যাই হোক্, আমি ওদের কাছে হার মান্‌বার ছেলে নই। ওরা যা করবার করুক্ আমি দিনের আলোর দলে রইলুম। তোমাকে কিন্তু কুচক্রী নক্ষত্রগুলোর উপরে টেক্কা দিতে হবে— বেশ শরীরটাকে সেরে নিয়ে, মনটাকে প্রফুল্ল করে, হৃদয়টাকে শান্ত কর, জীবনটাকে পূর্ণ কর— তারপরে লক্ষ্যকে উর্দ্ধে রেখে অপরাজিত চিত্তে সংসারের সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে চলে

যাও— কল্যাণ লাভ কর এবং কল্যাণ দান কর— নিজের বাসনাকে উদ্দাম করে না তুলে মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছাকে নিজের অন্তরে বাহিরে সার্থক কর। ইতি ২০ অক্টোবর ১৯১৮

তোমার ভানুদাদা

৩৭

২৭ অক্টোবর ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, আমার ভ্রমণ শেষ হল। যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিলুম সেইখানেই আবার এসে ফিরেচি। সকলেই পরামর্শ দিয়ে থাকে ছুটি পেলেই স্থান এবং বায়ু পরিবর্ত্তন করা দরকার— কিন্তু দেখা গেল সেটা যে অনাবশ্যক এবং ক্লেশকর সেইটে ভাল করে বুঝে দেখবার জন্যেই কেবল পরিবর্ত্তনের দরকার— কিন্তু আসল দরকার যেখানে আছি সেইখানেই মনটাকে সম্পূর্ণ এবং সচেতন ভাবে ঢেলে দেওয়া। এই যে মাঠ আমার চোখে পড়চে এর কি দেখবার রস ফুরিয়ে গেচে— আর এই যে শিশিরার্দ্র সকালবেলাটি তার কিরণ দলের মাঝখানে আমার মনকে মধুপানরত স্তব্ধ ভ্রমরের মত স্থান দিয়েচে এ কি কোনোকালে এর বৃন্ত থেকে ঝরে পড়বে? আসল কথা, মনটা অসাড় হলেই তাকে সাড় দেবার জন্যে নাড়া দিতে হয়। তাই, আমাদের সাধনা হওয়া উচিত কি করলে আমাদের মন অসাড় না হয়।— তা হলেই নিজের মধ্যে নিজের সম্পদ লাভ করতে পারি কেবলি বাইরের জন্যে ছট্‌ফট্‌ করতে হয় না। আমাদের যা কিছু সব

চেয়ে বড় সম্পদ সব চেয়ে বড় আনন্দ তার ভাণ্ডার যদি বাইরে থাকে তাহলে আমাদের ভারি মুস্কিল। কেন না বাইরের পথে বাধা ঘটবেই, বাইরের দরজা মাঝে মাঝে বন্ধ হবেই। বাইরের কাছ থেকে সেই ভিক্ষা চাওয়ার অভ্যাস আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের ইচ্ছা বাইরের দিকে বাধা পেলেও আমরা যেন অন্তরের মধ্যে পূর্ণতা অনুভব করে শান্তি পেতে পারি। নইলে নিজেও অশান্ত হই, চারিদিককেও অশান্ত করে তুলি। এই সংসার থেকে যে প্রীতি যে কল্যাণ আমরা অন্তরের মধ্যে পেয়েচি সেই আমাদের অন্তরতম লাভের জন্যে যেন আমরা গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ হই, বাইরের দিকে যে-কিছু জিনিস পাই নি, সেদিক থেকে যা-কিছু বাধা আস্‌চে, তারই ফর্দ্দটাকে লম্বা করে তুলে যদি খুঁৎ খুঁৎ করি, ছট্‌ফট্‌ করতে থাকি, তাহলে অকৃতজ্ঞতা হয় এবং সেই চঞ্চলতা নিতান্তই বৃথা নিজের অন্তর বাহিরকে আহত করে মাত্র। স্থির হব, প্রশান্ত হব, মনকে প্রসন্ন রাখব, তাহলেই আমাদের মন এমন একটি স্বচ্ছ আকাশে বাস করবে যাতে করে অমৃত লোক থেকে আনন্দ-জ্যোতি আমাদের মনকে স্পর্শ করতে বাধা পাবে না। তোমার প্রতি তোমার ভানুদাদার এই আশীর্ব্বাদ যে, তুমি আপনার ইচ্ছাকে একান্ত তীব্র করে চিত্তকে কাঙাল-বৃত্তিতে দীক্ষিত কোরো না— বিধাতার কাছ থেকে যা-কিছু দান পেয়েছ তাকে অন্তরের মধ্যে নম্রভাবে গ্রহণ এবং অবিচলিতভাবে রক্ষা কর। শান্তি হচ্চে সত্য এবং আনন্দ উপলব্ধি করবার সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা— সংসারের অনিবার্য্য আঘাতে ব্যাঘাতে ইচ্ছার অনিবার্য্য নিষ্ফলতায় সেই সুস্নিগ্ধ শান্তি যেন তোমার মধ্যে সর্ব্বদা বিক্ষুব্ধ না হয়। ইতি ১০ই কার্তিক ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৩৮

৫ নভেম্বর ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠির উপরেই তুমি লিখেচ "আপনি কি করচেন?"[১] আগে তার উত্তরটা লিখে দিই তার পরে অন্য কথা। সকাল বেলা থেকেই একটু একটু মেঘ করে আছে রোদ্দুর এক একবার ফুটে উঠ্চে আবার মিলিয়ে যাচ্চে— ঠিক যেন রোদ্দুর দেওয়ালির রাত্রে যাত্রা শুন্‌তে গিয়েছিল, তাই আজও সকাল বেলাতেও ঘুম পাচ্চে, এক একবার চোখ ঢুলে আস্‌চে আবার চম্‌কে উঠে ভান করচে যেন একটুও তার ঘুম পায় নি। আমার আকাশের ভানুদাদার ত এই অবস্থা। কিন্তু তোমার ভানুদাদা খুব সজাগ আছে। সে ব্যক্তি তার সেই কোণের ডেস্কে বসে খাতা খুলে তার বাংলা কবিতার নতুন ইংরেজি তর্জ্জমাগুলি[২] নিয়ে খুব কষে মাজা ঘষা করচে। হঠাৎ এত ব্যস্ততার কারণ হচ্চে এই যে, এই ইংরেজি তর্জ্জমাই আমার পশ্চিম সমুদ্রতীরে তীর্থযাত্রার পাথেয়। বাংলা কবিতার জোরেই— তোমাদের দরজায় গিয়ে দরজা খোলা পেয়েছি— ভানুদাদার দর্শনের জন্যে ছুটে এসেছে আমার বাঙালী রাণু এবং তার সব সভাসদ— আবার ঐ কবিতাগুলিকেই ইংরেজি করে নিয়ে রাজবাড়ির পশ্চিম মহলের সিংহ-দ্বারও পার হতে পেরেছি। যুদ্ধ থেমে গিয়েচে,[৩] পথ খোলসা হয়েচে, আনাগোনার সময় আবার কাছে আস্‌তে চল্‌ল, কাজেই আবার থলি ঝেড়ে দেখ্‌চি আমার তহবিলে কি আছে। হিসাব করে দেখা গেল যা আছে তাতে আমার বেশ চল্‌বে। একথা ত তোমার জানা আছে পূর্ব্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্য্যন্ত ভানুর যাত্রাপথ— সেই প্রদক্ষিণ শেষ করতে না পারলে ত তার বিদায় মঞ্জুর হবে না— সেই

জন্যেই আজ সকাল বেলায় কোণে বসে বসে আমার পশ্চিমের পথ পরিষ্কার করতে লেগে গেছি।

তোমার বাবার চিঠিতেই খবর পেয়েছি, নানা ব্যাঘাতে এবার দেওয়ালির ছুটিতে তোমার আসা হল না।[৪] আস্‌তে পারলে খুব খুসি হতুম সে কথা তুমি নিশ্চয় জান। কিন্তু আমার পণ এই যে, যেটা ইচ্ছা করি সেটা যখন না ঘটে তখন ধরে নিই আমার ঠাকুরের ইচ্ছাই ফল্‌ল। তাঁর ইচ্ছাকেই খুব সহজে গ্রহণ করবার জন্যে মনকে প্রস্তুত রেখে দিই। নিজের মুখরা ইচ্ছাটাকে নিয়ে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে, হাত পা নেড়ে, গলা চড়িয়ে, কোঁদল করতে আমার ভারি লজ্জা করে। নিজের ইচ্ছাটাকেই যেমন তেমন করে জয়ী করবার চেষ্টা করতে গিয়েই সংসারে যত অনর্থ ঘটে— এ কথা বেশ জানি অথচ মাঝে মাঝে ভুলে যাই। কিন্তু ভুললে চলবে না— ঐ ইচ্ছার দাসত্ব করিয়ে জীবনটাকে রাস্তায় ঘাটে যেখানে সেখানে হয়রান করে বেড়ানোর মত প্রাণের এমন অপব্যয় আর কিছু নেই। যা কাজ তা করব কিন্তু কুলি মজুরের মত ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার মজুরী দাবী করব না। ঠাকুরের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব করতে চাই তবে তাঁর বন্ধুর মতই কাজ করতে হবে— বন্ধু ত খোরাকী চায় না, মাইনে চায় না। যদি কথায় কথায় বলতে থাকি আমার ইচ্ছা পূরণ করে দাও তাহলেই ত মজুরী চাওয়া হল। মজুর মাইনে দাবী করতে পারে কিন্তু প্রভুর সঙ্গে এক আসনের দাবী করতে পারে না ত। ঐ এক আসনের অংশের পরেই আমার লক্ষ্য। সেইজন্যে সংসারে ইচ্ছার দাবী নিষ্ফল হলে হেসে উড়িয়ে দিতে চাই— সব সময়ে জোর থাকে না— কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চল্‌বে না। নিজের ইচ্ছার উপরে নিজে যদি কর্ত্তা হতে পারি তাহলেই বিশ্বের যিনি কর্ত্তা তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে পারি। নইলে দাসের দশা কোনোদিন ঘুচবে না; আর দাসের মুস্কিল এই যে, তাকে দরজার পাশে দূরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়। আমি পাশে বসবার নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় আছি—

আজ হোক্ বা কাল হোক্ বা দেরিতেই হোক। ইতি ১৯ কার্ত্তিক ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৩৯

৮ নভেম্বর ১৯১৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, কবে তোমার জন্মদিন[১] তোমার চিঠির মধ্যে তার তারিখের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। আমার আবার এমনি দশা যে তারিখ সম্বন্ধে আমার কোনও হুঁষ থাকে না। তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে মিরজুম্লা কবে জন্মেছিল এবং বৈরাম খাঁর প্রথম বিবাহ কবে হয় আমি তার কিছুই জানি নে, ইব্রাহিম লোডির মৃত্যুর তারিখ নিশ্চয়ই তুমি জান কিন্তু অনেক চিন্তা করেও সেটা আমার কিছুতেই মনে পড়চেনা। ভানু ঠাকুর বলে এক ব্যক্তির জন্মতারিখ কি ভাগ্যে বহুকষ্টে মনে আছে কিন্তু তার জীবনের অন্যান্য প্রধান ও অপ্রধান ঘটনার একটা তারিখও আমার মনে নেই— এমন কি, শ্রীমতী রাণুদেবী নাম্নী কাশীবাসিনী কুমারী কবে তাকে প্রথম পত্র লেখে সে প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে মূঢ়ের মত নিরুত্তর হয়ে থাক্‌তে হবে, পত্রখানা দেখেও যে তার জবাব দেব সে পথও বন্ধ। কারণ, পত্রেও তার কোনও চিহ্ন [য] নেই। এমনি করে উক্ত ভানু ঠাকুরের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্চে। ভেবে দেখ্‌লুম মীরজুম্লা এবং ইব্রাহিম লোডি সম্বন্ধে তারিখগুলো না জানা থাক্‌লেও আমার কাজ চলে যাবে

কিন্তু রাণুর জন্মতারিখটি সময়মত না পাওয়ায় তাকে সময়মত আমার আশীর্বাদ পাঠানো হল না। একখানা গীতপঞ্চাশিকা[২] পাঠিয়েছিলুম কিন্তু সেটা তোমার জন্মদিন লক্ষ্য করে নয়। পর্শুদিন চিঠিতে তোমার জন্মোৎসবের আভাস পেয়ে তখনই হাতের কাছে একখানা ওড়না ছিল সেইটে পাঠালুম। এই ওড়নাতে একটুখানি সোনালি আঁচ্‌লা এবং পাড় আছে— অম্বরের প্রান্তে সোনার রেখা দিয়ে অস্তোন্মুখ রবি ধরিত্রীর ললাটের কাছে যে আশীর্ব্বাদলিপিটি রেখে চলে যায় এই সোনালি পাড় দেওয়া ওড়নায় তোমাকে সেই কথাটি মনে করিয়ে দেবে। মাথার উপর দিয়ে এই ওড়নাটি যখন পরবে তখন তোমার ভানুদাদার আশীর্ব্বাদের কিরণ-লেখা তোমার ললাট স্পর্শ করবে। এই কাপড়খানি একটি রূপক মাত্র— এ হারাতে পারে, ছিঁড়তে পারে, মলিন হতে পারে— কিন্তু আমার একান্ত কামনা এই যে, আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ তোমাকে বেষ্টন করে তোমাকে সুন্দর করে তুলুক্, সংসারের সমস্ত ধূলিসংসর্গ হতে তোমাকে নির্ম্মল করে আবৃত করুক, তোমাকে সংযত করুক, সম্বৃত করুক, তোমাকে ধৈর্য্যে, বীর্য্যে, মাধুর্য্যে ও কল্যাণে ভূষিত করুক। অন্তরের মধ্যে মঙ্গলের যে একটি পবিত্র সুন্দর আদর্শ আছে, সেটিকে বাইরে কোনোখানে পবিত্র সুন্দর রূপে বিকশিত দেখ্‌তে ইচ্ছা করে— সেইজন্যে ভানুদাদা উৎসুক দৃষ্টিতে রাণুর দিকে তাকিয়ে থাক্‌বে, দেখ্‌বে তার চিত্তটি প্রতিদিন শিশিরস্নাত পূজার ফুলটির মত ধীরে ধীরে আলোকের দিকে অসীমের দিকে ফুটে উঠে আপনার অন্তরের স্নিগ্ধ সৌগন্ধ্যকে উৎসর্গ করচে। ইতি ২২ কার্ত্তিক ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৪০

১৮ নভেম্বর ১৯১৮

ঔঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, যাবার সময় তুমি মন খারাপ করে' চোখের জল ফেলে চলে গিয়েচ তাই আমারও মনটা ব্যথিত আছে।[১] আজই ছোট্ট এই চিঠি তোমাকে লিখে পাঠাচ্চি— যেদিন কাশীতে পৌঁছবে তার পরদিনেই এটি তোমার হাতে গিয়ে পড়বে। এতক্ষণে তুমি রেলগাড়িতে ধক্‌ধক্ করতে করতে চলেচ, কত ষ্টেশন পার হয়ে চলে গিয়েচ— আমাদের এই লালমাটির, এই তাল গাছের দেশ হয়ত ছাড়িয়ে গেছ বা। আমার পূব দিকের দরজার সামনে সেই মাঠে রৌদ্র ধূ ধূ করচে এবং সেই রৌদ্রে নানা রঙের গোরুর পাল চরে বেড়াচ্চে। এক একটা তালগাছ তাদের ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে পাগ্‌লার মত দাঁড়িয়ে আছে। আজ দিনে আমার সেই বড় চৌকিতে বসা হল না— খাওয়ার পর এণ্ড্রুজ সাহেব এসে আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা করলেন তাতে অনেকটা সময় চলে গেল। তারপরে নগেন বাবু[২] নামক এখানকার একজন মাষ্টার তাঁর এক মস্ত তর্জ্জমা নিয়ে আমার কাছে সংশোধন করবার জন্যে আন্‌লেন— তাতেও অনেকটা সময় চলে গেল। সুতরাং বেলা তিনটে বেজে গেছে তবু আমি আমার সেই ডেস্কে বসে আছি— বই কাগজ খাতা দোয়াত কলম ওষুধের শিশি এবং অন্য হাজার রকম জবড়জঙ্গ জিনিসে আমার ডেস্ক পরিপূর্ণ— তার মধ্যে এমন অনেক আবর্জ্জনা আছে যা এখনি টেনে ফেলে দিলেই চলে, কিন্তু কুঁড়ে মানুষের মুশকিল এই যে, আবশ্যকের জিনিস সে খুঁজে পায় না, আর অনাবশ্যক জিনিস না খুজলেও [য] তার সঙ্গে লেগেই থাকে। এমন অনেক ছেঁড়া লেফাফা কাগজ-চাপা দিয়ে

জমানো রয়েচে যার ভিতরকার চিঠিরই কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় না। আর দশ বৎসর পরে রাণু যখন তার ভানুদাদার প্রাইভেট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হয়ে আস্‌বে তখন এই সমস্ত জঞ্জালগুলোর সদ্‌গতি হতে পারবে। কি বল? কিন্তু ভানুদাদার যেমন নানা প্রকার দরকারী চিঠিপত্র বই পেন্সিল হারিয়ে যায় তেম্‌নি আবার তার নতুন তৈরি-করা গানের সুরও হারিয়ে যায়— প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ হবে আমার সেই সুরগুলিকে কুড়িয়ে ধরা [য] রাখা— অতএব তোমার সেই শিশু মহাভারতের সন্ন্যাস ধর্ম্ম বাদ দিয়ে কিছুদিন তোমাকে এস্‌রাজ যন্ত্রটা নিয়ে পড়তে হবে। ছড়ি টেনে টেনে যখন বেশ হাত দোরস্ত হয়ে আস্‌বে তখন তোমাকে আমার সুর-কুড়োনীর কাজে লাগিয়ে দেব। তখন গান তৈরি করে আমাকে আর হা-দিনু, জো-দিনু করে বেড়াতে হবেনা। কিন্তু মনে আছে, আমাকে তোমার রূপকথা পাঠিয়ে দিতে হবে— সেই অলাবু-নন্দিনীর "কাহানী", আর সেই "চম্‌কিলা" "সোনে কি তরহ", চুলওয়ালী রাজকুমারীর কথা°— তাছাড়া আর একটি কথা মনে রাখ্‌তে হবে, মন খারাপ কোরো না— লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে ঘর উজ্জ্বল করে থাক্‌বে। সকলেই বল্‌বে রাণু এমন সোনে কি তরহ্ হাসি পেয়েচে কোন্ পারিজাতের গন্ধ থেকে, কোন নন্দন বীণার ঝঙ্কার থেকে, কোন্ প্রভাত তারার আলোক থেকে, কোন সুরসুন্দরীর সুখস্বপ্ন থেকে, কোন্ মন্দাকিনীর চলোর্ম্মি-কল্লোল থেকে, কোন্— কিন্তু আর দরকার নেই এখনকার মত এই ক'টাতেই চলে যাবে— কেননা কাগজ ফুরিয়ে এসেচে, দিনও অবসন্নপ্রায়, অপরাহ্নের ক্লান্ত রবির আলোক ম্লান হয়ে এসেচে।

তোমার ভানুদাদা

২ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

৪১

[? ২৩ নভেম্বর ১৯১৮]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, কাল তোমার চিঠি পেয়েচি। আমার চিঠিও নিশ্চয় তুমি পেয়েচ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বেশ হাসিমুখে খুসি মনে সেই বাংলা মহাভারত এবং চারুপাঠ পড়চ। যে তোমাকে দেখচে সেই মনে করচে চারুপাঠের মধ্যে খুব মনোহর গল্প এবং তোমার শিশুমহাভারতের মধ্যে খুব মজার কথা কিছু বুঝি আছে। কিন্তু তারা জানেনা প্রায় দুশো ক্রোশ তফাৎ থেকে ভানুদাদা তোমাকে খুসি পাঠিয়ে দিচ্চে— এত খুসি যে, কার সাধ্য তোমাকে বিরক্ত করে বা রাগায় বা দুঃখ দেয়। আমি প্রায় সন্ধ্যাবেলায় সেই যে গান গাই "বীণা বাজাও মম অন্তরে" সেই গানটি তোমার মনের মধ্যে বরাবরকার মত স্বরলিপি করে লিখে রেখে দেবার ইচ্ছা আছে— মনটি গানের সুরে এমনি বোঝাই হয়ে থাক্‌বে যে বাইরের তুফানে তোমাকে নাড়া দিতে পারবে না। শুধু তোমাকে বলচি নে, আমারও ভারি ইচ্ছে, নিজের ভরা মনটির মাঝখানে বেশ নিবিষ্ট হয়ে বসে বাইরের সমস্ত যাওয়া আসা কাঁদা হাসার অনেক উপরে স্থির হয়ে থাকতে পারি। আপনার ভিতরে আপনার চেয়ে বড় কাউকে যদি ধরে রাখা যায় তাহলেই সেই ভিতরের গৌরবে বাহিরের ধাক্কাকে একটুও কেয়ার না করবার শক্তি আপনিই আসে। সেই ভিতরের ধনকে ভিতরে পেয়ে ভিতরে ধরে রাখবার জন্যেই আকাঙ্ক্ষা করচি। বাহিরের কাছে যখনই কাঙালপনা করতে যাই তখনই সে পেয়ে বসে, তার আর দৌরাত্ম্যের অন্ত থাকে না— সে যতটুকু দেয় তার চেয়ে দাবী ঢের বেশি করে— সে এমন মহাজন, যে, শতকরা পাঁচশো টাকা সুদ আদায় করতে চায়। সে শাইলক্, সামান্য টাকা দেয়

কিন্তু ছুরি বসিয়ে রক্তেমাংসে তার শোধ নেবার দাবী করে। তাই ইচ্ছে করি বাহিরটাকে ধার দেব কিন্তু ওর কাছ থেকে শিকি পয়সা ধার নেব না। এই আমার মৎলবের কথাটা তোমার কাছে বলে রাখলুম— তোমার গণনা মতে আমার যখন আটাশ বৎসর বয়স হবে ততদিনে যদি মৎলব সিদ্ধি হয় তা হলে বেশ মজা হবে।— এখানকার খবর সব ভাল। সাহেব গেছে বাঁকিপুরে, দিনু কমল এসেচে আমার ঘরের একতলায়, আমি সেই অনুবাদের কাজে ভূতের মত খাট্‌চি। (কিন্তু ভূত যে খুব বেশি খাটে এ খ্যাতি তার কেন হল বল দেখি?)[১]

তোমার ভানুদাদা

৪২

২৫ নভেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

এখনও আমার কাজের ভিড় কিছুই কমেনি। সবাই মনে করে আমি কবি মানুষ, দিনরাত্রি আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখি, হাওয়ার গান শুনি, চাঁদের আলোয় ডুব দিই, ফুলের গন্ধে মাতাল হই, পল্লবমর্ম্মরে থর্‌থর্ করে' কাঁপি, ভ্রমর গুঞ্জনে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই ইত্যাদি ইত্যাদি— এ সব হল হিংসের কথা— তারা জাঁক করে বল্‌তে চায় যে, তারা কবিতা লেখে না বটে কিন্তু হপ্তায় সাত দিন করে' অপিসে যায় আদালত করে, খবরের কাগজ চালায়, বক্তৃতা দেয়, ব্যবসা করে— তারা এত বড় ভয়ঙ্কর কাজের লোক! আপিসের ছুটি নিয়ে তারা একবার এসে দেখে যাক্ আমি

কাজ করি কি না। আচ্ছা, তারা খুব কাজ করতে পারে আমি না হয় মেনে নিলুম, কিন্তু খুব কাজ না করতে পারে এমন শক্তি কি তাদের আছে? যেই তাদের হাতে কাজ না থাকে অমনি তারা হয় ঘুমোয় নয় তাস খেলে, নয় মদ খায়, নয় পরের নিন্দে করে, কি করে যে সময় কাটাবে ভেবেই পায় না। আমার মত কবির সুবিধা এই যে যখন কাজ থাকে তখন রীতিমত কাজ করি, আবার যখন কাজ না থাকে তখন খুব কষে কাজ না করতে পারি— তার কাছে কোথায় লাগে তোমার বাব্‌জার কমিটি মীটিং! যখন কাজ না করার ভিড় পড়ে তখন তার চাপে আমাকে একেবারে রোগা করে দেয়। সম্প্রতি কিন্তু কাজ করাটাই আমার ঘাড়ে চেপেচে। তাই সেই নাটকটা[১] আর এক অক্ষরও লিখ্‌তে পারি নি— এই গোলমালের মধ্যে যদি লিখ্‌তে যাই আর যদি তাতে গান বসাই[২] তবে তার ছন্দ আর মিল অনেকটা তোমার শিশু মহাভারতেরই মত হয়ে উঠবে। চিঠিতে যে ছবি এঁকেচ খুব ভাল হয়েচে। মেয়েটিকে দেখে বোধ হচ্চে ওর ইস্কুলে যাবার তাড়া নেই, ঘরকন্নার কাজের ভিড়ও বেশি আছে বলে মনে হচ্চে না, ওর চুলের সমস্ত কাঁটা রাস্তায় পড়ে গেছে, আর "গহনা ওয়হনা" "চুনরি উনরি"র কোনও ঠিকানা নেই— "কদু"র ভিতর থেকে যে "দুলহীন্‌" বেরিয়ে এসেছিল এ মেয়ে বোধ হয় সে নয়। এর নাম কি লিখে পাঠিয়ো। তোমাদের ছোট বউ কিম্বা গাব্‌লোর বউ নয় ত? এঁকে দেখ্‌তে সুন্দর বটে কিন্তু ভানুদাদার সঙ্গে যার নামের মিল আছে তার চুলের দশা ঐ রকম হলেও সে এর চেয়ে অনেক ভালো। ইতি ৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৪৩

৩ ডিসেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, আজকের তোমাকে সব খবরগুলি দেওয়া যাক্। অনেক দিন পরে আজ আমার ইস্কুল খুলেছে। আজ থেকে ইস্কুল মাস্টারি ফের সুরু হল। আজ সকালে তিনটে ক্লাস নিয়েছি। কিন্তু ছেলেরা সব আসে নি। খুব কম এসেচে। বোধ হয় ব্যামোর ভয়ে আস্‌চে না।— আমার বৌমা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেছেন জিজ্ঞাসা করেচ। তিনি পাড়াতেই আছেন। আমি যে ঘরে থাকি— তার সাম্‌নে এক লাল রাস্তা আছে— তার ঠিক ওধারেই এক দোতলা ইমারত তৈরি হচ্চে— তারই একতলা ঘরে তিনি বাস করেন। শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরী[১] তাঁকে অচ্ছী অচ্ছী কাহনী শুনাতী হৈ। কিন্তু সেটা আমি আন্দাজে বল্‌চি। কিছুকাল থেকে তার কণ্ঠস্বরও শুনি নি, তাকে দেখ্‌তেও পাই নি— তাই আশঙ্কা হচ্চে সে হয় ত তার সেই রূপকথার "কদু"র মধ্যে ঢুকে পড়েচে। আজকাল বৌমার এক সখীকে প্রায়ই লাল রাস্তা পেরিয়ে এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী আনাগোনা করতে দেখি— তার নাম ননীবালা। যাই হোক্ পাড়ার সমস্ত খবর রাখবার সময় আমি পাই নে, আমি কখনও বা আমার সেই কোণের ডেস্কে কখনো বা সেই লাইব্রেরি ঘরের টেবিলে ঘাড় হেঁট করে কলম চালিয়ে দিন যাপন করচি— সামনেকার খাতাপত্রের বাইরে যে একটি প্রকাণ্ড জগৎ আছে, তার প্রতি ভাল করে চোখ তুলে যে দেখা সে আর দিনের আলো থাক্‌তে ঘটে উঠ্‌চে না। সন্ধ্যার পরে সেই নীচের বারান্দায় খাবার টেবিলটা ঘিরেই বৈঠক হয়— সেখানে তর্ক হয় বিতর্ক হয় এবং মাঝে মাঝে গানও হয়ে থাকে। কারণ আজকাল ফের আবার দুটি একটি করে গান জম্‌চে।[২] সন্ধ্যার পরে সেই

আমার কোণের বিছানায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে কেরোসিনের আলোয় মৃদু মন্দস্বরে খাতা পেন্সিল হাতে গান করি, আর পশ্চিমের উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে— তুমি ভাবচ সেই বাতায়ন থেকে স্বর্গের অপ্সরীরা আমার গান শুন্‌তে আসেন— ঠিক তা নয়, সেই উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে কীট পতঙ্গ আস্‌তে থাকে— তাও যদি তারা আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে আস্‌ত তাহলেও আমি মনে মনে একটু অহঙ্কার করতে পারতুম,— তারা আসে ঐ ডীট্‌জ্‌ লণ্ঠনের কেরোসীন আলোটা লক্ষ্য করে। উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে হঠাৎ এক একবার— আন্দাজ করে বল দেখি কি শুন্‌তে পাই? তুমি ভাবচ নক্ষত্রলোক থেকে অনাহত বীণার অশ্রুত গীত ধ্বনি? তা নয়, একসঙ্গে ভোঁদা, দাজু, টম, রঞ্জু, এবং এ মুল্লুকের যত দিশি কুকুরের তুমুল চীৎকার শব্দ। যদি তারা আমার এই গান শুনে বাহবা দেবার জন্যে এই আওয়াজ করত, তাহলেও বুঝতুম কবির গানে চতুষ্পদ পশুরা পর্য্যন্ত মুগ্ধ— কিন্তু তা নয়, তারা স্বজাতি আগন্তুকের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে স্বর্গমর্ত্ত্যকে চঞ্চল করে তোলে— কবির গানে তারা কর্ণপাতও করে না। যাই হোক্, ভূতলের কুকুর থেকে আকাশের তারা পর্য্যন্ত সবাই যদিচ উদাসীন তবুও দুটো একটা করে গান জম্‌চে। আকাশের তারার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে চাই নে— করলেও তারা জবাব দেবেনা— কিন্তু রাণুর সঙ্গে ঝগড়ার উপলক্ষ্য পেলে আমি ছাড়ব না— সে উপলক্ষ্যটি এই যে, আমার গান শোন্‌বার জন্যে রাণুর বাবজা কাশী কলকাতা প্রভৃতি বহু দূর দেশ ঘুরে এই শান্তিনিকেতনে এলেন আর তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী রাণু এলেন না কেন? শিশু মহাভারত আর চারুপাঠ তৃতীয় ভাগের কাছে শ্রীযুক্ত ভানুদাদার গান আজ হার মান্‌ল এও কি সহ্য হয়? ঝগড়াটা চিঠির শেষ দিকটাতে আরম্ভ করেছি— বেশ ভাল করে হাত মুখ নাড়বার জায়গা পাচ্চিনে— হঠাৎ থামিয়ে দিতে হল। ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৪৪

[ডিসেম্বর ১৯১৮]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, আজ দুপুর বেলা যখন খেতে বসেছি, এমন সময়ে— রোসো আগে বলে নিই কি খাচ্ছিলুম। খুব প্রকাণ্ড মোটা একটা রুটি— কিন্তু মনে কোরো না তার সবটাই আমি খাচ্ছিলুম— রুটিটাকে যদি পূর্ণিমার চাঁদ বলে ধরে নেও তাহলে আমার টুক্‌রোটি দ্বিতীয়ার চাঁদের চেয়ে বড় হবে না, সেই রুটির সঙ্গে কিছু ডাল ছিল, আর ছিল চাট্‌নি— আর একটা তরকারিও ছিল। যা হোক্ বসে বসে রুটি চিবচ্চি এমন সময়ে— রোসো আগে বলে নিই রুটি ডাল চাট্‌নি এল কোথা থেকে? তুমি বোধ হয় জানো আমার এখানে প্রায় পঁচিশ জন গুজ্‌রাটি ছেলে আছে— আমাকে খাওয়াবে বলে তাদের হঠাৎ ইচ্ছা হয়েছিল।[১] তাই আজ সকালে আমার লেখা সেরে স্নানের ঘরের দিকে যখন চলেচি এমন সময়ে দেখি একটি গুজ্‌রাটি ছেলে থালা হাতে করে আমার দ্বারে এসে হাজির। যা হোক্, নীচের ঘরে টেবিলে বসে বসে রুটির টুক্‌রো ভাঙ্‌চি আর খাচ্চি, আর তার সঙ্গে একটু একটু করে চাট্‌নিও মুখে দিচ্চি এমন সময়ে— রোসো, আগে বলে নিই খাবার কি রকম হয়েছিল। রুটিটা বেশ শক্ত গোছের ছিল— যদি আমাকে সম্পূর্ণ চিবিয়ে সবটা খেতে হত তাহলে আমার একলার শক্তিতে কুলিয়ে উঠ্‌ত না, মজুর ডাক্‌তে হত। কিন্তু ছিঁড়তে যত শক্ত মুখের মধ্যে ততটা নয়— আবার রুটিটা মিষ্টি ছিল। ডাল তরকারি দিয়ে মিষ্টি রুটি খাওয়া আমাদের আইনে লেখে না কিন্তু খেয়ে দেখা গেল যে, খেলে যে বিশেষ অপরাধ হয় তা নয়। সেই রুটি খাচ্চি ঠিক এমন সময়ে— রোসো, ওর মধ্যে একটা [কথা] বল্‌তে একেবারেই ভুলে

গেছি। দুটো পাঁপর ভাজাও ছিল। সে দুটো, আমি যাকে বলে থাকি সুশ্রাব্য— অর্থাৎ খেতে বেশ ভাল লাগে। শুনে তুমি হয় ত আশ্চর্য্য হবে এবং আমাকে হয় ত মনে মনে পেটুক ঠাউরে রেখে দেবে— এবং যখন আমি কাশীতে যাব তখন হয় ত সকালে বিকালে আমাকে চাট্‌নি দিয়ে কেবলি পাঁপর ভাজা খাওয়াবে— তবু সত্য গোপন করব না, দু খানা পাঁপর ভাজা সম্পূর্ণই খেয়েছিলুম। যা হোক্ সেই পাঁপর মচ্‌মচ্ শব্দে খাচ্চি এমন সময়ে— রোসো মনে করে দেখি সে সময়ে কে উপস্থিত ছিল। তুমি ভাবচ তোমার বউমা তোমার ভানুদাদার পাঁপর ভাজা খাওয়া দেখে অবাক হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে টেবিলের এক কোণে বসে মনে মনে ঠাকুর দেবতার নাম করছিলেন, তা নয়— তিনি তখন কোথায় আমি জানি নে— আর কমল? সেও যে তখন কোথায় বসে রোদ পোয়াচ্ছিল তা আমি জানি নে। তাহলে দেখ্‌চি টেবিলে আমি একলা ছাড়া কেউই ছিল না। যাই হোক্ দুখানা পাঁপর ভাজার পরে প্রায় শিকি টুক্‌রো রুটির পৌনে চার আনা যখন শেষ করেছি— এমন সময়ে— হাঁ হাঁ একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি— আমি লিখেচি খাবার সময় কেউ ছিল না, কথাটা সত্য নয়। ভোঁদা কুকুরটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লালায়িত জিহ্বায় চিন্তা করছিল, যে, আমি যদি মানুষ হতুম তাহলে সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত ঐ রকম মুচ্‌মুচ্ মুচ্‌মুচ্ মুচ্‌মুচ্ করে কেবলি পাঁপর ভাজা খেতুম, ইতিহাসও পড়তুম না, ভূগোলও পড়তুম না— শিশুমহাভারত চারুপাঠের কোনো ধার ধারতুম না। যা হোক্ যখন দুখানা পাঁপর ভাজা এবং কিছু রুটি ও চাট্‌নি খেয়েছি এমন সময়ে— কিন্তু ডালটা খাইনি— সেটা নারকোল দিয়ে এবং অনেকখানি কুয়োর জল দিয়ে তৈরি করেছিল, তাতে ডালের চেয়ে কুয়োর জলের স্বাদটাই বেশি ছিল— আর তরকারিটাও খাইনি— কেননা আমি মোটের উপর তরকারি প্রভৃতি বড় বেশি খাইনে— যাই হোক্ যখন রুটি এবং পাঁপর

ভাজা খাওয়া প্রায় শেষ হয়েচে এমন সময়ে ডাকহরকরা আমার হাতে কাশির ছাপমারা একখানা চিঠি দিয়ে গেল

ভানুদাদা

৪৫

১০ ডিসেম্বর ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, দেরি করে তোমার চিঠির উত্তর দিয়েছি, তুমি আমাকে এত বড় অপবাদ দেবে আর আমি তাই যে নীরবে সহ্য করে যাব এত বড় কাপুরুষ আমাকে পাও নি। কখ্‌খনো দেরী করি নি, এ আমি তোমার মুখের সাম্‌নে বল্‌ছি, এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর। দেরি করি নি, দেরি করি নি, দেরি করি নি— এই তিন বার খুব চেঁচিয়েই বলে রাখলুম— দেখি তুমি এর কি জবাব দাও। যত দোষ সব আমার, আর তোমার অগস্ত্যকুণ্ডের পোষ্টমাষ্টারটি বুঝি ৩৮টি গুণের আধার। ভাল কথা মনে পড়ল, তোমাকে শেষ বারে চিঠি লেখার পর আমি খোঁজ নিয়ে শুনলুম শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরীকে বৌমা বিদায় করে দিয়েচেন। কি অন্যায় দেখ দেখি! তার অপরাধটা কি? না, সে যতটা কাজ করে তার চেয়ে কথা কয় ঢের বেশী। তাই যদি হয়, তা হলে তোমার ভানুদাদার কি গতি হবে বল ত রাণু। আমি ত জন্মকাল থেকে কেবল কথাই কয়ে আসচি,— তুলসীমঞ্জরী যেটুকু কাজ করেচে আমি তাও করি নি। বৌমা তাই রেগে মেগে হঠাৎ যদি আমার খোরাকি বন্ধ করে দেন তাহলে আমার কি দশা

হবে? যাই হোক্ এই কথাটা নিয়ে এখন থেকে ভাবনা করে কোনও লাভ নেই— সময় যখন উপস্থিত হবে তখন তোমাকে খবর দেওয়া যাবে। আমার যা কপালে থাকে তাই হবে। কিন্তু তোমার গুরু মা তোমাকে যে ছাঁদে বাংলা চিঠি লেখাতে চান আমাকে সেই ছাঁদে লিখ্‌লে চল্‌বে না— তা আমার নামের আগে শুধু না হয় একটা "শ্রী"ই দেবে— কিম্বা শ্রী নাই বা দিলে। আমার বিলেত যাবার একটা কথা উঠেচে— কিন্তু শুধু কথায় যদি বিলেত যাওয়া যেত তা হলে আমার ভাবনা ছিল না, কথা একলা যদি না জোটাতে পারতুম তা হলে তুলসীমঞ্জরীকে ডেকে পাঠাতুম। কিন্তু মুস্কিল হচ্চে এই যে, বিলেত যেতে জাহাজের দরকার করে। যুদ্ধের উৎপাতে সেই জাহাজের সংখ্যা কমে গেছে অথচ যাবার লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে— তাই এখন

"ঘাটে বসে আছি আনমনা
যেতেছে বহিয়া সুসময়।"[১]

এদিকে রোজ আমার একটা করে নতুন গান বেড়েই চলেচে। গানের সুবিধে এই যে তার জন্যে জাহাজের দরকার হয় না, কথাতেই অনেকটা কাজ হয়। প্রায় পনেরোটা গান শেষ হয়ে গেল।[২] তুমি যদি দেরি করে আস তা হলে ততদিনে এত গান জমে উঠ্‌বে যে, শুন্‌তে শুন্‌তে তোমার চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ আর পড়া হবেনা— তোমার শিশু মহাভারত বৃদ্ধ মহাভারত হয়ে উঠ্‌বে তুমি হয় ত এম্ এ পাস করার সময় পাবে না।— শান্তি আমার বর্ণনা করে কি লিখবে শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি— এক দিন তোমাদের ওখানে যখন গিয়েছিলুম আমার কাপড় ছেঁড়া ছিল, সে কথা যেন না লিখে দেয়, তুমি একটু দেখে শুনে দিয়ো— তুমি যে রকম করে আমার চুল আঁচড়ে দিয়েছিলে তার যেন একটু ভাল রকম বর্ণনা থাকে— সে পাখা করতে করতে আমার চুল যে রকম এলোমেলো করে দিত সেটা যেন না লিখে বসে। আর আমার নাক চোখ প্রভৃতি সম্বন্ধে শান্তির

যদি কোনো ভুল ধারণা থাকে তা হলে তুমি সেটা সংশোধন করে দিয়ো। ইতি ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৪৬

[ডিসেম্বর ১৯১৮]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

তুমি ভাবচ মজা কেবল তোমাদেরই হয়েচে। তাই তোমাদের ইস্কুলের প্রাইজের মজার ফর্দ্দ আমাকে লিখে পাঠিয়েছ। কিন্তু অত সহজে আমাকে হার মানাতে পারচ না। মজা আমাদের এখানেও হয় এবং যথেষ্ট বেশি করেই হয়। আচ্ছা, তোমাদের প্রাইজে কত লোক জমেছিল? পঞ্চাশ জন? কিন্তু আমাদের এখানে মেলায় অন্তত দশ হাজার লোক ত হয়েই ছিল। তুমি লিখেছ একটি ছোট মেয়ে তার দিদির কাছে গিয়ে খুব চীৎকার করে তোমাদের সভা জমিয়ে তুলেছিল— আমাদের এখানকার মাঠে যা চীৎকার হয়েছিল তাতে কত রকমেরই আওয়াজ মিলেছিল, তার কি সংখ্যা ছিল? ছোট ছেলের কান্না, বড়দের হাঁকডাক, ডুগডুগির বাদ্য, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচ্ কোঁচ্, যাত্রার দলের চীৎকার, তুবড়ি বাজির সোঁ সাঁ, পটকার ফুট্‌ফাট্, পুলিস্ চৌকিদারের হৈ হৈ, হাসি, কান্না, গান, চেঁচামেচি, ঝগড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ৭ই পৌষে মাঠে খুব বড় হাট বসেছিল। তাতে গালার খেলনা, ফলের মোরব্বা, মাটির পুতুল, তেলে ভাজা ফুলুরি, চীনেবাদাম ভাজা, প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস বিক্রি

হল। এক এক পয়সা দিয়ে ছেলে মেয়েরা সব নাগর দোলায় দুল্‌ল, চাঁদোয়ার নীচে নীলকণ্ঠ মুখুজ্জের[১] কংসবধ যাত্রার পালা গান হচ্ছিল— সেইখানে একেবার ঠেলাঠেলি ভিড়। তার পরে ৯ই পৌষে আমাদের মেয়েরা আবার এক মেলা[২] করেছিলেন— তাতে সিঙাড়া আলুর দমের দোকান বসিয়েছিলেন— একটা একটা আলুর দম এক এক পয়সায় বিক্রি হল— হেমলতা বৌমা লক্ষ্ণৌ থেকে ৪১ টাকায় অনেক জোড়া জুতো আনিয়েছিলেন তার সাইজ এত ছোট হয়েছিল যে কেউ কিন্‌তে চায় না— তিনি জোর করে যাকে পেলেন তার পকেটে গুঁজে দিলেন— সুকেশী বৌমা[৩] চিনে বাদামের পুতুল গড়েছিলেন, তার এক একটা দু আনা দামে বিক্রি হয়ে গেল। কমল কাদা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছিল— তার খড়ের চাল, চারি দিকে মাটির পাঁচিল, আঙিনায় শিব স্থাপন করা আছে— সেটা কেউ কিন্‌তে চায় না, তাই কমল আমাকে সেটা জোর করে তিন টাকায় বিক্রি করেচে, ভেবে দেখ কি রকম ভয়ানক মজা! ছোট মেয়েরা এক টুক্‌রো ন্যাকরা ছিঁড়ে তার চারদিকে পাড় সেলাই করে' আমার কাছে এনে বল্লে "এটা রুমাল, এর দাম আট আনা, আপনাকে নিতেই হবে"— বলে সেটা আমার পকেটে পূরে দিলে— এমন ভয়ানক মজা! ওঁদের বাজারে এই রকম শ্রেণীর সব ভয়ানক ভয়ানক মজা হয়ে গেছে— তোমরা যে সব প্রাইজ পেয়েচ সে এর কাছে কোথায় লাগে! তার পরে মজা, মেলা যখন ভেঙে গেল সমস্ত রাত ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেসুরো গান গাইতে গাইতে দলে দলে লোক আমার শোবার ঘরের ঠিক সাম্‌নের রাস্তা দিয়েই যেতে লাগ্‌ল, মজায় একটুও ঘুম হল না— নীচে যতগুলো কুকুর ছিল সবাই মিলে ঊর্দ্ধশ্বাসে চেঁচাতে লাগ্‌ল, এমন মজা! তার পরে কলকাতা [থেকে] অনেক মেয়ে তাঁদের ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের কারো কাশী কারো জ্বর— নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাইজে এমন ধুমধাম গোলমাল কাশি সর্দ্দি অসুখবিসুখ আট আনায় রুমাল

বেচা প্রভৃতি হয় নি— অতএব আমারই জিৎ রইল। [পৌষ ১৩২৫]

তোমার ভানুদাদা

৪৭

৩ জানুয়ারি ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

নাঃ, তোমার সঙ্গে পারলুমনা— হার মান্‌লুম। তুমি যে ইস্কুলে যেতে যেতে একেবারে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি সুদ্ধ, একগাড়ি মেয়ে সুদ্ধ, তোমাদের মোটা দিদিমণি সুদ্ধ একবারে উল্টে কাৎ হয়ে পড়বে, এত বড় ভয়ঙ্কর মজা করবে এ কি করে জান্‌ব বল? তার পরে আর-এক ভদ্রলোককে বেচারার এক্কা গাড়ি থেকে নামিয়ে তার গাড়িতে চড়ে বসবে, এত মজাতেও সন্তুষ্ট নও, আবার এক পাটি জুতো রাস্তার মাঝখানে ফেলে দেবে আর সেই জুতোর পিছনে কাশীবাসী ভদ্রলোকটিকে দৌড় করাবে— তারো উপরে আবার ইস্কুলে পৌঁছে কান্না— কি মজা! যদি সেই জুতো-শিকারী বেচারা ভদ্রলোকটি কাঁদত তাহলেও বুঝতুম— কিন্তু তুমি! বিনা ভাড়ায় পরের এক্কাগাড়িতে চড়ে, বিনা আয়াসে পরকে দিয়ে হারানো চটি জুতো খুঁজিয়ে নিয়ে— তার পরে কি না কান্না! একেই না বলে লঙ্কাকাণ্ডর পরেও আবার উত্তর কাণ্ড। তুমি লিখেছ আমিও যদি তোমাদের গাড়ির মধ্যে থাকতুম, আর হাত পা মাথা বুদ্ধি সুদ্ধি সমস্ত একেবার উল্টে পাল্টে যেত তাহলে তোমাদের মতই বাবারে মলুমরে করে চিৎকার করতুম এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করবনা— নিশ্চয়ই পা দুটো

[উপরে] আর মাথাটা উপরে [নীচে] করে আমি তানানানা শব্দে কানাড়া রাগিণীতে গান ধরতুম

হায়রে হায়, সারে গামা পাধা নি সা—
(আমার) গাড়ির হল উল্টো মতি
কোথায় হবে আমার গতি
খুঁজে আমি না পাই দিশা
সারে গামা পাধা নি সা।

যখন কাশীতে যাব আমার গাড়িটা উল্টে দিয়ে বরঞ্চ পরীক্ষা করে দেখো।— ইস্কুলে গিয়ে কাঁদব না, তোমার মাস্টার সামনে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে তান লাগিয়ে দেব—

যদিও আঘাত গায়ে লাগে নি
তবুও করুণ সুরে
দিব আমি গান জুড়ে
ঝাঁপতালে ভৈরবী রাগিনী
শুন সবে দিদিমণি, মামা,
সা রে সা রে সা রে গারে গা মা!

এই ত গেল মজার কথা। এইবার কাজের কথা। পর্শু,[১] চল্লুম মৈসুরে, মাদ্রাজে, মাদুরায় এবং মদনাপল্লিতে— ফিরতে বোধ হয় জানুয়ারি কাবার হয়ে ফেব্রুয়ারি সুরু হবে— ইতিমধ্যে ঐ দুটো গানে সুর বসিয়ে এস্রাজে অভ্যাস করে নিয়ো। আবার যদি বিশ্বেশ্বরের গোরু গাড়ি উল্টে দিয়ে নন্দীভৃঙ্গীর গোয়ালের দিকে দৌড় মারে তাহলে পথের মাঝখানে কাজে লাগাতে পারবে— আর যে ব্যক্তি তোমার এক পাটি চটি জুতো নিয়ে আস্‌বে তাকে উচ্চৈঃস্বরে তানে মানে লয়ে চমৎকৃত করে দিতে পারবে।

ততদিন কিন্তু ডাকঘরের পালা বন্ধ। আমার চিঠি ফুরোলো নটে শাকটি মুড়োলো ইত্যাদি

তোমার ভানুদাদা

১৯ পৌষ

১৩২৫

৪৮

[২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯]

ওঁ

Wood National College

Madanapalle[১]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, ১লা ফেব্রুয়ারি তুমি আমাকে যে চিঠি লিখেচ সেই চিঠি এক মাস ধরে দেশে বিদেশে আমাকে সন্ধান করতে করতে আজ ২৮শে ফেব্রুয়ারিতে আমাকে এসে ধরেচে। তুমি জিজ্ঞাসা করেচ কেন আমি তোমাকে ঠিকানা জানাই নি। কেন বল দেখি? দেখি তুমি কেমন আন্দাজ করতে পার। পাছে তোমাকে ঠিকানা জানালে তোমার চিঠি আমার হাতে এসে পৌঁছয়? তোমার চিঠির সঙ্গে আমি কি লুকোচুরি খেলা খেলতে বসেচি? কত ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, শিশু-মহাভারত পড়ে শেষ করে দিলে আর এই প্রশ্নটার জবাব দিতে পারলে না? আমি বুঝেচি, আসল ব্যাপার হচ্চে আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার যে কোনো একটা ছুতো পেলে তুমি ছাড়তে চাও না। আমি ভালো মানুষ লোক; আমি ঝগড়াঝাটি একেবারেই ভালো বাসিনে— রাগাবার জন্যে তোমাকে আমি ঠিকানা লিখি

নি এ কথা একেবারেই সত্যি নয়। তবে কেন লিখি নি, যদি জিজ্ঞাসা কর তার একমাত্র উত্তর হচ্চে, যে হেতু আমার কোনো ঠিকানা নেই। আমি কখনো এ সহরে, কখনো সে সহরে, কখনো রেলগাড়িতে। সম্প্রতি আমার একমাত্র ঠিকানা হচ্চে ভারতবর্ষ। সেই ঠিকানাটা তোমাকে লিখি নি, তার কারণ হচ্চে আমি নিশ্চয় জানতুম তুমি সেটা জান। আর কিছুদিন পরে হয়ত শুন্‌বে তার চেয়ে বড় ঠিকানায় গিয়ে পৌঁচেছি, যেমন এসিয়া কিম্বা য়ুরোপ। আরো কিছুদিন পরে হয়ত শুন্‌বে যে— যাক্‌, ঐ ঠিকানা নিয়ে আর বকাবকি করবনা। তুমি যখন চান্সালার ভাইস্‌ চান্সালারের লেকচার শুনছিলে আমি তখন কি করছিলুম বল দেখি। আমিও লেকচার দিচ্ছিলুম। তোমার বাব্‌জা ভাইস্‌ চান্সালারের লেকচারের প্রশংসা করেচেন— আমার লেকচারের প্রশংসা তোমার কানে পৌঁছিয়ে দেয় এমন কোনো লোক আমার শ্রোতাদের মধ্যে ছিল না। তাই ভাবচি আমি নিজেই সে কাজটা সেরে রাখি। ~~সার রবীন্দ্রনাথ চমৎকার বক্তৃতা করেছিলেন খূ ব চমৎকার।~~ তাঁর বক্তৃতা শুনে শ্রোতার দল একেবারে— না, আর বলব না— তুমি ভাববে, তোমার ভানুদাদা ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী। কিন্তু তা বলবার জো নেই— পাছে নিজের প্রশংসা করতে হয় এই ভয়ে আমার কথাটা আমি শেষ করতেই পারলুম না— আর গোড়ায় যে সত্য কথাটা লিখেছিলুম পাছে সে তোমার চোখে পড়ে তাই যত্ন করে কেটে দিয়েচি। আমার বিনয়গুণে নিশ্চয় তুমি খুব মুগ্ধ হয়েচ— নিজের প্রশংসা এমনতর সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারে পৃথিবীতে এত বড় অসাধারণ সৌজন্যশালী ব্যক্তি কজন বা মেলে? ঢের ঢের চান্সালার ভাইস্‌ চান্সালার বক্তৃতা দিতে পারে— কিন্তু অত্যাশ্চর্য্য অতি সুন্দর বক্তৃতা দিয়েও যে মহানুভব ব্যক্তি সে সংবাদটা সম্পূর্ণ গোপন করে যেতে পারে সে লোকটি কে বল দেখি? ভাল করে একবার আন্দাজ করে দেখ। তোমার মাথায় যদি না আসে আমি বলে দিতে পারি সে কে। কিন্তু বল্লে পাছে নিজের

গুণগান করা হয় সেই ভয়ে আমি একেবারে নীরব হয়ে গেলুম।
ইতি শিবরাত্রি ১৩২৫

তোমার শুভানুধ্যায়ী
ভানুদাদা

৪৯
২৫ মার্চ ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, কাশী ত যাবই তা কপালে যা'ই থাক্। কিন্তু তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল দেবতাদের সঙ্গে আমার কিছুতেই বনিবনা হবে না— বাবা বিশ্বেশ্বর কি করবেন এখনও তার সংবাদ পাওয়া যায় নি— কিন্তু তোমার আকাশের ভানুদাদা তোমার মর্ত্ত্যের ভানুদাদার প্রতি খুব উষ্মা প্রকাশ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন সে খবর তোমার চিঠি থেকেই পাওয়া গেল। তা হোক্ তিনি যতই গরম হোন্ না কেন, আমি উত্তেজিত হব না। তিনি যতই আমার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবেন, আমি ঠাণ্ডা হয়ে বসে হাত-পাখা সঞ্চালনের দ্বারা শান্তি রক্ষার চেষ্টা করতে থাক্‌ব। হাত-পাখার অধীশ্বরী শান্তি দেবীর প্রসন্নতা থেকে বঞ্চিত হবার কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু পয়লা এপ্রিলের এক্‌জামিনেশন! তাঁকে ঠেকায় কে? প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের চেয়ে তাঁর প্রতাপ বেশি। রাণুর অধিকার সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আর রাণুর মর্ত্ত্য-ভানুদাদার সঙ্গে যখন বিরোধ বাধবে তখন আমাকে মাথা হেঁট করে হার মান্‌তেই হবে। অবশ্য, চেষ্টা করব সন্ধি করবার জন্যে— দেখ্‌ব একটা রফা নিষ্পত্তি করে তাঁর সঙ্গে ভাগ-বখ্‌রা চলে কি না। সর্ব্বনাশে

সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ— কিন্তু আমি ত পণ্ডিতঃ নই— আমি শিশু মহাভারত রচনা করতে অক্ষম— অতএব আশঙ্কা হচ্চে অর্দ্ধং-এর চেয়ে আরো অনেক বেশি এই অপণ্ডিতকে ত্যাগ করতে হবে। বারো আনা, তেরো আনা, চোদ্দ আনা,— কিন্তু আর বেশি নয়— দর করতে করতে শেষ কালে যদি সাড়ে পনেরো আনা পর্য্যন্ত ওঠে তা হলে কিন্তু— চোখ রাঙিয়ে লাভ কি— তা হলে কিন্তু তাও যথালাভ বলে মেনে নিতে হবে— তোমার বাবাকে লিখেছিলেম, যে, শনিবার গিয়ে পৌঁছব। সেটা ঘটবে না। আমার নিজের বারেই প্রভাতে গিয়ে উদয় হব— রবিবারে[১]— সেদিন তোমাদের ছুটি— ঝগড়া করবার এবং ঝগড়া মেটাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। তার পরে তুমি এক্‌জামিন দেবে, আর আমি বক্তৃতা দেব[২]— তুমি পাবে লম্বা লম্বা মার্কা আর আমি— সে কথা বল্‌ব না, কারণ আমি নিরহঙ্কার— বিনয়ক্ষীরসাগর— নিরভিমানতায় জগতে আমার তুলনা নেই— তবে কি না উৎপৎস্যতেহস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বীঃ—

ইতি ১১ই চৈত্র ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৫০

৯ এপ্রিল ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণুকে ছোট্ট চিঠি লিখচি— কারণ ডাক্তার বলেচে শুয়ে থাক্‌তে[১]— শুয়ে শুয়ে চিঠি লেখা যায় না— তাই শোওয়া এবং বসার মধ্যে অল্পক্ষণের

জন্যে সন্ধি করে নিয়েচি— সেই সন্ধির সর্ত্ত এই যে বেশিক্ষণ বসতে পারব না। তোমাকে আমার বলবার কথা হচ্চে এই, যে, তোমার ভানুদাদার জন্যে তোমার মনে যে লেশমাত্র কষ্ট হবে এইটেই তোমার ভানুদাদার পক্ষে খুব কষ্টের কথা। আমার আশীর্ব্বাদ তোমাকে শক্তি দেবে, কল্যাণ দেবে, আনন্দ দেবে, সমস্ত ছোট বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে বড়র কাছে আত্মোৎসর্গের জন্যে তোমার জীবনকে প্রস্তুত করবে, তোমার চিত্তকে নির্ম্মল করবে, তোমার ভক্তিকে সুন্দর করবে, তোমার কর্ম্মকে সত্য করবে এই আমি কামনা করচি। ঈশ্বর আমাকে তাঁরই বিশেষ কাজে পাঠিয়েছেন— তাঁরই হুকুমে আমার নিজের কোনো ভোগ সংসারের কোনো বন্ধন আমাকে আটক করতে পারবে না। আমি আমার সেই পথিকবন্ধুর পথের সঙ্গী। তুমি তোমার আঙিনায় খেলা করছিলে এমন সময় দৈবাৎ এই পথচলা পথিকের সঙ্গে দেখা হল, তার অন্তরের স্নেহ আশীর্ব্বাদ পেলে— এই ঘটনাটুকুতে তোমার জীবনের আঙিনায় মুক্তির হাওয়া খেলুক, তুমি আপনাকে ভোল— আমারও পথের উপরে মাধুর্য্যের সুগন্ধ আনুক্, আমিও আপনাকে ভুলি। শোক যাক্, অবসাদ যাক্, মোহ যাক্,— অন্তর বাহির সুপ্রসন্ন হোক্। ইতি ২৬ চৈত্র ১৩২৫

তোমার ভানুদাদা

৫১

১৬ এপ্রিল ১৯১৯

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

এখন থেকে আমার ছোট চিঠির কাগজের দিন এসেচে। অনেক দিনের অনাবৃষ্টিতে এখানে কুয়োর জল কমে এসেচে, তাই আগেকার মত

নির্ভয়ে দেদার জল তুল্‌তে আর পারি নে— এখন দরকার বুঝে হিসাব করে ছোট পাত্রে জল তোলার ব্যবস্থা করতে হয়েচে— আমার চিঠি-লেখার কুয়োর জলও প্রায় তলায় এসে ঠেকেছে— তাই আমার পত্রের পাত্রগুলি আয়তনে ছোট হয়ে এসেচে। তোমাদের কাশীতে তিনটে বক্তৃতা করেছিলুম বলে তুমি আমাকে খুব ধম্‌কেচ— এই বুঝি তোমার কৃতজ্ঞতা? আমি আরো ভাব্‌লুম তোমার কাশীকে আমি খুব করে খুসি করে আসব— তাই তোমার জরির চাদর গলায় ঝুলিয়ে সার রবীন্দ্রনাথ তাঁর ~~চমৎকার বক্তৃতা শক্তির দ্বারা কাশীবাসী সকলকে মুগ্ধ করে দিলেন~~[১] ভাঙা গলাকে আরো ভেঙে তাঁর সামান্য শক্তিতে যতটুকু পারলেন সেই মত সামান্যই কিছু বলে এলেন— আর যাই হোক্ তোমার কাশীর লোক বুঝলে মানুষটা নিতান্ত মুখচোরা নয়, পীড়াপীড়ি করলে দুই একটা কথা বল্‌তে পারে। এটা কি ভানুদাদার রাণুর পক্ষে খুসির কথা নয়? আচ্ছা বেশ, এবার যদি কাশীতে যাই তা হলে তোমার চাদর গলায় ঝোলাব কিন্তু কখ্‌খনো বক্তৃতা করব না। অন্তত যদি, বক্তৃতা করি তা হলে তিনটে করব না— চারটে পাঁচটা কিম্বা একটা দুটোর সীমা লঙ্ঘন করা হবেনা। তোমার ৩০শে চৈত্রের চিঠি আজ ৩রা বৈশাখে পেলুম, তাতে পয়লা বৈশাখে কোনো কাজ না করে শুয়ে থাকতে বলেচ— আজ থেকে ৩৬২ দিন পরে যদি মনে রাখ্‌তে পারি তাহলে আগামী ১লা বৈশাখে তোমার কথা পালন করবার চেষ্টা করব, কিন্তু এ বছরের ১লা বৈশাখে ফিরি কোন রাস্তা দিয়ে। এ তো তোমার grammarএর conjugation সাধা নয় যে past tenseএর দুই একটা অক্ষর বদ্‌লে তাকে present tense করে দেব? বর্ষশেষের সন্ধ্যায় এবং বর্ষারম্ভের সকালে, আর গত কল্য বুধবারে আমি আমাদের মন্দিরের কাজ করেচি। এ সব দিন ডাক্তারের আমলের মধ্যে পড়ে না। একমাত্র শরীরের দিকেই তাকাব এ কথা ত সকল দিন বলা চলে না। কিন্তু তাই বলে এ কথা মনে কোরো না আমাদের এখানকার

পাঁজিতে রোজই পয়লা বৈশাখ পড়চে। সমস্ত দিন শুয়ে শুয়েই ত প্রায় দিন কাট্‌চে— কিন্তু তোমাকে চিঠি লেখবার সময় উঠে বসি সেজন্যে যদি রাগ কর তাহলে সে হবে অকৃতজ্ঞতা নম্বর দুই। এণ্ড্রুজ সাহেব কিছু দিন থেকে এখানে নেই— কলকাতায় গেছে, হয় ত দিল্লি যাবে। আমার বর্ষারম্ভের আশীর্ব্বাদ তোমরা সকলে নিয়ো— ঈশ্বর তোমাদের শান্তি দিন, স্বাস্থ্য দিন, কল্যাণ দিন, তাঁর পুণ্যধারায় স্নান করিয়ে তোমাদের জীবনকে নির্ম্মল করুন। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৫২

৭ মে ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু ইংরেজি মতে আজ আমার জন্মদিনের পরের দিন, বাংলা মতে আগের দিন। আমার আসল জন্মদিনে ইংরেজি তারিখ ছিল ৬ মে, বাংলা তারিখ ছিল ২৫শে বৈশাখ। তখনকার পঞ্জিকায় দুটিতে বেশ ভাবসাব করে একত্রেই থাক্‌ত। কিন্তু তার পরে আজকাল দেখি সেই ইংরেজি তারিখে বাংলা তারিখে ঝগড়া বেধে গেছে, তাদের মুখ-দেখাদেখি বন্ধ। এটা কি ভাল হচ্চে? যাই হোক তোমার রুমালটি বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই দুটো দিনের মাঝখানে এসে সেই ঝগড়াটে তারিখ দুটোকে সখ্যবন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করেচে। সে চেষ্টা সফল হোক্ আর না হোক্ রুমালটি আমার

পকেটের ভিতরে দিব্যি গুছিয়ে বসেচে। জন্মদিনের সারাদিন এই রুমালটি আমার পকেটে রাখ্‌তে বলেচ— কিন্তু দেখ, তার পকেট-বাসের মেয়াদ অনেক বেড়ে গেল। কাল পরমান্ন খাব— সাজ সজ্জা করবারও চেষ্টা করব কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার না আছে বিদ্যা না আছে উপকরণ। বর্ত্তমানে যিনি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি[১], তিনি যদিচ কেম্‌ব্রিজ য়ুনিভার্সিটিতে ডিগ্রি পেয়েচেন কিন্তু চুল আঁচড়ে দিতে একেবারেই পারেন না। এই সব দেখে তাঁর উপরে আমার শ্রদ্ধা একেবারেই চলে গেছে। অতএব এখন থেকে ন বছর কয় মাস আমার সাজটা অসম্পন্নই থেকে যাবে। দশটা জন্মদিন বই ত নয়— সবুর সইবে। কিন্তু দেখো, কলেজে ডিগ্রি নিতে নিতে তুমি যেন চুল আঁচড়াবার বিদ্যা ভুলে গিয়ে এণ্ড্রুজ সাহেবের মত হয়ে যেয়ো না, এই চিঠি জুড়ে আমার আশীর্ব্বাদ রইল। ইতি ২৪ বৈশাখ ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৫৩

১৮ মে ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, তোমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত এইমাত্র পাওয়া গেল।[১] আমি ভাবছি তোমার এমন চিঠির বেশ সমান ওজনের জবাবটি দিই কি করে? তুমি চলিষ্ণু, আমি স্তব্ধ; তুমি আকাশের পাখি আমি বনান্তের অশথগাছ, কাজেই তোমার গানে আর মর্ম্মরে ঠিক সমকক্ষ হতে পারে না। এক জায়গায় তোমার

সঙ্গে আমার মিলেচে; তুমিও গেছ হাওয়া বদল করতে আমিও এসেচি হাওয়া বদল করতে। তুমি গেছ কাশী থেকে সোলনে, আমি এসেচি আমার লেখবার ডেস্ক থেকে আমার জান্‌লার ধারের লম্বা কেদারায়। তুমি ভাবচ অতটুকুতে আর বদল কি হল। খুব বদল। তোমাদের বিশ্বনাথের বাড়ি থেকে আর তাঁর শ্বশুরবাড়ি যত বদল তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি যে হাওয়ায় ছিলুম এ হাওয়া তার থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ। তবে কিনা তোমার ভ্রমণে আমার ভ্রমণে একটি মূলগত প্রভেদ আছে। তুমি নিজে চলে চলে ভ্রমণ করচ কিন্তু আমি নিজে থাকি স্থির, আর আমার সামনে যা-কিছু চল্‌চে তাদেরই চলায় আমার চলা। এই হচ্চে রাজার উপযুক্ত ভ্রমণ— অর্থাৎ আমার হয়ে অন্যে ভ্রমণ করচে, চলবার জন্যে আমার নিজেকে চল্‌তে হচ্চে না।[২] ঐ দেখ না, আজ রবিবার হাটবার, সাম্‌নে দিয়ে গোরুর গাড়ি চলেচে— আমার দুই চক্ষু সেই গোরুর গাড়িতে সওয়ার হয়ে বস্‌ল। ঐ চলেচে সাঁওতালের মেয়েরা, মাথায় খড়ের আঁটি। ঐ চলেচে মোষের দল তাড়িয়ে সন্তোষবাবুর গোষ্ঠের রাখাল। ঐ চলেচে ইস্টেশনের দিক থেকে গোয়ালপাড়ার দিকে কারা এবং কিসের জন্যে তা কিছুই জানিনে— একজনের হাতে ঝুল্‌চে এক থেলো হুঁকো, একজনের মাথায় ছেঁড়া ছাতি, একজনের কাঁধে চড়ে বসেচে একটা উলঙ্গ ছেলে। ঐ আস্‌চে ভুবন ডাঙ্গার গ্রাম থেকে কলসী কাঁখে মেয়ের দল, তারা শান্তিনিকেতনের কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাবে। ঐ সব চলার স্রোতের মধ্যে আমার মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি চুপ করে বসে আছি। আকাশ দিয়ে মেঘ চলেচে, কাল রাত্রিবেলাকার ঝড় বৃষ্টির ভগ্ন পাইকের দল— অত্যন্ত ছেঁড়া খোঁড়া রকমের চেহারা। এরাই দেখ্‌ব আজ সন্ধ্যেবেলায় নীল লাল সোনালি বেগ্‌নি উর্দ্দি পরে কাল বৈশাখীর নকিবের মত গুরুগুরু দামামা বাজাতে বাজাতে উত্তর পশ্চিম থেকে কুচ [কাওয়াজ][৩] করে আস্‌তে থাক্‌বে— তখন আর এমনতর ভালমানুষী চেহারা থাক্‌বেনা।

আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ। এখন আশ্রমে যা-কিছু আসর জমিয়ে রেখেচে শালিখ পাখির দল। আরো অনেক রকমের পাখী জুটেচে— বটের ফল পেকেচে তাই সব অনাহুতের দল জমেচে— বনলক্ষ্মী হাসিমুখে সবার জন্যেই পাত পেড়ে দিয়েচেন। আমার ঘরে কেউ নেই— অসুখ করে মীরা* তার ছেলে মেয়ে নিয়ে কলকাতায় গেছেন। কমল হেমলতা গেছেন আত্মীয়ার বিয়ের নিমন্ত্রণে। আমার নামে কত নিমন্ত্রণ এল, কত চিঠি, কত টেলিগ্রাম, কিন্তু আমি অটল হয়ে বসে আছি। এণ্ড্রুজ সাহেবও নেই, তিনি দিল্লি সিমলা ঘুরে আমেদাবাদে গান্ধির* কাছে গেছেন। খবর পেলুম রাত্রে রথী* বৌমা এখানে আস্‌বেন— তাঁরা এতদিন শিলঙে ছিলেন। ইতি ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৫৪

২২ মে ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিতে যে রকম ঠাণ্ডা এবং মেঘলা দিনের বর্ণনা করেচ তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে তুমি তোমার ভানুদাদার এলাকার অনেক তফাতে চলে গেছ। বেশি না হোক্ অন্তত দু তিন ডিগ্রির মতও ঠাণ্ডা যদি ডাকযোগে এখানে পাঠাতে পার তাহলে তোমাদেরও আরাম আমাদেরও আরাম। বেয়ারিং পোষ্টে পাঠালেও আপত্তি করব না, এমন কি, ভ্যালু পেয়েব্‌লেও রাজি আছি। আসল কথা, ক'দিন থেকে এখানে রীতিমত খোট্টাই ফেশানের

গরম পড়েছে। সমস্ত আকাশটা যেন তৃষার্ত্ত কুকুরের মত জিব বের করে হাঃ হাঃ করে হাঁপাচ্চে। আর এই দুপুর বেলাকার হাওয়া, এ যে কি রকম সে তোমাকে বেশি বোঝাতে হবে না— এই বল্‌লেই বুঝবে যে, এ প্রায় বেনারসি হাওয়া, আগুনের লক্‌লকে জরির সুতো দিয়ে আগাগোড়া ঠাস বুননি; দিকলক্ষ্মীরা পরেচেন, তাঁরা দেবতা বলেই সইতে পারেন, কিন্তু ওর আঁচলা যখন মাঝে মাঝে উড়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ে তখন নিজেকে মর্ত্ত্যের ছেলে বলে খুব বুঝতে পারি। আমি কিন্তু আমার ঐ আকাশের ভানুদাদার দূতগুলিকে ভয় করিনে। এই দুপুরে দেখ্‌বে ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ। কিন্তু আমার ঘরে সব দরজা জানলা খোলা। তপ্ত হাওয়া হু হু করে ঘরে ঢুকে আমাকে আগাগোড়া ঘ্রাণ করে যাচ্চে। এম্‌নি তার ঘ্রাণ যে, ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং। গরমের ঝাঁজে আকাশ ঝাপ্‌সা হয়ে আছে— কেমন যেন ঘোলা নীল— ঠিক যেন মূর্চ্ছিত মানুষের খোলা চোখটার মত। সকলেই থেকে থেকে বলে বলে উঠ্‌চে, "উঃ, আঃ, কি গরম!" আমি তাতে আপত্তি করে বল্‌চি গরম তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তার সঙ্গে আবার ঐ তোমার উঃ আঃ জুড়ে দিচ্চ কেন। যাই হোক্ আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি কিন্তু মর্ত্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হচ্চে না। তোমরা ত পাঞ্জাবে আছ— পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধহয় পাও।[১] এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিল তাই অনেক মার খেতে হচ্চে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেচে। তাই কত শত বৎসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইচে, কিন্তু আজো শিক্ষা শেষ হয়নি। আমাদের অনেক ভালো হতে হবে, আমাদের প্রেম পৃথিবীর সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে তবে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হবে। ইতি ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৫৫

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

মাঝে তোমার একটা চিঠির জবাব দিতে পারি নি। কলকাতায় এসেচি। কেন এসেচি হয় ত খবরের কাগজ থেকে ইতিমধ্যে কতকটা জানতে পারবে। তবু একটু খোলসা করে বলি। তোমার লেফাফায় তুমি যখন আমার ঠিকানা লেখ— তখন বরাবরই আমার সার্-পদবী বাদ দিয়ে লেখ। আমি ভাবলুম ঐ পদবীটা তোমার পছন্দ নয়। তাই কলকাতায় এসে বড় লাটকে চিঠি লিখেচি যে আমার ঐ ছার পদবীটা ফিরিয়ে নিতে।[১] কিন্তু চিঠিতে আসল কারণটা দিই নি— তোমার নামের একটুও উল্লেখ করি নি— বানিয়ে বানিয়ে অন্য নানা কথা লিখেচি। আমি বলেচি বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেচে— সেই ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছি নে, তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করচি। যাক্ এ সব কথা আর বল্তে ইচ্ছা করে না— অথচ অন্য কথাও ভাব্তে পারি নে। এত লোকে এত অন্যায় দুঃখ পাচ্চে যে, দূরে বসে বসে আরামে থাক্তে লজ্জা হয়— তাদের দুঃখের অংশ যদি আমি নিতে পারি তাহলেও তাদের দুঃখ অনেকটা লাঘব হয়। ঐ দেখ, আবার ফের, ঘুরে ফিরে সেই একই কথা।

আমাদের ইস্কুল থেকে শান্তিনিকেতন[২] বলে একটি মাসিক পত্র বের হয়। প্রবাসী[৩] তারই থেকে কিছু কিছু লেখা তুলে দিয়েচে— তোমাকে আমি সেই কাগজের গ্রাহক করে দেব। আমাদের শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাড়া আর কাউকে ঐ কাগজ দেওয়া হয় না। কিন্তু তুমি ত প্রায় একমাস

আমাদের ছাত্র হয়ে আমার কাছে পড়েছিলে, সেইজন্যে ঐ কাগজ পাবার দাবী তোমার আছে। কিন্তু তোমার বাবা যদি তার গ্রাহক না হন্ তাহলে তোমার কাগজ যেন তাঁকে পড়তে দিয়ো না। এরকম পড়তে দেওয়া আমাদের নিয়ম নেই— যে পড়তে দেবে তাকে একটাকা জরিমানা দিতে হবে। তোমাদের সোলনে আমাকে যেতে লিখেছ, কিন্তু সিম্‌লা সোলনের খুব কাছেই। যদি আমাকে সেখানে ধরে নিয়ে যায় তাহলে সে দৃশ্য তুমি সইতে পারবে না, তোমাকে দুই চক্ষের জল বর্ষণ করতে হবে। আমি ভীতু মানুষ, আমি রাজদ্বার থেকে দূরে থাকি। বর্ষা নামুক, তার পরে তোমরাও নববর্ষার স্নিগ্ধ ধারার মত পাহাড় থেকে আমাদের প্রান্তরে নেমে এস। ততদিনে আমার নূতন বাড়ি[৪] শেষ হয়ে যাবে, সেখানে তোমাদের সকলের কাছে আমার গৃহপ্রতিষ্ঠার নিমন্ত্রণ রইল। ইতি বাংলা তারিখ জানি নে। পয়লা জুন ১৯১৯

তোমার ভানুদাদা

৫৬

১৮ জুন ১৯১৯

ঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

কাল ছিলুম কলকাতায় আজ বোলপুরে। এসে দেখি তোমার একখানি চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আর দেখি আকাশে ঘন ঘোর মেঘ— বর্ষার আয়োজন সমস্তই রয়েচে কেবল আমি আসি নি বলেই বৃষ্টি আরম্ভ হয় নি। বর্ষার মেঘের ইচ্ছা ছিল আমাকে তার কাজরী গান শুনিয়ে দেবে— তার পরে আমিও তাকে আমার গানে জবাব দেব। তাই

এতক্ষণ পরে আমি দুপুর বেলায় যখন খেয়ে এসে বসলুম তখন বৃষ্টি সুরু করে দিয়েছে। পূবে হাওয়ার কি নৃত্য, জলধারার ওড়না উড়িয়ে দিয়েছে এক মাঠ থেকে আর এক মাঠে! আর তার কলসঙ্গীতে আকাশে কোথাও যেন ফাঁক রইল না। নববর্ষার জলস্থলের আনন্দ উৎসব যদি দেখ্‌তে চাও তাহলে এস আমাদের মাঠের ধারে— বস এই জানলাটিতে চুপ করে। পাহাড়ে বর্ষার চেহারা স্পষ্ট দেখবার জো নেই— সেখানে পাহাড়েতে মেঘেতে ঘেঁষাঘেঁষি মেশামেশি একাকার কাণ্ড— সমস্ত আকাশটা বুজে যায়— সৃষ্টিটা যেন সর্দ্দিতে কাশীতে জবুস্থবু হয়ে কম্বলমুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। পাহাড় আমার কেন ভাল লাগে না বলি— সেখানে গেলে মনে হয় আকাশটাকে যেন আড়কোলা করে ধরে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা করে' দেওয়া হয়েচে— সে একেবারে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্ত্ত্যবাসী মানুষ, সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই— সেই আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় পাহাড় একপাল মহিষের মত শিং গুঁতিয়ে মারতে চায় তাহলে সেটা আমি সইতে পারিনে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত— সেইজন্যে বাংলা দেশের বড় বড় দিল্‌-দরাজ নদীর ধারে অবাধ [অবারিত][১] আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেচি এই কারণেই দূর হতে তোমাদের সোলন পর্ব্বতকে নমস্কার করি। যা হোক্ বর্ষা বিদায় হবার পূর্ব্বেই তোমরা আমার প্রান্তরে আতিথ্য নেবে শুনে আমি খুসি হয়েচি। তোমাদের জন্যে কিছু গান সংগ্রহ করে রাখ্‌ব— আর পাকা জাম, আর কেয়া ফুল, আর পদ্মবন থেকে শ্বেতপদ্ম— আর যদি পারি গোটাকতক আষাঢ়ে গল্প। অতএব খুব বেশি দেরী কোরোনা, পর্ব্বত থেকে ঝরনা যেমন নেমে আসে তেমনি দ্রুতপদে নেমে এস। ইতি আষাঢ়স্য তৃতীয় দিবসে। ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৫৭

২৯ জুন ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

সোলনে খুব-যে বৃষ্টি হচ্চে কুয়াশা হচ্চে এতে আমি কেন খুসি হয়েচি বলব? আমি খুব জাঁক করে বল্‌তে পারব এখানে বৃষ্টি হচ্চে না কুয়াশা হচ্চে না। তুমি হয় ত উত্তরে বল্‌বে, তাহলে নিশ্চয় খুব গরম হচ্চে— সে কথাও বলবার জো নেই। দিব্যি ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে; আকাশে মেঘগুলো আমার দেখা-দেখি কুঁড়েমি শিখেচে,— যখন খেয়াল যায় একটু আধটু বর্ষণ করে মাত্র, তারপরে অষ্টপ্রহর আকাশের এ কোণে ও কোণে হেলান দিয়ে বসে থাকে। আমি যে ওদের অকর্ম্মণ্যতা নিয়ে একটু ভর্ৎসনা করব আমার সে জো নেই— নিজে প্রায় অষ্ট প্রহর পড়ে থাকি জানলার কাছে কেদারায় হেলান দিয়ে— কাজকর্ম্মের নামগন্ধ নেই। ওরা যেমন খাপছাড়া রকম করে একটু আধটু বৃষ্টি বর্ষণ করে আমিও তেমনি এক আধবার খাতাটা টেনে নিয়ে মাথায় যা আসে একটু আধটু লিখে ফেলি। এমনি্তর নেহাৎ কুঁড়েমি করতে করতেও লেখা মন্দ জমে নি— প্রায় একখানা বইয়ের মত হয়ে এল। কবি মানুষের ঐ হচ্চে মজা, যে-সময়ে কুঁড়েমি জমে সেই সময়েই তাদের কাজ বেশি হয়। আর যে সময়ে ব্যস্ত থাকি সেই সময়ে সব কাজ নষ্ট হয়।— যাই হোক্ তোমাদের ওখানে খুব বৃষ্টি হোক্ খুব কুয়াশা হোক একেবারে তোমরা দলেবলে হুড়মুড় করে পর্ব্বত থেকে নেমে এস— নাম্‌তে নাম্‌তে একেবারে এই শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে এসে উপস্থিত হও— তার পরে গল্প গান কবিতা ঝগড়া ভাব তর্ক বিতর্ক নিবিড় হয়ে উঠ্‌বে, আষাঢ়ের মেঘের মত। মনে কোরোনা এখানে তোমাদের সকলকে ধরবেনা। খুব হাত পা ছড়িয়ে ধরবে।

কিন্তু দেখ, তুমি যে আমাকে জুয়ো খেলা শেখাবে লিখেচ সেইটে শুনে আমার অভিভাবকেরা সকলেই বড় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেচেন। আমার এই সাতাশ বছর বয়সে আমি যদি জুয়োখেলা ধরি তাহলে পরিণামে আমার দশা কি হবে? দেখ আমি খুব ভাল ছেলে, তামাক খাই নে পান খাই নে, মুখে কথা নেই, নিতান্ত নিরীহ মানুষ, অত্যন্ত সজ্জন সচ্চরিত্র সদ্‌বিবেচক সদাশয় সদ্ভাবসম্পন্ন সৎকর্ম্মশীল— ভুলেও কখনো নিজের প্রশংসা করতে জানি নে, আমার স্বভাব তুমি যদি বিগ্‌ড়ে দাও তাহলে সেটা বড় দুঃখের বিষয় হবে— আমার দেড়শো ছাত্র নিয়ে জানলার ধারে যদি জুয়ো খেলতে বসি তাহলে এখানে কেউ ছাত্র পাঠাবে না। কিম্বা এমন সব ছাত্র আস্‌বে যাদের বয়স আমারি মত সাতাঁশ বছর। আমি প্রতিজ্ঞা করচি কিছুতেই আমি জুয়ো খেলব না কোনোদিন না— তবে যদি হপ্তার মধ্যে পাঁচটা সাতটা দিন কেবল পাঁচটা সাতটা ঘণ্টা তোমার সঙ্গে খেলা যায় তাতে ক্ষতি হবেনা। ১৪ই আষাঢ় ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৫৮

১১ জুলাই ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোমার আজকের চিঠি পেয়ে বড় লজ্জা পেলুম। কেন বলব? এর আগে তোমার একখানি চিঠি পেয়েছিলুম— তার জবাব দেব-দেব

করচি এমন সময়ে তোমার এই চিঠি। আজ তোমার কাছে আমাকে হার মান্‌তে হল। আমি এত বড় লেখক, বড় বড় পাঁচ ভলুম কাব্যগ্রন্থ লিখেচি, গান লিখেচি হাজার খানেক, মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখেচি কত তার সংখ্যা নেই, গল্প লিখেচি ঝুড়ি ঝুড়ি, নাটক লিখেচি কম নয়, তারপরে গদ্য বই যা জমেচে তাতে একখানা পুরো মালগাড়ির ট্রেন বোঝাই হতে পারে, তার পরে ইংরেজি বইও শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে গড়গড় শব্দে এগিয়ে চলেচে— এ হেন যে আমি— যার উপাধিসমেত নাম হওয়া উচিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ শর্ম্মা রচনালবণাম্বুধি, কিম্বা সাহিত্য অজগর, কিম্বা বাগক্ষৌহিনীনায়ক, কিম্বা রচনা-মহামহোপদ্রব, কিম্বা কাব্য "কলা"কল্পদ্রুম, কিম্বা ফস্‌ করে এখন মনে পড়চে না পরে ভেবে বল্‌ব— রাণুর মত একরত্তি মেয়ে . "সাতাশ" বছর বয়স হতে যাকে অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর সাধনা করতে হবে, তারই কাছে পরাভব— 2 goals to nil। তার পরে আবার তুমি যে সব বিপজ্জনক ভ্রমণবৃত্তান্ত' লিখ্‌চ আমার এই ডেস্কে বসে তার সঙ্গে পাল্লা দিই কি করে? আজ সকালে তাই ভাবছিলুম, পারুলবনের সাম্‌নে দিয়ে যে রেলের রাস্তা আছে সেখানে গিয়ে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকব— তার পরে বুকের উপর দিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেণটা চলে গেলে পর যদি তখনো হাতে [য] চলে তাহলে সেই মুহূর্ত্তে সেইখানে বসে তোমাকে যদি চিঠি লিখ্‌তে পারি তবে তোমাকে টেক্কা দিতে পারব। এ সম্বন্ধে এখনো বউমার সঙ্গে পরামর্শ করি নি, এণ্ড্রুজ সাহেবকেও জানাই নি। আমার কেমন মনে মনে সন্দেহ হচ্চে ওঁরা হয়ত কেউ সম্মতি দেবেন না। তাছাড়া আমার নিজের মনেও একটা কেমন ধোঁকা লাগ্‌চে— মনে হচ্চে যদি গাড়িটার চাপে বুড়ো আঙুলটা কিছু জখম করে তাহলে হয় ত লেখা ঘটেই উঠ্‌বে না— আর যদি না ঘটে তাহলে অনন্তকালের মত ঐ দুখানা চিঠির জিৎ তোমার রয়েই যাবে। অতএব থাক্‌।

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের এখানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার একটাও ঘটেনি।

ঝড়বৃষ্টি অল্পস্বল্প হয়েচে কিন্তু তাতে আমাদের বাড়ির ছাত ভাঙে নি। আমাদের কারো মাথায় যে সামান্য একটা বজ্র পড়বে তাও পড়ল না। বন্দুক নিয়ে ছোরা ছুরি নিয়ে দেশের নানা জায়গায় ডাকাতি হচ্চে কিন্তু আমাদের এমনি অদৃষ্ট মন্দ যে আজ পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করে আমাদের আশ্রমে তারা কিম্বা তাদের দূর সম্পর্কের কেউ পদার্পণ করলে না। না, না, ভুল বলচি। একটা রোমহর্ষণ ঘটনা অল্পদিন হল ঘটেছে। সেটা বলি। আমাদের আশ্রমের সাম্‌নে দিয়ে নির্জ্জন প্রান্তরের প্রান্ত বেয়ে একটি দীর্ঘপথ বোলপুর স্টেশন পর্য্যন্ত চলে গেছে। সেই পথের পশ্চিমে একটি দোতলা ইমারত।[২] সেই ইমারতের একতলায় একটি বঙ্গীয় রমণী একাকিনী বাস করেন। তাঁর ডাক নাম মীরা। সঙ্গে কেবল কয়েকটি দাসদাসী বেহারা গোয়ালা পাচক ব্রাহ্মণ এবং উপরের তলায় এণ্ড্রুজ সাহেব নামক একটি ইংরেজ থাকেন— সমস্ত বাড়িটাতে এছাড়া আর জনপ্রাণী নেই। সেদিন মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি মেঘের আড়াল থেকে চন্দ্র ম্লান কিরণ বিকীর্ণ করচেন। এমন সময় রাত্রি যখন সাড়ে এগারোটা— যখন কেবলমাত্র দশ বারোজন লোক নিয়ে একাকিনী রমণী বিশ্রাম করচে এমন সময়ে ঘরের মধ্যে কে ঐ পুরুষ প্রবেশ করলে? কোন্ অপরিচিত যুবক? কোথায় ওর বাড়ি, কি ওর অভিসন্ধি? হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ নিদ্রিত ঘরের নিঃশব্দতা সচকিত করে তুলে সে জিজ্ঞাসা করলে "ইস্কুল কোথায়?" অকস্মাৎ জাগরণে মীরা নাম্নী রমণীর ঘন ঘন হৃৎকম্প হতে লাগল— রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বল্‌লে, "ইস্কুল ঐ পশ্চিম দিকে।" তখন যুবক জিজ্ঞাসা করলে, "হেডমাস্টারের ঘর কোথায়?" মীরা বল্‌লে, "জানি নে।" তার পরে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। এই যুবক সেই ম্লান জ্যোৎস্নালোকে সেই ঝিল্লিমুখরিত মধ্যরাত্রে আবার আশ্রমের কঙ্করবিকীর্ণ পথে আশ্রমকুক্কুরবৃন্দের তার-তিরস্কার শব্দ উপেক্ষা করে কমলা নামধারিণী একটি একাকিনী রমণীর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলে। সেই ঘরে তৎকালে উক্ত রমণীর পূর্ণবয়স্ক একটি স্বামীমাত্র ছিল, আর

জনপ্রাণীও না। সেখানেও পূর্ব্ববৎ সেই দুটি মাত্র প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের শব্দে স্তিমিত দীপালোকিত সেই নির্জ্জনপ্রায় কক্ষটি আতঙ্কে নিস্তব্ধ হয়ে রইল। লোকটা মধ্যরাত্রে বহু দূর দেশ থেকে হেডমাস্টারকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে কেন এখানে এল? তার সঙ্গে কিসের শত্রুতা? সেই রাত্রে স্বামীসনাথা ঐ একটি রমণী এবং স্বামীদূরগতা অন্য অবলা না জানি তাদের সরল কোমল হৃদয়ে কি আশঙ্কা বহন করে ঘুমিয়ে পড়ল? পরদিন প্রভাতে হেড্‌মাস্টারের হেড্ কি কোথাও পাওয়া পাবে [যাবে] তাঁরা আশা করেছিলেন?— তারপরে তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পরদিন মীরা আমাকে বল্‌লে, "তাত, কাল মধ্যরাত্রে একটি অপরিচিত যুবক ইত্যাদি।" শুনে আমার পাঠিকা বিস্মিত হবেন যে, আমি আশ্রম ছেড়ে পালাই নি। এমন কি, আমি তরবারীও কোষোন্মুক্ত করলুম না— করবার ইচ্ছা থাক্‌লেও তরবরী [য] ছিল না, থাকবার মধ্যে একটা কাগজ-কাটা ছুরি ছিল। সঙ্গে কোনো পদাতিক বা অশ্বারোহী না নিয়েই আমি সন্ধান করতে বেরলুম, কোন্ অপরিচিত যুবা কাল নিশীথে "হেড মাষ্টার কোথায়" বলে অবলা রমণীর নিদ্রাভঙ্গ করেচে?— তার পরে উপসংহার। যুবককে দেখা গেল, তাকে প্রশ্ন করা গেল। উত্তরে জানা গেল এখানে তার কোনো একটি আত্মীয় বালককে সে ভর্ত্তি করে দিতে চায়। ইতি সমাপ্ত।

এখানে আজকাল অধ্যয়ন অধ্যাপনার খুব ধুম পড়ে গেচে। পালি প্রাকৃত সংস্কৃত সিংহলী বাংলা ইংরেজি দর্শন কাব্য ব্যাকরণ অলঙ্কার ইত্যাদি চল্‌চে। ছবি ও গানও জমে উঠেচে। সন্ধ্যাবেলায় একদিন আমি বাংলা কাব্য আর একদিন ব্রাউনিঙের কাব্য আলোচনা করে সমবেত সুধীবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করে থাকি— সকাল বেলায় বালকদের ক্লাসও কিছু কিছু নিচ্চি। ইতমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমন্ত্রণসহ টেলিগ্রাম আস্‌চে। অনেক দ্বিধা করে করে শেষকালে ঠিক করেচি সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সমুদ্র পাড়ি দেব। আমাকে হয় ত ওদের কিছু দরকার থাক্‌তে পারে।

তাছাড়া যে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েচি বিদায় নেবার পূর্ব্বে তাকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে আসা উচিত। নইলে ক'দিনই বা এখানে থাকা আর কতটুকুই বা দেখা। ইতি ২৬ আষাঢ় ১৩২৬

ভানুদাদা

৫৯

[২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৯]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

কয়দিন তোমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলুম। আজ তোমার বাবজার স্বহস্তের চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমি আমার সেই পুরাতন কোণটিতে এসে ঢুকেচি। মীরা পিসি নেই, বৌমা নেই, কমলও নেই, থাকবার মধ্যে আছে সাধুচরণ।[১] জান ত তার ব্যবহার। তুমি না থাকাতে তাঁর দিবানিদ্রার মেয়াদ আরো অনেক বেড়ে গেছে। এখন আমার উপায় কি বল দেখি। এখানে মাঠের মধ্যে কেবলমাত্র ঐ এক সাধুসঙ্গে আমার দিন কাট্‌বে কি করে? তাই ঠিক করেচি বিবাগী হয়ে একেবারে শিলং পাহাড়ে চলে যাব— সেখানে চাটগাঁ বিভাগের কমিশনার সাহেবের[২] বাগানবাড়িতে তপসাধন করব— অর্থাৎ, যদি শীত করে তবে আগুন জ্বেলে তারি পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকব, আর যদি ক্ষুধা পায় তবে রুটি মাখন বিস্কুট ভাত ডাল তরিতরকারী ফল ফুলুরি রসগোল্লা সন্দেশ জিলিবি কেক প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুই খাব না, আর পানীয় দ্রব্যের মধ্যে কেবল মাত্র জল দুধ চা কফি লেবুর সরবৎ, আনারসের সরবৎ দইয়ের সরবৎ, এবং দু চার রকমের আইস্‌ক্রীম-মাত্র— একরকম শুকিয়ে থাকা আর

কি। এর থেকে বুঝতে পারবে কত বড় বৈরাগ্যের ভাব আমার মনে এসেচে। তা ছাড়া বিনয় চর্চ্চাও একেবারে ভুলি নি— অহঙ্কার ছেড়ে দিয়ে এমন আশ্চর্য্য নম্রতা অবলম্বন করেচি যে, ঘরে বাইরে যে আমাকে দেখ্‌চে সেই বিস্মিত হয়ে বল্‌চে, আহা তিনভুবনে এমনতর— যা বল্‌চে তা বল্‌তে গেলে বিনয় রক্ষা হয় না। অতএব চিঠির ও পিঠ সমস্তটা ফাঁক রেখে দিলুম— তাতেও কুলোয় কি না সন্দেহ।

আশা শান্তি কেমন থাকে আমাকে লিখো, আর আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ তাদের সকলকে জানিয়ো। ইতি তারিখ জানিনে— আজ বোধ হচ্চে পঞ্চমী। ১৩২৬ [১২ আশ্বিন ১৩২৬]

তোমার ভানুদাদা

৬০

[৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৯]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

কাল তোমাকে চিঠি লিখেচি এমন সময়ে আজ তোমার চিঠি এসে উপস্থিত। যতদিন রাজধানী কলকাতায় ছিলুম ততদিন সময়টা ছিল কাজে কর্ম্মে লোকের ভিড়ে একেবারে নিরেট— সেখানকার পাথরে বাঁধানো রাস্তার মত— সে রাস্তায় আপিস গাড়ি ট্রামগাড়ি চলে কিন্তু কোনো একটু ফাঁকে বনফুল ফোটে না। তোমাকে চিঠি লেখা সেই বনফুল ফোটানো,— তার জন্যে অকেজো সময়ের পোড়ো জমি দরকার। আমার কপালে সেই পোড়ো জমি চাষার দলে মিলে সবই প্রায় চষে ফেলে দিলে,— এই যে এখানে এসেচি, দেশ বিদেশের চিঠি জমেচে কত—

মাথা হেঁট করে সমস্ত দিন ধরে জবাব দিচ্চি। কেউবা আমাকে ইংরেজি কবিতা পাঠিয়েচে; আমাকে লিখ্‌তে হচ্চে, সে ইংরেজিও নয় কবিতাও নয়; কেউবা খান্দেশ থেকে আমার নিজের কবিতার মানে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েচে, আমাকে বিনয় সহকারে জানাতে হচ্চে, আমি কবিতা লিখ্‌তে পারি কিন্তু তার মানে বল্‌তে পারি নে; কেউবা লিখেচে, সে বই ছাপাতে চায় আমাকে তার ভূমিকা লিখে দিতে হবে, আমাকে লিখ্‌তে হচ্চে, বই যে ব্যক্তি লিখেচে তার পাপের দায় তারই, আমি কেন তার ভূমিকা লিখে খামকা সেই পাপের ভাগ মাথায় করব; এমন আরো কত তার সংখ্যা নেই।— আশা বুঝি বলেচে আমি তোমাকে ভুলে গেচি? আমি এ পর্য্যন্ত একটাও পাস্ করতে পারি নি কিনা, তার উপরে আবার কত নামতা ভুল করি সেও ত তুমি জান, তাই আশা ঠিক করে বসে আছে আমার স্মরণশক্তি কিছুই নেই,— আচ্ছা, মেনেই নেওয়া গেল আমার স্মরণ শক্তি নেই, কিন্তু তাই বলে বিস্মরণ শক্তিতে জগতে আমি অদ্বিতীয় এত বড় অহঙ্কারের কথাই বা কোন্ মুখে স্বীকার করব? আশা হয়ত ভাব্‌চে, তোমার চিঠি হাতে করে আমি বসে বসে চিন্তা করচি "রাণু? কে বল ত? Elizabeth the Great? না জাপানের রাণী কুসিকাওয়া? না চীনের মহারাণী চুংফুং ফা?" কোনো কিনারা করতে না পেরে পরম পণ্ডিত হরিচরণের কাছে গিয়ে উপস্থিত। "ওহে হরিচরণ, রাণু কে আমাকে বলে দিতে পার?" তিনি বলচেন "জানেন না? সেই যে রাণু পাগ্‌লী, খোলা চুল দুলিয়ে ছুটে ছুটে চলে?" হাঁ হাঁ, বটে বটে, একটু একটু আবছায়া আবছায়া মনে পড়চে— "সেই যে থাকে ডেরাইস্মাইল খাঁয়ে, না ময়ূরভঞ্জে, না ভিজাগাপাটামে, না কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে— সেই যে— কি রকম দেখ্‌তে বল ত?" ইতি শুক্লাষষ্ঠী কার্ত্তিক ১৩২৬ [১৩ আশ্বিন ১৩২৬]

তোমার ভানুদাদা

৬১

[৯ অক্টোবর ১৯১৯]

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোমাকে পরে পরে দুদিন ধরে দুখানি চিঠি লিখ্‌লুম তার কোনো হিসেব পাওয়া গেলনা কেন? এতদিন নিশ্চয় পেয়েচ। কিন্তু আমার খুবই ইচ্ছে ছিল ছুটির কয়দিন আশ্রমে নির্জ্জন বাস করব— কিন্তু আমার সেই মাঠের বাড়ি— যাকে আমি বলি রবির উত্তরায়ণ[১]— সেটা এখনও অতিথির অধিকারে। সুদীর্ঘকালেও তাঁকে বিচলিত করতে পারা গেল না— অবশেষে আমাকেই বিচলিত হতে হল। তার পরে এবার আশ্রমে প্রাক্তন ছাত্র অনেকে এসে জুটেচে। তারা ক্ষণে ক্ষণে আমাকে বেষ্টন করে ধরত। বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল আমার ভাগ্যে ওখানে অবকাশ নেই। আমার জ্যোতিষ্ক মিতাটি আকাশ নইলে বিচরণ করতে পারেন না— তাঁরি নামধারী আমি অবকাশ নইলে টিক্‌তে পারি নে— আমার যদি কোনো আলো থাকে তবে সেই আলো প্রচুর অবকাশের মধ্যেই প্রকাশ পায়— সেই জন্যেই আমি ছুটির দরবার করি— কেননা ছুটিতেই আমার যথার্থ কাজ। তাই লোকসমাগম দেখে আমি আশ্রম ছেড়ে দৌড় দিয়েচি। অথচ ঠিক এই সময়েই উজ্জ্বল সূর্য্যের আলোয়, রঙীন মেঘের ঘটায়, ঘাসে ঘাসে মেঠো ফুলের প্রাচুর্য্যে, হাওয়ায় হাওয়ায় শিউলিফুলের গন্ধে ক্ষেত ভরে কাঁচা ধানের শ্যামলতায়, দিকে দিকে কাশমঞ্জরীর উল্লাসহাস্যহিল্লোলে আশ্রম খুব রমণীয় হয়ে উঠেছিল। ষ্টেশনের দিকে যখন গাড়ি চলেছিল তখন পিছনের দিকে মন টান্‌ছিল। কিন্তু ষ্টেশনে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজ্‌ল আর রেলগাড়িটা আমাদের আশ্রমকে যেন টিটকারি দিয়ে পোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলে এল। রাত এগারোটায় হাওড়ায় উপস্থিত। এসে শুনি হাওড়ার ব্রিজ খুলে দিয়েচে।[২]

নৌকোয় গঙ্গা পার হতে হবে। মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে ঘাটে গেলেম। সবে জোয়ার এসেচে— ডিঙ্গি নৌকো ঘাট থেকে একটু তফাতে, একটা মাল্লা এসে আমাকে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে চল্‌ল। নৌকোর কাছাকাছি এসে আমাকে সুদ্ধ ঝপাস্ করে পড়ে গেল— আমার সেই ঝোলাকাপড় নিয়ে সেইখানে জলে কাদায় লুটোপুটি ব্যাপার। গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হয়ে নিশীথরাত্রে বাড়ি এসে পৌঁছন গেল। গঙ্গাতীরে বাস তবু ইচ্ছা করে বহুকাল গঙ্গাস্নান করি নি— ভীষ্মজননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তার শোধ তুল্‌লেন। আজ বিকেলের গাড়িতে শিলং পাহাড়ে যাত্রা করব। আশা করি এবারকার যাত্রাটা গতবারের গঙ্গাযাত্রার মত হবে না। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হয়েচে— আর ঘন মেঘের আবরণে দিগঙ্গনার মুখ অবগুণ্ঠিত।

আমাকে এবার যখন চিঠি লিখ্‌বে কলকাতার ঠিকানায় লিখো— আমি যেখানে থাকি পাঠিয়ে দেবে। তোমাকে আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বেই পাঠিয়েচি— আবার পাঠালুম। আশা শান্তি ভক্তিকেও আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। পূর্ণিমা আশ্বিন ১৩২৬ [২২ আশ্বিন ১৩২৬]

তোমার ভানুদাদা

১২ অক্টোবর ১৯১৯

ঙ

Brookside
Shillong
Assam.

কল্যাণীয়াসু

রাণু কাল এসে পৌঁচেছি শিলঙ পর্ব্বতে। পথে কত যে বিঘ্ন ঘটল তার ঠিক নেই। মনে আছে বোলপুর থেকে আসবার সময় মা গঙ্গা আমাকে

জল কাদার মধ্যে হিঁচড়ে এনে সাবধান করে দিয়েছিলেন? কিন্তু মানলুম না, বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে রেলে চড়ে বসলুম। দুদিন আগে রথী আমাদের একখানা মোটর গাড়ি গোহাটি [য] ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ইচ্ছা ছিল সেই গাড়িটাতে করে পাহাড়ে চড়ব। সঙ্গে আমাদের আছেন দিনুবাবু এবং কমল বোঠান, এবং আছেন সাধুচরণ, এবং আছে বাক্স তোরঙ্গ নানা আকার এবং আয়তনের, এবং সঙ্গে সঙ্গে চলেচেন, আমাদের ভাগ্যদেবতা, তাঁকে টিকিট কিন্‌তে হয় নি। সান্তাহার স্টেশনে আসাম মেলে চড়লুম, এমনি কসে ঝাঁকানি দিতে লাগ্‌ল যে, দেহের রস রক্ত যদি হত দই তাহলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাণটা তার থেকে মাখন হয়ে ছেড়ে বেরিয়ে আসত। অর্দ্ধেক রাত্রে বজ্রনাদ সহকারে মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগ্‌ল। গৌহাটির নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে যখন খেয়া জাহাজে ব্রহ্মপুত্রে ওঠা গেল তখন আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন কিন্তু বৃষ্টি নেই। ওপারে গিয়েই মোটর গাড়িতে চড়ব বলে খেয়ে দেয়ে সেজে গুজে গুছিয়ে গাছিয়ে বসে আছি— গিয়ে শুনি ব্রহ্মপুত্রে বন্যা এসেচে বলে এখনো ঘাটে মোটর নামাতে পারে নি। এদিকে বেলা দুটোর পরে মোটর ছাড়তে দেয় না। অনেক বকাবকি দাপাদাপি ছুটোছুটি হাঁকডাক করে বেলা আড়াইটের সময় গাড়ি এল, কিন্তু সময় গেল। তীরের কাছে একটা শূন্য জাহাজ বাঁধা ছিল সেইটেতে উঠে মুটের সাহায্যে কয়েক বাল্‌তি ব্রহ্মপুত্রের জল তুলিয়ে আনা গেল— স্নান করবার ইচ্ছা। ভূগোলে পড়া গেছে পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল, কিন্তু বন্যার ব্রহ্মপুত্রের ঘোলা স্রোতে সেদিন তিনভাগ স্থল একভাগ জল। তাতে দেহ স্নিগ্ধ হল বটে কিন্তু নির্ম্মল হল বল্‌তে পারি নে। বোলপুর থেকে রাত্রি এগারোটার সময় হাওড়ার তীরে কাদার মধ্যে পড়ে যেমন গঙ্গাস্নান হয়েছিল, সেদিন ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নানটাও তেমনি পঙ্কিল। তা হোক্‌, এবার আমার ভাগ্য আমাকে ঘাড়ে ধরে পুণ্যতীর্থোদকে স্নান করিয়ে নিলেন। কোথায় রাত্রি

যাপন করতে হবে তারি সন্ধানে আমাদের মোটরে চড়ে গৌহাটি সহরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া গেল। কিছু দূরে গিয়ে দেখি আমাদের গাড়িটা হঠাৎ ন যযৌ ন তস্থৌ। বোঝা গেল আমাদের ভাগ্যদেবতা বিনা অনুমতিতে আমাদের এ গাড়িতেও চড়ে বসেচেন, - তিনিই আমাদের কলের প্রতি কটাক্ষপাত করতেই সে বিকল হয়েচে। অনেক যত্নে যখন তাকে একটা মোটর গাড়ির কারখানায় নিয়ে যাওয়া গেল তখন সূর্য্যদেব অস্তমিত। কারখানার লোকেরা বল্‌লে "আজ কিছু করা অসম্ভব কাল চেষ্টা দেখা যাবে।" আমরা জিজ্ঞাসা করলুম রাত্রে আশ্রয় পাই কোথায়? তারা বল্লে ডাকবাংলায়। ডাকবাংলায় গিয়ে দেখি সেখানে লোকের ভিড়— একটিমাত্র ছোট ঘর খালি তাতে আমাদের পাঁচজনকে পূরলে পঞ্চত্ব সুনিশ্চিত। সেখান থেকে সন্ধান করে অবশেষে গোয়ালন্দগামী ষ্টীমারঘাটে একটা জাহাজে আশ্রয় নেওয়া গেল। সেখানে প্রায় সমস্ত রাত বৌমা এবং কমলের ঘোরতর কাশি আর হাঁপানি— রাতটা এই রকম দুঃখে কাট্‌ল। পরদিনে প্রভাতে আকাশে ঘন মেঘ করে বৃষ্টি হতে লাগ্‌ল। কথা আছে সকাল সাড়ে সাতটার সময় মোটর কোম্পানির একটি মোটর গাড়ি এসে আমাদের বহন করে পাহাড়ে নিয়ে যাবে। সে গাড়িখানা আর একজন আর এক জায়গায় নিয়ে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছিল— সেখানা না পেলে দুঃখ আরো নিবিড়তর হবে তাই রথী গিয়ে নানা লোকের কাছে নানা কাকুতি মিনতি করে সেটা ঠিক করে এসেচেন— ভাড়া লাগ্‌বে একশো পঁচিশ টাকা— আমাদের সেই হাতী কেনার চেয়ে বেশি। যা হোক্‌ পৌনে আটটার সময় গাড়ি এল— তখন বৃষ্টি থেমেচে। গাড়ি ত বায়ুবেগে চল্‌ল, কিছু দূরে গিয়ে দেখি, একখানা বড় মোটরের মালগাড়ি ভগ্নঅবস্থায় পথপার্শ্বে নিশ্চল হয়ে আছে— পূর্ব্বদিনে আমাদের জিনিসপত্র এবং সাধুচরণকে নিয়ে এই গাড়ি রওনা হয়েছিল— এই পর্য্যন্ত এসে তিনি স্তব্ধ হয়েচেন— জিনিস তাঁর মধ্যেই আছে, সাধু ভাগ্যক্রমে একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি পেয়ে চলে

গেছে। জিনিস রইল পড়ে, আমরা এগিয়ে চল্‌লুম। বিদেশে, বিশেষত শীতের দেশে, জিনিসে মানুষে বিচ্ছেদ সুখকর নয়। সইতে হল। যা হোক্ শিলঙ পাহাড়ে এসে দেখি পাহাড়টা ঠিক আছে; আমাদের গ্রহবৈগুণ্যে বাঁকে নি, চোরে নি, নড়ে যায় নি, আমাদের জিওগ্রাফিতে তার যেখানে স্থান ঠিক সেই জায়গাটাতে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আশ্চর্য্য বোধ হল। এখনও পাহাড়টা ঠিক আছে, তাই তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি কিন্তু আর বেশি লিখ্‌লে ডাক পাওয়া যাবেনা। অতএব ইতি কৃষ্ণা তৃতীয়া ১৩২৬
[২৫ আশ্বিন ১৩২৬]

তোমার ভানুদাদা

৬৩

? অক্টোবর ১৯১৯

ওঁ

Brookside

Shillong

কল্যাণীয়াসু

আজ তোমার চিঠি পেলুম। বেশ একটু শীত পড়েচে— স্নানের ঘরে ঢোকবার সময় মনটা একটু পিছু হটবার চেষ্টা করবে— কিন্তু তাকে হট্‌তে দেব না— ঝপাঝপ্ মাথায় জল ঢালবই আর কাঁপতে কাঁপতে তোয়ালে দিয়ে গা মুছ্‌বই এ আমি তোমাকে লিখে দিলুম। সাধুচরণ আমার শোবার ঘর ঝাড়াঝুড়ি করচে তাকে আমি ডেকে মুক্তকণ্ঠে বলে দিয়েচি, "সাধু, শীঘ্র আমার নাবার জল ঠিক করে দে।" কথাটা যে কত বড় বীরত্বের তা তুমি কাশীতে বসে হাত পাখার বাতাস খেতে খেতে বুঝতেই পারবেনা। আমি যেদিন এখানে এসে পৌঁছলুম সেদিন থেকেই বৃষ্টি বাদলা কেটে

গিয়েচে। আজ এই সকালে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে চারিদিক প্রসন্ন। মোটা মোটা গোটাকতক মেঘ পাহাড়ের গা আঁকড়ে ধরে চুপচাপ রোদ পোহাচ্চে— তাদের এম্‌নি বেজায় কুঁড়ে রকমের চেহারা যে শীঘ্র তারা বৃষ্টি বর্ষণে লাগ্‌বে এমন মনেই হয় না। আমার এখানকার লেখবার ঘরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সেই কোণটার কোনো তুলনাই হয় না। বেশ বড় ঘর— নানা রকমের চৌকি টেবিল সোফা আরামকেদারায় আকীর্ণ— জানলাগুলো সমস্তই শাসির— তার ভিতর থেকে দেখ্‌তে পাচ্চি দেওদার গাছগুলো লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাতাসে মাথা নেড়ে নেড়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে ইসারায় কথা বলবার চেষ্টা করচে। বাগানে ফুলগাছের চান্‌কায় কত রঙ বেরঙের ফুল যে ফুটেচে তার ঠিক নেই— কত চামেলি কত চন্দ্রমল্লিকা কত গোলাপ— আরো কত অজ্ঞাতকুলশীল ফুল। আমি ভোরে সূর্য্য ওঠবার আগেই রাস্তার দুই ধারের সেই সব ফোটা ফুলের মাঝখান দিয়ে পায়চারি করে বেড়াই— তারা আমার পাকা দাড়ি আর লম্বা জোব্বা দেখে একটুও ভয় পায় না— হাসাহাসি করে— বোধ হয় যেন তারা আমার "ভানুদাদা" নামটা জানে— আর জানে আমার বয়েস খুব অল্প— আর বোধ হয় যেন তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে "তোমার বৌমা কেন তোমাকে আমাদের মত নানা রঙের কাপড়ে সাজিয়ে বেড়াতে পাঠান না।" আমি আমার সেই শালের কাপড়টা পরে বেড়াই তার একটা রঙ আছে বটে— কিন্তু সে রঙটা যে কি বলা শক্ত— রঙ আর না-রঙের মাঝামাঝি। এই পর্য্যন্ত লিখেচি এমন সময়ে সাধু এসে খবর দিলে স্নানের জল তৈরি— অমনি কলম রেখে চৌকি ছেড়ে রবিঠাকুর দ্রুতপদবিক্ষেপে স্নান যাত্রায় গমন করলেন। স্নান করে বেরিয়ে এসে খবর পাওয়া গেল— কি খবর বল দেখি? আন্দাজ করে দেখ। নিজে যদি ভেবে না পাও আশাকে শান্তিকে জিজ্ঞাসা কর। খবর পাওয়া গেল যে রবিঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত— শ্রীযুক্ত তুলসী নামক উৎকলবাসী পাচকের স্বহস্তে পাক করা। আহার

সমাধা করে এই আস্‌চি— সুতরাং চিঠির ওভাগে পূর্ব্বাহ্ন [য] ছিল, এভাগে অপরাহ্ন [য] পড়েছে— এখন ঘড়ির কাঁটা বেলা একটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করচে। সেই মোটা মেঘগুলো সাদা-কালো রঙের কাবুলি বেড়ালের মত এখনো অলস ভাবে স্তব্ধ হয়ে রৌদ্রে পিঠ লাগিয়ে পড়ে আছে, পাখী ডাক্‌চে আর জানলার ভিতর দিয়ে চামেলি ফুলের গন্ধ আস্‌চে। ঐ মেঘগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একটা লম্বা কেদারা আশ্রয় করে নিস্তব্ধ ভাবে জানলার কাছে যদি বস্‌তে পারতুম তাহলে খুসি হতুম— কিন্তু অনেক চিঠি লিখ্‌তে বাকি আছে অতএব গিরিশিখরে এই শরতের অপরাহ্ন [য] আমার চিঠি লিখেই কাট্‌বে। তুমি ছবি আঁকচ কি না লিখো, আর সেই এস্‌রাজের উপর তোমার ছড়ি চল্‌চে কি না তাও জান্‌তে চাই। ইতি ২৮শে আশ্বিন ১৩২৬ (তারিখ ভুল করি নি— পাঁজি দেখে লিখেছি)

তোমার ভানুদাদা

৬৪

২৩ অক্টোবর ১৯১৯

Brookside

কল্যাণীয়াসু

আজ কার্ত্তিকী অমাবস্যা। আজ তোমার জন্মদিন। আশীর্ব্বাদ করি পুণ্য দীপোৎসবের দীপাবলীর মতই তোমার জীবনের দিনগুলি উজ্জ্বল হয়ে পবিত্র হয়ে দীপ্তি পাক্। অন্ধকার বিনাশ করবার জন্যেই তোমার জীবন উৎসর্গ-করা হোক্। আমাদের স্বার্থপরতার দিক্, ভোগপরায়ণ প্রবৃত্তির দিক্, অহমিকার দিক্‌ই হচ্চে অন্ধকারের দিক্, ঐ দিকেই পশুত্ব— ঐ

দিকেই ঈর্ষা দ্বেষ আত্মাভিমান, ঐ দিকেই যত দুঃখ যত গ্লানি। আমাদের ঋষিরা তাদের সাধনা থেকে যে একটি মহতী প্রার্থনা আমাদের দান করে গেছেন সেটি হচ্চে, তমসো [মা] জ্যোতির্গময়— অন্ধকার থেকে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও— অহঙ্কারের আবরণ থেকে আমার আত্মাকে মুক্ত কর। এই প্রার্থনা তোমার অন্তরের প্রার্থনা হোক্ এবং তোমাকে সমস্ত ক্ষুদ্রতা থেকে প্রলোভন থেকে রক্ষা করুক। নিরাসক্ত হয়ে তোমার প্রেম বিশুদ্ধ হোক, নিঃস্বার্থ হয়ে তোমার কর্ম্ম বিশুদ্ধ হোক্, আত্মনিবেদনের দ্বারা তোমার পূজা বিশুদ্ধ হোক্।

জন্মদিনে তোমাকে কিছু দেব বলে সন্ধান করছিলুম। সন্ধান করতে করতে তোমার জন্মদিন এসে পড়ল। এখনো আশা ছাড়ি নি— কিছু পাওয়া যাবে। উদ্দেশে আজই সেটা তোমাকে দিয়ে রেখে দিলুম— তার পরে সেটা তোমার হাতে পৌঁছতে যদি দেরি হয় তাতে ক্ষতি নেই।

এই চিঠি পাওয়ার পরে আপাতত এখানে আমাকে চিঠি না লিখে কলকাতার ঠিকানায় লিখো, যে পর্য্যন্ত না শান্তিনিকেতনে যাওয়ার খবর পাও। ইতি ৬ই কার্ত্তিক ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৬৫

১৪ নভেম্বর ১৯১৯

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু অনেক ঘুরে ফিরে কাল এখানে এসেছি।[১] এতদিনকার চিঠি জমে পর্ব্বত সমান হয়ে উঠেচে। কত কালে সব জবাব সারা হবে জানি নে।

এরি মধ্যে ফস্ করে তোমাকে দু চার লাইন লিখে দিচ্চি। শিলঙে থাকতেই তোমার জন্যে সেখানকার তৈরি একটা বস্ত্র খণ্ড কিনেছিলুম— পাঠাবার সুবিধা না হওয়াতে এতদিন পড়ে ছিল। এইবার এখান থেকে পাঠাচ্চি। এটা তোমার কি কাজে লাগ্‌বে জানি নে, হয় ত জামা তৈরি হতে পারবে, নয় ত মাথার পাগ্‌ড়ি, নয়ত কোমর বন্ধ, নয় ত টেবিলের ঢাকা, নয় ত হাব্‌লার মায়ের সাড়ি। যাই হোক্ এটা হারিয়ো না, এর পরে অনেক দিন বাদে, পঁয়তাল্লিশ কিম্বা উনসত্তর বছর পরে হঠাৎ ঐটে দেখে তোমার মনে পড়বে ভানুদাদা বলে কোনো একজন কোনো এক জায়গায় কোনো এককালে বর্ত্তমান ছিল;— হয়ত তার নাকের ডগাটা, কিম্বা পায়ের গোড়ালিটা কিম্বা কনুয়ের কোন্‌টা, কিম্বা কড়ে আঙুলের আগাটা খুব অল্প অল্প মনে আস্‌বে— স্পষ্ট মনে পড়বে না তার দাড়ি ছিল কি ছিল না, কিম্বা সে লম্বা কি বেঁটে, কিম্বা সে কালো কি গৌরবর্ণ, কিন্তু এটা হয়ত মনে পড়বে যে, সে সাতাশ বছর কিছুতেই পার হতে পারে নি, আর তাকে নামতার কোঠা জিজ্ঞাসা করলে সে বলত তিন-নাম পঁয়তাল্লিশ।

আজ মেঘ করে টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়চে— এই শীতের বৃষ্টি বয়স্ক পুরুষের কান্নার মত— দেখ্‌লে রাগ ধরে। আজই আমার সেই মাঠের বাড়িতে[১] উঠে যাবার কথা আছে— কিন্তু এই রকম ছিচকাঁদুনে দিনে কোথাও নড়তে ইচ্ছা করে না। যদি কাল রোদ্দুর ওঠে তবেই যাব, নচেৎ আজ দিনুবাবুর সেই দোতলা ঘরে চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে থাক্‌ব। সাধুচরণ এখনো আমার চা এনে দিলে না— নিশ্চয় সে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমচ্চে। ডিসেম্বরে যখন তুমি আস্‌বে তখন তাকে খুব বকে দিয়ো। ইতি? [২৮] কার্ত্তিক ১৩২৬।

ভানুদাদা

৬৬

১১ ডিসেম্বর ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

কিছুকাল থেকে খুব ব্যস্ত থাক্‌তে হয়েচে। সকালে নানা লেখা লিখ্‌তে হয়। সমস্ত দুপুর বেলায় চিঠির উত্তর। সন্ধ্যাবেলায় ক্লাস। বাইরে একটু বেড়াতে যাবারও সময় পাইনে। একটা সুবিধা এই যে এখন মাঠের মধ্যে যে জায়গায় বাসা নিয়েচি এখানে বসে বসেই বেড়ানো চলে। চারদিকেই খোলা আকাশ, খোলা মাঠ। কিন্তু চোখ দুটোকে ত লেখবার কাগজের থেকে ছুটি দেওয়া চাই নইলে সে কেবলি কালো অক্ষরগুলোর মধ্যে ঘুরে ঘুরে মরে— মাটিতে মটর ছড়িয়ে দিলে পায়রা যে রকম মাথা হেঁট করে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে বেড়ায়। থেকে থেকে ইচ্ছে করে— উত্তরে হাওয়ায় আজকাল যেমন গাছের শুকনো পাতা সব উড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্চে তেমনি করেই সমস্ত কাগজপত্র আকাশে উড়িয়ে দিই— কাজকর্ম্ম সব বন্ধ করে দিয়ে বারান্দাটাতে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে দুটো চক্ষুকে নীল দিগন্তে বিবাগী করে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু কাজ আমার ঘাড়ে চড়ে ঝুঁটি ধরে বসেচে— তাকে যতই নাড়া দিই সেই ঝাঁকানি আমার নিজের ঘাড়েই পড়ে— শেষকালে বল্‌তে হয়, "আচ্ছা রে বাপু, আমার দুটি স্কন্ধ তোমাকেই উৎসর্গ করে দিলুম, তোমার গুরুভারে আমার মস্তক ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ুক আমার মেরুদণ্ড ধনুকের মত বেঁকে যাক্, আমার জীবনের দণ্ডপল মুহূর্ত্তগুলো জাঁতায় পেষা ময়দার মত চূর্ণ হয়ে গিয়ে বস্তাবন্দী আকারে কাজের হাটে চালান্ হতে থাক।" এই মাত্র তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে লিখ্‌তে আমার দুটি ছাত্র[1] এসে উপস্থিত, ঘণ্টা খানেক ধরে তাদের ইংরেজি শেখালুম। তার পরে পুনশ্চ চিঠিতে হাত দিলুম। তোমার

বাব্‌জা লিখেচেন ২০শে তারিখে তাঁর ছুটি আরম্ভ। তাহলে তার পরে তোমাদের আসার সম্ভাবনা। ২৩শে ডিসেম্বরে ৭ই পৌষ। বাব্‌জাকে বোলো সেই দিনটা কাটিয়ে যেন ২৪শে ডিসেম্বরে আসেন। কেননা সেদিন পর্য্যন্ত ভয়ানক ভিড় হবার কথা, তোমাদের কষ্ট হবে, তোমার মায়ের ভাল লাগ্‌বে না।[২] সে সময়ে কলকাতা থেকে বিস্তর লোক আসবেন, তাঁদের নিয়ে আমাকে দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হবে, তোমাদের কারো সঙ্গে কথা কবারও সময় পাব না। কলকাতার সেন্ট পল্‌স কলেজের প্রিন্সিপাল Dewick সাহেব[৩] কাল থেকে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেচেন— কাল সকালে তিনি চলে যাবেন। তাঁর অভ্যর্থনাতেও আমাকে ব্যস্ত থাক্‌তে হয়েচে। ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৬৭

২৬ ডিসেম্বর ১৯১৯

ওঁ

BRAHMACHARYA-ASHRAM
SANTINIKETAN
Birbhum

কল্যাণীয়াসু

রাণু, আমাদের ৭ই পৌষ শেষ হয়ে গেল। তার পরেও আমাদের কিছুদিন ধরে নানা রকম কাণ্ড কারখানা চলেছিল, আজ থেকে আবার বিদ্যালয়ের কাজ সুরু হয়েচে। আমবাগানে আজ অধ্যয়নের গুঞ্জনধ্বনি উঠেচে। আজ কাল আমাদের বিদ্যালয়ের সকল ক্লাসই আমবাগানে বসে।[১] আগেকার মত এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকেনা। দেখতে বেশ লাগে। এবার

তুমি যখন আস্‌বে দেখতে পাবে অনেক নতুন বাড়ি উঠ্‌চে। আমাদের ছুটির নিয়মও বদ্‌লে গেছে। এখন থেকে গ্রীষ্মের তিন মাস ছুটি হবে, পূজোর ছুটি থাকবে না।' দুবার ছুটিতে অনেক অসুবিধা। যাদের বাড়ি দূরে তাদের যাতায়াতের খরচও বেশি হয়, যাদের গ্রামে ম্যালেরিয়া তারা ম্যালেরিয়ায় বোঝাই হয়ে আসে। এখানে তুমি যাদের সঙ্গে থার্ড গ্রুপে পড়তে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেচে। শ্রীমতী রেখা দেবী' 'সেই গৌরবে মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করে' মাথা উপরে তুলে বেড়াচ্চে— এইবার তারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রত্যন্তদেশে (frontier) এসে পৌঁছল। কিন্তু গণিতশাস্ত্রে রেখা দেবীর বিদ্যা প্রায় আমারই মত, সেইজন্য আজ সকালে মাধবীবিতানে জগদানন্দের ক্লাসে যখন তাকে দেখ্‌লুম তখন রেখার মুখে আনন্দের রেখামাত্র দেখা গেল না। আমার ইচ্ছা হল তাকে নামতার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, পাঁচ নাম কত হয়— আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি সে কখনই বল্‌তে পারত না যে, সাতাশ হয়— হয়ত ফস্‌ করে বলে ফেলত পঁয়তাল্লিশ। গোরার' ক্লাসে যার দুর্গতি স্মরণ করে তোমার হাসি পেত সেই তোমার জাম-তলার প্রিয় সহচরী কল্যাণী' এখানে নেই। সে আজকাল কলকাতায় পড়ে। জাম গাছে চড়বার যোগ্য মেয়ে আজকাল একটিও নেই— লাবী' আছে, কিন্তু কিছুদিন থেকে তার শরীর অসুস্থ। দিনুর ঘরের সাম্‌নেকার গাছে কাঁচা পেয়ারাগুলো প্রায় পাকবার অবস্থা হয়েচে— এমন দুর্গতি! দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব, আমলকিগুলো গাছের তলায় ঝরে ঝরে পড়চে— গাছে উঠে পেড়ে নেয় এমন দুঃসাহসিকা আজ কোথায়?— বড় শীত পড়েচে— উত্তরে বাতাস সাঁই সাঁই করে এসে একেবারে কলিজার ভিতরে ঢুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্চে। কিন্তু স্নানের সময় এল, এখন শীতের হাওয়ার মধ্যে শীতের জল এসে জুট্‌বেন— কিন্তু আমি পিছব না। ইতি ১০ পৌষ ১৩২৬

ভানুদাদা

৬৮

১৩ জানুয়ারি ১৯২০

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

তুমি এত দেরীতে কেন আমার চিঠি পেয়েচ ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমি তোমার চিঠি পেতে অনেক দেরী হল দেখে ভাবলুম হয় ত অমৃতসর কন্‌গ্রেসে[১] তোমাকে ডেলিগেট করেচে, কিম্বা হাওয়া জাহাজে কাপ্তেন রসের[২] সঙ্গে তুমি অষ্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েচ, কিম্বা হিমালয়ের পর্ব্বতশৃঙ্গে কোন্ পওহারী বাবার[৩] শিষ্য হয়ে মাটির নীচে বসে একমনে নিজের নাকের ডগা নিরীক্ষণ করচ, কিম্বা লয়েড জর্জ্জের[৪] প্রাইভেট সেক্রেটারির সর্দ্দি হয়েচে খবর পেয়েই তুমি সেই পদের জন্য দরখাস্ত করতে ইংলণ্ডে চলে গিয়েচ। আমি পার্লামেন্টে লয়েড জর্জ্জকে টেলিগ্রাফ করতে যাচ্চি ঠিক এমন সময়ে তোমার চিঠি পেলুম। পড়ে দেখি তুমি বরুণার ধারে কোথায় বেড়াতে গিয়ে আর একটু হলেই কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলে। আশ্চর্য্য দেখ, কাল সন্ধে বেলায় আমারো প্রায় সেইরকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তখন রাত্তির নটা। মুখ ধুয়ে বিছানায় শুতে যাচ্চি এমন সময়ে— কি বল দেখি? আমার পড়বার ঘরে টেবিলের উপর— কি বল দেখি? কুয়ো? সেই রকমই বটে। এক কপি নৌকোডুবি[৫] বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এক গল্পের বই। হঠাৎ তারি মধ্যে একবার হঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। একেবারে শেষ পাতা পর্য্যন্ত তলিয়ে গেলুম। এত বড় বিপদ ঘটবার কারণ হচ্চে, বিলাত থেকে একজন ইংরেজ[৬] ঐ বইটা তর্জ্জমা করবার অনুমতি নিয়েছিল। আবার সেদিন আর একজন ইংরেজ[৭] ঐটে তর্জ্জমা করতে চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেচে। তাতেই আমার দেখবার ইচ্ছে হল, ওটার মধ্যে ইংরেজের ভাল লাগার মত জিনিষ কি আছে।

কিন্তু সে ইচ্ছেটা রাত নটার সময় হঠাৎ উদয় হওয়া কোনো শুভগ্রহের প্রভাবে নয়। কারণ, এই কুয়োটা থেকে উদ্ধার হতে রাত তিনটা বেজে গেল। তার মানে আমার পরমায়ু থেকে একটা রাতের বারোআনা" গেল চিরকালের মত হারিয়ে। আজ সকালবেলা আমার মুখচোখ দেখে এখানকার সি. আই. ডি পুলিস সন্দেহ করচে কাল রাত্রে আমি কোথায় সিঁধ কাট্‌তে গিয়েছিলুম। তুমি ত কুয়োর মধ্যে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছ, শুন্‌চি সে কুয়োয় অনেক জল ছিল। আমি কিন্তু সাম্‌লাতে পারলুম না— একেবারে ৩৬৮ পাতার ডুবজলের মধ্যে আমার আর টিকি পর্য্যন্ত দেখবার জো ছিল না। ঐ যে ডাক হরকরা আসচে। একরাশ চিঠি দিয়ে গেল। তোমার বাবার হাতের লেখা এক লেফাফা দেখ্‌তে পাচ্চি। তার মধ্যে তোমাদের আধুনিক ইতিহাস কিছু পাওয়া যাবে। ওদিকে আবার কাল রাত্রে এক ইংরেজ অতিথি এসেছেন— আজ সমস্ত দিন তিনি বিদ্যালয় পর্য্যবেক্ষণ করবেন, সেই সঙ্গে আমাকেও পর্য্যবেক্ষণ করবেন বলে বোধ হচ্চে— যখন করবেন তখন হয়ত ঢুলব— আর তিনি তাঁর নোট্‌বুকে লিখে নিয়ে যাবেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত দিন ধরে কেবল ঢোলেন। এমনি করেই জীবনচরিত লেখা হয়। সাহেব যখন আমার জীবনচরিতে এই কথা লিখ্‌বেন তখন তুমি খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ কোরো— বোলো, আমার অনেক দোষ থাক্‌তে পারে কিন্তু দিনের বেলায় আমার ঢোলা অভ্যাস একেবারেই নেই। যাই হোক্ তুমি লয়েড জর্জ্জের প্রাইভেট সেক্রেটারির পদ গ্রহণ কর নি এইটেতে আমার মন অনেকটা আশ্বস্ত হয়েচে।

ইতি ২৮ পৌষ ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৬৯

১৫ জানুয়ারি ১৯২০

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি তোমার বাব্‌জার জিম্বায় দিয়েছিলে তিনি ডাকে ফেল্‌তে দেরী করেচেন, এই জন্যে তোমার বাব্‌জাকে ক্ষমা করতে বলেচ। আচ্ছা তাঁকে ক্ষমা করলুম,. কিন্তু তোমাকে ক্ষমা কবব কেন? তোমার বাব্‌জার হাতে কেন তুমি চিঠি দিয়েছিলে? তিনি হলেন তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ, চিঠি একটা সত্যবস্তু কিনা এ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ এখনো ঘোচে নি। তিনি শুধু চিঠি কেন ডাকঘরটাকেও মায়া বলে মনে করে বসে আছেন। তোমাকে বোধ হয় মায়া বলে স্থির করা তাঁর পক্ষে কঠিন, সেইজন্যেই একদা ব্যস্ত হয়ে চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিয়েচেন। তোমার বিরুদ্ধে আমার নালিশ হচ্চে এই যে কবিকে পত্র লেখবার সময় তুমি তত্ত্বজ্ঞানীকে তার বাহন কর কেন? এর সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ যতক্ষণ না দেবে ততক্ষণ তোমাকে আমি ক্ষমা করবনা।— রাজা বলে আমার স্বরচিত একখানা নাটক[১] অভিনয়ের আয়োজন চল্‌চে। সেই নাটক আবার প্রায় আগাগোড়া নতুন করে লিখ্‌চি[২]— যত পারচি গান তার মধ্যে গুঁজে দিচ্চি।[৩] আমি স্বয়ং সাজব ঠাকুরদাদা। সাজের জন্যে বেশি কিছু ভাবতে হবে না; কারণ সংসার নাট্যে নেপথ্যবিধানের ভার যাঁর উপরে তিনি স্বহস্তে আমাকে সাজিয়ে রেখেচেন— পরচুলো প্রভৃতি কেনবার জন্যে এক পয়সা আমাকে খরচ করতে হবেনা। দুটি একটি নাৎনীকেও নাট্যমঞ্চে পাওয়া যাবে— সুতরাং আমি যে ঠাকুরদাদা, বাহির থেকেও তার সাক্ষীর অভাব হবেনা। অভিনয়টা কলকাতায় করতে হবে— সেই ফাল্গুন মাসের শেষে।[৪] এই সব ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত আছি।— আশা চষমা পরেচে শুনে মনে মনে

একটু খুসি হয়েচি— আমার চষমার উপর যদি কখনো সে কটাক্ষপাত করে তাহলে চষমার ভিতর দিয়েই তাকে করতে হবে।— আজকাল চষমা ভাঙার পালা আমার বন্ধ হয়েচে কিন্তু ঘড়ি ভাঙা সুরু হয়েচে। ঘড়ি অল্পকালের মধ্যে দুবার ভেঙেচি। দেশ ও কাল এই দুই পদার্থের মধ্যে জগতের যা কিছু আছে— যখন চষমা ভাঙছিলুম তখন সেই দেশের দৃষ্টি বিঘ্ন পাচ্ছিল, আজ কাল ঘড়ি যতই ভাঙচি ততই কালের দৃষ্টির ব্যাঘাত হচ্চে। চষমা ঘড়ি দুই ভেঙে ফেলে দৃষ্টিকে একেবারে দেশকালের অতীত করে দেওয়া যায় কি না তোমার বাবজাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো। ইতি ১ মাঘ ১৩২৬

তোমার ভানুদাদা

৭০

৬ মে ১৯২০

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু বোম্বাই প্রদেশ ঘুরে কলকাতায় এসেচি[১] কিন্তু এখনো আমার ভ্রমণের গ্রহ শান্ত হয় নি। বিলেতে যাচ্চি— ১৫ই মে তারিখে বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়বে, সেই জাহাজে যাত্রা করব— রথী বৌমাও সঙ্গে যাবেন।[২] মঞ্জুর[৩] বাবা মঞ্জুকেও ঐ সঙ্গে শিক্ষার জন্যে, বিলাতে পাঠাবার ইচ্ছা করচেন যদি জাহাজে জায়গা পাওয়া যায় ত সেও যাবে। আগামী মঙ্গলবারে বোম্বাই মেলে বোম্বাই যাত্রা করব[৪] যদি তোমরা বুধবারে মোগলসরাই স্টেশনে আসতে পার তা হলে দেখা হতে পারে। ইস্কুল

যখন খুল্‌বে তখন তুমি তোমার ক্লাসে যোগ দিয়ো, তোমার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক থাক্‌বে, মীরা পিসি[৫] তোমাকে খাওয়াবেন এবং ননী মাসি[৬] তোমাকে নাওয়াবেন, আর প্রমদাবাবু[৭] তোমাকে ইংরেজি পড়াবেন আর নন্দলালবাবু[৮] আঁকতে শেখাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি খুব সম্ভবত ৭ই পৌষের পূর্ব্বেই ফিরে আস্‌ব।[৯] ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩২৬ [১৩২৭][১০]

তোমার ভানুদাদা

৭১

[* স্ট্রাসবুর্গ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২০][১]

রাণু

নানা দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। খুব ব্যস্ত। তোমাকে চিঠি লিখিনি বটে কিন্তু বৌমাকে জিজ্ঞাসা কোরো তোমার কথা প্রায় হয়— তুমি নিশ্চয় তা জান্‌তে পার। এখানকার অনেকেই তোমার খবর জানে। কবে দেশে ফিরব তার কোনো ঠিকানা নেই। আজ রাত্রে হল্যাণ্ডে যাব। তার পর কিছুদিন বাদে যাব আমেরিকায়। সেখানে বক্তৃতা সেরে আবার য়ুরোপে আস্‌তে হবে। তার পরে আসচে বছর ইস্কুল খুল্‌লে নতুন করে শান্তিনিকেতনে ভর্ত্তি হব। সমুদ্রপারে তোমার কাছে আমার আশীর্ব্বাদ চল্‌ল— সিন্ধুপারগামী পাখীটির মত। [৪ ভাদ্র ১৩২৭]

৭২

[* রটারডাম ১ অক্টোবর ১৯২০]

রাণু

হল্যাণ্ডে রটর্‌ডাম নামে এক নগরী আছে। সেইখানে বক্তৃতা দিতে এসেচি।[১] এখান থেকে আবার প্যারিসে যাব। তোমরা সবাই আমার আশীর্ব্বাদ নিয়ো। এবারে যখন দেশে ফিরব য়ুরোপের ভূগোলবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তুমি আমাকে হারিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু ৩x৪-এ ৪৫— এ আমার সংশোধন হবে না [১৫ আশ্বিন ১৩২৭]

২০ আশ্বিন ১৩২৭

[ব্রাসেল্‌স্]

৬ অক্টোবর

১৯২০

রটরডাম থেকে এন্টওয়ার্প[১], এন্টওয়ার্প থেকে ব্রাসেলে এসেচি। এখানে আজ রাত্তিরে বক্তৃতা দিতে হবে।[২] তার পরে যাব প্যারিস। সকাল হয়েচে, খুব শীত, কিন্তু আকাশের ভানুদাদা প্রসন্ন। হোটেলে খাবার টেবিলে বসে লিখচি। সামনে রুটি মাখন কফি, আশেপাশে অন্য টেবিলে অন্য লোকেরা বসে খাচ্চে আর কটাক্ষে আমাকে পর্য্যবেক্ষণ এবং মনে মনে পর্য্যালোচনা করচে।

আশীর্ব্বাদ।

৭৪

[* লন্ডন ১৪ অক্টোবর ১৯২০]

প্যারিস ছেড়ে লণ্ডনে এসেছি[১] লণ্ডন থেকে আগামী মঙ্গলবারে[২] উঠ্‌ব জাহাজে। সেই জাহাজ পাড়ি দেবে আমেরিকায়। তার পরে বক্তৃতা করতে করতে কোথা থেকে কোথায় ঘুরে বেড়াব তার কোনো ঠিকানা নেই তার পরে কবে দেশে ফিরব তাও অনিশ্চিত। [২৮ আশ্বিন ১৩২৭]

৭৫

[* লন্ডন ২০ অক্টোবর ১৯২০]

আজ এখনি লণ্ডন ছাড়চি।[১] কাল অতলান্তিক পাড়ি দেব। তার পরকার খবর সমুদ্রের ওপারে। আমার আশীর্ব্বাদ [৩ কার্তিক ১৩২৭]

৭৬

[* নিউইয়র্ক ৩০ অক্টোবর ১৯২০]

রাণু, ধরণীর ভানুদেব অতলান্তিকের পূর্ব্ব পার থেকে আজ পশ্চিম পারে অবতীর্ণ হয়েচে।[১] আকাশের ভানু তরণীর গবাক্ষ ভেদ করে স্মিত হাস্যে সেই লীলা অবলোকন করচে। পুরাণে সমুদ্র মন্থনের কথা শুনেছিলুম— সেই মথিত সমুদ্রের মূর্ত্তি কি, এবার তা মাঝে মাঝে দেখে নিয়েচি।[২] [১২ কার্তিক ১৩২৭]

৭৭

[* নিউ ইয়র্ক ৩০ নভেম্বর ১৯২০]

কোন দৈত্যপুরীতে এসেচি ছবি[১] দেখলেই বুঝতে পারবে। দেয়ালের গায়ে দরজার ফুকরগুলো গুণে দেখলেই বুঝবে বাড়িগুলো কয় তলা। সহরটা

শিং তুলে আকাশটাকে যেন গুঁতিয়ে মারবার চেষ্টা করচে। আর কি ভীড়। রাস্তা দিয়ে যেন পাগ্‌লামির বন্যা ছুটেচে। [১৫ অগ্রহায়ণ ১৩২৭]

৭৮

[* Yama Farms ২৭ ডিসেম্বর ১৯২০]

আ-মরি-ক্যা-হ্যায় নামে এক মহাদেশ আছে সেইখানে য়ম-পুরম্‌ নামে এক স্থানে নির্ব্বাসন যাপন করচি।[১] বনের মধ্যে কুটীর— চিত্রকুটের মত এক পাহাড়, তারই পদতলে নির্ঝরিণী বয়ে যাচ্চে। হনুমান যদি থাক্‌ত তার ল্যাজ আঁক্‌ড়ে ধরে এই মুহূর্ত্তে ভারত সমুদ্রপারে গিয়ে পৌঁছতুম। কিন্তু সেই বানরটাকে খুঁজে পাচ্চিনে। [১২ পৌষ ১৩২৭]

৭৯

[* নিউ ইয়র্ক ৬ জানুয়ারি ১৯২১]

আজ ২০শে পৌষ। কাশীতে শীত কেমন? যেমনই হোক এখানকার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। তোমাদের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের গোটা কয়েক টুক্‌রো এখানে যদি পাঠিয়ে দিতে পার তাহলে এখানকার জানুয়ারির আসর গরম করে তুল্‌তে পারি। [৪ জানুয়ারি ১৯২১]

৮০

[ফেব্রুয়ারি ১৯২১]

[টেক্‌সাস]

ছিলুম বাংলাদেশে— তমালতালীবনরাজি-বেষ্টিত নিভৃত নিকুঞ্জ কুটীরে— আর কোথায় এসেচি আমেরিকার পশ্চিমতম প্রান্তে টেক্‌সসে।[১] সহরে

সহরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্চি। সেই আমার উত্তরায়ণের বারান্দায় আমার আরামকেদারা তার দুই শূন্য হাত শূন্যে প্রসারিত করে আমাকে ডাক দিচ্চে। সে ডাক শুন্‌তে পাচ্চি, সেই সঙ্গে এই ফাল্গুনমাসের শালবীথিকার নবকিশলয়দলের মর্ম্মরধ্বনি আমার হৃদয়ের মধ্যে বেজে উঠ্‌চে। কবে আবার সমুদ্রের পূর্ব্বঘাটে আমার তরী গিয়ে ভিড়বে সেই কথাই ভাবচি— এই বক্তৃতার ঘূর্ণী হাওয়ায় পাক খেয়ে বেড়াতে আর একটুও ভাল লাগচেনা। [ফাল্গুন ১৩২৭]

৮১
[এপ্রিল ১৯২১]

ও পাতায় যে পক্ষিরাজের ছবি দেখচ সেই পক্ষিরাজে চড়ে আমরা লণ্ডন থেকে সমুদ্র পার হয়ে প্যারিসে এসে পৌঁচেছি।[১] দু ঘন্টা সময় লেগেছিল। ভানুদেবতা এই মর্ত্ত্যভানুর আকাশলীলা দেখে সমস্ত গগনতল পূর্ণ করে হাস্য করেছিলেন— তিনি মনে করেছিলেন এতদিন পরে বুঝি তাঁর এক সঙ্গী জুটে গেল। কিন্তু যখন দেখ্‌লেন প্যারিসে এসে আমার পক্ষিরাজের পক্ষ ভূমিতল স্পর্শ করল তখন থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে কেবলি বৃষ্টি পড়চে। আমি তাঁকে কি করে বোঝাব, মর্ত্ত্যের আকর্ষণ আমার পক্ষে এখনো প্রবল— যতই উধাও হয়ে যাই মাটির আহ্বান এড়াতে পারিনে অতএব মর্ত্ত্যের রবির সঙ্গে আকাশের রবির নিকট সম্বন্ধ কখনো ঘটবে কি না সন্দেহ, দূর থেকে তাঁর করস্পর্শ মাথায় করে নেব।

৮২
[১৮ জুন ১৯২১]

জিয়োগ্রাফিতে তোমার ক্লাসে নিশ্চয় তুমি প্রথম বিভাগে প্রথমা হয়ে উত্তীর্ণ হয়েচ কিন্তু আমি বাজি রাখ্‌তে পারি Czechoslovakia[১] সৌরজগতের

কোন্ গ্রহের কোন্ বিভাগ অধিকার করে তা তুমি কিছুই জান না,— এমন কি যদিও বল্‌তে সাহস হয় না তোমার বিদুষী দুই দিদি ফস্ করে এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। তোমার পিতার সম্বন্ধে আমি কোন সন্দেহ প্রকাশ করতে ইচ্ছা করি নে— তোমাদের যদি অভিরুচি হয় তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে পার। যা হোক্, এই চেকোস্লোভাকিয়া থেকে আমি পত্র লিখ্‌চি। কিন্তু এই পত্রলেখকটি যে কে তা বোধ হয় তুমি কিছুতেই অনুমান করতে পারবে না। যদি চ এ সম্বন্ধে বাজি রাখ্‌তে আমি ভরসা করচি নে। এখানকার য়ুনিভার্সিটিতে আজ বক্তৃতা দিতে চলেচি।[৫] হিন্দু য়ুনিভার্সিটিতে যে সভায় আমি বক্তৃতা দিয়েছিলুম[৬] সেখানকার চিত্র বোধ হয় তোমার মনে আছে। কিন্তু আজানুবিলম্বিত সেই আমার উত্তরচ্ছদটি নেই। সেটি বোধ হয় কোনো কাশী-অধিবাসিনী অপহরণ করে নিয়েচে। এই পত্র যে দিন তোমার হস্তগত হবে তার অনতিকাল পরেই পত্রলেখক তোমার দৃষ্টিগোচর হতে পারে যদি তুমি দৃষ্টিপথে এস। তোমরা সকলে মিলে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর [৪ আষাঢ় ১৩২৮]

৮৩

[অগাস্ট ১৯২১]

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তুমি আমার পরে রাগ করতে পার, আর ভানুদাদার শরীরে কি একটুও রাগ নেই? সেপ্টেম্বরে আমি অজন্তায় যাব[১] বলে তুমি যদি রাগ করতে পার, তাহলে সেপ্টেম্বরের আগে তুমি আস্‌চনা বলে আমি রাগ

করতে পারি নে? কিন্তু কাজ নেই, আমি বহু কষ্টে রাগ সম্বরণ করলুম। তুমিও আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। তাহলে আর আড়ি না, তাহলে আবার আমাদের ভাব। আমি হার মানচি। মনে কর না কেন আমি জর্ম্মণী। Peace Conference এ[২] আমাদের সন্ধিপত্র লেখা হোক্‌। অবশ্য জর্ম্মনিকে দণ্ড দিতে হবে। জর্ম্মনি তার দণ্ড চল্লিশ বছর ধরে দেবে— অর্থাৎ যখন সম্ভব তখনি তোমার সঙ্গে তার দেখা করতে হবে— সেপ্টেম্বর না হয় ত অক্টোবর, অক্টোবর না হয় নবেম্বর, নবেম্বর না হয় ডিসেম্বর, ডিসেম্বর না হয় জানুয়ারি, জানুয়ারি না হয় ত ফেব্রুয়ারি ইত্যাদি— যদি দৈবাৎ এক বছর না হয় ত অন্যবছর ভয়ানক কঠিন সর্ত্ত— তবু দেখ দেখি কত সহজে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে রাজি হলুম। আমার এই চল্লিশ বছরের দেনা চল্লিশ বছরে যদি না কুলোয় তাহলে আরো চল্লিশ বছর মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে রাজি আছি।

আজকাল কি করচি জিজ্ঞাসা করেচ? বক্তৃতা দিচ্চি। আমি দিচ্ছি বক্তৃতা আর লোকে দিচ্চে গাল,— সুতরাং বুঝতেই পারচ কেমন আছি। কাল দেব একটা বক্তৃতা[৩] পর্শু কেমন থাকি সেই খবরটা নিয়ো। তার পর দিন শুক্রবার একটা বর্ষা উৎসবের কাজরী সভা হবে।[৪] বক্তৃতায় যাদের মন তেতে উঠবে— গানের বর্ষাধারা বর্ষণ করে তাদের মন ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করব। কিন্তু ঠাণ্ডা না হয়ে যদি গুমট[৫] হয় তাহলে কি করা যাবে বল দেখি?

ভানুদাদা

৮৪

১০ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আমি এমন ভয়ঙ্কর রাগ করলুম আর তুমি সেটা একেবারে ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিলে? মনে এতটুকুও ভয় হোল না। আমি দেখ্‌তে পাচ্চি আমাদের স্বরাজ এল বলে, আর দেরি নেই— নইলে বঙ্গরমণীর মনে এমন হঠাৎ সাহসের সঞ্চার হল কি করে? যা হোক্ এবারকার মত তোমার সঙ্গে সন্ধি করব বলেই মন স্থির করেচি। যথাসময়ে তুমি যদি আমাকে ধরতে পার তাহলে আমি ধরা দেব— ঠিক যখন টাইম টেব্‌ল্ হাতে নিয়ে রেলগাড়ির সময় বিচার করচি এমন সময়ে ছুটে এসেই একেবারে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেবে— আমি ভালমানুষটির মত চুপ করে বসে থাকব— কেবল যখন খাবার সময় আসবে সেই সময়ে ক্ষিধের জ্বালায় একটু চেঁচামেচি করব— তুমি যদি জান্‌লার ফাঁক দিয়ে আমাকে অতি যৎসামান্য কিছু খাবার গলিয়ে দাও, (যথা, কালিয়া পোলাও, কাবাব, কোর্ম্মা, আলুর দম, পটলের দোর্ম্মা, ডালপুরিয়া, কিস্‌মিসের চাট্‌নি, কচুরি, সিঙ্গারা, নিম্‌কি, আলুভাজা, রুইমাছের মুড়ো, ইলিষমাছের অম্বল, আর সামান্য কিছু মিষ্টি, যেমন, সন্দেশ, রসগোল্লা, ছানাবড়া, সরভাজা, ছানার পায়েস, গজা, নারকেল নাড়ু, বাদামের বরফি, রাবড়ি এবং তা ছাড়া আর যা কিছু তোমার মনে আসে) তা হলেই আমি কোনোমতে সন্তুষ্ট চিত্তে দিনযাপন করব। আমার ভয় হচ্চে উপরে যৎসামান্য আহারের যে ফর্দ্দটি দিলুম ওটাকেও পাছে তুমি ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দাও— তাহলে কিন্তু সন্ধির সর্ত্ত রক্ষা হবে না; পুনর্ব্বার যাকে বলা Casas belli[১] অর্থাৎ ঝগড়ার কারণ ঘট্‌বে। যাই হোক্ এ কথা তোমাকে জানিয়ে রাখচি তুমি যদি সময় বিচার করে এসে পড় এবং দুই হাত দিয়ে আমার

দ্বার আগ্‌লে দাঁড়াও তাহলে আমি পালাবার চেষ্টাও করবনা। এর থেকে. বুঝতে পারবে আমার মত ভালোমানুষ লোক সংসারে অতি অল্পই আছে— যদিচ এ সব কথা নিজ মুখে বল্‌তে নেই। কিন্তু আমার মুষ্কিল হয়েচে এই, অন্য লোকে আমার সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ প্রয়োগ করে তোমার চিঠিতে তা উদ্ধৃত করতে প্রবৃত্তি হয় না— তাই দায়ে পড়ে নিজের কল্পনাশক্তি এবং রচনাশক্তি খাটাতে হয়।

আজ এই পর্য্যন্ত। কারণ, কাজ আছে— তা ছাড়া আকাশে ঘন মেঘ করেচে আমার কবিচিত্ত তাই উতলা হয়েচে— এমন অবস্থায় চুপ চাপ করে বসে থাকাই বিধেয়— কারণ গদ্য এখন কলম দিয়ে বেরতে চাচ্চে না। ইতি ২৫ ভাদ্র ১৩২৮

ভানুদাদা

বাব্‌জাকে বোলো
তিনি যদি অক্টোবরের
সুরুতেই আসেন
আমার দর্শন
পাবেন।

৮৫

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আজকাল তুমি ঠাট্টা বুঝতে আরম্ভ করে আমার উপরে জিতে যাবার চেষ্টা করচ— কিন্তু সেটি হবেনা। যেই আমি খাবারের ফর্দ্দ দিলুম অমনি

তুমি বলে বস্‌লে ওটা ঠাট্টা— আর যদি উল্‌টো হত, ফর্দ্দটা যদি তোমার নিজের ভোজের জন্যে হত তাহলে কিছুতেই ঠাট্টা বলে মনে করতে না। এমনতর নিজের সুবিধা বিচার করে তুমি যদি ঠাট্টা বুঝতে আরম্ভ কর তাহলে তোমার সঙ্গে ঠাট্টা বন্ধ করতে হবে।

সামনে তোমার পরীক্ষা'— এখন দিনরাত তোমার মাথায় সেই ভাবনা লেগে আছে, তুমি এখন ভানুদাদার দিকে ফিরেও তাকাবে না— অ্যালজেব্রা নিয়ে পড়ে থাক্‌বে। তোমার ভয় হবে আমার কাছে থাক্‌লে পাছে তোমার নাম্‌তা ভুল হয়ে যায়, আর পাছে animal বানান করতে গিয়ে annie mull লিখে বস। এই কথা মনে করেই আমি উদাস হয়ে একেবারে অজান্তা [য] গুহার মধ্যে চলে যাচ্ছিলুম। তুমি যদি আমাকে আট্‌কে রাখ্‌তে চাও তাহলে কিন্তু অ্যালজেব্রার বইখানা তোমায় ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হবে। তুমি হঠাৎ এসে পিছন দিক থেকে আমার চোখ টিপে ধরতে চাও— আলজেব্রার [য] বইখানা হাতে থাক্‌লে কি করে চোখ টিপ্‌বে? আর যদি জিওমেট্রি হাতে নিয়ে আমার চোখ টিপে ধর তাহলে আইসসিলিস্‌ ট্রাইঅ্যাঙ্গ্‌লের খোঁচা লেগে আমার চষমা ভেঙে যাবে। দেখ এবারকার চিঠিতে তোমাকে একটুও ঠাট্টা করি নি— ভয়ঙ্কর গম্ভীর ভাষায় তোমাকে লিখলুম। তুমি পরীক্ষা দিতে যাচ্চ আমি কোনোদিন পরীক্ষা দিই নি— এই জন্যে ভয়ে সম্ভ্রমে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় আমার মুখ থেকে একটিও ঠাট্টার কথা বেরতে চাচ্চে না— আমি নতশিরে এই কথাই কেবল আবৃত্তি করচি

যা দেবী পাঠ্যগ্রন্থেষু ছাত্রীরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ইতি ১লা আশ্বিন ১৩২৮

ভানুদাদা

৮৬

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২১

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

তুমি যখন ছুটির আগেই আলজেব্রার ক্লাস ফেলে এখানে আস্‌তে চেয়েচ[১] তখন বুঝতে পারচি ভানুদাদার সঙ্গে তোমার খুব ভাব। যে লোক নামতা জানে না তাকে যে এখনো ভোলো নি এতে তোমার স্মরণশক্তিরও প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার মনে বড় খট্‌কা লেগেচে। তুমি চিঠিতে লিখেচ আমি নিশ্চয়ই আশার চেয়ে বেশি ইংরেজি জানি। এটা কি উচিত? আশা তোমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, কলেজে পড়ে, তার ইংরেজি-জ্ঞানের প্রতি এত বড় অবজ্ঞা প্রকাশ কি ভাল হয়েচে? সে যদি জান্‌তে পারে তাহলে তার মনে কত বড় আঘাত লাগবে একবার ভেবে দেখ দেখি। আমার চিঠি পেয়েই তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কোরো। আশার মত আমি যদি ইংরেজিতে পরীক্ষা পাশ করতে পারতুম তাহলে কি আজ এমন বেকার বসে থাক্‌তুম? তাহলে অন্তত পুলিসের দারোগাগিরি জোগাড় করতে পারতুম। চিরদিন ইস্কুল পালিয়ে কাটালুম, কুঁড়েমি করেই এমন মানবজন্মের সাতাশটা বছর বৃথা নষ্ট করলুম— এইজন্যে পাছে আমার কুদৃষ্টান্তে তোমাদের হঠাৎ বানান্‌ ভুলে পেয়ে বসে তাই ত সহর ছেড়ে তোমাদের কাছ থেকে দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াই। এবারকার মত যা হবার তা ত হল, আর-জন্মে ম্যাট্রিকুলেশন যদি বা না পারি ত অন্তত মাইনর ইস্কুলের ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তবে ছাড়ব। কিছু না হোক্‌ অন্তত ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত অঙ্ক কষ্‌বই, আর ফার্স্ট, সেকেণ্ড দুটো রীডার্‌ যদি শেষ করতে পারি তাহলে গাঁয়ের প্রাইমারি ইস্কুলের হেডমাস্‌টারি করতে পারব আর তারই সঙ্গে সঙ্গে মাসিক সাড়ে আট টাকা বেতনে ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের

পোষ্ট মাষ্টারি পদটাও জোগাড় করে নেবার চেষ্টা করব— নেহাৎ না পাই যদি, তবে জমিদার বাবুর কনিষ্ঠ ছেলেটির প্রাইভেট টিউটারের কাজটা নিশ্চয় জুটবে। ইতি ৭ আশ্বিন ১৩২৮

ভানুদাদা

৮৭

২১ অক্টোবর ১৯২১

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[১] আমাদের আশ্রম থেকে আজ সকালে কাশীধামে যাত্রা করেছেন। তিনি সদ্‌ব্রাহ্মণ ফুলের মুখটি। তাঁকে যত্নপূর্ব্বক আতিথ্য করে পুণ্য অর্জ্জন কোরো।

তুমি লিখেচ, তুমি এখানে থেকে কালো এবং রোগা হয়ে গেচ। এখানকার আবহাওয়ায় কালো রঙের প্রলেপ আছে। তোমার ভানুদাদার উজ্জ্বলতা এখানে অনেক পরিমাণে ম্লান হয়ে আসে, আমার সহস্র রশ্মির উপরে সাঁওতালি ছায়া পড়ে। তোমার কাশীর পাণ্ডাদের গৌরিমার কথা যখন শুনি তখন লোভ হয়। ইতিমধ্যে যদি পাণ্ডার পদ খালি হবার খবর পাও তাহলে আমি তার জন্যে উমেদারী করতে রাজি আছি। তুমি যে এখান থেকে রোগা হয়ে গেচ সে তোমার নিজগুণে। ইতিহাস ভূগোল গণিত প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমার অনেক শিক্ষা হয়েচে, এমন কি, চেকো-স্লোভাকিয়া মানচিত্রের কোন্ অংশে তাও তোমার অগোচর নেই, কিন্তু দেহরক্ষার পক্ষে আহার যে অত্যাবশ্যক এই তথ্যটি সম্বন্ধে তোমার ধারণা

অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। দুই একজন সতীর্থ হিন্দুস্থানী ছাত্রীর কাছ থেকে এই বিষয়ে উপদেশ নিতে পার— বিষয়টি গুরুতর, কারণ এতে গুরুত্ব লাভের সহায়তা করে। শুনেচি আহার সম্বন্ধে কাশীর পাণ্ডাদের ধারণাশক্তি অসামান্য— তাদের দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষে দুর্লভ হবে না।

আমার অবস্থা পূর্ব্বেরই মত। ডাকযোগে প্রচুর পত্রোদগম হচ্চে, কিন্তু তাতে ফল নেই। এ ছাড়া মাঝে মাঝে সকালে অকস্মাৎ কোথা থেকে গানের সুর এসে আমার মস্তিষ্ক অধিকার করে নিয়ে মৌচাকে মধুকরের মত গুঞ্জন করতে থাকে।[২]

কবিত্ব ছাড়া আমার আর এক ব্যবসায় আছে সে হচ্চে কবিরাজী। দুইয়েতেই রসায়ণের সম্পর্ক আছে কিন্তু সে এক জাতের নয়। সকাল বেলায় এক হাতে ওষুধের চর্ম্মপেটিকা আর এক হাতে ছাতা নিয়ে সন্তোষের ঘর থেকে আরম্ভ করে' সুকুমারের[৩] ঘর হয়ে প্রভাতকুমারের[৪] কুটীর পর্য্যন্ত রোগী দেখে বেড়াই। অশ্বিনীকুমারের কৃপায় এ পর্য্যন্ত কোন দুর্ঘটনা হয় নি। কিন্তু বুঝতে পারচ সময় আমার পক্ষে সুলভ নয়। ভবভূতি বলে গিয়েচেন, কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমার পক্ষে অবসর কালের অভাবই নিরবধি হয়ে উঠেচে। সেইজন্যেই যদি "উৎপৎস্যতেহস্তি মম কোহপি সমানধর্ম্মা" তাহলে তাঁকে প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখতেই হবে— কিন্তু একটা মুষ্কিল, গান তৈরি আর কবিতা লেখা প্রাইভেট সেক্রেটারি দ্বারা হবার জো নেই— আর কবিরাজীতেও আশঙ্কার কারণ আছে। মনের এই উদ্বেগ জানিয়ে আজ পত্র সমাধা করি। ইতি
৪ কার্ত্তিক ১৩২৮

ভানুদাদা

৮৮

[? ২ নভেম্বর ১৯২১]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

এই মাত্র তোমার জন্মদিনের চিঠি পেলুম। প্রতি জন্মদিনে তুমি যেমন বয়সে বড় হচ্চ তেমনি যেন অন্তরের মধ্যেও বড় হতে থাক এই আমার আশীর্ব্বাদ। অন্তরের মধ্যে যতই আমরা বড় হতে থাকি ততই আমরা স্বার্থের গণ্ডি ছাড়িয়ে যাই, ততই আমরা নিজের সুখ দুখের বাঁধন কাটিয়ে পরের জন্যে বাঁচতে শিখি। তোমার প্রেম তোমার আত্মসুখের কামনাকে দগ্ধ করে ফেলে বিশুদ্ধ দীপ্তিতে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠুক, তার আলোক তোমার জীবনকে সার্থক এবং সমস্ত সংসারকে আলোকিত করুক। গর্ভ থেকে যেমন আমাদের দেহের জন্ম তেমনি আমাদের অহঙ্কারের বেষ্টন থেকে আত্মার জন্ম— যে সব ইচ্ছা আমাদের নিজের দিকে টেনে রাখে সেই সব বন্ধন ছেদন করে তবে আত্মার নবজন্ম লাভ হয়। তোমার আত্মা তার বিকাশের সমস্ত বাধা দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে ছেদন করে মুক্তির জন্যে প্রস্তুত হতে থাক এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। ইতি বুধবার [? ১৬ কার্তিক ১৩২৮][১]

ভানুদাদা

৮৯

৯ নভেম্বর ১৯২১

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]
২৩ কার্ত্তিক ১৩২৮

কল্যাণীয়াসু

পর পৃষ্ঠায় যে কবিতাটি আছে[১] সেটি যদি দৈবাৎ আশার চোখে পড়ে তাহলে নিশ্চয় কেড়ে নিয়ে তাদের কাগজে ছাপিয়ে দেবে এই আমার ভয়। তোমার একটা সুবিধা তুমি ইংরেজিতে কবিতা লেখনা, এই জন্য এই কবির কীর্ত্তির সম্বন্ধে তোমার ঈর্ষা জন্মাবে না। বলা যায় না, তুমি হয়ত এর ভাষা ছন্দ প্রভৃতি নিয়ে কঠোর সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হবে— আর কেউ যে তোমার ভানুদাদার স্তবগান করবে এতে হয় ত তোমার মনে একটুখানি jaylussie[২] হতে পারে— সেটা হওয়াও nachiralle। আমি দেখেচি তুমি অন্যলোকের ingllish কিছুতেই পছন্দ কর না— বিশেষত তাদের espeling। তাই আমার ভয় হচ্চে তুমি হয়ত এই poate কে kriticisise করতে বস্‌বে, আর হয় ত বল্‌বে ও যা লিখেচে সে একেবারে piore dograil। দেখ রাণু। তুমি যেন বাংলায় poitree লিখতে চেষ্টা কোরো না— তাহলে আমার কবিতার তুমি folt finde করতে আরম্ভ করবে— আমার উপর তোমার আর কিছুই reshpekt থাক্‌বেনা। আমি নিজে কবিতা লিখি বটে কিন্তু আমার স্বভাব খুব humbull— আমি তাই মুক্তকণ্ঠে konfes করচি এই মাদ্রাজি কবির মত কবিতা আমি কিছুতেই লিখ্‌তে পারি নে— আজ অধ্যাপক সিল্‌ভ্যাঁ লেভি[৩] আসচেন— আবার Lord Kinnaird এর মেয়ে আসচে— কোথায় যে কাকে জায়গা দিই ভেবেই পাচ্চি নে। এখন থেকে আমার সময় আর কিছুই থাকবেনা। আজকাল শীতের উত্তর বায়ু বইতে আরম্ভ হয়ে এখানকার আশ্রমতরুর

পত্ররাজি চারিদিকে বিকীর্ণ হচ্চে— কিন্তু আমি নিরন্তরবায়ুগ্রস্ত হয়ে বসে আছি আমার পত্র আর সহজে বিক্ষিপ্ত হতে চাইবে না।

ধীমু অন্নপূর্ণার আরতি দেখে এখানে ফিরে এসেচে— তোমাদের হাতের আতিথ্য পেয়ে সে বিশ্বেশ্বরকে বলে অন্নপূর্ণার দ্বারেই পূজা সমর্পণ করে এসেচে। এখন সে কেবল তোমাদের গুণগান করচে— বুঝতে পারচি ব্রাহ্মণকে মিষ্টান্ন বিতরণ করতে তোমাদের ত্রুটি হয় নি— মুখোপাধ্যায়ের মুখ তাই মিষ্ট বাণীতে পূর্ণ।

ভানুদাদা

৯০

৬ জানুয়ারি ১৯২২

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, আমি নদীপথে কয়েকদিন কাটিয়ে এলুম[১]— কাল রাত্রে ফিরে এসেচি— আজ সকালে দেখি এখানে তোমার চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তুমি জান আমি নদী ভালবাসি। কেন বল্‌ব? আমরা যে-ডাঙার উপরে বাস করি সে ডাঙা ত নড়ে না, স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু নদীর জল দিনরাত্রি চলে; তার একটা বাণী আছে; তার ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্ত চলাচলের ছন্দ মেলে; আমাদের মনে নিরন্তর যে চিন্তাস্রোত বয়ে যাচ্ছে সেই স্রোতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে— এই জন্যে নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব। বয়স যখন আরো কম ছিল, তখন কত কাল নৌকোয় কাটিয়েচি; কোনো জনমানব আমার কাছেও থাকত না, পদ্মার চরের

উপরকার আকাশে সন্ধ্যাতারা আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাক্‌ত; আর প্রতিবেশী ছিল চক্রবাকের দল, তাদের কলালাপ থেকে আর কিছু বুঝি বা না বুঝি এটুকু জানতুম আমার সম্বন্ধে কোনো জনরব তারা রটাত না— এমন কি, আমার জয় পরাজয় নামক গল্পের নায়ক নায়িকার পরিণাম সম্বন্ধে তারা লেশমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করত না। যা হোক্‌, তে হি নো দিবসা গতাঃ। এখন বোলপুরের শুষ্কধূসর মাঠের মধ্যে বসে ইস্কুলমাষ্টারি করচি; ছেলেগুলোর কলরব চক্রবাকের কলকোলাহলকে ছাড়িয়ে গেচে। তুমি মনে কোরো না, এখানে কোনো স্রোত নেই; এখানে অনেকগুলি জীবনের ধারা মিশে একটি সৃষ্টির স্রোত চলেচে, তার ঢেউ প্রতি মুহূর্ত্তে উঠ্‌চে, তার বাণীর অন্ত নেই। সেই স্রোতের দোলায় আমার জীবন আন্দোলিত হচ্চে; সে তার আপনার পথকে কাট্‌চে,[২] দুই তটকে গড়ে তুল্‌চে— সে কোন্‌ এক অলক্ষ্য মহাসমুদ্রের দিকে চলেচে, দূর থেকে আমরা তার বার্ত্তার আভাস পাই মাত্র। আমি ছোট একটি নাটক লিখ্‌তে আরম্ভ করেচি।[৩] যদি শীঘ্র শেষ করতে পারি তাহলে হয় ত কলকাতায় তার অভিনয় দেব। কাশীতে আমার যাওয়ার সঙ্কল্প ত আমি ত্যাগ করিনি। তবে কিনা আমাদের মত লোক অনাহূত হয়ে কোথাও যেতে পারিনে— এই জন্যে হিন্দু য়ুনিভার্সিটি থেকে যথোপযুক্ত সাদর আমন্ত্রণের অপেক্ষায় স্তব্ধ হয়ে আছি,— আমাদের আদর অভ্যর্থনার যা যা দরকার— মাল্য চন্দন ধূপ দীপ নৈবেদ্য ইত্যাদি— সমস্ত যেন প্রস্তুত থাকে— একটা রসনচৌকি যেন বাজে; আর আহারের ফর্দ্দটা এবারকার চিঠিতে দিলুম না, কেননা পূর্ব্বেকার একটা চিঠিতে সংক্ষেপে দিয়েছিলেম— অর্থাৎ সামান্যমত কালিয়া পোলাও কোপ্তা কোর্ম্মা কাবাব ঘণ্ট চচ্চড়ি ভাজা দই ক্ষীর লুচি সন্দেশ ইত্যাদি তাছাড়া পৌষমাসে পিঠা চাই। ইতি ২২শে পৌষ ১৩২৮

ভানুদাদা

৯১

১৮ জানুয়ারি ১৯২২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, আজ বুধবার— আজ ছুটির দিনে আমার বারান্দার সেই কোণ্‌টায় বসে তোমাকে লিখ্‌চি, মাঘের দুপুর বেলাকার রৌদ্রে আমার ঐ আমলকী বীথিকার মধ্যে দিনটা রমণীয় লাগ্‌চে। এই রকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না— আমার সমস্ত মনটি, ঐ ডালের উপরে বসা ফিঙে পাখীটির মত চুপ করে রোদ পোয়ায়। আজ উত্তরে হাওয়া থেকে থেকে উতলা হয়ে উঠ্‌চে— শালবনের পাতায় পাতায় কাঁপুনি ধরেচে— একটা মস্ত কালো ভ্রমর মাঝেমাঝে অকারণে আমার মাথার কাছে এসে গুনগুনিয়ে আবার বেরিয়ে চলে যাচ্চে— একটা কাঠবিড়ালি এই বারান্দার কাঠের খুঁটি বেয়ে চালের কাছে উঠে কিসের ব্যর্থ সন্ধানে চঞ্চল চক্ষে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার তখনি পিঠের উপর ল্যাজ তুলে দুড় দুড় করে নেবে যাচ্চে,— এই শীতের মধ্যাহ্নে [য] যেন আজ কারো কিচ্ছু কাজ নেই। আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখ্‌ছিলুম— শেষ হয়ে গেছে— তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা "প্রায়শ্চিত্ত" নয়— এর নাম পথ।[১] এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই— সে গল্পের কিচ্ছু এতে নেই— সুরমাকে এতে পাবেনা। তুমি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছ— আমার এই কুঁড়েমির চিঠিতে পাছে তোমার জিয়োমেট্রির ধ্যান ভঙ্গ করে এই ভয় আছে।

৪ঠা মাঘ ১৩২৮

ভানুদাদা

৯২

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

২৪ মাঘ ১৩২৮

রাণু,

অনেকদিন তোমার চিঠি পাইনি— কেমন আছ একটু লিখে দিয়ো। তুমি বোধ হয় পরীক্ষার পড়ায় খুবই ব্যস্ত আছো। আমি কিছু দিন একটা নাটক লেখা ও সেইটে পড়ে শোনানো নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলুম— সেটা সকলের ভালো লেগেচে, অভিনয় করতে বল্‌চে— কিন্তু রিহার্শাল জিনিষটা পরীক্ষার পড়ার চেয়ে খারাপ। আজ কলকাতায় যাচ্চি, সেখানে বন্ধুদের পড়ে শোনাবো।[১] তোমরা যদি এই সময় এখানে থাক্‌তে তাহলে শুন্‌তে পেতে— তাহলে তোমাকে একটা পার্ট্‌ দিতুম। সমস্ত বইয়ের মধ্যে কেবল একটি মেয়ে আছে— তার নামটা হয়ত তোমার পছন্দ হবে না— তার নাম অম্বা। আজকাল আবার আমাকে বিশ্বভারতীর ক্লাস নিতে হচ্চে। Mathew Arnoldএর Essays পড়াতে হবে, আর Keats এর কবিতা। সন্ধ্যার সময় বলাকার কবিতা পড়ে বোঝাতুম, সেটা শেষ হয়ে গেছে— এবার ফিরে এসে য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে কিছু একটা ধরব।[২] মার্চ্চের আরম্ভে একবার হাইদ্রাবাদ, আর তার পরে নেপালে যাবার কথা আছে। তার আগে খবর দিয়ো তুমি কেমন আছ।

ভানুদাদা

৯৩

[ফেব্রুয়ারি ১৯২২]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

শরীর জিনিষটা দাম দিয়ে কিন্‌তে হয় নি বলে সেটা অনাদরের নয়। ম্যাট্রিকুলেশন পাস না করলেও চলে কিন্তু হৃৎপিণ্ডটা ঠিকমত চলাটা দেহযাত্রার পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমি একটাও পাস করি নি কিন্তু হৃৎপিণ্ডটাকে পারৎপক্ষে কখনো রুদ্রতালে চল্‌তে দিই নে, তাতে অনেক সুবিধা পাই। তোমাকে পরামর্শ দিই যে আহার যখন করতেই হবে তখন পরিপাকের জন্যে যে সময়টা দিতে হবে সেটাকে সময়ের অপব্যয় বলে মনে করলে ভুল হয়; সংসারে থাকতে গেলে মাথা যখন খাটাতেই হবে তখন মাথাটাকে বিশ্রাম করতে দিতে কৃপণতা করা মূলধন খোওয়াবার পন্থা। দেহটা না হলে নয় অতএব দেহটা যে আছে এ কথা ভুলে যাওয়া একটা বিষম ভুল। আজ তুমি ছুটোছুটি করতে চাচ্চ আর তোমার দেহ জেদ ধরে বসে আছে যে সে দৌড়ে চল্‌বে না। এটা আর কিছুই নয় নন্‌কোঅপারেশন। তুমি অনেককাল তাকে অশ্রদ্ধা করেচ সে এখন তোমাকে বল্‌চে আড়ি। দেহরাজ্য শাসনের পক্ষে এ অবস্থাটা ভাল নয়, এ হচ্চে Civil disobedience।

আমার নাটকটা হাতে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলুম। যাঁরা শুন্‌লেন তাঁরা ভালই বললেন কিন্তু হিসেব করে দেখা গেল সময় এত অল্প যে এর মধ্যে স্টেজ বেঁধে সাজসজ্জা তৈরি করে অভিনয় হতে পারে না। অতএব আগামী বৎসরে কোনো এক সময়ে অভিনয়ের চেষ্টা করা যাবে, তাহলে তোমার পক্ষে অম্বা সাজা অসম্ভব হবে না। আমাকে সাজতে হবে বৈরাগী।[১]

তোমার ভানুদাদা

৯৪

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

তুমি রোজ দুটো করে ডিম খেয়ে একটি মাত্র ক্লাসে পড়চ খবর পেয়েই খুসি হয়ে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। আমিও ঠিক দুটি করে ডিম খাই আর একটি মাত্র ক্লাসেও পড়ি নে। সেইটেতেই আমার মুষ্কিল বেধেচে, কেন না যদি আমার ক্লাস থাক্‌ত, যদি আমাকে নাম্‌তা মুখস্থ করতে হত তাহলে সব সময়েই আমার কাছে লোক আনাগোনা করতে পারত না— আমি বলতে পারতাম আমার সময় নেই, আমাকে এক্‌জামিন দিতে হবে। তোমার ভারি সুবিধে— তোমার কাছে কইম্বাটুর থেকে ত্রিম্বক্‌টু থেকে কঞ্জিভেরাম থেকে কামস্কাট্‌কা থেকে মক্কা মদিনা মস্কট থেকে যখন তখন নানা লোক মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে বা পরামর্শ দিতে আসে না— তারা জানে যে মার্চ্চ মাসে তোমাকে ম্যাট্রিকুলেশন দিতে হবে। আমি তাই এক একবার মনে করি আমিও ম্যাট্রিকুলেশন দেব— দিলে নিশ্চয়ই ফেল করব— ফেল করার সুবিধে এই যে ফি বৎসরেই ম্যাট্রিকুলেশন দেওয়া যায় আর তাহলে ত্রিম্বক্‌টু থেকে নিজ্‌নিনবগরড থেকে বেচুয়ানাল্যাণ্ড থেকে সদাসর্ব্বদা লোক আসাটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। লেডি সাহেব আমার বন্ধু হয়েও তোমার কাছে হেমনলিনীর কথাটা ফাঁস করে দিয়েচেন এতে আমি মনে বড় দুঃখ পেয়েচি— একথা সত্য যে, আমি তারই সাধনায় প্রবৃত্ত আছি।[১] কিন্তু সেই স্বর্ণশতদলের পাপ্‌ড়িগুলি হচ্চে bank notes। সাধনায় বিশেষ যে সিদ্ধিলাভ করতে পেরেচি তা মনেও কোরো না। তোমরা কামনা কোরো এই হেমনলিনী যেন আমার পাণিগ্রহণ করেন— কিন্তু কপালক্রমে আমার

পঞ্জিকায় অকাল পড়েচে— শুভলগ্ন আর আসেই না। তাই গান গাচ্চি—

ওগো হেমনলিনী

আমার দুখের কথা কারো কাছে বলিনি।

লক্ষ্মীর চরণতলে ফুটে আছ শতদলে

সে পথ করিয়া লক্ষ্য কেন আমি চলিনি?

ইতি ১০ ফাল্গুন ১৩২৮

তোমার ভানুদাদা

৯৫

১৪ মার্চ ১৯২২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু, আমি ভেবেছিলুম প্রয়াগধামে মাথা মুড়োবার কথা চল্‌চে— তোমার অমন চুল সমস্ত পাণ্ডার হাতে কাটে [য] যাবে মনে করে পাণ্ডার উপরে মনে মনে খুব রাগ করে "কুন্তলকৃন্তন কাব্য" নাম দিয়ে একটা মহাকাব্য লিখব ঠিক করেছিলুম— আরম্ভ করেছিলুম:

কর্ত্তরী-চালনে রাণু চূড়া-শোভাকর

কেশজাল ফেলি যবে দিলা ভূমিপরে

অকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী

কোন্ কেশধারিণীরে বরি তাঁর পদে

পাঠাইলা পুনরায় পাণ্ডা সন্নিধানে ইত্যাদি—

কিন্তু এমন সময়ে তোমার চিঠি পেয়ে আমার অমিত্রাক্ষরের ধ্যান ভঙ্গ হল। ভালই হল, কেন না আজ রাত্রেই কলকাতায় যাচ্চি[১]— জিনিষপত্র

গোছাতে হবে, সময় কিছুমাত্র নেই। কথা আছে সেখান থেকে নেপালে যাবার, কিন্তু না যাওয়া হতেও পারে[২]— যদি যাই পয়লা বৈশাখের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আশ্রমে ফিরব— অতএব যদি তোমরা পরীক্ষার জয়মাল্য পরে এখানে আস তবে যথাবিধি তোমাদের অভ্যর্থনা করতে পারব। সেই যে ছেলেটি তোমার কাছে এক্‌সেসাইজ করিয়ে নিতে চায় তাকে বরং সঙ্গে করে এনো। আমরা সকলে মিলে তাকে খুব করে এক্‌সেসাইজ করাতে পারব। কিন্তু আশাকে বোলো, আমাকে সে যেন তাড়া না লাগায়— আমি কোনরকম উৎপাত করব না। নেপালে যাবার রেলগাড়ি কাশির কাছ দিয়ে যাবে এমন সম্ভাবনা নেই, কেননা তোমার কাছ থেকে এক্‌সেসাইজ বুঝে নেবার জরুরি দরকার তার ঘটে নি— এক্‌সেসাইজ করে করে সে হাঁপিয়ে উঠ্‌চে, থামতে পারলেই বাঁচে। কাল দোল পূর্ণিমা গেল— সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্নায় বসে গান বাজনা হয়ে গেল— খুব বীণা বেজেছিল, নতুন গান অনেক তৈরি হয়েচে— তার সুরগুলো নিশ্চয় তোমার খুব ভাল লাগত।[৩]
ইতি ৩০ ফাল্গুন ১৩২৮

ভানুদাদা

৯৬

৫ এপ্রিল ১৯২২

ঔঁ

শিলাইদা

কল্যাণীয়াসু,

তুমি আমাকে চিঠি লিখেচ শান্তিনিকেতনে, আমি সেটি পেলুম এখানে, অর্থাৎ শিলাইদহে।[১] তুমি কখনো এখানে আস নি, সুতরাং জান্‌তে পারবে

না জায়গাটা কি রকম। বোলপুরের সঙ্গে এখানকার চেহারার কিছুমাত্র মিল নেই। সেখানকার রৌদ্র বিরহীর মত, মাঠের মধ্যে একা বসে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌চে,— সেই তপ্ত নিঃশ্বাসে সেখানকার ঘাসগুলো শুকিয়ে হল্‌দে হয়ে উঠ্‌চে। এখানে সেই রৌদ্র তার সহচরী ছায়ার সঙ্গে মিলেচে, তাই চারিদিকে এত সরসতা,— আমাদের বাড়ির সামনে সিসু-বীথিকায় তাই দিনরাত মর্ম্মরধ্বনি শুনচি, আর কনকচাঁপার গন্ধে বাতাস বিহ্বল, কয়েৎবেলের শাখায় প্রশাখায় নতুন চিক্কন পাতাগুলি ঝিল্‌মিল্‌ করচে, আর ঐ বেণুবনের মধ্যে চঞ্চলতার বিরাম নেই। সন্ধ্যার সময় টুক্‌রো চাঁদ যখন ধীরে ধীরে আকাশে উঠ্‌তে থাকে তখন সুপুরি গাছের শাখাগুলি ঠিক যেন ছোট ছেলের হাত নাড়ার মত চাঁদা মামাকে টী দিয়ে যাবার ইস্‌... করে ডাক্‌তে থাকে। এখন চৈত্র মাসের ফসল সমস্ত উঠে গিয়েচে,— ছাতের থেকে দেখ্‌তে পাচ্চি চষা মাঠ দিকপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে' আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিছু বৃষ্টির জন্যে। মাঠের যে অংশে বাব্‌লা বনের নীচে চাষ পড়ে নি, সেখানে ঘাসে ঘাসে একটুখানি স্নিগ্ধ সবুজের প্রলেপ, আর সেইখানে গ্রামের গোরুগুলো চরচে। এই উদার-বিস্তৃত চষা মাঠের মাঝে মাঝে ছায়াগুণ্ঠিত এক একটি পল্লী— সেইখান থেকে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ বেয়ে গ্রামের মেয়েরা ঝক্‌ঝকে পিতলের কলসী নিয়ে দুটি তিনটি করে সার বেঁধে বেঁধে প্রায় সমস্ত বেলাই জলাশয় থেকে জল নিতে চলেচে। আগে পদ্মা কাছে ছিল— এখন নদী বহু দূরে সরে গেছে— আমার তেতলা ঘরের জান্‌লা দিয়ে তার একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ করে বুঝতে পারি। অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল— শিলাইদয়ে যখনই আসতুম তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সঙ্গে ই আমার আলাপ চলত। রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে ঐ নদীর কলধ্বনি মিশে যেত আর নদীর কলস্বরে আমার জাগরণের প্রথম অভ্যর্থনা শুন্‌তে পেতেম। তার পরে কত বৎসর বোলপুরের মাঠে মাঠে কাট্‌ল, কতবার

সমুদ্রের এপারে ওপারে পাড়ি দিলুম— এখন এসে দেখি সে নদী যেন আমাকে চেনে না; ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল,— সবশেষে উত্তর দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের একটি নীলতর পাড়ের মত একটি বনরেখা দেখা যায়, সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটি ঝাপ্‌সা বাষ্পলেখাটির মত দেখ্‌তে পাচ্চি জানি ঐ আমার সেই পদ্মা, আজ আমার কাছে অনুমানের বিষয় হয়ে রয়েচে। এই ত মানুষের জীবন, ক্রমাগতই কাছের জিনিষ দূরে চলে যায়, জানা জিনিষ ঝাপ্‌সা হ্য়ে আসে, আর যে স্রোত বন্যার মত প্রাণমনকে প্লাবিত করেচে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মত জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।

এখন বেলা ফুরিয়ে এসেচে, ছ'টা বাজ্‌ল। অল্প একটুখানি মেঘেতে আকাশ ঢাকা। দিনাবসানেও বাগানে পাখীর ডাকে একটুও ক্লান্তি দেখ্‌চিনে। দুই কোকিলে কেবলি জবাব চল্‌চে, কেউ হার মান্‌তে চাচ্চে না— তা ছাড়া আরো অনেক পাখী ডাক্‌চে তাদের ডাক স্পষ্ট করে চেনা যায় না, সকলের ডাক মিশিয়ে জড়িয়ে গেছে। অন্যাদিনের মত বাতাস আজ দুরন্ত নয়, ঝাউগাছ্‌গুলি স্তব্ধ এবং নিঃশব্দ হয়ে গেছে। আজ অষ্টমীর চাঁদ দেখ্‌চি মেঘের পর্দ্দার আড়ালে রাত্রি যাপন করবে। আমার ঘরের দক্ষিণ দিকে ঐ ছাদে একটি কেদারা পাতা আছে— ঐখানে সন্ধ্যার সময় আমি গিয়ে বসি— এ কয়দিন দ্বিতীয়ার চাঁদ থেকে আরম্ভ করে অষ্টমীর চাঁদ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই উদয়কালে এই কবির সঙ্গে মুকাবিলা করেচে। ঐ চাঁদ হচ্চে আমার জন্মলগ্নের অধিপতি, আর আমার কাব্য প্রভৃতি স্থানের অধিপতি হচ্চে বৃহস্পতি।[২] আমি যখন ছাদে বসি তখন আমার বামে পূর্ব্ব আকাশ থেকে বৃহস্পতি আমার মুখের দিকে তাকায় আর পশ্চিম আকাশ থেকে চন্দ্রমা।— এইবার ক্রমে একটু অন্ধকার হয়ে আস্‌চে— ঘরের মধ্যেকার এই ঘোলা আলোয় আর দৃষ্টি চল্‌চেনা; বাইরে গিয়ে বসবার সময় হল।

তুমি আমার কাছে বড় চিঠি চেয়েছিলে; বড় চিঠিই লিখ্‌লুম। লিখ্‌তে পারলুম তার কারণ এখানে অবকাশ আছে। কিন্তু এই চিঠি যখন ডাকে দেব, অর্থাৎ কাল বৃহস্পতিবারে— কলকাতায় রওনা হব। সেখানে ট্র্যাম আছে, মোটর আছে, ইলেক্‌ট্রিক পাখা আছে, বরফ আছে, সময় নেই। তার পরে বোলপুরে যাব,— সেখানে শালের বনে ফুল ফুটেচে, আমবাগানে ফল ধরেচে, সেখানে মাঠ আছে বিস্তীর্ণ, আকাশ আছে অবারিত কিন্তু সেখানেও অবকাশ নেই। চিঠি জিনিষটি ছোট্ট, মালতী ফুলের মত, কিন্তু সেই চিঠি যে অবকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই অবকাশ মালতী লতারই মত বড়। আমাদের মত কেজো লোকের অবকাশ টবের গাছ, তার থেকে যে সব পত্রোদ্গম হয় সে ত পোষ্ট্‌ কার্ডের চেয়ে বড় হতে চায় না। ইতি ২২ চৈত্র ১৩২৮

ভানুদাদা

৯৭

১৪ এপ্রিল ১৯২২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আজ বর্ষারম্ভের দিন। তোমরা আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তোমাদের জীবন পবিত্র হোক্, চিত্ত নির্ম্মল হোক, হৃদয় সুন্দর হোক— সংসারে তোমাদের সমস্ত সুখদুঃখ সমস্ত লাভক্ষতি কল্যাণে পরিণত হোক্— তোমাদের চিন্তা বাক্য ও আচরণ কলুষমুক্ত হয়ে ভূমাকে প্রকাশ করুক।

আমি আবার শান্তিনিকেতনে এসেচি। পূর্ণ বেগে কাজ করবার মত জোর পাচ্চি নে— ক্লান্ত আছি। চেষ্টা করি বিশ্রাম করতে, কিন্তু ছিদ্রঘটকে

জলের মধ্যে রাখ্‌লে সে যেমন কেবলি ভরে ওঠে, আমার বিশ্রামের অবকাশকাল তেমনি এখানে কর্ম্মে এবং ভাবনায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভরে উঠ্‌তে থাকে।

পরীক্ষার উদ্বেগ থেকে তোমার মন মুক্ত হয়েচে এবং তোমার শরীর সুস্থ হয়ে উঠেচে শুনে খুসি হলুম। এতদিনে আশার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেচে। পরীক্ষা জিনিষটার আদিই বা কি, মধ্যই বা কি, আর অন্তই বা কি, তা আমার জানা হল না। ফাঁকি দিয়ে এবারকার মত বিনা পরীক্ষায় একরকম উত্তীর্ণ হয়ে গেছি। আর-জন্মে হয়ত তোমাদের ঘরে মেয়ে হয়ে জন্ম লাভ করে পরীক্ষা দিতে দিতে পাকযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতি সমস্ত জীর্ণ করে দিয়ে কায়াটাকে প্রায় ছায়া করে ফেলব। ইস্কুলে যেতে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে এ কথা স্মরণ করলে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভের জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আবার যদি জন্মাই তখন হয়ত আমারই নিজের বই পড়ে, মুখস্ত করে, তার নোট নিয়ে আমাকে একজামিন দিতে হবে— এই আশঙ্কায় আজকাল বই লেখা প্রায় বন্ধ করে দিয়েচি। ইতি ১ বৈশাখ ১৩২৯

ভানুদাদা

৯৮

১৭ আষাঢ় ১৩২৯

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, এতদিনে তুমি কাশী পৌঁচেছ। পথের মধ্যে ভিড় পাওনি ত? এখন কেমন আছ লিখো। তোমরা যাবার পর দিন থেকেই বিদ্যালয়ের

কাজ রীতিমত আরম্ভ হয়ে গেছে।[১] রোজই কমিটি মীটিং এবং ক্লাসের কাজও চল্‌চে। ছেলেরা অনাবৃষ্টির পরে আষাঢ়ের ধারার মত কলরব করতে করতে এখানকার শূন্য ঘর সব পূর্ণ করে দিয়েচে। এখন আমার কাজের আর অন্ত নেই। মেয়েরা সকলেই পরশুরাম হয়ে উঠেচে— কুড়ুল নিয়ে ঠকাঠক গাছ কাটতে লেগে গেছে।[২] তারা আছে ভাল। এ দিকে আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি সুরু হয়েচে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে মেঘগুলোকে কার্পেটের মত গুটিয়ে আকাশের এক পাশে জড় করা হয়েচে, আর বৃষ্টি-স্নাত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রোদ্দুর তার পরশপাথর ঠেকিয়ে সমস্ত আকাশকে সোনা করে তুলেচে। আমি আমার সাম্‌নের খোলা জানলা দিয়ে ঐ শাল তাল শিরীষ মহুয়া ছাতিমের দল-বাঁধা বনের দিকে প্রায় তাকিয়ে থাকি। এখন আমার ঘড়িতে সাড়ে দুপুর, অর্থাৎ সাধারণ ঘড়িতে দুপুর। ছেলেরা তাদের মধ্যাহ্ন [য] ভোজন শেষ করে দলে দলে কুয়োতলায় মুখ ধুতে আস্‌চে— দীর্ঘ ছুটির দুঃখদিনের পরে কাকগুলো ছেলেদের এঁটো শাল পাতার উপর শ্রাদ্ধবাড়ির ভিখিরির পালের মত এসে পড়েচে, বাতাসটি মধুর হয়ে বইচে, জাম গাছের চিকন পাতার ঘনিমার উপর রৌদ্র ঝিলমিল করে উঠ্‌চে, পাটল রঙের দুটো গোরু ল্যাজ দিয়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে ধীরমন্দ গমনে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্চে— আমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চি আর ভাবচি। ইতি ১ জুলাই ১৩২৯ [১৯২২]

ভানুদাদা

৯৯

১৩ জুলাই ১৯২২

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু কলকাতা সহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে— মনে হয় যেন ইঁট কাঠের একটা মস্ত জন্তু আমাকে একেবারে গিলে ফেলেচে। তার উপরে আবার আকাশ মেঘে লেপা, রাত্তির থেকে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়চে। শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বাদল নামে তখন তার ছায়ায় আকাশের আলো করুণ হয়ে আসে, ঘাসে ঘাসে পুলক লাগে, গাছগুলি যেন কথা কইতে চায়, আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে আর তার সুর গিয়ে পৌঁছয় দিনুর ঘরে। আর এখানে নববর্ষা বাড়ির ছাতে ছাতে ঠোকর খেতে খেতে খোঁড়া হয়ে পড়ে— কোথায় তার নৃত্য, কোথায় তার গান, কোথায় তার সবুজ রঙের উত্তরীয়, কোথায় তার পূবে বাতাসে উড়ে পড়া জটা জাল। কথা হচ্চে এবার শ্রাবণ মাসে আর বছরের মত কলকাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে।[১] কিন্তু যে গান শান্তিনিকেতনের মাঠে তৈরি হয়েচে সে গান কি কলকাতা সহরের হাটে জমবে? এখানে অনুরোধে পড়ে কখনো কখনো আমার নতুন বর্ষার গান গাইতে হয়েচে। কিন্তু এখানকার বৈঠকখানায় সেই গানের সুর ঠিক মত বাজে না। তোমাদের ওখানে এতদিনে বোধহয় বর্ষা নেমেচে— অতএব তোমার নতুন শেখা বর্ষার গান কখনো কখনো গুন গুন স্বরে গাইতে পারবে কখনো বা এসরাজে বাজিয়ে তুল্‌বে। তুমি যাওয়ার পরে আরো কিছু কিছু নতুন গান আমার সেই খাতায় জমে উঠেচে।[২] কলকাতায় না এলে আরো জমত। এদিকে দিনুবাবুও দাঁত তোলাবার জন্যে দু তিন দিন হল কলকাতায় এসেচেন। আষাঢ় মাসের বর্ষাকে এ সহরে যেমন মানায়

না দিনু বাবুকেও তাই। আজ সকালেই সে পালাবে স্থির করেচে। ইতি ২৯ আষাঢ় ১৩২৯

ভানুদাদা

১০০

১৮ জুলাই ১৯২২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, আত্রাই নামক একটি নদীর উপর বোটে করে ভেসে চলেচি।[১] বর্ষার মেঘ ঘন হয়ে আকাশ আচ্ছন্ন করেচে, একটু ঝোড়ো বাতাসের মত বইচে, পাল তুলে দিয়েচে। নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ, স্রোত খরতর, দলে দলে শৈবাল ভেসে আসচে। পল্লীর আঙিনার কাছ পর্য্যন্ত জল উঠেচে; ঘন বাঁশের ঝাড়; আম কাঁঠাল তেঁতুল কুল শিমুল নিবিড় হয়ে উঠে গ্রামগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে; মাঝে মাঝে নদীর তীরে তীরে কাঁচা ধানের ক্ষেতে জল উঠেছে, কচি ধানের মাথা জলের উপর জেগে আছে। দুই তটে স্তরে স্তরে সবুজ রঙের ঘনিমা ফুলে ফুলে উঠেচে, তারি মাঝখান দিয়ে বর্ষার ঘোলা নদীটি তার গেরুয়া রঙের ধারা বহন করে ব্যস্ত হয়ে চলেচে— সমস্তটার উপর বাদল সয়াহ্নের [য] ছায়া। বৃষ্টি নেমে এল— দূরে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যাস্তের একটা ম্লান আভা। এই বৃষ্টিধারার আবেগের উপর যেন সান্ত্বনার ক্ষীণ প্রয়াসের মত এসে পড়েচে। আমার এই বোট ছাড়া নদীতে আর নৌকো নেই। এই জলস্থল আকাশের ছায়াবিষ্ট নিভৃত শ্যামলতার সঙ্গে মিল করে একটি গান তৈরি করতে ইচ্ছে করচে,

কিন্তু হয় ত হয়ে উঠ্‌বে না— আমার দুই চক্ষু এখন বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে চায়— খাতার দিকে চোখ রাখবার এখন সময় নয়। অনেকদিন বোলপুরের শুক্‌নো ডাঙায় কাটিয়ে এসেচি— এখন এই নদীর উপর এসে মনে হচ্চে পৃথিবীর যেন মনের কথাটি শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে। নদী আমি ভারি ভালবাসি। আর ভালবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিল্‌, রঙে রঙে, আলোয় ছায়ায়;— ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মত। আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না। এই জলের উপর ছাড়া। আজ রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায় যাব। মনে করে ভাল লাগ্‌চে না। ইতি ২ শ্রাবণ ১৩২৯

ভানুদাদা

১০১

১৪ অগাস্ট [?২৫ জুলাই] ১৯২২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, ঘুরে ফিরে[১] শেষকালে কাল্‌ এখানে এসে পৌঁচেছি। কিন্তু স্থিতি খুব বেশি দিন নয়। কেননা, কলকাতায় "বর্ষামঙ্গল" হবে— তারই আয়োজন চল্‌চে। আগামী সোমবারের পরের সোমবারে দিন স্থির হয়েচে।[২] এখানে সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিনু খুব কষে গান শেখাতে লেগে গিয়েচে। তোমরা চলে যাবার পর নানা কাজের ব্যস্ততায় বেশি গান লেখবার সময় পাই নি। তবু গোটাকতক নতুন গান লেখা হয়েচে।[৩] কলকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলন বলে একটা সভা হয়েচে। এই সভায় কিছু দিন ধরে আমাকে

আসর জমাতে হয়েছিল।[৪] এখন থেকে এই সভার কাজ নিয়ে একবার কলকাতা একবার শান্তিনিকেতন খেয়া পারাপার করতে হবে। এই ব্যাপারে কলকাতার ছেলেদের খুব উৎসাহ দেখ্‌তে পাচ্চি। প্রায় একদিনের মধ্যেই আমাদের পাঁচশো মেম্বার হয়ে গেচে। পাঁচশোর বেশি লোক ধরাবার মত জায়গা আমাদের আর নেই তাই এখন আর বেশি সভ্য নিতে পারব না। এই সভায় সেদিন মুক্তধারা পড়েছিলুম— প্রথমে ওর ভিতরকার ভাবটা সকলকে ভাল করে বুঝিয়ে বলেছিলুম।[৫] তার পরে আমার পড়া শুনে সেদিন সকলের ভাল লেগেছিল। এর পরে একদিন বিসর্জ্জন অভিনয় হবার কথা চল্‌চে। কিন্তু অনবরত এই সমস্ত হাঙ্গামা নিয়ে থাক্‌তে আমার একটুও ভাল লাগে না। আমাদের এদিকে কয়েকদিন খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে। এত বেশি যে সেদিন হঠাৎ রান্নাঘরের ছাত ভেঙে পড়ে গেচে। ভাগ্যে কারো কিছু হয়নি— কেবল একটা কুকুর চাপা পড়েছিল।[৬] ইতি ২৯ [?৯] শ্রাবণ ১৩২২ [১৩২৯]

ভানুদাদা

১০২

১৯ অগাস্ট ১৯২২

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, বর্ষামঙ্গল হয়ে গেল। তিন দিন হল।[১] শেষ দিনে আমার গলা গেল ভেঙে। তাতে ক্ষতি হয়নি— কেননা আমার উপর গান গাবার

ভার ছিল না— আমি কেবল মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করব কথা ছিল। প্রথম দুই দিন করেছিলুম। লোকের ভালই লেগেছিল। তৃতীয় দিনে উঠে দাঁড়িয়ে পড়তে গিয়ে দেখি গলা দিয়ে আওয়াজ আর বেরয় না। কোনো রকম করে সেরে নিয়ে বসে পড়লুম। যাই হোক্ গানের সুখ্যাতি সকলেই করচে। বর্ষামঙ্গল গানের যে পোগ্রাম বাহির হয়েচে সেটা তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্চি।[২] সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিষ পাঠাই। সেটা একখানি বই, তার নাম লিপিকা। এইগুলি একদা কথিকা নামে মাঝে মাঝে সবুজপত্রে বাহির হয়েছিল।[৩] এই বইদুটি তোমার বাবজার নামে পাঠালুম, তুমি অধিকার করে নিয়ো। আজ এই মাত্র দুপুর বেলাকার খাওয়া সেরে এসে বসেচি। এম্নি ভয়ানক ঘুম পাচ্চে সে আর কি বলব। লেখাগুলো বেঁকে চুরে যাচ্চে, মাথা ঢুলে ঢুলে পড়চে। আসলে শরীরটা ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েচে। ঠিক করেচি কাল ভোরের গাড়িতেই বোলপুরে পালিয়ে যাব। এবার ছুটির ঠিক আগেই কলকাতায় শারদোৎসব করব।[৪] তার জন্যে কসে রিহার্শাল দিতে হবে। আমি সাজব রাজা। কিন্তু মাঝখানে একবার ধাঁ করে বোম্বাই ঘুরে আস্তে হবে। ১লা সেপ্টেম্বরে রেলে চড়ব। সেখানে থেকে ফিরে এসে অভিনয় করা যাবে। এবার কাশীর সাহিত্য সম্মেলন আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েচেন, তাই বম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের নিমন্ত্রণ স্বীকার করতে পেরেচি। আজ এই পর্য্যন্ত

২ ভাদ্র ১৩২৯

ভানুদাদা

১০৩

৩০ অগাস্ট ১৯২২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, আজ বুধবারে সকালে মন্দিরের কাজ শেষ করে যেই আমার কুটীরের সামনে উত্তর দিকের বারান্দায় বসেচি অমনি নানাবিধ চিঠি ও খবরের কাগজের সঙ্গে তোমার চিঠি এসে পৌঁছল। এর আগে দুই একদিন খুব ঘন বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল— আজও স্তূপাকার কালো মেঘ আকাশক্ষেত্রের এদিকে ওদিকে ভ্রূকুটি করে বসে আছে; এখনি তারা বৃষ্টিবাণ বর্ষণ করবে বলে ভয় দেখাচ্চে। কিন্তু আজ প্রথম সকালে মেঘের ফাঁক দিয়ে অরুণোদয় খুব সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছিল— আমি পূব দিকের বারান্দায় তখন বসেছিলুম, আমার মনের সঙ্গে যেন তার মুখোমুখি কথা চল্‌ছিল। মন যেদিন তার চোখ মেলে, সেদিন প্রত্যেক সকাল বেলাটিই তার কাছে অপূর্ব্ব হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বলক্ষ্মী তাঁর ভাণ্ডারের দ্বারের কাছে রোজই দাঁড়িয়ে থাকেন, যেদিন আমরা প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাতি সেদিন তার দান মুঠো ভরে দিয়ে থাকেন। পৃথিবী থেকে যাবার সময় এ কথা আমি বলে যেতে পারব যে, এমন দান আমি অনেক পেয়েচি।

সেপ্টেম্বরের আরম্ভে আমার বম্বাই যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা সেপ্টেম্বরের ১৫ই তারিখে কলকাতায় আমাদের শারদোৎসবের পালা বস্‌বে[১]— আমাকে সাজ্‌তে হবে সন্ন্যাসী [য]। আমার এই সন্ন্যাসী সাজবার আর কোনো অর্থ নেই অর্থসংগ্রহ ছাড়া। শুনে তোমরা বিস্মিত হোয়ো না, তোমাদের বারাণসীধামে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা সন্ন্যাসী সেজেচেন অর্থের প্রত্যাশায়, আর যাঁদের প্রত্যাশা নিরর্থক হয় নি।

এল্‌মহার্স্ট[২] সাহেব এসেচেন, তাঁর কাছে শুনলুম তুমিও নাকি আসক্তি

বন্ধন ছেদন করে' সন্যাসিনী হবার চেষ্টায় আছ। সেই জন্যেই কি লজিক পড়া সুরু করেছ? কিন্তু লজিক জিনিষটা হচ্চে কাঁটা গাছের বেড়া, তাতে করে' মানসক্ষেত্রের ফসলকে নির্ব্বোধ গোরু বাছুরের উৎপাত থেকে রক্ষা করা চলে, কিন্তু আকাশ থেকে যে সব বর্ষণ হয়, রৌদ্রই বল, বৃষ্টিই বল, তার থেকে নিরাপদ হবার উপায় তোমার ঐ ন্যায়শাস্ত্রের বেড়া নয়। তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েচ যে, এবার আমার সঙ্গে দেখা হলে তুমি আমার লজিকের পরীক্ষা নেবে। আমি আগে থাকতেই হার মেনে রাখচি। পৃথিবীতে দুই জাতের মানুষ আছে; এক দলকে লজিকের নিয়ম পদে পদে মিলিয়ে চলতে হয়, কেননা তারা পায়ে হেঁটে চলে; আর এক দল ন্যায়শাস্ত্রের উপর দিয়ে চলে যায়, উনপঞ্চাশ বায়ু তাদের বাহন; তারা এ পক্ষ ও পক্ষের বিরোধ খণ্ডন করতে করতে নিজের পথ খুঁজে মরে না— তারা এক কালে নিজেরই দুইপক্ষ বিস্তার করে' সেই পথ দিয়ে চলে' যায় যে-পথ হচ্চে রবি-কিরণের পথ। এই প্রসঙ্গে, এই পত্রলেখক কোন্ জাতের লোক তার একটু আভাসমাত্র যদি দিই তাহলে তুমি নিশ্চয়ই বলে বস্‌বে তিনি ভারি অহঙ্কারী। যারা লজিকের অহঙ্কার করে' তাল ঠুকে বেড়ায় তারাই নন্‌-লজিক্যালদের ব্যোমপথযাত্রার পক্ষবিধূননের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে মহিমা ত যুক্তির দ্বারা আত্মসমর্থনের অপেক্ষা করে না, সে আপন অচিহ্নিত [য] পথে আপন গতিবেগের দ্বারাই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এ সম্বন্ধে তোমার বাবজাকে আমি সাক্ষী মান্‌চি। তিনিই বলুন রবির রথ শূন্যে ওড়ে কি না। রবির অশ্ব পায়ে পায়ে লজিকের ধূলো উড়িয়ে আকাশ অন্ধকার করে দেয় না। আজ এইখানেই ইতি।
১৩ই ভাদ্র ১৩২৯

তোমার ভানুদাদা

১০৪

৪ সেপ্টেম্বর ১৯২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

তুমি যে তোমার লজিকের খাতার পাতা ছিঁড়ে আমাকে চিঠি লিখেচ তাতে বুঝতে পারচি লজিক সম্বন্ধে আলোচনা পড়ে তোমার উপকার হয়েচে। লজিক যেমনি পড়া হয়ে যায় অমনি তার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না— যে-কলাপাতায় খাওয়া হয়ে যায় সে কলাপাতা ফেলে দিলে ক্ষতি হয় না; কিন্তু যে তালপাতার উপর মেঘদূত লেখা হয়েচে সেটা ফেলবার জিনিষ নয়।

আমরা এবার দু'তিন দিন ধরে বর্ষামঙ্গল করেচি। তার ফল কি হয়েচে একবার দেখ। আজ ভাদ্রমাসের আঠারই তারিখ, অর্থাৎ শরৎকালের আরম্ভ। কিন্তু বর্ষার আয়োজন এখনো ভরপুর রয়েচে। আকাশ ঘন মেঘে কালো হয়ে আছে— থেকে থেকে ঝমাঝম্ বৃষ্টি হচ্চে। আমার কবিত্বের এই আশ্চর্য্য প্রভাব দেখে আমি নিজেই অবাক্ হয়ে গেছি। এমন কি, শুন্‌তে পাই, আমার এই বর্ষামঙ্গলের জোর তোমার সেই কাশী পর্য্যন্ত পৌঁচেছে। সেখানেও বৃষ্টি চল্‌চে। বোধ হচ্চে আমরা যখন শারদোৎসব করব তার পর থেকেই শরতের আরম্ভ হবে। এই শারদোৎসবের রিহার্সালে আমাকে অস্থির করেচে। রোজ দুপুরবেলায় বিভূতি[১] এসে একবার করে আমার কাছ থেকে আগাগোড়া পাঠ নিয়ে যায়— ছোট ছেলেরা যে রকম পড়া মুখস্থ করে আমাকে তাই করতে হয়। কিন্তু এমনি আমার বুদ্ধি তবু রিহার্সালের সময় কেবল ভুলি— ছোট ছোট ছেলেগুলো পর্য্যন্ত হাসে— এত অপমান, সে আর কি বল্‌ব। যাই হোক যদি তুমি এবার শারদোৎসব দেখতে আস তাহলে বোধ হয় দেখ্‌বে ঠিক ঠিক মুখস্থ বলে যাচ্চি।

তোমার বাবজাকে শারদোৎসব দেখবার জন্যে আসতে বলে দিয়েচি। কিন্তু যেরকম ব্যস্ত মানুষ, তাঁর মনে থাক্‌লে হয়। ঐ বিভূতি এল এইবার আমার পড়া দিই গে যাই। ১৮ ভাদ্র ১৩২৯

ভানুদাদা

১০৫

১০ সেপ্টেম্বর ১৯২২

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু,

কলকাতায় সব দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়েচি। আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ি একতলা থেকে তিনতলা পর্য্যন্ত কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেচে— পা ফেলতে গেলে সাবধান হতে হয় পাছে একটা না একটা ছেলেকে মাড়িয়ে দিই এম্‌নি ভিড়। আমি অন্যমনস্ক মানুষ কোন্‌দিকে তাকিয়ে চলি তার ঠিক নেই, ওরা যখন তখন কোনো খবর না দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ে' প্রণাম করে। কখন্ তাদের মাটির সঙ্গে চ্যাপ্‌টা করে দিয়ে তাদের উপর দিয়ে চলে যাব এই ভয়ে এই ক'দিন ধুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে চলচি। মেয়ের দলও এবার নেহাৎ কম নয়— নুটু[১] থেকে আরম্ভ করে অতি সূক্ষ্ম অতি ক্ষুদ্র লতিকা[২] পর্য্যন্ত। ননীবালা[৩] তাদের দিনরাত সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে হয়রান্ হয়ে পড়চে। কিন্তু আমাকে দেখবার লোক কেউ নেই— স্বয়ং এণ্ড্রুজ সাহেব পাঞ্জাবের আকালীদের নাকাল[৪] সম্বন্ধে তদন্ত করতে অমৃতসরে চলে গেচে— লেডি সাহেবরা গেছেন বম্বাই— বৌমা আছেন শান্তিনিকেতনে— সুতরাং আমাকে ঠিকমত শাসনে

রাখ্‌তে পারে এমন অভিভাবক কেউ না থাকাতে আমি হয়ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যেতে পারি এমন আশঙ্কা আছে। আপাতত যা' তা' বই পড়তে আরম্ভ করেচি, কেউ নেই আমাকে ঠেকায়। তার মধ্যে লজিকের বই একখানাও নেই। এমনি করে পড়া ফাঁকি দিয়ে বাজে পড়া পড়ে পড়ে ২৭ বছর কেটে গেল, এখন চেতনা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার কোন লক্ষণ নেই।

আমি ভেবেছিলুম সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তোমাদের ছুটি, তা যখন নেই তখন শারদোৎসব দেখা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ ওটা হচ্চে ছুটির নাটক— ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির; রাজা ছুটি নিয়েচে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েচে পাঠশালা থেকে— তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র ইচ্ছে, "বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাট্‌বে সকল বেলা।" ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ করচে কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ। তোমরা যখন ছুটি পাবে আমরা তখন বম্বাই অভিমুখে রেলপথে ছুটেচি। কিন্তু সে পথ মোগলসরাই দিয়ে যায় না, সে হচ্চে বেঙ্গল নাগপুর লাইন। তার পরে বম্বাই হয়ে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ হয়ে মালাবার, মালাবার হয়ে সিংহল, সিংহল হয়ে পুনশ্চ বম্বাই, এমনি বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খেতে খেতে অবশেষে একদিন নভেম্বর মাসের কোনো এক তারিখে শান্তিনিকেতনে এসে একখানা লম্বা কেদারার উপরে চীৎ হয়ে পড়ব। তার পরেই আবার সুরু হবে সাতই পৌষের পালা— তার পরে আরো কত কি আছে তার ঠিক নেই। ছুটির নাটক লিখ্‌লেই কি ছুটি পাওয়া যায়? আমি ইস্কুল পালিয়েও ছুটি পেলুম না, ইস্কুলের আবর্ত্তের মধ্যে লাঠিমের মত ঘুরতে লাগলুম— অঙ্ক কষতে ঢিলেমি করলুম। আজ চাঁদার অঙ্কের ধ্যান করতে করতে আহার নিদ্রা বন্ধ— ইংরেজি প্রবাদে এইরকম ব্যাপারকেই বলে থাকে ভাগ্যের বিদ্রূপ।

এতদিন পরে আমাদের এখানে শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল চেহারা দেখা

দিয়েচে— মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্চে কিন্তু সে শরতের ক্ষণিক বৃষ্টি। দিন সুন্দর, রাত্রি নির্ম্মল, মেঘ রঙীন, বাতাস শিশির-স্নিগ্ধ,— এ হেনকালে অতলস্পর্শ অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল বিধির বিধি— কিন্তু ভাগ্যের লিখন বিধির বিধিকেও অতিক্রম করে— এই কথা স্মরণ করে' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই পত্র সমাপন করি। ইতি ২৪ ভাদ্র ১৩২৯

ভানুদাদা

১০৬

[২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২]

ওঁ

*SUMMER PALACE
MYSORE

কল্যাণীয়াসু,

ঘুরতে ঘুরতে মৈসুর রাজভবনে এসে পৌঁচেছি![১] কলকাতা থেকে গেছি পুণায়,[২] পুণা থেকে এসেছি মৈসূরে, এখান থেকে যাব মাদ্রাজে,[৩] মাদ্রাজ থেকে কৈম্বাটুর,[৪] সেখান থেকে অল্‌বে (ট্রাবাঙ্কারে),[৫] তার পর মাঙ্গালোর,[৬] তার পর সিংহল,[৭] তার পর সিন্ধু প্রদেশে,[৮] তার পর বোম্বাই,[৯] তার পর কোথায় সে আমার ভাগ্য বিধাতা জানেন। শুধু যদি ভ্রমণ হ'ত আমার খারাপ লাগত না, কিন্তু সভায় সভায় বক্তৃতার ঘূর্ণিহাওয়ার বেগে প্রাণপুরুষ উতলা হয়ে ওঠে, শুধু তাই নয়, পথের মধ্যে সমস্ত বড় বড় স্টেশনে আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে প্লাটফর্ম্মের উপরে ভিড় ক'রে বক্তৃতা করিয়েচে— অর্থাৎ ঠিক যে সব জায়গায় আহার করবার জন্যে পনেরো বা পঁচিশ মিনিট সময় দেয় সেইখানেই আমার রসনাকে আহারের পরিবর্ত্তে আলাপে প্রবৃত্ত করিয়েচে। এমনি করে ভূগোলের সঙ্গে ভূয়ো গোল মিশ্রিত

হয়ে আমার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেচে। এখন যে রাজপ্রাসাদে আছি এ অতি সুন্দর জায়গা— সমস্ত বাড়িটা আমাদের জন্যে ছেড়ে দিয়েচে; আমার সঙ্গে আছেন এণ্ড্রুজ, এল্‌ম্‌হর্স্ট্ আর অধ্যাপক লেভি আর তাঁর স্ত্রী। কাল সকালে এখানে এসেচি কাল বিকেলে আমার বক্তৃতা হয়ে গেচে, আজ সকালে নানাবিধ লোকসমাগম হবার উপক্রম হয়েচে, আজ বিকেলেই বেলা দুটোর গাড়িতে হুস্ করে চলে যাব। এখানে আর কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারলে খুসি হতুম। কাল সকালে মাদ্রাজে গিয়ে পৌঁছব—বিকেল থেকেই বক্তৃতা চক্রের আবর্ত্তন চল্‌তে থাক্‌বে।

তোমার গেল চিঠিতে এল্‌মহর্স্টকে তোমার ভালবাসা জানাতে বলেছিলে, আমি যথাসময়ে যথাবিধি তাঁকে তোমার প্রিয়সম্ভাষণ নিবেদন করেচি, তার থেকে এক কণামাত্রও গোপনে আমার নিজের জন্যে অপহরণ করিনি। এর থেকে আমার আশ্চর্য্য ঔদার্য্যের পরিচয় পাবে। তুমি যাই বল, আমি লোক ভাল।

রথী বৌমার কাশীতে যাবার কথা শুনে এসেছিলুম। মীরাও কিছুদিনের জন্যে সেখানে প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের[১০] বাড়িতে গিয়ে থাক্‌বে ঠিক করেছিল,— যাওয়া হল কিনা কোনো খবর পাইনি। খবর পাবার উপায় নেই— আমি যে নিরুদ্দেশ। নবেম্বর মাসের শেষে শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে সমস্ত খবর জান্‌তে পাব। অতএব ভেবে দেখ, তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি ফলাকাঙ্ক্ষাবিবর্জ্জিত হয়ে— এর উত্তর পাবার আশা নেই। তাই আবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্চি যে যদিচ লজিকে আমি কাঁচা, তবু আমি মানুষটি ভাল, এমন কি এল্‌ম্‌হর্স্টের চেয়ে মন্দ নই, তা তুমি আমাকে যাই মনে করনা কেন? ইতি তারিখ জানিনে, বোধ হয় বিজয়া দশমী। ১৩২৯

ভানুদাদা

১০৭

[নভেম্বর ১৯২২]

ওঁ

বোম্বাই

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, রবির দক্ষিণায়নের পালা সমাধা হল, এবার উত্তরায়ণের অভিমুখে চলেচি। পথের মধ্যে দুই একদিনের মত কাশীধামে অবস্থান করব। সেই দুই একদিন হয়ত তোমার লজিকশাস্ত্রচর্চ্চায় কিছু ব্যাঘাত হবে— কারণ আমার মত নির্লজ্জিক মানুষ দুনিয়ায় নেই। আপাতত এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে এখনি সেখানে যেতে হবে— মোটর-সারথি দ্বারের কাছে ক্ষণে ক্ষণে অধীরভাবে শৃঙ্গধ্বনি করচে। যা হোক তোমাকে খবর দিয়ে রাখলুম— আতিথ্যের আয়োজনে যেন ত্রুটি না হয়। ইতি, অগ্রহায়ণের কোনও এক তারিখ, ১৩২৯

ভানুদাদা

১০৮

২১ ডিসেম্বর ১৯২২

ওঁ

*SANTINIKETAN,
BEERBHUM, BENGAL

রাণু,

আমি কয়দিনের জন্যে কলকাতায় গিয়েছিলুম। সেখানে আমাদের বিশ্বভারতী সম্মিলনী আছে। অনেককাল অনুপস্থিতিবশত সেখানে

অনেকদিন আমার বক্তৃতাদি না হওয়াতে সভ্যেরা দুঃখিত ছিল। তাড়াতাড়ি গিয়ে ইংরেজ কবি ব্রাউনিঙের একটা নাটক তাদের শুনিয়ে এলুম।[১] আমি বইখানা ধরে আগাগোড়া বাংলায় তর্জ্জমা করে বলে গিয়েছিলুম। কাজটা নিতান্ত সোজা নয়, বিশেষত ব্রাউনিঙের মত কবির দুর্বোধ ও জটিল লেখা। শ্রোতাদের ভাল লেগেছিল। আমার কাজ এখন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েচে— আগে আমার কাজের ক্ষেত্র শান্তিনিকেতনেই বদ্ধ ছিল এখন শান্তিনিকেতন আর কলকাতার মাঝখানে প্রায়ই আমাকে খেয়া দিতে হয়। তার পরে মাঝে মাঝে বাংলাদেশের বাইরেও দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াবার ডাক পড়ে।

কলকাতা থেকে ফিরে এসে দেখি তোমার চিঠি আমার ডেস্কের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তা ছাড়া আরো অনেক চিঠি এসে জমেচে— কোনোটা এদেশী কোনোটা বিদেশী। অনেক কাজ আছে যা শেষ করতে পারলেই তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় কিন্তু চিঠি জিনিসটা আজ শেষ করলেই আবার কাল এসে জমে— চিরজীবন এই রকমই চলবে। কাল আসচে ৭ই পৌষ। চারদিকে ব্যস্ততার অন্ত নেই। এবার দুদিন ধরে মেলা চলবে— যাত্রা, কীর্ত্তন, বায়োস্কোপ, আতসবাজি, কৃষিপ্রদর্শনী, শিল্পপ্রদর্শনী ইত্যাদি নানাবিধ ব্যাপার আছে।[২] অতিথি সমাগম কম হবে না। এই নিয়ে দুদিন আমাকে বিষম ব্যস্ত থাকতে হবে। ক'দিন ধরে শীত পড়েচে খুব। হি হি করে উত্তর পশ্চিম থেকে হাওয়া দিচ্চে, আর আমলকির পাতাগুলো খসে খসে উড়ে উড়ে পড়চে। তোমাদের ওখানে নিশ্চয়ই এর চেয়ে অনেক বেশি শীত।— আচ্ছা রাণু একবার য়ুরোপে গিয়ে তোমার পড়ে শুনে আস্‌তে ইচ্ছে করে? তোমার যে রকম বুদ্ধি, যে রকম শেখবার শক্তি ও পড়বার নিষ্ঠা তাতে সেখান থেকে তুমি অনেক উন্নতি লাভ করতে পার। আমার অনেকবার মনে হয়েচে তোমাকে ফ্রান্সে পাঠালে তুমি নানা বিদ্যায় বিদুষী হয়ে

আসবে। তুমি যদি ইচ্ছা কর আমি তাহলে চেষ্টা করে দেখি। ইতি ৬ই পৌষ ১৩২৯

ভানুদাদা

১০৯

[২৫ ডিসেম্বর ১৯২২]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

সে কি কথা রাণু? তোমার চিঠি পেয়েই ত আমি তখনি তার উত্তর দিয়েছিলুম, কেন তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছল না তা ত বলতে পারি নে। আশা করি এ চিঠি তুমি পাবে। আমি কিছুকাল থেকে বিষম ব্যস্ত আছি। প্রথমত ৭ই পৌষের জন্যে কিছুদিন ধরে নানা লোকের ভিড়, নানা সভায় নানা বক্তৃতা প্রভৃতি ব্যাপারে সমস্ত দিন আমার একটুমাত্র সময় ছিল না— তার উপরে এই সময়ে আমাদের বিশ্বভারতীর সেশন সুরু হচ্চে বলে নানারকমের হাঙ্গামের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি। ৭ই পৌষ হয়ে গেলে আশা লীলাবতীকে নিয়ে তোমার বাবজা এসে উপস্থিত। আমার সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত তাদের ভাল করে দেখাই হয় নি। তার কারণ আমি অতিথি অভ্যাগতের আবর্ত্তের মধ্যে কেবলি পাক খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্চি। তোমাকে এইটুকু চিঠি লিখ্‌তে আমাকে দশবার থাম্‌তে হয়েচে। শুনেচি মেয়েদের বোর্ডিঙের মধ্যে কোন একজায়গায় আশা স্থান পেয়েচে— আজ গিয়ে একবার দেখে আস্‌ব। তাদের রীতিমত পড়াশুনো আরম্ভ হবে জানুয়ারির আরম্ভ থেকে। এ কয়দিন ছুটি যাবে। তোমার বাবজা কাল গেছেন কলকাতায় তাঁর কাজে। আবার তিরিশ তারিখে তিনি ফিরে এসে

একদিন থেকেই স্বস্থানে ফিরে যাবেন। আজকাল আমার এখানে অনেক বিদেশীর আমদানি হয়েচে, শীঘ্রই আরো অনেকে আসবেন। আমাদের দিশী শিক্ষক যত, বিদেশী শিক্ষক তার প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে দাঁড়িয়েচে। নানা দেশের গুণী জ্ঞানী লোক এখানে আকৃষ্ট হয়ে আস্চে এতে আমার মনে খুব আনন্দ হয়। আস্চে বুধবারে প্যালেস্টাইন থেকে একজন মেয়ে আস্বেন[১] তিনি জর্ম্মান, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা খুব ভাল জানেন। তিনি টলস্টয়ের মতে দীক্ষিত। মিস্ ক্রাম্রিশ[২] গেচে মাদ্রাজ অঞ্চলে, সেখানে দুই একমাস ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবে। এখানে শীত খুব পড়েচে, উত্তর এবং পশ্চিম থেকে হু হু করে হাওয়া বইচে আর আমাদের শালবনের পাতাগুলো হি হি করে কেঁপে উঠ্চে। আমি এই হাওয়ার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ঘরের দরজা বন্ধ করে লিখ্চি। আজকাল এ বাড়িতে আমি একলাই থাকি, এণ্ড্রুজ এখন অন্য প্রদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। একলা থাকি বটে কিন্তু অতিথির ভিড় লেগেই আছে তার উপরে দেশ বিদেশের চিঠির বোঝা জম্চে আর আমি ক্রমাগতই তার জবাব লিখ্চি, বিশ্রামের অবকাশ একটুও পাই নে। ঐ বাজ্‌ল ঘণ্টা, এখনি একটা কমিটি বস্বে, আমি হচ্চি তার সভাপতি, সুতরাং আমার আর পালাবার জো নেই। প্রায় দুটো বাজ্‌ল। এইমাত্র খেয়ে উঠেচি— তার পরে বোধ হয় বিকেলে চা খাওয়া পর্য্যন্ত মীটিং চল্বে। পশুদিন এখানে বৈকুণ্ঠের খাতার অভিনয় হয়েছিল। দিনু সেজেছিল বৈকুণ্ঠ, বিশি[৩] সেজেছিল তিনকড়ি, বিভূতি সেজেছিল অবিনাশ, সবসুদ্ধ খুব যে ভাল [হয়েছিল] তা বলতে পারি নে। সংস্কৃত নাটক মুদ্রারাক্ষস থেকে একটা অঙ্ক অভি[নীত হয়েছিল]।[৪] কলকাতায় আমাকে [নাটকগুলো] অভিনয় করবার জন্যে [বলা হচ্চে, কিন্তু] আমি যে তাতে উৎ[সাহ বোধ] করচি তা নয়। [১০ পৌষ ১৩২৯]

ভানুদাদা

১১০

[২৮ ডিসেম্বর ১৯২২]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

আজ সকালে শ্রীমতীকে নিয়ে লীলাবতী আমার এখানে এসেছিল। তোমার এই বন্ধুকে আমার বেশ ভালই লাগ্‌ল। ধ্রুবর[১] অসুখ বেড়ে উঠেচে টেলিগ্রাম এসেচে তাই ব্যস্ত হয়ে পড়েচে— হয়ত আজকালের মধ্যেই সে চলে যাবে। লীলাবতী আমাকে কিছু একটা কবিতা পড়ে শোনাতে বল্‌লে। আমি তাকে ইংরেজি গীতাঞ্জলি থেকে দুই একটা পড়ে শোনালুম। ওর ছোট বোনও ওর সঙ্গে আছে। তোমাদের ক্লাসের যে সুন্দর ছেলেটি গায়ে আতর মেখে বেড়ায় একবার ভেবেছিলুম তার কথা ওকে জিজ্ঞাসা করব— কিন্তু ভয় হল পাছে তুমি রাগ কর।

আমাদের এখানে এখনো খুব তীব্র শীতের হাওয়া বইচে— গায়ে দুটো তিনটে কাপড় পরেও হাড়ের মধ্যে শীত শীত করতে থাকে। আশা বল্‌লে কাশীর শীতের চেয়ে এখানে যে শীত কম তা নয়। আশা আজকাল পুরোপুরি বোর্ডিঙে আশ্রয় নিয়েচে— কি রকম লাগচে বুঝতে পারি নে— জিজ্ঞাসা করলে ত বলে বেশ ভাল আছি। খাওয়া দাওয়া ঠিকমত পরিমাণে হচ্চে কিনা বল্‌তে পারিনে। ওদের বোর্ডিঙে একটি নতুন ইহুদি মেয়ে[২] এসেচেন। তিনি লোকটি খুব ভালো— নানা বিষয় জানা আছে। নানা দেশেবিদেশে ঘুরেচেন। সম্প্রতি আসচেন প্যালেস্টাইন্‌ থেকে। একদল য়িহুদি তাদের পিতামহদের বাসভূমিতে ফিরে যেতে চাচ্চে— সেখানে থেকে তাদের নিজের সাহিত্য স্বাজাত্য শিল্প আত্মশক্তি জাগিয়ে তুল্‌বে। এই মেয়েটি সেই দলের। আমার লেখা প্রভৃতি পড়ে ভারতবর্ষে আসবার জন্যে উৎসুক হয়েছিল। পাসপোর্ট্‌ নিয়ে বিস্তর গোলমাল বেধেছিল। এখানে এসেই

এখানকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েচে। তা ছাড়া একজন রাশিয়ান অধ্যাপক[৩] আমাদের এখানকার কাজে যোগ দিয়েচেন। আজকাল রাশিয়ায় অনেক পণ্ডিত অনেক গুণী অন্নাভাবে মারা যাচ্চে, তাদের কথা বোধ হয় পূর্ব্বেই শুনেচ— ইনি সেই উপবাসীদের দলে। সোভিয়েট গবর্মেণ্টের তাড়া খেয়ে বম্বাই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে বহুকষ্টে দিন চলছিল। এই লোকটি অনেকদিন পারস্য দেশে ছিলেন, পারসিক ভাষায় খুব পণ্ডিত। এখানে ইনি সেই ভাষা শেখাবার ভার নিয়েচেন। সম্প্রতি একজন ইংরেজও[৪] এসে জুটেচে— তার হাতে বিশ্বভারতীর বড় ছাত্রদের ইংরেজি সাহিত্য শেখাবার ভার দিয়েচি। এরা সব আপনি এসে জুটেচে। তুমি এবারে যখন এসে দেখ্‌বে সব তোমার নতুন ঠেক্‌বে। কেবল আমি আছি পুরোণো মানুষ, আমার পুরোনো [য] সেই কুটীরটির কোণের ঘরে বসে চিঠি লিখ্‌চি। বেলা প্রায় আড়াইটা হয়— এইবার কমিটির সব লোক আসবে— অতএব ইতি ১৩ পৌষ ১৩২৯

ভানুদাদা

১১১

১৩ জানুয়ারি ১৯২৩

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু,

রাণু— কলকাতায় তোমার চিঠি পেলুম। কিছুদিন হল এসেচি। প্রথমে ছিলুম আলিপুরে, পশুশালার পাশেই[১] সেখানে অদূরে ছিলেন ভারত-রাজপ্রতিনিধি বড়লাটবাহাদুর[২]। এই সমস্ত পশুসিংহ ও নরসিংহদের পাড়ায় বেশিদিন টিকতে পারলুম না— পর্শুদিন থেকে এখানে আছি। শরীর যে

খুব ভাল আছে তা বলতে পারব না, অথচ এত বেশি খারাপ হয় নি যাতে অচল হয়ে ওঠে— এই কারণে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত করতেই হয়, তার পরে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অতিরিক্ত যে সব কাজের ভিড় চারদিকে চেপে ধরে তাদের দূরে ঠেকিয়ে রাখবার উপযুক্ত কোনো ছুতো খুঁজে পাইনে। এই পর্য্যন্ত তোমাকে লিখেচি হেনকালে চীন দেশ থেকে একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি বল্লেন, "চীনদেশে আপনাকে যেতেই হবে, সেখানকার যুবকেরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করচে।" অক্টোবর নবেম্বর ডিসেম্বর এই তিনমাস উত্তর চীন এবং দক্ষিণ চীন ভ্রমণ করবার জন্যে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করে তিনি চলে গেলেন। তারপরে এলেন Cinema কোম্পানির এক কর্ম্মচারী। আমার "রাজর্ষি" ওরা সিনেমাতে প্রকাশ করবার উদ্যোগ করেচে।[৩] সেই উপলক্ষ্যে আমারও একখানা সিনেমা ছবি নিতে চায়। অনেক বক্তৃতার পর সে যখন চলে গেল— তখন এলেন এক ভদ্রলোক, তিনি ভারত মন্ত্রিসভায় সদস্যরূপে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, আমার কাছে ভোট দাবী করেন। তিনি যেতে না যেতে All India Musical Conference-এর উদ্যোগকর্ত্তারা এসে উপস্থিত। এই সভার কার্য্যপ্রণালী কি রকম হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আমার পরামর্শ নেওয়া তাঁদের অভিপ্রায়। সুদীর্ঘকাল তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমার আহার প্রস্তুত শুনে তাঁরা চলে গেলেন। সেই আহারকালেও একজন আর্টিস্ট ভদ্রলোক বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য উপকরণ কার্য্যপ্রণালী তার আয়ব্যয় প্রভৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দিলেন। আমার আহার শেষ হল তবু তাঁর প্রশ্ন হলনা। রাত্রি সাড়ে নটা পর্য্যন্ত বকাবকির পর তিনি বিদায় হলেন। আজ সকালে আবার তোমার চিঠি আরম্ভ করলুম। দুই তিন দিন থেকে এখানে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কাল রাত্তিরে টিপ্‌টিপ করে বৃষ্টি হয়েচে। আজ সকালেও মেঘেতে কুয়াশাতে অন্ধকার, আকাশটা যেন কম্বলমুড়ি দিয়ে আছে। শীতের দিনে এ রকম বাদলা একটুও ভাল লাগেনা।

কাল আমি শান্তিনিকেতনে ফিরব। পর্শুদিন আমাদের গবর্নর লর্ড লিটন্* আমাদের বিদ্যালয় এবং সুরুল কৃষিক্ষেত্র দেখ্‌তে আস্‌বেন। সে একটা বিষম হাঙ্গামা। সুরুলে তিনি মধ্যাহ্নভোজন [য] করবেন, শান্তিনিকেতনে খাবেন চা। এই ব্যাপারে দুটো দিন যাবে। তার পরে বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে টাকা তোলবার জন্যে কিছু একটা অভিনয় করবার প্রস্তাব হচ্চে।* শরীর ক্লান্ত, কিন্তু এ কাজটা ঠেলে রাখবার জো নেই, করতেই হবে।

তোমার বন্ধু লীলাবতীর বুঝি শান্তিনিকেতনের মানুষজন, শিক্ষাপ্রণালী কিছুই ভাল লাগে নি। তিনি কিছু দেখেচেন বলে ত বোধ হল না— সে সময়ে ত মেলার ব্যাপারে বিদ্যালয় বন্ধই ছিল। খোলা থাকলেও এখানকার উদ্দেশ্য ও কার্য্যবিধি বোঝবার মত তাঁর বয়স ও শিক্ষা হয় নি।

আশাদের ক্লাস এখন আরম্ভ হয়ে গেছে।* কি রকম চল্‌চে ফিরে গিয়ে দেখ্‌তে পাব। সে বেচারার বোধ হয় খুব মন কেমন করে। বোর্ডিঙে তার খাওয়া দাওয়া কি রকম চল্‌চে তাও ত জানি নে। কোন অসুবিধা হলে সে যে আমাকে কিছু বল্‌বে এমন সম্ভাবনা নেই। তাই আমি তার জন্যে উদ্বিগ্ন থাকি। ২৯ পৌষ ১৩২৯

ভানুদাদা

১১২

[জানুয়ারি ১৯২৩]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু তোমার চিঠির ভাবে বোধ হল যে আমার চিঠি পাবার আগেই তুমি আমাকে লিখেচ। আমি ত সেদিন তোমাকে লিখেচি।

হঠাৎ কাল থেকে আমি কিছু অসুস্থ হয়ে পড়েচি। বোধ হয় যাকে আজকাল ইনফ্লুয়েঞ্জা বলেচে—

উপরের ঐটুকু লিখে তার পরে শয্যাশায়ী হয়ে কাটিয়েচি। কাল এইভাবে দিন ও রাত কাটিয়ে আজ মধ্যাহ্নে [য] তোমার এ চিঠি শেষ করতে বসেচি।

কাল রাতে আশাদের শয়নশালায় এক চোর ঢুকে দুটো বাক্স চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। ওরা চোরকে দেখ্‌তে পেলে কিন্তু চোর তাতে বিচলিত হল না— ধীরে ধীরে বাক্স তুলে নিয়ে মৃদুমন্দগমনে চলে গেল। তার পর থেকে ওরা সকলেই খুব ভীত অবস্থায় আছে। ওরা যেরকম ঔদার্য্যের সঙ্গে চোরকে তার স্বকর্ত্তব্য সাধন করতে দিলে তাতে পরম সাধুব্যক্তিরও চুরি করতে উৎসাহ হতে পারে।

এখানে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়ে আবার ঠাণ্ডা পড়েচে। আজ সকালে কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন ছিল। আমি নিজে যেমন অসুস্থ তেমনি আমার মনে হচ্চে বাইরের আকাশটারও যেন অসুখ করেচে সে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। তোমাদের ওখানেও ত শুন্‌চি বৃষ্টিবাদলা এক চোট হয়ে গেছে। আজ আর বেশি নয় [মাঘ ১৩২৯]

ভানুদাদা

১১৩

১০ জানুয়ারি ১৯২৩

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু অনেকদিন আগে তোমাকে একখানি চিঠি লিখেছিলুম। তার উত্তর পাইনি। সম্প্রতি আশার কাছে শুন্‌লুম মাঝে অশোকের[১] খুব অসুখ করেছিল,

তার থেকে মনে হচ্চে তুমি হয় ত সেই উদ্বেগে লেখবার সময় পাওনি। আমারও আজকাল কাজের উৎপাত আগেকার চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে নইলে তোমার চিঠি না পেলেও একখানা লিখে দিতুম। আশা খুব পড়াশুনোর মধ্যে ডুবে রয়েচে তার পাঠ্যবিষয়ের আর অন্ত নেই। শুধু তাই নয়, বোর্ডিঙের যে কোন মেয়ে যে কোন বিষয়ে পিছিয়ে আছে আশাকে ধরলেই আশা তাকে পড়াবার ভার নেয়। [illegible] অসুখের কথা শুনে সেদিন বেচারা ভারি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল।

আমি ত আর কিছুদিন পরেই তোমাদের ওখানে যাচ্ছি। ক্ষিতিমোহনবাবু আমার সহযাত্রী। সাহেবকে পাঠিয়েছি বোম্বাই, সুতরাং আমার তত্ত্বাবধানের জন্যে একজন সমর্থ লোকের দরকার। ক্ষিতিবাবু খুব সমর্থ, আর তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেও বেশ লাগে। কাশী লক্ষ্ণৌ হয়ে বোম্বাইয়ের পথ দিয়ে আমাকে করাচি যেতে হবে। সে কথা স্মরণ করলে এখন থেকেই মন ক্লান্ত হয়ে ওঠে— আর ঘোরাঘুরি ভাল লাগেনা— বিশ্রাম করবার সুযোগ পেলে বাঁচি। তুমি ভাল আছ ত? ইতি ২৭ মাঘ ১৩২৯

ভানুদাদা

১১৪

[মার্চ ১৯২৩]

ওঁ

Mount Petit
Pedder Road
Bombay

রাণু তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। আমি মনেও করিনি আমার এই ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় তুমি আমাকে চিঠি লিখতে পারবে। কেননা তুমি ত আমার

ঠিকানা জান্‌তে না। যে ঠিকানায় আমাকে চিঠি লিখেচ সে সম্পূর্ণ তোমার বানানো। তবু যে যথাসময়ে চিঠি আমার কাছে পৌঁছল তার কারণ তোমার ভানুদাদা কোনো পোষ্ট আপিসের কাছে লুকোনো নেই। আমাকে কেউ কেউ শুধু ইণ্ডিয়া ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখেচে— তাও আমার হাতে এসে পৌঁচেচে। তোমরা ত সবাই এক রাস্তা দিয়ে এক দিকে চলে গেলে, আমি আর ক্ষিতিবাবু আর এক রাস্তা দিয়ে আর এক দিকে চলে গেলুম।[১] সেদিন আর তার পরের সমস্ত দিন রাস্তায় কেটে গেল। কি আর করব, পথের মধ্যে তিন চারটে গান তৈরি করে ফেল্লুম।[২] তুমি শুনলে হয় ত তোমার ভালো লাগ্‌ত। কিন্তু জানই ত আমার কি সে রকম গলা আছে যে তোমাকে গান শুনিয়ে খুসি করতে পারি। কিন্তু গলা না থাক্ সুর ত আছে— তাই মনে মনে অহঙ্কার করি যে আমি সুরলোকের কবি। সুরগুলো মাঝে মাঝে উতলা হয়ে আমার মাথার মধ্যে মৌমাছির ঝাঁকের মত পাখা তুলে গুন্‌গুনিয়ে বেড়ায়। রেলের রাস্তায় সেই গুঞ্জনে আমার মন ভরে গিয়েছিল। ক্ষিতিমোহন আমার কাণ্ড দেখে অবাক্— ধূলোয়, কয়লার গুঁড়োয়, ঝাঁকানিতে, গরমে, অনিদ্রায়, অনিয়মে দল পাকিয়ে যতই উৎপাত করতে থাক্‌ল, আমার গান থাম্‌তে চায় না— কোনোটা ভৈরবী, কোনোটা পূরবী, কোনোটা বেহাগ, কোনোটা বাউলের সুর। এবার যখন আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে যদি সুর মনে থাকে তাহলে তোমাকে শোনাব। যদি পছন্দ না হয় তাহলে সেটা প্রকাশ কোরো না— বোলো, মন্দ হয় নি। আমাকে এখান থেকে আবার সিন্ধুপ্রদেশে যেতে হবে।[৩] ঘুরে ঘুরে দেহ মন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে গেছে— আর ভাল লাগ্‌চেনা। যদি ইতিমধ্যে তোমাকে চিঠি লেখায় পেয়ে বসে তাহলে ও পাতের বোম্বাই ঠিকানায় লিখো— বোলো যে ভানুদাদার কথা মনে করে' তোমার মন বেশ খুসি হয়ে আছে। এখানকার কাজ সেরে আমার ফিরতে বোধ হয় চৈত্রমাস পেরিয়ে যাবে।

ভানুদাদা

১১৫

১ অগাস্ট ১৯২৩[১]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

রাণু, কি করে যথাসময়ে তোমাকে এনে উপস্থিত করা যেতে পারে সেই চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হয়েচি। ক্ষিতিমোহনবাবু এসেছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তিনি বল্লেন তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। এখানে উপস্থিত এমন কেউ নেই যাঁর হাতে তোমার ভার সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। তোমার বাবজাকে আজ টেলিগ্রাফ করা গেছে, দেখি কি উত্তর আসে। যদি ওখান থেকে আনবার লোক কেউ না থাকে তাহলে এণ্ড্রুজকে পাঠিয়ে দেব স্থির করেচি। এণ্ড্রুজের সঙ্গে তোমার ত ঝগড়া মিটে গেছে। বোধ হয় এই পথটুকু কোনোরকম বনিবনাও করে চলে আসতে পার। পথে যদি তোমার গাড়িতে সেই মোটা অসভ্য মেয়ের সঙ্গ আবার পাও তাহলে এণ্ড্রুজের গাড়িতে এসে চড়ে বোসো। অন্তত ১৯শে তারিখে তোমার এখানে এসে পৌঁছন দরকার। আমি ত একরকম সব ভুলে টুলে বসে আছি। ৭টা দিন ভাল করে রিহার্সাল না দিতে পারলে জিনিষটা মনের মত হবে না। দর্শকের দল এবার খুব ব্যগ্র হয়ে আছে— মনে করচে ভারি একটা কাণ্ড হবে। সেইজন্যে অভিনয়টাকে সম্পূর্ণ নিখুঁৎ করে তোলবার ইচ্ছে আছে। তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করে তোমাকে যে লুঠ করে[২] আনা যাচ্চে সেটাতে আমাদের মন একটুও প্রসন্ন নেই— কিন্তু এখন আর উপায় দেখি নে। তোমাদের অধ্যক্ষ ধ্রুবর[৩] কাছ থেকে যখন ছুটি আদায় করে নিয়েচ তখন আশা করচি ১৯শে তারিখে তোমার আসবার কোনো বাধা নেই। ঝুলন এবং মহরমের ছুটি[৪] কি তোমাদের নেই? তাহলে অভিনয়ের সময়ের অনেকটা সেই ছুটির মধ্যে

পড়বে— সুতরাং তোমার বাবজা হয় ত স্বয়ং তোমাকে সঙ্গে আন্‌তে পারেন। যাহোক্ শীঘ্রই ত তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তাহলে অলমতি বিস্তরেন। ইতি ১৬ শ্রাবণ ১৩৩০

ভানুদাদা

১১৬

৮ অগাস্ট ১৯২৩

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

সঙ্গীত চলে গিয়েচে যন্ত্র পড়ে রয়েচে। রথীকে বল্লুম এসরাজ সুবীরের[১] হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতে। রথী কোনো জবাব করলে না। বোধ হয় তার ভাবখানা এই যে, যন্ত্রটা এইখানে বন্ধক রইল যতক্ষণ না সঙ্গীত স্বয়ং এসে ওটা খালাস করে না নিয়ে যায়। এ সম্বন্ধে বোধ হয় সে নিজে তোমাকে লিখ্‌বে।— কিছুকাল ঘোর বাদ্‌লা করেছিল আজ কেটে গিয়ে রোদ্দুর উঠেচে। সমস্ত তেতালা আজকাল ফাঁকা। বৌমা পাশের ঘরে শোন্ বটে কিন্তু সমস্ত দিন তাঁরা নীচের ঘরে আড্ডা করেন। আমি একলা আমার সেই তাকিয়া রাজ্যে কল্পনার মেঘলোকে বিহার করি। যখন আমার বয়স অল্প ছিল তখন দুপুর বেলা এই তেতালার ঘরে দক্ষিণের দরজা খুলে দিয়ে একটা বাঁকা কৌচের উপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় নিজের মনটাকে নিয়ে কি খেলা করতুম জানিনে। দূর আকাশ থেকে চীলের ডাক শোনা যেত, আর পাশের গলি থেকে চুড়িওয়ালা সুর করে হাঁক দিত, শুনে মনটা উতলা হয়ে উঠ্‌ত। আজ সেই আমার ছেলেবেলার নিঃসঙ্গ

মধ্যাহ্নগুলোর [য] কথা মনে পড়চে।[২] তখন গান লেখবার মত শক্তি থাক্‌লে বড় বয়সের মতই লিখ্‌তুম "হেলাফেলা সারা বেলা এ কি খেলা আপন মনে।" বাঁশির ফাঁক গানের সুরে বেজে ওঠে, আমার জীবনের ফাঁকগুলো কত গান দিয়েই যে বসে বসে ভরিয়েচি তার কি ঠিক আছে! কত গান কত সুর দিয়ে। এক এক সময়ে মনে হয় সুর সব ফুরিয়ে গেল বুঝি। তার পরে আবার হঠাৎ দেখি উৎস এখনো শূন্য হয়ে যায় নি। আবার কোথা থেকে সুর এসে জমা হয়, আবার দিনুর ভাণ্ডারে জমা করবার জন্যে দৌড়োদৌড়ি করতে হয়।

তোমাকে অভিনয়ে পাঠাবার জন্যে তোমার বাব্‌জাকে লিখেচি। তুমি না এলে মুষ্কিলে পড়তে হবে। মঞ্জুকে[৩] তৈরি করবার জন্যে গগনকে[৪] বলেছিলুম কিন্তু সে হয়ে উঠ্‌ল না। তুমি ত জান, তোমাকে ছাড়া গগনের আর কাউকে পছন্দ হয় না। সুবীরের বাবা আজ কাশীতে যাচ্চেন। তাঁর সঙ্গে যদি তোমাকে পাঠানো সম্ভব হয় তাহলে কোনো হাঙ্গাম থাকে না। নইলে আবার হপ্তাখানেক পরেই তোমাকে আনবার জন্যে আর কাউকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। কেননা আবার কিছুদিন রিহার্সাল দিতে হবে। তোমার জন্যে হয়ত ভাবনা নেই, তোমার নিশ্চয় সব মনে আছে। কিন্তু তোমার ভানুদাদা যে কি রকম মেধাবী সে তোমার অগোচর নেই। আবার পাঁচ ছয় দিন ভালো করে রিহার্সাল না দিলে হয় ত বেশ বড় রকমের গলদ করে বস্‌ব।

আমার শরীর যে খুব ভালো আছে তা নয়। এখনো কিছুতে দুর্ব্বলতা যাচ্চে না— সেই জন্যে মনের মধ্যে কেমন একটা অবসাদ লেগে আছে।

আশাদিদির আর শান্তির শরীর ভাল নেই শুনে উদ্বিগ্ন হলুম। ইতি
২৩ শ্রাবণ ১৩৩০

ভানুদাদা

১১৭
৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

তুমি জানতে চাও আমি কোথায় বসে লিখ্‌চি। যেখানে তুমি আমাকে দেখে্‌ গিয়েছিলে সেখানে নয়। সেই যেখানে আমার পাকা বাসস্থান, সেখানে কাল ফিরে এসেচি। আমার এই লেখবার ঘর তোমার পরিচিত কিন্তু তার আসবাবপত্রের বদল হয়ে গেচে। আমার সেই স্লেট বাঁধানো লেখবার টেবিলটা দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ থেকে সরে এসে উত্তর পশ্চিম কোণ আশ্রয় করেচে। সেই দক্ষিণ পূর্ব্ব দেয়ালের গায়ে মস্ত একটা তক্তপোষ পড়েচে। আমার ডানদিকের খোলা দরজা দিয়ে উত্তর দিকের মাঠ দেখ্‌তে পাচ্চি, ধূ ধূ করচে। আজ শরতের আগমনবার্ত্তা বহন করে' প্রথম উত্তরের হাওয়া দিয়েচে। দুপুর বেলাকার রৌদ্রে সে হাওয়া অল্প একটু তেতে উঠেচে। দুপুর বেলাকার আহারস্বরূপ একটি রুটি তরকারী সহযোগে সেবা করে চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। অল্প অল্প ঘুম পাচ্চে, কেননা সেই ক্লান্তি এখনো আমাকে ছাড়ে নি। চারিদিকে কেউ কোথাও নেই— সমুখের রাস্তা দিয়ে ইঁট বোঝাই করা গোরুর গাড়ি ক্যাঁ কোঁ করতে করতে মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে চলেচে। আর দক্ষিণের বারান্দায় কয়েকজন ছুতোর মিস্ত্রি ঠুক্‌ঠাক্‌ খস্‌খস্‌ শব্দে এ বাড়ির জানলা [য] দরজার সংস্কার সাধন করতে লেগেচে। আকাশে বর্ষার মেঘের পর্দ্দা শতছিন্ন, তারি ফাঁক দিয়ে শরতের নবীন চেহারা আজ দেখা দিয়েছে। পূজোর ছুটির আভাস আজ আকাশে বাতাসে রোদের সোনায় সোনালি ও শিউলি ফুলের মৃদু গন্ধে আবিষ্ট হয়ে উঠেচে।

প্রবীণ ও বিখ্যাত অভিনেতা অমৃত বোস তোমার অভিনয়ের জয়গান ক'রে ইংরেজি দৈনিক ডেলি নিউসে একটা পত্র লিখেচে।[১] পড়ে দেখো—

বাবজাকে দেখিয়ো, তিনি খুশি হবেন। প্রশংসার ছলে আমার কি রকম নিন্দা করেচে, তাও দেখো। বলেচে আমার অভিনয় কেউ যেন নকল করবার চেষ্টা না করে। অর্থাৎ ওটা খারাপ। অথচ মজা এই, যে-কয়জনে অভিনয় করেচে সকলে আমারই অঁভিনয়ের নকল করেচে— আমিই ত তাদের দেখিয়ে দিয়েচি— দিনুর রঘুপতি আমারই রঘুপতি অভিনয়ের প্রায় অবিকল নকল।

বেনোয়াকে নিয়ে এখনো আমার নন্দিনীর তর্জ্জমা করে চলেচি।[২] কাল সকালে বোধহয় শেষ হয়ে যাবে। তার পরে চীনযাত্রার জন্যে বক্তৃতা লিখতে বসতে হবে।— এণ্ড্রুজের সঙ্গে ঝগড়া হয় নি ত? রাস্তায় কি রকম জমেছিল? খেতে দিয়েছিল ত? ইতি ২০ ভাদ্র ১৩৩০

ভানুদাদা

১১৮

১২ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু,

ইংলিশম্যানে তোমার যে স্তবগান[১] তোমার কোনো ভক্ত করেচেন, তুমি ভাবচ সে আমি যথাসময়ে পড়ি নি। পড়েচি, এবং তোমাকে পাঠাব কিনা সে কথাও মনে মনে আলোচনা করেচি। কিন্তু যে হেতু নিশ্চয় জানতুম সেই লেখাটিও তোমার নয়নগোচর করবার জন্যে আগ্রহবান যুবকের অভাব হবেনা সেই জন্যে তোমার উপর ঐ পত্রাংশবৃষ্টি আর

করলুম না। কাগজে যা বেরিয়েচে তা ত বেরিয়েচে তার উপরে লোকমুখে বিসর্জ্জনের অভিনয় আলোচনা এখনো চল্‌চে। অধিকাংশ লোকের মত এই যে, এমন কাণ্ড তারা আর কখনো দেখে নি। আরো দশদিন যদি হত তাহলে দশদিনই ঘর ভরে' যেত। অনেক লোকেই জায়গা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। প্রশান্ত কয়েকদিন পূর্ব্বে এখানে এসেছিল। তার প্রস্তাব এই যে আগামী শীতের সময় আমি পর্য্যায়ক্রমে রঘুপতি, এবং গোবিন্দমাণিক্য সেজে অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়ে সকলকে অভিভূত করে দিই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রশান্ত সেই সঙ্গে আমাকে অপর্ণা সাজ্‌তে অনুরোধ করে নি। তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে, প্রশান্তর মতে অপর্ণার অভিনয়ে তোমার সঙ্গে টক্কর দিতে পারি আমার এমন সাধ্য নেই। এতে আমি মনের মধ্যে কিছু দুঃখ বোধ করেচি। সেই দুঃখের খেদে আমি রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্য সেজে বাহাদুরী করতে কিছুতে সম্মত হলুম না। আমার ইচ্ছে সেই যক্ষপুরীর অভিনয়টা করে' অভিনয়ের আর একরকম ধারা দেখিয়ে দিই। তার উপযুক্ত দেশকালপাত্র কবে জুট্‌বে জানিনে।— উইন্টারনিট্‌জ্[২] আগামী ১৫ই তারিখে আশ্রম থেকে বিদায় নেবেন। তদুপলক্ষে বিশ্বভারতীর ছাত্রেরা উত্তররামচরিতের একটা অংশ অভিনয় করবে।[৩] সীতা বাসন্তী তমসা প্রভৃতি সাজবার জন্যে এখন থেকে পুরোদমে দাড়ি গোঁফ কামানো চল্‌চে। এই ব্যাপার দেখে দীনু ভীষণ ক্ষাপা হয়ে উঠেচে, সে আকাশে তার দুই বাহু প্রক্ষেপ করে বল্‌চে—

ঘোর কলি এসেচে ঘনায়ে— ছিন্ন গুম্ফ
দন্ত ভরে নারী-কান্তি হসিবারে [য] চায়,
কাছা-কোঁচা সাড়িরূপে আস্ফালন করে!

এই মাত্র তাঁর দূতেরা আমার কাছে এসে তাঁর আক্ষেপোক্তি জানিয়ে গেল। আমারও মনে ক্ষোভ জন্মালো। এই সেদিন যে আমি রঙ্গমঞ্চপরে দাঁড়ায়েছি গর্ব্বভরে, সাথে লয়ে অভিনেত্রী সখী মোর। আমার মনে হল যেন তারই

কণ্ঠ আমাকে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ভানুদাদা, এস যাই এ নাট্যমন্দির ছেড়ে।" আমি তার জবাবে বল্‌লুম, "যাব যাব, তাই যাব, হায় রাণু, তাই যেতে হবে!" আগামী কাল অভিনয়ের দিন; আমি ঠিক করেচি অভিনয় শেষ হয়ে গেলে উপস্থিত হয়ে ওদের উৎসাহ দেব। কারণ অভিনয়কালে উপস্থিত থাকলে উৎসাহ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে।

এণ্ড্রুজ সাহেব এসেছেন। খুব শীর্ণ দুর্ব্বল, প্রায় সমস্ত দিনই শয্যা আশ্রয় করে আছেন। বল্লেন যে, তোমার সঙ্গে পথে কিম্বা ঘরে কোথাও একটুও ঝগড়া হয়নি। জিজ্ঞাসা করলেন বর্দ্ধমানে খুব যে চমৎকার ডিনার খাইয়েছিলেন তার বিবরণ তোমার পত্রে আমাকে জ্ঞাপন করা হয়েচে কি না। আমি বল্‌লুম, হয়েচে বৈ কি! কিন্তু বিবরণটা যে কি রকম সেটা আমি বিস্তারিত করে বলি নি। বল্‌লে শান্তি ভঙ্গ হত। সেখানে তাঁকে তোমাদের বাড়ির সকলে যে খুবই যত্ন করেছিলেন সে কথা বারবার করে বল্‌লেন— শুনে তোমাদের ওখানে কোনো এক সময়ে রোগশয্যা আশ্রয় করবার সঙ্কল্প আমার মনে দৃঢ় হল। কোনো রোগ যদি না জোটাতে পারি ত মাথা ধরতে কতক্ষণ। সেটা ত থার্ম্মোমিটার কিম্বা স্টেথোস্কোপ দিয়ে ধরা পড়ে না। পেট কামড়ানো, মাথা ধরা প্রভৃতি বহুবিধ দুর্লক্ষ্য রোগের তালিকা বাল্যকাল থেকে আমার কণ্ঠস্থ আছে; শাস্ত্রে বলে কলিযুগে নামেই পরিত্রাণ, ঐ সকল রোগের নাম গ্রহণ করেই আমি কঠিন স্কুলবন্ধন থেকে ত্রাণ পেতুম, তার চেয়ে বেশি দূর যাবার দরকারই হত না। তোমরা মুক্তি পিপাসু নও, এই জন্যে এ সকল তত্ত্বে তোমাদের অধিকার হয় নি।

উইন্টারনিট্‌স সেপ্টেম্বরের শেষভাগে কাশীতে যাবেন— তোমার বাব্‌জাকে বোলো তাঁর যেন উপযুক্ত অভ্যর্থনা হয়। সেদিন তিনি Indian Literature as a World Literature নামক একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, খুব ভাল লেগেছিল! তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি তাঁকে বক্তৃতায় আমন্ত্রণ করা হয় তবে সেইটে তাঁকে বলতে বোলো।

আজ দীর্ঘ চিঠি লিখলুম। অন্য চিঠির দাবীতে এবার মন দেওয়া যাক্‌। ইতি ২৬ ভাদ্র ১৩৩০

ভানুদাদা

১১৯

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

যদি প্রশংসা শুনে এখনো পেট ভরে না থাকে তাহলে প্রবর্ত্তক নামক মাসিকপত্রে তোমার অভিনয়ের যে সমালোচনা বেরিয়েচে[১] সেটা পড়ে দেখো। পড়ে' আমার মনে হল— শুধু তুই আর আমি, প্রশংসায় আর কেহ নাই!— এমন কি দিনুর রঘুপতিকে পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিয়েচে। তোমার সিংহাসনের পাশে যে আমাকেও স্থান দিয়েচে সে কম কথা নয়। প্রবর্ত্তক হয়ত তোমাদের হাতে না পড়তে পারে অতএব সমালোচনাটা কেটে পাঠিয়ে দিচ্চি।

ইতিমধ্যে আমার দৈনিক কার্য্যকলাপের একটুখানি scene বদলে গেছে। সেই বড় ঘরটা ছেড়ে দিয়েচি। সেটা রাস্তার ধারে থাকাতে যখন তখন যে সে এসে বড় উৎপাত করত। এখন এসেচি দক্ষিণের বারান্দার পূর্ব্বকোণে, নাবার ঘরটার ঠিক বিপরীত প্রান্তে একটি ছোট্ট ঘরে। এ ঘরটার গোড়াপত্তন তুমি বোধ হয় দেখে গিয়েছিলে। আমার সেই কালো স্লেট-বাঁধানো লেখবার টেবিলেই ঘরের প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে গিয়েচে। কেবল আর একটি মাত্র চৌকি আছে— ঘরের মধ্যে লোকের ভিড় হবার জায়গা রাখি নি। এখন মধ্যাহ্ন [য]। কটা বেজেছে ঠিক বলতে পারিনে—

কারণ আমার ঘড়ি বন্ধ। বন্ধ না থাক্‌লেও যে ঠিক সময় পাওয়া যেত তা নয়— তুমি আমার সেই ঘড়ির পরিচয় জানো। এইটুকু বলতে পারি— কিছুকাল পূর্ব্বেই একখানা পরোটা ডাল ও তরকারী সংযোগে আহার করে লিখ্‌তে বসেচি। রৌদ্র প্রখর, শরতের শাদা মেঘ স্তরে স্তরে আকাশের যেখানে সেখানে স্ফীত হয়ে পড়ে আছে, বাইরে থেকে শালিখ পাখীর ডাক শুন্‌তে পাচ্চি, বামের রাস্তা দিয়ে ক্যাঁচকোঁচ করতে করতে মন্দগমনে গোরুর গাড়ি চলেচে, আমার ডানদিকের দক্ষিণের জানলা দিয়ে কচিধানের ক্ষেতের প্রান্তে সুদূর তাল গাছের শার [য] দেখা যাচ্চে, তন্দ্রালয় ধরণীর দীর্ঘনিঃশ্বাসটি নিয়ে আতপ্ত হাওয়া ধীরে ধীরে আমার পিঠে এসে লাগ্‌চে। এরকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না, এই মেঘগুলোর মতই অকেজো হাওয়ায় মনটা বিনাকারণে দিগন্ত পার হয়ে ভেসে যেতে চায়। জানলার বাইরে মাঝে মাঝে যখন চোখ ফেরাই তখন মনে হয় যেন সুরবালকেরা স্বর্গের পাঠশালা থেকে গুরুমশায়কে না বলে পালিয়ে এসেচে— আকাশের এ কোণ ও কোণ থেকে সবুজ পৃথিবীর দিকে তারা উঁকি মারচে, হাওয়ায় হাওয়ায় তাদের কানাকানি শুনে আমার মনটাও উতলা হয়ে দৌড় মারবার মৎলব করচে। কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর ভারাকর্ষণের টানে বাঁধা— মাটি আমাদের পা জড়িয়ে থাকে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। অতএব মনের একটা ভাগ জানলার বাইরে দিয়ে যতই উড়তে থাকে, আর একটা ভাগ ডেস্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পত্ররচনায় ব্যস্ত। দূরে কোথাও যদি যাবার ব্যবস্থা হয়— মনটাকে রেলভাড়ার কথা ভাব্‌তে হয়, দেবতার মত শরতের মেঘের উপর চড়ে মালতী-সুগন্ধী হাওয়ার হিল্লোলে বেণুবনের পাতায় পাতায় দোল খেয়ে খেয়ে বিনাব্যয়ে ভ্রমণ করে বেড়াতে পারে না।

এ ঘরে বসে লিখ্‌চি পাশের ঘরে একটি উড়িষ্যাদেশবাসী অতিথি অপেক্ষা করে আছে। লোকটি এম্ এ পাস করা, নন্ কো অপরেশনের ধাক্কায় বেকার অবস্থার ভাঁটার টানে ভেসে পড়েচে। আমার কাছ থেকে

হয়ত কোনো রকম সাহায্য বা উপদেশ চাইবে। সাহায্যের চেয়ে উপদেশ দেওয়া আমি পছন্দ করি। কিন্তু কেমন ঘুম পেয়ে আস্‌চে— উপদেশের মধ্যে জোর লাগাতে পারবো না। যাই হোক্ এ ঘরের পালা আজ এইখানেই শেষ করি। দেখা যাক্ আগন্তুক্‌টির অভিপ্রায় কি? ইতি ৩১ ভাদ্র ১৩৩০

ভানুদাদা

১২০

২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

সেদিন তোমাকে লিখলুম যে, প্রবর্ত্তক থেকে বিসর্জ্জনের সমালোচনা তোমাকে পাঠাচ্চি। বলে পাঠাতে ভুলে গেলুম। ওটাই হল কবি মানুষের লক্ষণ— তুমি বল্‌বে ওটা ভাল লক্ষণ নয়— সে কথা মানি নে যারা সবই মনে রাখে তাদের স্মৃতিপটে বিষম ভিড় হয়— সেই ভিড়ে প্রধান অপ্রধানের ভেদ থাকে না। যারা বাজে জিনিষকে ভুল্‌তে জানে তারাই মনের মধ্যে আসল জিনিষকে যথোচিত জায়গা দিতে পারে। দিনের আকাশ তারাদের কথা ভুলে যায় বলেই ত সূর্য্যকে অভ্যর্থনা করা তার পক্ষে সম্ভব। অতএব, কবিরা অনেক নামক হ য ব র ল কে স্মরণ থেকে বাদ দেয় বলেই, যে-সব এক একাধিপত্য করবার অধিকারী তাদের সিংহাসনে বসাতে পারে। আমার এই কথাটির গভীর অর্থটি কি তা বরঞ্চ আশাদিদিকে জিজ্ঞাসা কোরো, সে অনেক শাস্ত্র, অনেক তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা করেচে সে তোমাকে বুঝিয়ে বল্‌তে পারবে। আমি খুব স্পষ্ট ভাষায় বোঝাবার

চেষ্টা করতে পারতুম কিন্তু আজ অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। প্রথম ব্যস্ততা একটা কবিতা লেখা নিয়ে— বঙ্গবাণী নামক এক মাসিক পত্র আমার সম্মতি না নিয়েই বিজ্ঞাপন দিয়েচে যে আশ্বিনের বঙ্গবাণীতে আমার কবিতা বেরবে।[১] পিতৃসত্য পালনের জন্যে রামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন সে ত্রেতাযুগে, সম্পাদকের সত্য পালনের জন্যে কবিকে কবিতা লিখ্‌তে হয় সে কলিযুগে। আজই লিখে না দিলে চল্‌বে না। কবিতা দেবী যে হেতু স্ত্রীজাতীয়া এই জন্যে তাঁর স্বভাবে ঈর্ষাগুণের প্রাবল্য আছে— তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বিনীর প্রতি মনোযোগ করলে তিনি তাঁর পদ্মবনে গা ঢাকা দেন, সাঁতার দিয়েও তাঁর নাগাল পাওয়া যায় না। এ ছাড়া আরো অনেক কাজ জমে আছে। তোমাকে প্রবর্ত্তক পাঠাতে ভুলে গেলুম বলে বুদ্ধিপূর্ব্বক তোমার মাকে পাঠালুম— তাতে তুমিও খুসি হলে তোমার মাও খুসি হলেন। কবিদের লোকে নির্ব্বোধ বলে সে কথাটা মিথ্যে। আজ এই পর্য্যন্ত ইতি ৪ আশ্বিন ১৩৩০

ভানুদাদা

১২১

৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

ওঁ

Observatory

Alipore, Calcutta

রাণু

তোমার চিঠির প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর যেন দিই এই বলে তুমি আমাকে অনুরোধ করেচ। তাই দেব। কিন্তু আসল কথা, চিঠির উত্তর আমি দিই নে, স্বয়ং চিঠি লিখি। আমার চিঠি স্বরাজের স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে চায়,

অন্যের চিঠির উপর নির্ভর করে না। তুমি ত জানই বিদেশের কলে-কাটা সুতোর দ্বারা কাপড় বুনে পরা পরতন্ত্রতা বলে আজকাল আমরা নিজের চরকায় সুতো কাট্‌তে বসেচি। স্বরাজপ্রাপ্তির সেই তত্ত্ব চিঠি লেখায় আমি বহুকাল থেকে ব্যবহার করে আস্‌চি। অন্য লোকে তার চিঠিতে যে প্রশ্নের সূত্র ধরিয়ে দেয় সেই সূত্রগুলিকে উত্তররূপে বুনে চিঠি লেখা আমার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মন অগ্রাহ্য করে।

হাঁ, কলকাতা থেকেই যাত্রা করব। যাত্রার শেষ গম্যস্থান হচ্চে কাঠিয়াবাড়। কোন্ পথ আশ্রয় করব সেইটে নিয়ে একটু দ্বিধা আছে। ভেবেছিলুম লক্ষ্ণৌ হয়ে যাব— সেখানে অতুল সেনকে[১] সেনানী করে মামুদাবাদের রাজার[২] রাজকোষ আক্রমণ করব। গতবারে রাজা বিশ্বভারতীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু সে কথা বিস্মৃত হতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। আমার স্মরণশক্তির সাহায্যে তাঁকে সচেতন করতে চাই। ইতিমধ্যে খবরের কাগজে পড়ে দেখলুম লক্ষ্ণৌ জলমগ্ন। সেখানে সেই বন্যার উপরে নিজের দুঃখের অশ্রুবর্ষণ করাটা সমীচীন হবে না।

আমার মনে হচ্চে আমার এই লক্ষ্ণৌ যাবার প্রস্তাব শুনে তোমার মনে একটা সন্দেহ উঠ্‌তেও পারে। তুমি নিশ্চয় ভাববে, লক্ষ্ণৌ যাবার পথপার্শ্বে একটি বালিকা অহোরাত্র একমনে লজিক অধ্যয়ন করে, তার পড়ার ব্যাঘাত করে যাবার এই একটা ভদ্র রকমের ছুতো আমি বের করেচি। ভানুদাদার পক্ষে এটা নেহাৎ অসঙ্গত নয়; সে ব্যক্তি নিজেও পড়াশুনো করে নি অন্য লোকের পড়াশুনোর প্রতিও তার শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু দেখ্‌চই ত, তোমার গ্রহ ভাল, লক্ষ্ণৌএর পথ সে বরুণ বাণ দিয়ে আট্‌কিয়েচে, লজিকে তুমি ফার্স্ট ডিবিশনেই পাস করবে তোমার ভয় নেই।— দিল্লি অথবা আগ্রার রেলপথ দিয়ে আমাকে যেতে হবে। প্রথমে যাবার কথা সিন্ধু প্রদেশে, করাচীতে, হায়দ্রাবাদে। তার পরে দশহরার উৎসব অতীত হলে যাব কাঠিয়াবাড়ে। তার পরে আমেদাবাদ বোম্বাই

হয়ে, ইন্দোর হয়ে স্বস্থানে ফিরে আসব এই রকম সঙ্কল্প। কিন্তু এখনো খুব পাকা রকম ঠিক হয় নি। জনশ্রুতি এই যে কাঠিয়াবাড়ের স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েচে— এ অবস্থায় সেখানে ভিক্ষুসমাগম কোনো পক্ষেই প্রার্থনীয় না হতে পারে। সেখান থেকে যাঁরা আমাকে আহ্বান করেছিলেন তাঁদের পত্রের প্রতীক্ষা করচি, যদি ভরসা দেন ত যাব। "ঐ ত সম্মুখে পথ চলেছে সরল, চলে যাব ভিক্ষাপাত্র হাতে।" কিন্তু আমার ভাগ্যে পথ সরল নয়, শূন্য ভিক্ষাপাত্রের বোঝা অত্যন্ত দুর্ভর, আর "ভিখারিণী সখী মোর"— সে দুঃখের কথা আর বলে কাজ নেই। পথে পথে দ্বারে দ্বারে আর ঘুরে বেড়াতে পারি নে— যেমন দুঃখ, তেম্‌নি ক্লান্তি, তেম্‌নি গ্লানি। আমি যত বলি, "কাজ কি ঠাকুর, আমি যাহা আছি সেই ভাল," আমার গ্রহ বলে "মুক্তি নাই, মুক্তি নাই কিছুতেই, চাঁদা তোরে আনিতেই হবে!" ইতি ১৩ আশ্বিন ১৩৩০

ভানুদাদা

১২২

[১০ অক্টোবর ১৯২৩]

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু রাণু

আজ সন্ধেবেলায় ঘন মেঘ করে খুব এক চোট বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশে মেঘ কালো হয়ে জমে আছে। প্রশান্ত আর রাণী[১] কোথায় চলে গেছে— বাড়িতে কেউ কোথাও নেই— আমি টেবিলের উপর ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। সমস্ত দিন নানা কাজে নানা লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতে, নানা

লেখায় কেটে গিয়েচে— এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করতে পাই নি— লেখার মাঝে মাঝে খুব ঘুম পেয়েছিল, কিন্তু কষে ঝাঁকানি দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে কাজ করে গেছি। নিজেকে এ রকম করে খুঁচিয়ে কাজ করানো একেবারেই ভাল নয় জানি— তাতে কাজও যে ভালো হয় তা নয় আর বিশ্রামও মাটি হয়ে যায়। কিন্তু আমার কুষ্টির কর্ম্মস্থানে শনি আছে সে আমাকে দয়ামায়া একটুও করে না— কষে খাটিয়ে নেয়, মজুরিও যথেষ্ট দেয় না। কাল দিনের বেলায় আবার নানা রকম কাজের পালা আরম্ভ হবে— তাই এখন চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। এখন সন্ধে সাড়ে আটটা— তোমার ওখানে হয় ত তুমি এখন পড়ার বই নিয়ে বসে গেছ। আজকাল আমাকে যে রকম দায়ে পড়ে খাট্‌তে হয় যদি তোমাদের বয়সে সেই রকম পরীক্ষার পড়ায় খাট্‌তুম তা হলে এতদিনে হয় ত আই, এ, পরীক্ষা পাসের তকমা পরে কন্যাকর্ত্তাদের মহলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারতুম— তাহলে পণের টাকায় বিশ্বভারতীর থলি ভর্ত্তি করে দিনে দুপুরে নাকে তেল দিয়ে নিদ্রা দিতে একটুও লজ্জা বোধ হত না। আমার কলকাতার কাজ শেষ হয়ে এল পর্শু কিম্বা শনিবারে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাব। সেখানে এতদিনে শরৎকালের রোদ্দুরে আকাশে সোনার রং ধরেছে আর শিউলি ফুলের গন্ধে বাতাস ভোর হয়ে আছে। আজ বুধবার, আজ থেকে ছেলেরা সব হো হো করতে করতে বাড়িমুখো দৌড়েচে— কাল পর্শুর মধ্যে আশ্রম প্রায় শূন্য হয়ে যাবে।[২] এদিকে শুক্লপক্ষ এসে পড়ল। দিনে দিনে সন্ধ্যার পেয়ালাটি চাঁদের আলোয় ভর্ত্তি হয়ে উঠ্‌তে থাকবে। আমি বারান্দায় আরামকেদারার উপর পা তুলে দিয়ে একলা চুপ করে বসব— চাঁদ আমার মনের ভাবনাগুলির পরে আপন রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে তাদের স্বপ্নময় করে তুল্‌বে— ছাতিমতলায় ঝরে পড়া মালতী ফুলের গন্ধ জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশে যাবে। সেই সুগন্ধি শুক্লরাত আমার মনের এ কোণে ও কোণে উঁকি দিয়ে কোনো নতুন গানের সুর খুঁজে বেড়াবে— বেহাগ কিম্বা সিন্ধু কিম্বা

কানাড়া।— যাক্ সে সব কথা পরে হবে— আপাতত চিঠি বন্ধ করে এখানকার বারান্দায় মেঘাবৃত রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করতে যাই— যদি ক্লান্তির জন্যে চোখ বুজে আসে তাহলে তাকে তাড়া দিয়ে দেশছাড়া করব না। [২৩ আশ্বিন ১৩৩০]

ভানুদাদা

১২৩

[?১৩ অক্টোবর ১৯২৩]

ওঁ

[কলকাতা]

রাণু

তোমার বাবজার সেবা আর তাঁর কাজ নিয়ে তোমাকে খুব ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়— এখন তোমার কাছ থেকে নিয়মমত চিঠির জবাব আমি প্রত্যাশা করি নে অতএব কষ্ট করে লেখবার চেষ্টা কোরো না। আজ চিঠি না পেয়ে রোগীর সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা বোধ করছিলুম, কিন্তু উৎকণ্ঠা নিরর্থক— কিছু ত করবার পথ নেই। এখানে আমার হাতেও রোগীর চিকিৎসা ভার পড়েচে। বিশ্বভারতীর একজন কর্ম্মচারী খুব কঠিন pleurisy রোগে সঙ্কট অবস্থায় পড়েচে— আমার ওষুধে তার উপকার হয়েচে বলে আমাকে সে ছাড়তে চায় না। অথচ জানি তাকে বাঁচানো প্রায় অসাধ্য। তাকে বিধান রায়[১] প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তার দেখচে— তারা হাসে— বলে রবিবাবুর এই আধ্যাত্মিক চিকিৎসা রোগীর ইহকালের পক্ষে বিশেষ কাজে লাগবে না।

কাল সন্ধের সময় সেই নন্দিনী নাটকটার একটা পাঠ দিয়েছিলুম।[২]

অনেক বদল হয়ে গেচে। জান বোধ হয় এখন তার নাম হয়েচে রক্তকরবী। সবাই শুনে বল্‌লে, রাণু না হলে নন্দিনীর ভূমিকা আর কেউ করতে পারবেনা। তোমার উপরে সকলেরই পক্ষপাত। আমার কথাটা ত জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেছে, গোপন করবার চেষ্টা করা মিথ্যে। গগন স্পষ্টই কবুল করলেন, তোমাকে তাঁরও মনে লেগেচে, সে কথা তিনি ভুল্‌তে পারেন না। শুনে মনে পড়ল, যখন তুমি জোড়াসাঁকোয় থেকে বিসর্জ্জনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলে সেই সব দিনের কথা,— আমি তখন নন্দিনী নাটকটার সংস্কারকার্য্যে নিযুক্ত। তুমি তাতে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যে নানা প্রকার চেষ্টা করেচ— আমি তাতে প্রকাশ্য আপত্তি করেচি কিন্তু গোপনে কিছুই যে খুসি হই নি তা মনে কোরো না। কর্ত্তব্যের টান বলে একটা জিনিষ আছে কিন্তু কর্ত্তব্যের বাধার যে কোনো টান নেই এমন কথা জোরের সঙ্গে বল্‌তে গেলে অন্তর্য্যামী তার প্রতিবাদ করবেন। স্মৃতির চিত্রপটে সেই বাধার ছবিগুলি খুব স্পষ্ট হয়ে জাগ্‌চে। বিসর্জ্জনের সেই রিহার্সাল্‌-পর্ব্বের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে আমার এই তেতলার ঘর ভরা আছে। ইতি [?২৬ আশ্বিন ১৩৩০]

তোমার ভানুদাদা

১২৪

২১ কার্ত্তিক ১৩৩০

ওঁ

[ধার্স্ধা]

রাণু

তোমাকে য়ুরোপের ভূবৃত্তান্তে হার মানাতে পারিনি, চেকোস্লোভাকিয়ার বিবরণ পর্য্যন্ত তোমার জানা আছে কিন্তু ধাঙ্গধ্রা' কোথায় আমাকে বল

দেখি। আধুনিক গানের মধ্যে যাকে "আমার দেশ" বলে সুর তান লয়ে গৌরব করে থাকি এ জায়গাটি তারই মধ্যে, কিন্তু রামকেলী কিম্বা ভৈরবী সুরে যদি এই শব্দটাকে বসাবার ভার আধুনিক কবির উপর পড়ে তাহলে নিশ্চয় তার কলম ভোঁতা হবে, তার তানপুরার তার ছিঁড়ে যাবে। এক হতে পারে পাখোয়াজের বোলের মধ্যে "তেরে কেটে মেরে কেটে ধ্রাঙ্গধ্রা।" যা হোক্ এই রকম সব দুর্ণামধারী জায়গায় কবিকে ঘুরে বেড়াতে হচ্চে। হয়রান হয়ে গেচি— যাকে তোমাদের হিন্দীতে বলে, থক্ গয়া। ধ্রাঙ্গধ্রা থেকে আজ রাত্তিরে যাব "মোরবি"[২] শব্দটা তেমন শ্রুতিকটু নয় বটে কিন্তু ওর অর্থটা একটুও ভাল নয়। "মোরবি" যারা নাম রেখেছিল তারা না হয় "বাঁচবি" নাম রাখত তাতে দোষ কি ছিল? তবে যদি বল নামকরণকারী ধ্যানযোগে আমার আজকালকার অবস্থা চিন্তা করেছিল, তাহলে বল্‌তেই হবে লোকটার অসাধারণ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল। যে-জংসন দিয়ে মোরবিতে যেতে হয় তার নাম বাধা-বান (Wadhawan)।[৩] পথিকদের এরকম করে আগে থাকতে ভয় দেখাবার কি দরকার ছিল? নামের মধ্যেও ত একটা ভদ্রতা থাকা উচিত— নামটা "বাধাহীন" হয়ে কাজে না হয় বাধাবান হ'ত? মনে কর আমার উপর যদি তোমার প্রীতি কিছুই না থাকে তাহলে কি নাম সই করবার বেলায় লিখ্‌বে অপ্রীতি? কিম্বা আমি ম্লান হয়ে পড়েচি বলেই কি ভানু না বলে' নিজেকে ভাণু বলব?

আমার এই চিঠি জবাব-নিরপেক্ষ চিঠি। আমি এখন অঠিক-ঠিকানী। পোষ্ট আফিসের হাত এড়িয়ে এড়িয়ে চলেচি, চিঠি সম্বন্ধে এখন আমি অপ্রতিগ্রহী; চিঠি দিতে পারব কিন্তু নিতে পারব না। এতএব তোমাকে এ চিঠি দান করেও অঋণী করে দিলুম। এখন তোমার চিঠি লেখার দায় অনেক বেড়ে গেচে— অতএব তোমার চিঠির ধারাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা সঙ্গত হবে না।

যে ঘরে বসে চিঠি লিখ্‌চি সে ঘরের ছবি মনে আন্‌তে পারবেনা। রাজার অতিথিশালা, মস্ত ইমারত, কার্পেটমণ্ডিত পর্দ্দাবগুণ্ঠিত উন্নত ভিত্তিমান ঘর, গোলাপচিত্রিত ছিটের কাপড়ে ঢাকা মোটা মোটা আসবাবগুলো আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করচে। তারা নীরবে পরস্পরের প্রতি চোখ টিপা-টিপি করে বল্‌চে এই মানুষটার চেয়ে ঢের বড়বড় লোককে আমরা অভ্যর্থনা করেছি, যথা, স্বয়ং পুলিসের ইনস্পেক্টর সাহেব, বোম্বাই সহরের ইংরেজ জুয়েলার দোকানের মেজো আসিস্টান্ট সাহেব, ঘোড়-দৌড়ের জকি সাহেব, গ্র্যাণ্ড হোটেলের খানা-তদারককারী বাট্‌লার সাহেব, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ঘরের একপ্রান্তে রজত-লেখ্যাধার শোভিত সুপ্রশস্ত সুচিক্কণ লেখবার টেবিলে বসে সঙ্কুচিত মনে লিখে যাচ্চি। মরিস্[*] আমার সঙ্গীরূপে এখানে এসেচে কিন্তু তার কুলমান সম্ভ্রম গড়ের-বাদ্যকার ফিরিঙ্গিকুলপুঙ্গবদের ঠিক সমান না হওয়াতে তাকে দূরে অন্য বাড়িতে বাসা দেওয়া হয়েচে। এই বহু কক্ষবিচিত্র প্রাসাদ সৌধে আমি একা; সঙ্গীর মধ্যে বনমালী[*] নামধারী আমার উৎকলবাসী সেবক। সুতরাং আমার হাতে "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ" তা ছাড়া বিপুলা চ বাসা। কালযাপনের সাহায্যকল্পে মাঝে মাঝে এরা আমাকে উপলবন্ধুর দুর্গমপথে এখানকার মরুপ্রান্তরের মাঝখানে ঘুরিয়ে আনচে। গতকল্য মধ্যদিনের অসহ্য উত্তাপে আটঘণ্টাকাল বিচলিত দেহে অবিচলিত ধৈর্য্যে এই রকম রথযাত্রা করে এসেচি— সে রকম উৎকটমন্থনে আলোড়নেও যখন প্রাণ পদার্থটা দেহ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আসেনি তখন বোধ হচ্চে আমার আয়ুটি নেহাৎ সদ্যঃপাতী নয়। কিন্তু বিশ্রামের জন্যে চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেচে। ইতি ৭ নবেম্বর ১৯২৩

ভানুদাদা

১২৫

২৭ কার্ত্তিক ১৩৩০

ওঁ

[রাজকোট][1]

রাণু

তোমাকে একটা সুখবর দেবার জন্যে এই চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। এল্‌ম্‌হর্স্ট এসে পৌঁচেচে। সে বম্বাই থেকেই কোনো এক জায়গায় দৌড় দেবার চেষ্টায় ছিল আমি তাকে ডাকিয়ে এনেচি। সে এখন আমার সঙ্গে ঘুরচে। কাল তাকে কথায় কথায় বল্‌ছিলুম রাণু বিসর্জ্জনে খুব ভাল অভিনয় করেছিল। পৃথিবীসুদ্ধ লোক তাই নিয়ে আলোচনা করচে। শুনে এল্‌ম্‌হর্স্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, ভাগ্যি আমি ছিলুম না। থাকলে তার ভাগ্য নিয়ে কি মুস্কিল হত আমি ত কিছু বুঝতে পারলুম না। উমা যখন তপস্যা করেছিলেন তখন তিনি অপর্ণা হয়েছিলেন, তখন শিবের তিন নেত্রই তাঁর উপর পড়েছিল— কিন্তু তুমি যখন অভিনয় সাধনা করে অপর্ণা হল্লে তখন হাজার নেত্র তোমার উপর পড়ল, শিব অশিব কেউ বাদ যাচ্চেনা। তোমার সাধকদের মধ্যে ইদানীং কার কি দশা ঘটেচে তার হাল খবর কিছুকাল পাইনি, আরো কিছুকাল পাব না। কিন্তু আন্দাজ করতে পারচি।[2] পুরাণে লিখচে গৌরী ভানুর দিকে তাকিয়ে তপস্যার উগ্রতা বাড়িয়ে তুলে অবশেষে সকলপ্রকার ভোগসামগ্রীর সঙ্গে গাছের পত্র পর্য্যন্ত যখন ত্যাগ করলেন তখন তিনি বরলাভ করতে পেরেছিলেন— তোমার তপস্যায় আমি ত দেখচি পত্রসংখ্যা বাড়চে বই কমচেনা— তাতে তোমার বরলাভের কোনো বাধা ঘটবেনা, এও স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্চে। অপর্ণার এই তপঃকাহিনী লেখবার জন্যে পুরাকালে এক কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন— বর্ত্তমান কালেও এক কবিকে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্চে, কিন্তু এখনো তিনি অবাক্ হয়ে আছেন; হয়ত কোনদিন ছন্দে বন্ধে তাঁরও বাক্‌স্ফূর্ত্তি হতে

পারে। আপাতত তাঁর দুটি একটি কথা সামান্য পত্রপূট পূর্ণ করে ডাক-বাহন যোগে চলাচল করচে— কিন্তু যেখানে শ্রাবণের ধারায় পত্র বর্ষণ হচ্চে সেখানে এ পত্র লক্ষ্যগোচর না হতে পারে। ইতি ১৩ নবেম্বর ১৯২৩

ভানুদাদা

১২৬

[?২৮ নভেম্বর ১৯২৩][১]

ওঁ

LAL BUNGLOW
JAMNAGAR,
KATHIAWAR

রাণু

এখনো ঘুরচি। "রাজদ্বারে,"— যে রকম ক্লান্তি তাতে "শ্মশানে চ" দূর বোধ হয় না। এখানে আর দুই একটা জায়গা আছে তার পরে সিন্ধু, তার পরে বোম্বাই, তার পরে শান্তিনিকেতনে। ৭ই পৌষের কিছু আগেই হয়ত পৌঁছব। তার কিছুদিন পরেই চীন যাত্রার উদ্যোগ করতে হবে। সেখানে ডাকাতের দল আমাকে যদি কিছুদিন ধরে রেখে দেয় তাহলে সেই কটা দিন বিশ্রাম করবার সুযোগ হবে। আমার মুক্তির মূল্য তারা কত টাকা চাইবে বল্‌তে পারি নে— হয় ত লাখ দুই তিনের বেশি হবে না; সে টাকা আমার দেশের লোক সংগ্রহ করে দেয় কিনা আমার দেখবার সুবিধে হবে। না যদি দেয় ত মাথার পিছনে ঝুঁটি গজিয়ে একটা চীনে মেয়ে বিয়ে করে চৈনিক হয়ে আনন্দে কাটিয়ে দেব। এইরকম ঠিক করে রেখে দিয়েচি।

আমার ত বিশেষ খবর নেই— আমি মুসাফের মানুষ, চল্‌তে চল্‌তে সব খবর মুছে দিয়ে দিয়ে যাচ্চি। তুমি স্থির হয়ে আছ, তোমার চারদিকে প্রতিদিন নতুন খবর জমে উঠ্‌চে। তার কিছু কিছু বার্ত্তা হয়ত ফিরে গিয়ে পাব। পাব ত? তাও বলা যায় না। কিন্তু তোমার আধুনিক খবরের মধ্যে তীব্রতা যতই থাক খুব যে বৈচিত্র্য আছে তা বোধ হচ্চে না। বুঝতে পারচি ব্যাপারটা কি রকম চল্‌চে।

এবার ক্রিস্টমাসের ছুটিতে তোমরা আশ্রমে আসচ ত? আরো অনেক অতিথি হয়ত আসবে। [১২ অগ্রহায়ণ ১৩৩০]

ভানুদাদা

১২৭

[২৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩০]

ওঁ

[বোম্বাই]

রাণু

তুমি লিখেচ তোমার সব কথার জবাব দিতে। অতএব তোমার চিঠি সামনে রেখে জবাব দিতে বসেচি— এবারে বোধহয় পুরো মার্ক্‌ পাব। তোমার প্রথম প্রশ্ন আমি এখন কোথায় আছি। ছিলুম নানা জায়গায়, প্রধানত কাঠিয়াবাড়ে, তার পরে আমেদাবাদে, তার পরে বরোদায়। আজ সকালে এসেচি বম্বাইয়ে।[১] এতকাল ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বলে সমস্ত চিঠি এখানে জমা হচ্ছিল, তার মধ্যে তোমার দুখানা চিঠি— লেফাফার সর্ব্বাঙ্গে নানা প্রদেশের নানা ডাকঘরের কালো কালো চাকা চাকা ছাপ। এখানে বেশি দিন থাকা হবে বলে বোধ হচ্চে না, কারণ ৭ই পৌষ নিকটবর্ত্তী। অতএব

দু চার দিনের মধ্যে সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং বঙ্গভূমিকে প্রণাম করতে যাত্রা করব। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েচি। যাই হোক্ ক্রিস্টমাসের পূর্ব্বেই ফিরব। তোমার বাবজাকে লিখে দিয়েচি তোমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসতে। এই পর্য্যন্ত তোমার উত্তর দিয়ে তোমার চিঠি খুঁজে দেখলুম আর কোনো প্রশ্ন নেই। এল্‌ম্‌হর্স্ট আমার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে বরোদায় এসে জ্বরে পড়েছিল। সেখানে তিন দিন বিছানায় পড়ে ছিল। এখানে এসে সেরে উঠেচে। আর আমার সঙ্গে আছে গোরা[২]। এবারে সাধুচরণের সঙ্গ ও সেবা থেকে বঞ্চিত আছি।[৩] বনমালী নামধারী উৎকলবাসী সেবক বৌমার আদেশক্রমে এসেচে। সে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে— সব চেয়ে ভয় আমাকে, অথচ আমি বিশেষ ভয়ঙ্কর নই। দ্বিতীয় ভয় পাছে রাজবাড়ির অন্নপানে বিদেশে গঙ্গাতীর হতে দূরবর্ত্তী দেশে তার অকালমৃত্যু ঘটে। তৃতীয় ভয় রেলগাড়িতে বিদেশীর জনতাকে। তারা ওর সঙ্গে হিন্দী বলে, ও বলে বাংলা,— তাতে কথোপকথন উভয়পক্ষেই দুর্ব্বোধ হয়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস এজন্যে বিদেশীরাই দায়িক। ওর আর একটা বিশেষ গুণ এই যে, ওকে যদি কোনো কাপড় বের করে দিতে বলি, তাহলে সিন্ধুক থেকে একে একে সব কাপড় বের করে তবে সেটা নির্ব্বাচন করতে পারে। আবার সবগুলো তাকে একে একে ফিরে গোছাতে হয়। মানুষের আয়ু যখন অল্প, সময় যখন সীমাবদ্ধ তখন এরকম চাকর নিয়ে মর্ত্ত্যলোকে অসুবিধায় পড়তে হয়। ওর একটা মস্ত গুণ এই যে, ও ঠাট্টা করলে বুঝতে পারে, ঠিক সময়ে হাস্‌তে জানে, আমার late lamented সাধুচরণের সে বালাই ছিল না। আমার আবার স্বভাব এমন যে, ঠাট্টা না করে বাঁচিনে। তাই, ও যতক্ষণ কাপড় বের করচে আর গোচাচ্ছে আমি ততক্ষণ সেই সুদীর্ঘ সময় ঠাট্টা করে অতিবাহন করি। যাই হোক্ ওকে বিদেশী হাওয়া বিদেশী খাওয়া, বিদেশী ভিড় থেকে ফিরে নিয়ে গিয়ে কোনোমতে বৌমার হাতে আস্তটি ফিরে দিতে পারলে নিরুদ্বিগ্ন হই। আমার যে কত বড়

দায়িত্ব, সে ওকে না দেখ্‌লে ভাল করে অনুধাবন করতেই পারবে না। একে আমার বিশ্বভারতী তার উপরে বনমালী, ভাবনার আর অন্ত নেই।

আমি বোধ হয় আর দুই তিনদিনের মধ্যেই রওনা হব। অতএব যদি চিঠি লেখ ত শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় লিখো। ইতি বোধ হচ্চে ১০ই ডিসেম্বর [১৯২৩]।

ভানুদাদা

১২৮

[জানুয়ারি ১৯২৪]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

আজ সকালে তোমার পথের চিঠি পেয়েছিলুম, আবার আজ বিকেলেই তোমার ঘরের চিঠি পাওয়া গেল।[১] তোমাকে তার আগেই একটা লম্বা চিঠি লিখে ডাকে রওনা করে দিয়েচি।[২] প্রথমে ভেবেছিলুম ঐ একটা চিঠিতেই তোমার দুটো চিঠির জবাব সারা গেল। তার পরে ভাবলুম এই কয়দিন তুমি আমার চিঠির প্রত্যাশা করে ছিলে অথচ পাও নি— তার শোধ করবার উপলক্ষ্যে আর একটা চিঠি লিখে কাল পাঠালে তুমি খুসি হবে। কিন্তু আমার পত্রকে দৈনিক পত্রে পরিণত করতে পারব এমন আশা করে বোসো না। আমি ইতিপূর্ব্বে কখনো কখনো মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করেচি— আমার লেখনী, পত্র সম্বন্ধে সেই রকম বিলম্বিত ছন্দই পছন্দ করে থাকে। অর্থাৎ আমি ভয়ঙ্কর কুঁড়ে; কিন্তু ইচ্ছাশক্তি চালনার জোরে কুঁড়েমি কাটিয়ে উঠ্‌তে পারতুম, কারণ এই জড়তা দীর্ঘসূত্রিতা আমারই

নিজের আত্মগত রিপু, এ'কে আমারই আত্মগত শক্তির দ্বারা হয়ত পরাস্ত করা অসম্ভব হত না— কিন্তু আমার গ্রহ বাইরে থেকে আমার স্কন্ধে যে কাজ চাপিয়েচেন তাকে টলাব কি উপায়ে? তুমি যাওয়ার পর দেশী বিদেশী কত রকম চিঠি লিখেচি তার সীমাসংখ্যা নেই— তার পরে মনের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তার বোঝা চেপে রয়েচে, সে হচ্চে চীনের বক্তৃতা। এখনো তার একছত্রও লেখা হয় নি— রোজ সন্ধের সময়ে মনকে বুঝিয়ে বলি, ঠাণ্ডা হও, উতলা হোয়ো না, কাল সকালেই লেখা সুরু করে দেব— কিন্তু আমার মন আমাকে তিন কুড়ি বছর ধরে দেখে এসেচে; সে আমাকে খুব ভাল রকম করেই চেনে; সেই জন্যে আমার আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা পায় না— জানে যে আমি নানা অছিলা করে দিন পিছিয়ে দেব। ঠিক তাই ঘটে। রাত্রি অবসান হয়, প্রভাতের আলো দেখা দেয়— ভালোমানুষের মত ডেস্কে গিয়ে বসি কিন্তু চীনের লেকচারের পরিবর্ত্তে গান লিখ্‌তে বসে যাই। এমনি করে চারদিনে চারটে গান লিখেচি।[৫]

এই চিঠি আমি বারান্দার সেই কোণের কেদারায় বসে লিখ্‌চি। যখন লিখ্‌তে সুরু করেছিলুম তখন সূর্য্য অস্ত যাব যাব করচে— ক্রমে ক্রমে লোকসমাগম হতে লাগ্‌ল— সূর্য্য অস্ত গেল, অন্ধকার হয়ে এল, চাঁদের আলোর মত দেখ্‌তে সেই ল্যাম্প জ্বেলে নিয়ে এসে জানলার কাছে রাখ্‌লে। লোকসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল। অবশেষে বনমালী এসে খবর দিলে খাবার এসেচে। খাওয়া শেষ করে সেই প্রদীপের আলোতে সেই কোণের কেদারায় বসে লিখচি— অল্প অল্প ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্চে, তাই পায়ের উপর একটা বালাপোষ দিয়ে গরম হবার চেষ্টায় আছি। আজই চিঠি শেষ করতে চাই কারণ কাল চীনের লেকচার সুরু করব বলে ঠিক করে আছি। আমাদের পাড়া এখন খালি হয়ে গেচে। তোমার সেই সিংহলবাসী ভক্তটি চলে গেচে— আমার প্রতিবেশী বুবুরাও[৬] পলাতক, নলিনীরাও[৭] চলে গেচে। পর্শু শুনেচি রথী বৌমাও কয়েকদিনের জন্যে

কলকাতায় যাবে। মীরাকে সঙ্গে নিয়ে সৌম্য[৬] এসেছিল সেও বোধ হয় আজ চলে গেচে। এল্‌মহর্স্ট গেচে কলকাতায়, মিস্ গ্রীনও[৭] সেইখানে। মেয়েরা পদব্রজে ভ্রমণে বেরিয়েছিল সন্তোষ ছিল তাদের দলপতি। সাতদিন খুব পেট ভরে বেড়িয়ে আজ বিকেলে "আমাদের শান্তিনিকেতন" গাইতে গাইতে ফিরে এল।[৮]— আজ তবে এইখানে শেষ করি। রাত হয়েচে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসচে— পাড়ায় আর কারো বিশেষ সাড়া পাওয়া যাচ্চে না— মাঝে মাঝে কুকুর ডেকে উঠ্‌চে। তুমিও যাও শুতে, বই বন্ধ করে ফেল, এত রাত্রে লজিক মুখস্থ করতে হবেনা।

ভানুদাদা

আগামী বছরে আই এ পরীক্ষার জয়মাল্য পরে[৯] বিশ্বভারতীতে প্রবেশ করতে চাও। যদি তদুত্তরতর পদবীর প্রলোভন পরিহার করে এখানে আস্‌তে পার আমি খুসি হব। আজকাল আমি গঁদ দিয়ে লেফাফা জুড়ি, অতএব চিঠিতে উচ্ছিষ্টতা দোষ ঘটে না।

১২৯

[জানুয়ারি ১৯২৪]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

তোমার দুখানা চিঠি যে দিন পেয়েচি সেইদিনই তোমাকে দুখানা[১] উত্তর দিয়েচি। আমি জানি চিঠি না পেলে তুমি কষ্ট পাবে, তাই দেরি করি নি। কাশী থেকে এখানে চিঠি যাতায়াতে নিতান্ত কম সময়

লাগে না। আমার বোধ হয় নাগোয়া কাশি সহর থেকে দূরে বলে সেখানে ডাক পৌঁছতে কিছু বিলম্ব হয়। তোমার চিঠি আমার হাতে আস্‌তেও যথেষ্ট দেরি হয়েছিল। আজ বুধবারে তোমার যে চিঠি পেয়েচি সেটা তুমি রবিবারে লিখেছিলে। কিন্তু এক একবার এর চেয়েও দেরি হয়। যাই হোক্ এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই আমার দুখানা চিঠি পেয়েছ। হয় ত কাল ডাকেই সে খবর পাব। তুমি নিশ্চয় জেনো, রাণু, যে, তুমি একটুও দুঃখ পাও এ আমি ইচ্ছে করিনে— আমি একান্ত মনে ইচ্ছে করি তুমি সুখী হও, আমার সেই আন্তরিক ইচ্ছে তোমাকে সুখী করুক।

এখানে সেদিন জগদানন্দের বাড়িতে একটা ছোটো খাটো ডাকাতী হয়ে গেচে। ১২।১৩ জন লাঠি ছুরি নিয়ে তার বাড়ি লুঠ করেচে। যখন তারা বাক্স তোরঙ্গ ঘাঁটচে জগদানন্দ তখন তাদের অসাধু ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক মৌখিক উপদেশ দিয়েচেন— তারা তাঁর উপদেশও শুনেচে জিনিষপত্রও সরিয়েচে— এখন পুলিস তাদের অসাধু ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করচে কিন্তু তাদের দর্শন পাওয়া যাচ্চে না। আমার ঘরে যদি ডাকাত আসে তবে আমার সব লেখা কাগজগুলোকে পাছে নোট্ মনে করে নিয়ে যায় আর তার পরে নেহাৎ তুচ্ছ বলে ফেলে দেয় এই আমার আশঙ্কা। সংস্কৃত শ্লোকে একটি ভীল মেয়ের বর্ণনা আছে— সে বনের মধ্যে একটা রক্তমাখা গজমুক্তা দেখে প্রথমে বদরীফল মনে করে আগ্রহে কুড়িয়ে নিয়েছিল, তার পরে হাতে নিয়ে মুক্তা দেখে অবজ্ঞা করে ফেলে দিয়েছিল— আমার সেই দশা হতে পারে।[২]

আজকাল সন্ধের সময়ে আমার ঘরে সব গানশিক্ষার্থীর দল এসে জমে— তারা রাত্রি আটটা ন'টা পর্য্যন্ত আমার কাছ থেকে নতুন গান শেখে।[৩] অনেকগুলো নতুন গান তৈরিও হয়েচে।[৪] তাই আজকাল সন্ধের পরে আমার পশ্চিম বারান্দার সেই কোণের কেদারায় বেশিক্ষণ বস্‌তে

পাইনে। বিকেলে চা খাওয়ার পর খানিকক্ষণ বসে সূর্য্যাস্ত দেখতে পাই। এখন আমার সেই কোণের ঘরে সেই শ্লেটের টেবিলের উপরে বসে লিখ্‌চি। সকাল বেলায়, আকাশে অল্প অল্প মেঘ হয়েচে, শীত খুব তীব্র হয়েচে। মাঝে একদিন সমস্তদিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি হয়েছিল তাই বোধ হয় বাতাসটা ঠাণ্ডা হয়েচে। তোমাদের ওখানে এবার কনভোকেশনে অনেক রাজসমাগম হবে। আমার নিমন্ত্রণ ছিল কিন্তু কাজ আছে বলে যাওয়া সম্ভবপর হবেনা।[২] আমাকে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহের দিকে ঢাকা অঞ্চলে যেতে হবে।

আমাদের এখানে ইংরেজি পড়াবার যে পার্সি অধ্যাপক[৩] এসেচেন তাঁর স্ত্রী বিষ্ণু দিগম্বরের[৪] ইস্কুলে সাত বছর গান শিক্ষা করেচেন। সেদিন তাঁকে গাওয়ালুম কিন্তু সাতবছর শিক্ষার উপযুক্ত আওয়াজ বের হল না। আশার একজন মান্দ্রাজি মেয়ে বন্ধু এখানে চিত্রকলা শিখ্‌তে এসেছিলেন—কিন্তু প্রথম দিন থেকেই অশ্রুপাত হতে আরম্ভ হল, তৃতীয় দিনেই তিনি অন্তর্ধান করলেন। আসচে বছরে তুমি যখন এখানে পড়তে আস্‌বে তখন তুমি ত তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে না? আমি বৌমাকে বলে রেখেচি—তিনি তোমাকে তাঁর আপনার কাছে রেখে দেবেন— এখন আমি যে বাড়িতে থাকি, চাই কি, এইখানেই তুমি থাক্‌তে পারবে, আর আমার পশ্চিম বারান্দার কোণে সেই কেদারায় বসে রবির অস্তগমন দেখতে পাবে। আমার বই কাগজপত্র ও আসবাবে যাতে উই অথবা চোর না লাগে সেটা তোমাকে দেখ্‌তে হবে।

ভানুদাদা

১৩০

৯।১০ জানুয়ারি ১৯২৪

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

এবারে ছোট্ট চিঠি লিখ্‌ব। কেননা শীঘ্রই চিঠির খনিসুদ্ধ তোমার ওখানে গিয়ে পৌঁছবে। শুধু বিশল্যকরণী নয় স্বয়ং গন্ধমাদন গিয়ে উপস্থিত হবে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে বিদ্যুদ্বাহিনী বার্ত্তা তোমার কানে গিয়ে পৌঁচেছে যে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় ভানুকে তার পূর্ব্ব দিক্‌প্রান্ত হতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাচ্চে।[১] তুমি বোধ হয় পুরাণে পড়েচ ভানুর রথ হচ্চে একচক্র রথ। এই একচক্র রথেই তার দিন চলে। মর্ত্ত্যে এসেও ভানু আবিষ্কার করেচেন যে স্বর্ণময় একচক্র রথ না হলে তাঁর দিন চলে না। মাঝে মাঝে মর্ত্ত্যলোকের এই একচক্র ভেঙে গিয়ে তাঁর গতিবিধি অচল হয়ে ওঠে— তখন তিনি মনের দুঃখে স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করেন। বর্ত্তমানে এই একচক্রের অভাবজনিত দুঃখে ভানুকে পীড়া দিচ্চে, তাঁর সকল কাজই খুঁড়িয়ে চল্‌চে, তাঁর রিক্ত কর দেখে দেবতারা লজ্জা বোধ করচেন— কারণ এতে তাঁর নাম রক্ষা হচ্চে না। সম্প্রতি কাশীর দিকে স্বর্ণচক্রের একটা আওয়াজ শোনা যাচ্চে, তাই লৌহচক্রযানে ভানু তদভিমুখে যেতে উৎসুক। এর থেকে মনে কোরো না ভানুর মনে আর কোনো চক্রান্ত নেই। কিন্তু মনের কথা অনুমানে বুঝে নিতে হবে। সোনার চাকার কথা ঘর্ঘর ধ্বনি করতে সঙ্কোচ বোধ করে না— কিন্তু চক্রবাকের বাণী অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জন নদীপার থেকে কদাচিৎ শুনতে পাওয়া যায়। ইতি বোধ হয় ২৩শে কিম্বা ২৪শে পৌষ ১৩৩০

ভানুদাদা

১৩১

১৬ মাঘ ১৩৩০

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু,

বুধবারে তোমাদের ওখান থেকে চলে এসেচি[১] আর আজ বুধবার। এই সাতদিন পরে তোমার চিঠি পেয়েচি— মনে করেছিলুম রাণু বৈরাগ্য-সাধন করচে, কঠিন তপস্যা। একবার ভেবেছিলুম তোমার তপস্যাভঙ্গ করব। তারপরে ভাবলুম, না, যে মানুষ মুক্তি চাচ্চে তাকে বাঁধনের দিকে একটুও টানব না। এমন সময় আজ এই বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেয়ে বুঝতে পারলুম তোমার চিঠিখানা পথহারা হয়ে আমার সন্ধানে আলিপুর ঘুরে শান্তিনিকেতন পৌঁছল। তুমি ভেবেছিলে আমি কলকাতায়। খুব বেশি ভুল করনি। তাহলে ব্যাপারটা খুলে বলি।

কাশি থেকে প্রথম আসা গেল মোগল সরাইয়ে। বৌমা স্টেশনে যেখানে যত রং-করা পুতুল দেখ্‌লেন পুপের[২] জন্যে কিন্‌তে বল্‌লেন। সঙ্গে কেবলমাত্র ৮২৫ টাকা ছিল। আমি ভাবলুম, পথে আমাদের জলযোগের মত টাকাও বাকি থাক্‌বেনা। পুতুলের দোকান সব যখন খালি হয়ে গেল তখন বৌমার চোখ পড়ল পেয়ারার ঝাঁকার পরে। বল্লেন কাশির পেয়ারা যদি শান্তিনিকেতনে না নিয়ে যাই তাহলে কাশিতে আসাই নিষ্ফল হল। এক ঝাঁকা শেষ হল। আরেক ঝাঁকাও শেষ হল। ইতিমধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিলে বলে তৃতীয় ঝাঁকাটা বাকি রয়ে গেল। দ্বিতীয় শ্রেণীর তিন্‌টে সিটের মধ্যে একটা সীট্ পেয়ারায় ভরে গেল। দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে আশা করে একটু কাঁচা গোছের পেয়ারা কেনা হয়েছিল, অথচ তাতে পাকা রংটি ধরেচে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে মনে ভাবলুম এ ত দেখি আমার রাণুরই মত— তার মধ্যে কোথাও বা কাঁচা, কোথাও বা শ্যামল, কোথাও

বা গৌর, কোথাও বা কঠিন, কোথাও বা কোমল। এই রকম চিন্তা করতে করতে দানাপুরে এসে উপস্থিত। এমন সময় দেখি এসিষ্টান্ট স্টেশন মাষ্টার মচ্‌মচ্‌ করতে করতে আমারই গাড়ির সামনে হাজির। ভাবলুম পেয়ারা ওজন করিয়ে মাশুল আদায় করবার প্রস্তাব করতে এসেচে। ইচ্ছা করল, কালিদাসের[৫] মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে কেদারা রাগিণীতে গান ধরি "সখি আমারি দুয়ারে কেন আসিল?" এমন সময়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, "Are you Sir R. N. Tagore? সত্যের খাতিরে আমাকে কথাটা স্বীকার করতে হল। সে বল্লে, এ গাড়ীতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্চে, আমি তোমার খবর পেয়েই একটা ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ি নতুন জুড়ে দিয়েচি, পাটনা জংসন স্টেশনে সেই গাড়ি দখল কোরো। পাছে ভদ্রলোক মনে মনে দুঃখিত হয় সেই জন্যে পাটনা জংসনে ফার্ষ্টক্লাসে রওয়ানা হলুম। পেয়ারাগুলোকে নানা ট্রাঙ্কের কোণে সন্নিবেশিত করা গেল। আমাদের লীলমণি হাতে কাঠের পুতুল নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। বল্‌লে, "এটা ফেলে আসা হচ্চিল আমি এনেচি।" আমি বল্লুম "অনেক লোকসান বাঁচিয়েচ, কিন্তু হে লীলমণি, এর চেয়ে দামী জিনিষ ছিল সেগুলোর কি গতি হল?" সে বল্‌লে, "কুলীরা সব নিয়ে আস্‌চে।" আমি, এমন কি বৌমাও, লীলমণির এই আশ্চর্য্য বিবেচনা শক্তি ও সতর্কতা দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হলুম। কিছুক্ষণ পরে বেচারা পুরাতত্ত্ববিদ্‌ কালিদাস তোরঙ্গ বালিশ বিছানা ঝুড়ি চুপড়ি পুঁটুলি বাক্স টিফিন ক্যারিয়র জলের কুঁজো ইত্যাদি উপকরণ বাহক কুলীদের পথপ্রদর্শক হয়ে এসে বল্‌লে, "আমি একলা এই প্রভূত অস্থাবর সম্পত্তির গুরুভার দায়িত্ব বহন করে হয়রাণ হয়ে পড়েচি— আমাদের লীলমণিকে কোথাও দেখা গেল না।" আমি তাকে অনেক আশ্বাস দিয়ে বল্‌লুম "তার জন্যে কিছুই উৎকণ্ঠিত হোয়ো না। সে পৌত্তলিক একখানি কাঠের পুঁতুলের তদারকে তার দেহমনপ্রাণ একান্ত উৎসর্গ করেছিল। সম্প্রতি সেই ভারমুক্ত হয়ে ভৃত্যবাসের কাষ্ঠাসনে বিশ্রামের আনন্দ উপভোগ করচে।" লীলমণির

স্বভাব সম্বন্ধে তোমার মনে নিশ্চয়ই অনেক বিতর্ক উপস্থিত হয়েচে। তার পিতৃদত্ত নাম বনমালী। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে শোনা গেল তোমার পিতা তাকে নীলমণি বলে সম্ভাষণ করলেন। আমার মনে হল তোমার পিতৃদত্ত নামটি তার মুখচ্ছবির সঙ্গে সুন্দর খাপ খায়। সেই অবধি আপোষে আমাদের নিজেদের মধ্যে তাকে নীলমণি বলেই আখ্যা দিয়েচি। যাক্ কলকাতায় এসে পৌঁছন গেল। এসে দেখা গেল পরদিনেই এগারই মাঘ। আমি জন্মকালে ব্রাহ্ম ছিলুম। কিন্তু যেমন আমি কোনো ইস্কুলের পড়া স্বীকার করতে পারিনি তেমনি আমি কোনো ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বেড়ি মনকে পরাতে পারলুম না। সেই কারণে আমি সাম্প্রদায়িক উৎসবে যোগ দিতে পারি নে। স্থির করা গেল, জোড়াসাঁকোয় না থেকে আলিপুরে দুটো দিন অজ্ঞাতবাস যাপন করেই শান্তিনিকেতনে দৌড় মারব। প্রশান্তকে টেলিফোন করা গেল। প্রশান্ত বল্‌লে "তথাস্তু, আজ রাত্রে গিয়ে মোটর রথে করে আলিপুরে নিয়ে আসব।" বৌমার সঙ্কল্প হল তিনি সেই অপরাহ্নেই তাঁর কাঠের পুতুল আর কাশীর পেয়ারার বৃহৎ ঝুড়ি নিয়ে বোলপুরে যাত্রা করবেন। আমাদের সম্পত্তি যা কিছু ছিল দুই ভাগ হল। এক ভাগ যাবে আশ্রমে, একভাগ যাবে আলিপুরে। এমন সময় কি হল সেকথা লিখ্‌তে গেলে কিছুতে আজকের ডাক পাওয়া যাবেনা। অথচ আমি নিশ্চয় জানি তুমি প্রতিদিন ডাকের অপেক্ষা করচ আর ভাবচ "ভানুদাদা নিষ্ঠুর কঠিন।" তাই অনতিবিলম্বে এই চিঠি রওনা করে দিচ্চি গল্পের অবশিষ্ট অংশ পরের কিস্তিতে সমাপ্য।" ইতি ৩০শে জানুয়ারী ১৯২৪।

এ চিঠি কবে পেলে ঠিক করে দেখো ত।

তোমার ভানুদাদা

১৩২

২১ মাঘ ১৩৩০

ওঁ

[কলকাতা]

রাণু,

লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি মনকে শান্ত কর। তোমার জন্যেই আমি উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম। যে একটা জটিল জালের মধ্যে তুমি জড়িয়ে পড়েছিলে, তার জন্যে অনেক পরিমাণে আমিই দায়ী বলে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম। তোমার এই প্রথম বয়েস, এই সময়ে তোমার পড়াশুনো তোমার নিশ্চিন্ত হাসি উল্লাসের মাঝখানে এই সমস্ত উপদ্রব এনে তোমার সমস্ত জীবনকে এমন করে যে একটা ঘূর্ণিপাক খাইয়ে দেওয়া গেল সেটাতেই আমাকে দুঃখ দিয়েচে।[১] তোমার উপর আমি কখনো এমন রাগ করতেই পারিনে যাতে তুমি স্থায়ীভাবে ব্যথা পেতে পার। আমার স্নেহ তুমি হারিয়েচ কল্পনা করে যে কষ্ট পাচ্চ তার কোনো মূল্য নেই। আমার যে-স্নেহ তুমি এমন করে টেনে নিয়েচ সে আমি কোনোদিন কিছুতেই প্রত্যাহরণ করতে পারিনে। আমার স্নেহে যদি তোমার কোনো সান্ত্বনা থাকে, তাতে যদি তোমার হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে পারে, তাহলে সে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে ভোগ কর— তার দ্বারা তুমি বল পাও, সুখ পাও, কল্যাণ পাও, এই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। আমার কক্ষপথে কোথা থেকে কেমন করে তুমি একটি প্রাণের জ্যোতিষ্ক এসে পড়েচ, তোমার সংসারের অভিজ্ঞতা কিছুই নেই, তোমার মন কাঁচা, আমি কি তোমাকে রূঢ় ভাবে আঘাত করতে পারি? তোমার উপরে আমার বেদনাপূর্ণ স্নেহ সর্ব্বদা আপনি গিয়ে বিকীর্ণ হচ্চে। আমার জীবনের দায়িত্ব, কখন্ আমার অগোচরে, এবং জানিনে কার প্রেরণায় ক্রমশই বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠচে— তার সমস্তটার সঙ্গে তোমার সম্পূর্ণ

যোগ হওয়া সম্ভবপর নয়, তুমি ছাড়া আর কারো যে যোগ আছে তাও নয়— ঐখানে বিধাতা আমাকে অনেকটা পরিমাণে একলা করে দিয়েচেন। কিন্তু তুমি হঠাৎ এসে আমার সেই জীবনের জটিলতার একান্তে যে-বাসাটি বেঁধেচ, তাতে আমাকে আনন্দ দিয়েচে। হয়ত আমার কর্ম্মে আমার সাধনায় এই জিনিষটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই আমার বিধাতা এই রসটুকু আমাকে জুটিয়ে দিয়েচেন। আমার অনেক সহযোগী আছে যারা আমার কর্ম্মে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে, তুমি তা কর না; আমার জীবনের লক্ষ্যের দিকে তুমি হয়ত আমাকে সম্পূর্ণ বুঝতে এখনো পার না। কিন্তু জীবনের সেই লক্ষ্য যেখানেই থাক্ না, তুমি তোমার সরল প্রাণের অর্ঘ্যের দ্বারা আমার সেই জীবনকেই যা দিয়েচ তুমি কি মনে কর সে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক? তা যদি হ'ত তাহলে তুমি কখনই আমার কাছে আস্‌তে পেতে না। কেন না আমি জানি আমার ভাগ্যদেবতা আমাকে দিয়ে তাঁর একটা কোনো বিশেষ কাজ আদায় করবেন বলেই শিশুকাল থেকে আমার জীবনকে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে গড়ে নিচ্চেন। তাঁরি ডাকে আজ হঠাৎ তুমিও আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েচ। কি রকম অভাবনীয়রূপে এসেচ সে কথা মনে করলে আশ্চর্য্য হতে হয় না কি? আমার পক্ষে তুমি যে বন্ধন হয়ে আসবে এ কিছুতে হতেই পারে না, কেননা মুক্ত না থাক্‌লে, আমার মধ্যে যা সব চেয়ে বড় তাকে আমি ব্যক্ত করতে পারি নে, আর তা না করতে পারা আমার পক্ষে এক রকমের মৃত্যুরই মত। সেই জন্যেই তুমি আমার জীবনের প্রাঙ্গণে ফুল-ফোটা লতার মতই এসেচ, বেড়ার মত আস নি। তোমার সেই ফুলের গন্ধ আমার মনে লেগেচে। তারই আনন্দ আমার কাজের অনেক ক্লান্তি দূর করে, এবং অবকাশের মধ্যে গানের সুর লাগায়। আমি তোমাকে উপেক্ষা করে আমার জীবনের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রেখেচি এই কথা কল্পনা করে তুমি নিজেকে

কখনো অনর্থক ক্লিষ্ট কোরো না।

আমার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে আমি কলকাতায় এসেছিলুম। মনে হয়েছিল যেন কিছু কল বিগ্‌ড়েচে। আমি মেরামত-করা শরীর নিয়ে ব্যবহার করতে নিতান্তই নারাজ। এখানে এসে নীলরতন সরকারকে[২] দিয়ে দুদিন ধরে দেহটাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিলুম। তিনি বল্লেন, কল কোথাও কিছুই বিগ্‌ড়োয় নি; বল্লেন আমার নাড়ী যৌবনের নাড়ী। তবে আমি যে কথায় কথায় কেবলি ক্লান্ত হয়ে হাঁপিয়ে পড়ি তার কারণ আমার দেহের শক্তি, বিশেষভাবে হৃৎপিণ্ডের শক্তি, অতিরিক্ত খরচ করে দেহটাকে দেউলে করে আনচি— দেহযাত্রার পূর্ণ প্রয়োজনের জন্যে সর্ব্বদা যে পুঁজি হাতে রাখা উচিত অসাবধান হয়ে আমি সেটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় আছি। কিছুকাল সম্পূর্ণ বিশ্রাম করে আবার কিছু মূলধন সঞ্চয় করা বিশেষ আবশ্যক। যাই হোক্ একটা আশ্বাসের কথা এই যে, আমার দেহ মোটরগাড়ির পেট্রল অনেকখানি ফুরিয়ে এসেচে কিন্তু কল কোথাও ভাঙে নি, স্ক্রু কোথাও ঢিলে হয় নি। অতএব এখনো যতদিন দম সম্পূর্ণ ফুরিয়ে না যায় বসন্তের জয়গান করতে পারব।

কিন্তু তুমি এখন মনকে সুস্থির করে পড়াশুনায় লেগে যাও। পরীক্ষা-ফলের প্রতি উদাসীন হোয়ো না। আমি চীন থেকে ফিরে এসে[৩] তোমাকে প্রসন্ন প্রফুল্ল সুস্থ সবল দেখি যেন। ইতি ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

তোমার ভানুদাদা

১৩৩

২৮ মাঘ ১৩৩০

ওঁ

[শ্রীনিকেতন]

রাণু

তোমাকে কথা দিয়েচি যে তোমার চিঠি পেলে তোমাকে চিঠি লিখব— সজ্জনের বাক্য, শাস্ত্রে বলে, গজদন্তের মত, অর্থাৎ একবার যখন বেরিয়ে আসে তখন তাকে ভিতরে প্রত্যাহরণ করা যায় না। আজ সোমবার[১] অপরাহ্নে তোমার পত্র বহুতর য়ুরোপাগত পত্রের সঙ্গে পাওয়া গেল,— হঠাৎ পত্রের পশ্চিম হাওয়ার ঝড় উপস্থিত হল, বারাণসী, অস্ট্রিয়া, জর্ম্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা থেকে চিঠি এসে আমার ডেস্ক ভরে দিলে। তুমি চিঠি পাঠিয়েচ ৯ই ফেব্রুয়ারিতে, আমি পেয়েচি ১১ই তারিখে। যদিচ আজি তার উত্তর লিখ্‌তে বস্‌লুম কিন্তু কালকের আগে ডাকে দেওয়া চল্‌বে না। তুমি পাবে বৃহস্পতিবারে। তুমি যে আমার দুটো পত্র একদিনে পেয়েছিলে তার মধ্যে আমার কোনো চাতুরী ছিল না, খুব সম্ভব প্রথম চিঠি যখন ডাকে দিয়েছিলুম তখন পোস্টের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার কাছে ঠাট্টায় পাছে তুমি ঠকো সেইজন্যে আজকাল এত বেশি সাবধান হয়েচ যে খুব সাদা কথাতেও তোমার সন্দেহ হয়। কোন্‌দিন হয় ত বলে বস্‌বে, "আপনি ভানুদাদা বলে আমার সঙ্গে চালাকী করেন, নিশ্চয় আপনি ভানুদাদা নন, নিশ্চয়ই আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে একজন বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকার।" তখন আমি কি করে প্রমাণ করব যে, গ্রন্থকারটা হ'ল বাংলাদেশের পাঠকদের পরিচিত এক ভদ্রলোক, কিন্তু ভানুদাদা তাদের পরিচিত কেউ নয়; অতএব দুজনে দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত প্রতিভা নিয়ে কিন্তু লোকটি মাটির মানুষ, অত্যন্ত বিনয়ী; আর ভানুদাদা আছেন যাঁকে নিয়ে তিনিও কোনো কোনো

মহলে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়ে উঠ্‌চেন, সেই অহঙ্কারে এই ভানুদাদার আর মাটিতে পা পড়ে না। দুজনের প্রকৃতি আলাদা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয়; আর ভানুদাদার বয়স সম্বন্ধে তর্ক আছে— অতএব লজিকশাস্ত্র যাঁরা সম্প্রতি অধ্যয়ন করতে সুরু করেচেন তাঁরা কখনই দুজনকে এক ব্যক্তি বলে সন্দেহ করতে পারেন না। আমি পরম্পরায় শুনেচি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনস্মৃতি বলে একখানি বই লিখেচেন, তার থেকে প্রমাণ হয় তাঁর জীবনও আছে স্মৃতিরও অভাব নেই; আর ভানুদাদাকে দুই একজন যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন উক্ত ভদ্রলোকের জীবন বলে পদার্থ ক্ষীণ পরিমাণে যদি বা থাকে স্মৃতি বলে কোনো বালাই নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সব গান রচনা করেন ভানুদাদা যদি সেগুলি তাঁর বিশেষ পরিচিত কোনো কোনো লোকের কাছে গাইতে চেষ্টা করেন তাহলে তার সুরও ভোলেন কথাও ভোলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নাটক লেখেন ভানুদাদা তা অভিনয় করবার বেলায় সমস্ত গোলমাল করে' নিজের কথা বসিয়ে দিয়ে কোনো গতিকে কাজ সেরে দেন। কোনো কোনো রসিক লোকে সন্দেহ করে যে, ভানুদাদা গান ভুল করেন, নাটকের কথা উলটপালট করে দেন সেটা চিত্তবিক্ষেপের লক্ষণ— সেই চিত্তবিক্ষেপের কারণটি সঙ্গীতসভায় ও নাট্যমঞ্চে সশরীরে উপস্থিত থাকাতেই এইরকম দুর্গতি ঘটে। যা হোক্ জনশ্রুতি সবই যে বিশ্বাস করতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

Elmhirst যখন কাশী দিগ্বিজয় করে আশ্রমে ফিরে এলেন তখন ভানুদাদা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সখে, রাণু নামধারিণী কাশীবাসিনী বালিকাকে কেমন দেখলে আমার কাছে প্রকাশ করে বল।" সাহেব বল্‌লেন, "বন্ধু she looked very happy." ভানুদাদা স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবতে লাগ্‌ল, হঠাৎ এত happiness-এর কারণ কি ঘট্‌ল? দীর্ঘকাল ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে, "হে প্রিয়দর্শন, তাকে

কি কিছু কৃশ দেখ্‌লে? মুখ কি তার পাণ্ডুবর্ণ? সত্য বল, আমার কাছে গোপন কোরোনা।" সাহেব বললে, "উদ্বিগ্ন হোয়ো না, বন্ধু, সেই বরবর্ণিনীকে যেমন হৃষ্ট দেখ্‌লুম তেমনি পুষ্টও দেখা গেল, তবে কিনা তার মুখের বর্ণে যে পাণ্ডুরতার আভাস পাওয়া গেল সেটা নিশ্চয়ই কোনো প্রসাধনসামগ্রীর গুণে।" ভানুদাদা দীর্ঘতর কাল চিন্তা করে ও দীর্ঘতর নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলে, "প্রিয় সুহৃৎ, সেই বালিকার প্রসাধনের উৎসাহ আজকাল কি কিছুমাত্র কমে নি?" সাহেব বললেন, "ভো বন্ধো, শুনে খুসি হবে, আমি যতক্ষণ ছিলেম, তার প্রসাধনপটুত্বের বৃদ্ধি বই হ্রাস ত দেখি নি।" ভানুদাদা ম্লানমুখে পুনশ্চ প্রশ্ন করলে "আকাশের চাঁদকে দেখে তার কি কোনো প্রকার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে দেখেচ?" সাহেব বল্‌লে, "হে ধীমন্‌, তার চাঞ্চল্যের জন্যে আকাশের চাঁদের কোনো অপেক্ষা থাকে নি— নিকটবর্ত্তী কারণই যথেষ্ট।" তার পরে ভানুদাদা তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহ বোধ করলে না। বল্‌লে, "Good night!"

পূর্ব্বেই শুনেচ, রোজ সন্ধ্যাবেলায় মেয়েদের গান শেখাচ্চি। এত দিন প্রায় রোজই একটা না একটা নতুন গান চল্‌ছিল ইদানীং তাদের অনুরোধক্রমে পুরোণো গান ধরা গেছে। গত তিন দিন গানের বদলে তিনটে বড় বড় নতুন কবিতা লিখেচি।[২] তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঠকেরা আশ্চর্য্য হয়ে গেচে। তারা ভেবে রেখেছিল রবি ঠাকুরের কবিতার ডানা থেকে তার সব পালকগুলো ঝরে গিয়েচে, এখন সে কেবল গদ্যের চালে মাটির উপরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে পারে, পদ্যের চালে মেঘলোকে উড়তে পারে না। কিন্তু রবি ঠাকুর অস্তাচলের ধারে এসেও তার ছটা বিস্তার করচে। তাতে রঙের ঘটার কৃপণতা নেই, বিচারকদের এই মত।

রাত হয়ে এল। আকাশে মেঘ করে রয়েচে— সন্ধেবেলায় এক চোট বৃষ্টি হয়েও গেচে— আবার হয় ত মাঝরাত্রে বৃষ্টি পড়বে— হু হু করে বাদলার ভিজে হাওয়া বইচে। সব নিঃশব্দ, কুকুরগুলো পর্য্যন্ত আজ ঘরের

মধ্যে আশ্রয় নিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে, বাইরের অন্ধকারে কেবল ঝিল্লিধ্বনি শোনা যাচ্চে। এর অনেক আগে শুতে যাওয়া উচিত ছিল— আমার দেহটা কিছুকাল থেকে আমাকে বল্‌চে ছুটি দাও ছুটি দাও। বহুকাল সে বিনা ওজরে আমার সেবা করেচে, এতদিন পরে তার ত্রুটি হতে আরম্ভ হয়েচে, সে জন্যে সে লজ্জিত— আপনার দৈন্য সে ঢাক্‌তে চায় কিন্তু নানা ছিদ্রে বেরিয়ে পড়ে। আজ আর তাকে তাগিদ্‌ করব না, বাতি নিবিয়ে দিই, শুতে যাই। কাল সকাল থেকে আমার অন্য কাজের তাগিদ আছে তাই রাত্রেই চিঠি সেরে রেখে দিচ্চি। ইতি ১০[১১] ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

ভানুদাদা

১৩৪

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

তোমাকে কী বারেই রাত্রে ছাড়া চিঠি লেখবার সময় পাই নে। কিন্তু সেটা উচিত বলে মনে করিনে। মনে কোরো না, আমি সামান্য বুদ্ধির লোক এত বড় কথাটা আমার মুখে শোভা পায় না। আমি নিজের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক মন্থন করে বল্‌চিনে— হাজার চেষ্টা করলেও বল্‌তে পারতুম না। কিন্তু পৃথিবীতে অধিকাংশ বড় বড় জ্ঞানী লোকেরা এই গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করেচেন, যে, রাত্রিটা নিদ্রা দেবার জন্যে। নিজেদের এই মত সমর্থন করবার জন্যে তাঁরা স্বয়ং সূর্য্যের দোহাই দেন। তাঁরা আশ্চর্য্য গবেষণা এবং যুক্তিনৈপুণ্য প্রয়োগ করে বলেচেন, রাত্রে নিদ্রাই যদি প্রকৃতির অভিপ্রায় না

হবে তবে রাত্রে অন্ধকার হয় কেন, অন্ধকারে আমাদের দর্শন মননশক্তির হ্রাস হয় কেন, উক্ত শক্তির হ্রাস হলে কেনই বা আমাদের দেহ তন্দ্রালস হয়ে আসে? গভীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই সকল অকাট্য যুক্তির কোন উত্তর দেওয়া যায় না— কাজেই পরাস্ত হয়ে ঘুমোতে হয়। তাঁরা সব শাস্ত্র ও তার সব ভাষ্য ঘেঁটে বলেচেন, যে, রাত্রে ঘুম না হওয়াকেই বলে অনিদ্রা— ঘুম হলেই অনিদ্রা বলে' জগতে কোন পদার্থ থাক্‌তই না। এত বড় কথার সমস্ত তাৎপর্য্য বুঝতেই পারি না— আমাদের ত দিব্য দৃষ্টি নেই, আমরা যথোচিত পরিমাণে ধ্যানধারণা নিদিধ্যাসন করি নি— সেইজন্যে সংশয়কলুষিত চিত্তে আমরা তর্ক করে থাকি, যে, রাত্রে কয়েক ঘন্টা না ঘুমোলেই সেটাকে অনিদ্রা বলে' নিন্দা করে, অথচ দিনে অন্তত বারো ঘন্টাই যে কেউ ঘুমোই নে সেটাকে ডাক্তারীশাস্ত্রে বা কোনো শাস্ত্রেই ত অনিদ্রা বলে না। শুনে প্রবীণ লোকেরা আমাদের অর্ব্বাচীন বলে হাস্য করেন, বলেন আজকালকার ছেলেরা দু'চার পাতা ইংরেজি পড়ে তর্ক করতে আসে, জানে না যে, "বিশ্বাসে মিলায় নিদ্রা তর্কে বহু দূর"। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না— কারণ, বার বার পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তর্ক যতই করতে থাকি নিদ্রা ততই চড়ে যায়; বিনা তর্কে তার হাতে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়। অতএব, আজকের মত চিঠি বন্ধ করে শুতে যাই। যদি সম্ভবপর হয় তা হলে কাল সকালে চিঠি লিখব। কিন্তু চিঠি যে লিখ্‌তেই হবে তার কি কোনো অনিবার্য্য কারণ আছে? কারণ না থাক্‌লে যখন কার্য্য হয় না তখন অবশ্যই আছে। শুনে হঠাৎ মনে হয় কারণটা আছে আমার বাইরে— দূরে কোনো একটি বালিকার মধ্যে, আমার চিঠি না পেলে তার দুঃখ হবে সেই দুঃখের মধ্যে। কিন্তু ভেবে দেখ্‌তে গেলে দেখা যায় কারণটা আমারই অহঙ্কারের মধ্যে। আমি চিঠি না লিখ্‌লে বালিকা দুঃখ পাবে এটা কল্পনা করার মধ্যে অহঙ্কার আছে বই কি। সেই অহঙ্কারে আমাকে খামকা চিঠি লিখ্‌তে প্রবৃত্ত করেচে এই ঘনান্ধকারা যামিনীতে, এই ঝিল্লিমুখরিতা,

শাস্ত পথিকসঞ্চরা, নীরব বিহঙ্গ কলকাকলী, ক্বচিৎ শিবা-রুত মন্দ্রিতা, ক্বচিৎ "ভোঁদা"-কুক্কুর-ক্রন্দিতা নিশীথিনীতে। কলু ঘানিতে গোরু জুড়ে দিয়ে যখন তেল বের করে তখন তার চোখে ঠুলি দিয়ে দেয়— সেই ঠুলিতে অন্ধ হয়ে সে বিশ্বে নিজেকে ছাড়া আর কিছুকেই উপলব্ধি করতে পারে না— তখন সে নিজেকে নিয়ে কেবলি ঘুরতে থাকে আর কলু আদায় করে নেয় তার তেল। প্রকৃতি তেমনি আমাদের অহঙ্কারে অন্ধ করে সেই ঠুলির জোরে কেবলি খাটিয়ে মারেন— নইলে তাঁর কাজ চলে না। চিঠি লিখ্‌চি ত চিঠিই লিখ্‌চি! কেনরে বাপু, হয়েচে কি? অহঙ্কার! আচ্ছা না হয় অল্প একটুখানি লিখে শুতে যাও না— জো কি! বড় চিঠি লিখ্‌লে কেউ একজন খুসি হবে! অহঙ্কার, অহঙ্কার!— এত বড় নিঃসংশয়ে তুমি জান্‌লে কি করে' যে সে খুসি হবে? অহঙ্কার. অহঙ্কার! আমার চিঠির অপেক্ষায় ডাক-হরকরার পদধ্বনি গণনা করচে না, একি হতে পারে? অহঙ্কার, অহঙ্কার। নিশ্চয়ই সে "সচকিতনয়নং পশ্যতি পেয়াদা-পন্থনং"— অতএব লেখ, লেখ, থাক্‌ নিদ্রা, থাক্‌ আরাম। মায়া দিয়ে মায়ার জগতের বিস্তার হতে থাকে ; ভালো করে কিছুই জানি নে, কিছুই বুঝতে পারিনে ; আন্দাজের গোধূলির আলোতে কতই যে জাল বুনচি, আর সেই জালে ঘুরে ফিরে নিজেকে জড়াচ্চি। উজ্জ্বল আলোতে সুস্পষ্ট করে' সব কিছু দেখ্‌তে পেলে মানুষ অনেক স্বকপোল কল্পিত অনাবশ্যক তাগিদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে— তখন বিশ্বশতদলের ঠিক যেখানটাতে মধুকোষ সেখানে পথ পেতে তার বিলম্ব হতে পারে না— আর তার পরে সে আপনার অহঙ্কার ভুলে সব ভুলে সেই সুধারসের মূল কেন্দ্রে গিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, শান্ত হয়, কৃতার্থ হয়।— এই দেখ, কি কাণ্ড! হাস্যরসের চঞ্চল স্রোত বেয়ে হঠাৎ তত্ত্বজ্ঞানের গম্ভীর গুহার মধ্যে প্রবেশ করবার উপক্রম করেচি। রাত্রে চিঠি লেখার ঐ ত দোষ! রাত্রিচর পাখীরা গম্ভীর পাখী, তারা গান গায় না, সে ত জান। রাত্রিচর চিন্তারাও কোন্‌ অন্ধকার নীড়ের ভিতর থেকে দেহধারী ছায়াদলের

মত বেরিয়ে এসে অন্ধকারতর অনির্দ্দেশ্যের অভিমুখে পাখার ঝাপট দিয়ে চলে যায়। চিঠিপত্রের মধ্যে তাদের বাসা বাঁধতে দেওয়া কিছুতেই ভালো নয়। অতএব চিঠি বন্ধ করা যাক্, কেরোসিন্ প্রদীপটা নিবিয়ে দেওয়া যাক্, ঝপ্ করে বিছানাটার মধ্যে গিয়ে পড়া যাক্। শীত,— বেশ একটু রীতিমত শীত,— উত্তর পশ্চিমের দিক থেকে হিমেল হাওয়া বইচে। দেহটা বলে উঠ্‌চে, "ওহে কবি, আর বাড়াবাড়ি ভালো নয়— তোমার বাজে কথার কারবার বন্ধ করে' মোটা কম্বলটা মুড়ি দিয়ে একবার চক্ষু বোজো— অনন্যগতি আমি তোমার আজন্মকালের অনুগত, আর আমরণকালের সহচর— তাই বলেই কি আমাকে এত দুঃখ দিতে হবে? দেখ্‌চ না, পা দুটো কি রকম ঠাণ্ডা হয়ে এসেচে, আর মাথাটা হয়েচে গরম, বুঝচ না কি এটা তোমার রাত্রিকালের উপযোগী মন্দাক্রান্তা ছন্দের যতিভঙ্গের লক্ষণ— এ সময়ে মস্তিষ্কের মধ্যে শার্দ্দূলবিক্রীড়িতের অবতারণ করা কি প্রকৃতিস্থ লোকের কর্ম্ম?" কায়ার এই অভিযোগ শুনে তার প্রতি অনুরক্ত আমার মন বলে' উঠ্‌চে, "ঠিক্, ঠিক্! একটুও অত্যুক্তি নেই।" ক্লান্ত দেহ এবং উদ্ভ্রান্ত মন উভয়ের সম্মিলিত এই বেদনপূর্ণ আবেদনকে আর উপেক্ষা করতে পারিনে— অতএব চল্‌লুম শুতে—

প্রভাত হয়েচে। তুমি আমাকে বড় চিঠি লিখ্‌তে অনুরোধ করেচ। সে অনুরোধ পালন করা আমার সহজ-স্বভাবসঙ্গত নয়, পল্লবিত করে' পত্র লেখার উৎসাহ আমার একটুও নেই। আমি কখনো মহাকাব্য লিখিনে বলে আমার স্বদেশী অনেক পাঠক আমাকে অবজ্ঞা করে থাকেন,— মহাচিঠিও আমি সচরাচর লিখ্‌তে পারি নে। কিন্তু যেহেতু আমার চীনপ্রয়াণের সময় নিকটবর্ত্তী এবং তখন আমার চিঠি অগত্যা যথেষ্ট বিরল হয়ে আস্‌বে সেইজন্যে আগামী অভাব পূরণ করবার উদ্দেশ্যে বড় চিঠি লিখ্‌চি। সে অভাব যে অত্যন্ত গুরুতর অভাব, এবং সেটা পূরণ করবার আর কোনো উপায় নেই এটা কল্পনা করচি নিছক অহঙ্কারের জোরে। কিন্তু অহঙ্কার

রিপুটার সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায় কাল রাত্রে লিখেচি, দ্বিতীয় অধ্যায় আজ দিনে লিখ্‌তে বস্‌লে সইতে পারবে না।— আসল কথাটা এই যে, এবার তুমি যে-চিঠিটা লিখেচ সেটা তোমার সাধারণ চিঠির আদর্শ অনুসারে কিছু বড়— সেই জন্যে তোমার সঙ্গে পাল্লা দেবার গর্ব্বে বড় চিঠি লিখ্‌চি। তুমি নাম্‌তায় আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, লজিকেও তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আমার কর্ম্ম নয়, কিন্তু বাগ্‌বিস্তারবিদ্যায় কিছুতেই আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌বে না। এই একটি মাত্র জায়গায় যেখানে আমার জিৎ আছে সেইখানে তোমার অহঙ্কার খর্ব্ব করবার ইচ্ছা আমার মনে এল। কিন্তু দেখ্‌লুম অপর ব্যক্তির ইংরেজি চিঠি উদ্ধৃত করে তোমার চিঠির কলেবর পূরণ করেচ। এখানেও তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি সেইটে আজ প্রমাণ করব। যে চিঠির থেকে উদ্ধৃত করচি সেটা অপেক্ষাকৃত পুরাতন কালের— তার লেখক আমি নিজে— পিয়র্সনকে লিখেছিলুম।[১] তুমি যে যুবকের চিঠি থেকে তুলে দিয়েচ, এ চিঠিতে সে চিঠির রস পাবে না। কিন্তু যেহেতু এর বিষয়টা তোমার কাছে জগতের সকল বিষয়ের চেয়ে বেশি ঔৎসুক্যজনক সেইজন্যে বোধ হচ্চে এটাতেও তোমাকে কিছুপরিমাণে আমোদ দেবে।

I am very much amused to find in your letter how your vanity comes out when you describe your latest love adventure with a heroine of ten. But I feel sure that you will turn green with envy when you learn my own achievement in that direction. My sweetheart is a girl of eleven with a wonderful power of insight which has led her to discover in me the permanent dominance of the age 27. I had a suspicion of this myself, but waited for corroboration from a fresh mind unsophisticated. But once for all, the exploration has been done, the flag of possession prop-

erly hoisted, and my lost continent of the Eternal 27 has been recovered and captured by a brave little girl of eleven. Of all things for which I miss you so much this fact is one of the most important, for your rivalry would have greatly added to my triumph. I am certain that with all the tokens of your obvious youthfulness you would have found it hard to produce your runaway 27th year and lay claim to a youth which is at all durable. I hope Andrews will be able to give you a truthful account of this episode in my life in a more sober style than I can summon in my present state of exultation.

বাস্। আর নয়। কিন্তু এ চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে তখন থেকেই অহঙ্কারের সূত্রপাত হয়েচে। অবশেষে বোধ হয় দর্পহারী মধুসূদন আছেন— অহঙ্কার চূর্ণ হতে আর দেরি নেই। ইতি ৫ই ফাল্গুন ১৩৩০

ভানুদাদা

১৩৫
[২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪]

ওঁ

[কলকাতা]

রাণু

আজ রবিবার। কাল শনিবারে তোমার চিঠি শান্তিনিকেতনে আমাকে খুঁজতে গিয়েছিল। যেখানে ডেস্কে বসে লিখে থাকি সেখানে একবার উঁকি মারলে, দেখ্‌লে কেউ কোথাও নেই। যেখানে বৌমার খাবার ঘরে খেতে

যাই সেখানে ঘুরে এল, দেখ্‌লে সেখানেও আমি নেই। লীলমণির কাছে খবর নিতে গেল। হাঁক দিল, লীল্‌মণি, লীল্‌মণি! কোথাও তার সাড়া পেল না। শেষ কালে খবর পেলে চিঠির মালেক কলকাতায় চলে এসেচে, আর সঙ্গে এসেচে তার সবেধন লীলমণি। তখন পোষ্ট্‌ব্যাগের মধ্যে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করলে আর জোড়াসাঁকোয় আমার দক্ষিণহস্তের উপর অবতরণ করলে। এক ম্যালেরিয়া নিবারিণী সভা হয়েচে তাদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করব বলে কিছুকাল পূর্ব্বে কথা দিয়েছিলেম। তাই দায়ে পড়ে এই ক্লান্ত রুগ্ন দেহ টেনে টেনে কলকাতায় এসেচি। ম্যালেরিয়া সভায় বক্তৃতা করে এসেচি[১] যে, ম্যালেরিয়া রোগটা ভাল জিনিষ নয়— ওর সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ পাতিয়ে শ্রীমতী ম্যালেরিয়াকে অর্দ্ধাঙ্গিনী করবার চেষ্টা করলে ও দেখ্‌তে দেখ্‌তে সর্ব্বাঙ্গিনী হয়ে ওঠে। সাধারণত প্রেয়সীরা হৃৎকমলে স্থান গ্রহণ করে থাকেন কিন্তু শ্রীমতী ম্যালেরিয়া হচ্চেন যকৃৎবাসিনী, প্লীহাবিনোদিনী। কবিরা বলে থাকেন প্রেয়সীর আবির্ভাবে হৃদয়ে ঘন ঘন স্পন্দন উপজাত হয়, কিন্তু ম্যালেরিয়ার আবির্ভাবে সর্ব্বাঙ্গ মুহুর্মুহু স্পন্দিত হতে থাকে। অবশেষে অত্যন্ত তিক্ত উপায়ে তার বিচ্ছেদ ঘটাতে হয়। কিন্তু তার সঙ্গে একবার মিলন হলে বারে বারে সে ফিরে ফিরে আসে। তাই আমি করুণকণ্ঠে সানুনয়ে সকলকে অনুরোধ করে বলেছিলেম, "ভদ্রমহিলাগণ এবং ভদ্রলোক সকল, ধর্ম্মের নামে, দেশের নামে, সর্ব্বমানবের নামে আমি আপনাদের নিবেদন করচি, কদাচ আপনারা ম্যালেরিয়াকে প্রশ্রয় দেবেন না, আপনাদের প্লীহা ও যকৃতকে কদাচ তার চরণে উৎসর্গ করবেন না। আর যদি কখনো শোনেন মশা কানের কাছে মৃদুমন্দ গুঞ্জনধ্বনি করচে তবে তার সেই মায়ায় ভুলবেন না, যদি দেখেন সে আপনাদের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেচে তবে নির্ম্মমভাবে এক চপেটাঘাতে তাকে বিনাশ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য ডাক্তারাণ্ নিবোধত!" আমার সেই সারগর্ভ চিন্তাপূর্ণ

৬

উপদেশ বাক্যে, আমার সেই জ্বালাময়ী বাগ্মিতায় সেই সভায় এমন অল্পবুদ্ধি, এমন জড়প্রাণ একজনও ছিল না ম্যালেরিয়ার অপকারিতায় যার কিছুমাত্র সংশয় ছিল। সকলেই বারবার বল্‌তে লাগ্‌ল, "ধন্য সার্ রবীন্দ্রনাথ, ধন্য ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ, ধন্য বিশ্ববরেণ্য কবি, ম্যালেরিয়া যে এমন সর্ব্বনাশিনী এ কথা এমন ওজোময়ী বিশদভাষায় আর কোনোদিন কারো কাছে শোনা যায় নি। আজ হতে আমরা সকলেই দৃঢ় সঙ্কল্প হলেম আর কোনোদিন ম্যালেরিয়ার প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা রাখবো না, আর মশা গায়ে বসলেই হয় তালবৃন্ত ব্যজনে তাকে দূরীকৃত করব, নয় বীরোচিত অধ্যবসায় সহকারে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে তাকে যমসদনে প্রেরণ করব।" আমার বক্তৃতার এই আশু ফল দেখে আমি বড়ই তৃপ্তি ও সান্ত্বনা লাভ করেচি। সভা থেকে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে চিৎপুর রোডের জনতার মাথার উপর দিয়ে আমার দেশজননীর যেন আশীর্ব্বাণী ট্রামের ঘর্ঘর নিনাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আমার কর্ণকুহরে বাজতে লাগ্‌ল— "বৎস, সার্থক তোমাকে জন্ম দিয়েচি।" আমারও মনে হতে লাগ্‌ল, সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা এই যে সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরলা বঙ্গভূমিতে আমি এতদিন জীবন-যাপন করে এলুম, আজ তার ঋণ শোধ করতে পারলুম, আজ আমার ভাই বাঙ্গালীকে— যে বাঙ্গালী প্রতাপাদিত্যের বংশধর, যে বাঙালী সিংহলজয়ী বিজয়সিংহের বিজয়গৌরবমণ্ডিত, যে বাঙালী রঘুনন্দনের স্মৃতিভাষ্যের জটিল বটবৃক্ষচ্ছায়ায় লালিত সেই আমার ভাই বাঙ্গালীকে আজ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছি যে ম্যালেরিয়া একটা রোগ, এবং যে-কেহ স্বাস্থ্য লাভ করতে ইচ্ছুক এই রোগের হাত থেকে তার পরিত্রাণ পাওয়া চাই।

আবার কাল শান্তিনিকেতনে ফিরব।[২] আগামী ১০ মার্চ্চে মঞ্জুর বিবাহ।[৩] সেই বিবাহে আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। বোধহয় ৭ই মার্চ্চ তারিখে কলকাতায় আসব, তারপরে ১৪ই মার্চ্চে চীনে যাত্রা করব। খুব বেশি উৎসাহ বোধ হচ্চে না, কেননা শরীর ভাল নেই। কিন্তু চীনের নিমন্ত্রণ

অস্বীকার করা চলবে না।

এতক্ষণ তোমার সঙ্গে হাসি তামাসা করেচি এখন একটু গম্ভীর হতে হবে। ইচ্ছে করেনা গম্ভীর হয়ে তোমার মনকে নাড়া দিতে— কিন্তু অত্যন্ত আবশ্যক বলেই তোমাকে বলচি। তোমার একটা কথা বিশেষ জানা উচিত যে তোমার সম্বন্ধে বুড়োদের[৪] বাড়িতে কুশ্রীরকম অপমানজনক কথাবার্ত্তা চল্‌চে। এমন একটা অবস্থায় এসে ঠেকেচে যে তোমার সঙ্গে বুড়োর বিবাহ কোনোমতেই সম্ভবপর নয়। অথচ তুমি এখনো যদি বুড়োকে চিঠি লেখ তাহলে কেবল যে তোমারই আত্মসম্মানের হানি হবে তা নয় তোমার বাপ মায়ের প্রতি অবমাননা টেনে আনবে। আমি গোপনে বলচি তোমার সম্বন্ধে তোমার বাবাকে অপমান করতে বুড়োর বাড়ি থেকে আর একটু হলে চেষ্টা করা হচ্ছিল এ সত্ত্বেও যদি তুমি বুড়োকে চিঠি লিখ্‌তে না ছাড়ো তাহলে তাকেও তুমি বিপদে ফেল্‌বে, নিজেদেরও অপমানিত করবে, আর তা ছাড়া এতে আমারও খুব লাঞ্ছনা হবে। আমার সম্বন্ধেও ওদের বাড়িতে আলোচনা চল্‌চে তুমি যদি এখনো আত্মসংবরণ করতে না পার তাহলে আমার পক্ষেও গুরুতর লজ্জার কারণ হবে। অবশ্য জানি, আমি না বুঝে গোড়াতে প্রশ্রয় দিয়েচি— সেটা আমার গভীর বেদনা ও অনুশোচনার বিষয় হয়ে রয়েচে। অনেকটা পরিমাণে আমারই উৎসাহে যখন বুড়োর প্রতি তোমার হৃদয় আবদ্ধ হয়ে পড়েচে, তখন হঠাৎ সেদিক থেকে তোমার ভালোবাসা প্রত্যাহরণ করতে বল্‌লেই যে অমনি তখনি সেটা সুসাধ্য হবে এটা আশা করাই যায় না। কিন্তু ভালোবাসারও ত একটা আত্মসম্মান এবং একটা দায়িত্ব আছে। বুড়োকে যখন তুমি ভালোবাসো তখন বুড়োর কল্যাণের কথাও ত তোমার ভাবা উচিত।[৫]
[১২ ফাল্গুন ১৩৩০]

[স্বাক্ষরহীন। অসম্পূর্ণ?]

১৩৬

২ মার্চ ১৯২৪

ওঁ

[কলকাতা]

রাণু

সেই তেতলার কোণের ঘর, সেই নীচের বিছানা, সেই তাকিয়ার গিরিমালা, আর মাথার উপর সেই পাখা ভ্রাম্যমান, আর সেই ভানুদাদা the Mysterious। তফাতের মধ্যে এই যে, পাশ ফেরবার সময় এখন আর পাড়াসুদ্ধ লোক খবর পায় না। এমন কি কম্পিতচরণে চলেও বেড়াতে পারি। তাই বলে লম্বা চিঠির দাবী করলে রক্ষা করতে পারব না। এতদিন পরে আজ মাথার উপর জল ঢেলে স্নান করেচি— তবুও চল্‌তে যেমন পা টলে লিখ্‌তে পড়তেও তেমনি মাথাটা টলোমলো করে। তাই অধিকাংশ সময় তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে কাটাই। মাঝে মাঝে গগন বাবু[১] এসে দেখা করে যান,— প্রায়ই একজন বিশেষ লোকের কথা তিনি আলোচনা করেন— আমার বিশ্বাস সেই আলোচনা করবার জন্যেই তিনি আসেন আমাকে দেখবার জন্যে না। তিনি উক্ত ব্যক্তির অনেক গুণ আবিষ্কার করেচেন— তার তালিকা যদি দিই পত্রে স্থান হবে না। তাঁর বড় দুঃখ যে এতবড় গুণীর অভিনয় জগতের লোক দেখতে পেলে না। আমি যতটা পারি তাঁকে সান্ত্বনা দিই। তোমার কোনো খবর কেন পেলুম না? সন্তোষ[২] একেবারে বোলপুরে ফিরেচে নইলে তার কাছ থেকে তোমার খবর আদায় করে নিতুম। ইতি ১৯ ফাল্গুন ১৩৩০

ভানুদাদা

১৩৭

৭ মার্চ ১৯২৪

ওঁ

[কলকাতা]

রাণু

কলকাতার ঠিকানায় লিখেচ বলে তোমার চিঠিখানি আজ এইমাত্র পেলুম। তোমাকে যে বেদনা দিয়েছিলুম তারি কান্নার চিঠি এতদিন পেয়ে আসচি। তুমি জাননা এতে আমাকে কত ব্যথিত করে তুলেছিল। আমার পরের চিঠি পেয়ে তোমার হৃদয়ের ক্ষতযন্ত্রণা অনেকটা দূর হয়েচে এইটি জানবার জন্যে আমার মন অপেক্ষা করেছিল। সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন ঝড় বইতে থাকে তখন তার সমস্ত অশ্রুরাশি তরঙ্গিত হয়ে ওঠে— ঝড় থেমে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ থাকে ঢেউয়ের ভিতরকার সেই কান্না, তোমার এই চিঠির ভিতরেও তোমার ব্যথার সেই ঢেউ এখনো যেন ফুলে ফুলে উঠ্‌চে। যাক্‌ সে ঝঞ্ঝা কেটে গেছে— এখন তোমার মনের উপর একটি প্রশান্ত প্রসন্নতা মেঘমুক্ত প্রভাত আলোর উপর বিকীর্ণ হোক। এতে তোমার ভালোই হবে রাণু— দুঃখের এই মন্থনের ভিতর দিয়ে নিজের অন্তরের গভীরতাকে তুমি উপলব্ধি করেচ— এ আর তুমি কখনো ভুল্‌তে পারবে না। কুমারসম্ভবের গল্প ত জান। জীবনকে হাল্কা করে' জীবনের চরম সাধনার জিনিষকে পাওয়া যায় না। গভীর দুঃখের তপস্যায় নিজের পরম পরিপূর্ণতাকে স্পর্শ করা যায়। এই দুঃখের আঘাত তোমাকে চিরদিনের মত উদ্বোধিত করুক, জীবনের উপরিতলের চঞ্চল ফেনিলতার ভিতর দিকে নিজের মধ্যেকার যা শ্রেষ্ঠ তাকেই লাভ কর। অনেকদিন আমি এই ভেবেচি, আমি ইচ্ছে করেচি, আমি তোমাকে আর কিছু দেবার অবকাশ যদি না পাই তবে যেন তোমার গভীরতম আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

চীনে যাবার দিন কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল। ২৮শে মার্চ আমাদের

জাহাজ ছাড়বে। পথটা অনেকদূর পর্য্যন্ত খুব গরম হবে। তার পর যখন চীনের উত্তর অংশে যাব তখন আবার ঠাণ্ডা পাব। পথে সমুদ্রের উপর বেশ বিশ্রাম করতে পারব। ঢেউয়ের দোলায় আমাকে আজকাল আর দুঃখ দেয় না। প্রথম যখন সমুদ্রের পরিচয় পেয়েছিলুম তখন সেটা একবারেই সুখকর হয় নি। তিনদিন এত বেশি কষ্ট হয়েছিল যে যদি জাহাজ ডুবত তা হলে আমি উদ্বিগ্ন হতুম না। গেলবারে জাপানে যাবার সময় বঙ্গোপসাগরে প্রলয় ঝড়ের দোলা খেয়েও আমি কাতর হই নি। বাইরের দোলায় আমাকে কাবু করে না বটে কিন্তু ভিতরে যাত্রিদের গোলমাল, আর তাদের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা জটলা করে থাকা, আমার পক্ষে ভারি অসহ্য। সিঙ্গাপুর পর্যন্ত আমরা ইংরিজি জাহাজে যাব— অতএব ঐ ক'টা দিন ইংরেজের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করতেই হবে। ইংরেজের উপর আমার কোন রাগ নেই কিন্তু এসিয়ার গরম হাওয়ায় যাদের মেজাজ একেবারে পাকা রকমে গরম হয়ে গেচে তাদের কাছে গেলে সাত হাত দূর থেকেই গায়ে যেন কড়া আঁচ লাগ্‌তে থাকে। কিন্তু জাপানী জাহাজে ভারি আরাম। ওরা এত ভদ্র, আমাকে এত যত্ন করেছিল, এবারেও আমাকে ওদের জাহাজে নিয়ে যাবার জন্যে এত আগ্রহ করচে, যে ওদের জাহাজে আমি যেন মান্য অতিথির মত থাক্‌তে পাব। আরবারে জাহাজের কাপ্তেন আমাকে তার নিজের নাবার ঘর ছেড়ে দিয়েছিল— ডেকের উপরে যেখানে যেমন করে খুসি বসে লেখাপড়া করতে পারতুম। ইংরেজের জাহাজে সে সম্ভাবনামাত্র নেই।

ক্রমে গরম পড়ে আসচে। ক্ষণে ক্ষণে মনের ভিতরটাতে বসন্তকালের ডাক এসে পৌঁচচ্ছে। এমন এই জোড়াসাঁকোর গলিতেও তার স্পর্শ যেন রক্তের মধ্যে নাড়া দিয়ে যায়। এখন কি চীনে যেতে একটুও ইচ্ছে করে? এই রোদ্দুরের রংটা আমার চোখেতে কি রকম নেশা লাগায়। চিরদিনই কি আমার এইরকমই চলবে? ছেলেবেলাতেই এই অপরূপের স্পর্শ যেরকম

উতলা করে দিত এখনো ঠিক তাই করে। সেইজন্যেই কোনোমতেই পাকা কাজের লোক হয়ে উঠ্‌তে পারলুম না— প্রকৃতির খেলার অঙ্গনেই আমার সময় কেটে গেল। এই জোড়াসাঁকোর গলিতেও দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিনটে কবিতা লিখেচি।[৪] কাগজে ছাপা হলে কোনো সময় পড়ে দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু যার কবিতা, তার নিজের মুখে শুন্‌লেই তবে ওর রসটা পুরোপুরি পাওয়া যায়। আমার মুস্কিল এই যে, যে কবিতা নতুন লিখি তারই রস আমার কাছে তাজা থাকে, পুরোণো হলেই তার সুরটা আমার নিজেরই কাছে মোটা হয়ে আসে, আমি তাকে ঠিক সুরে পড়তে পারি নে।— আগামী রবিবারে কলকাতায় আমাকে একটা সভাপতির কাজ করতে হবে[৫]— তার পর দিন মঞ্জুর বিয়ে। তার পরে মঙ্গলবারে[৬] শান্তিনিকেতনে গিয়ে জাহাজ ছাড়বার [আগে] দুই একদিন পর্য্যন্ত চুপ করে বসে চীনের বক্তৃতা লিখব। ইতিমধ্যে তুমি মনকে ঠাণ্ডা করে বেশ ভালো করে পড়াশুনো করে নিয়ো রাণু। আজ আর দেরি করলে ডাক ধরতে পারা যাবেনা।

তোমার ভানুদাদা

১৩৮

[১১ মার্চ ১৯২৪]

*Rabindranath Tagore

[কলকাতা]

রাণু

কলকাতায় যখন শেষবার এসেছিলুম তখন তোমাকে শেষ চিঠি লিখেছিলুম। আজ আবার শান্তিনিকেতনে যেতে হবে আজ একখানি লিখ্‌তে

বস্‌লুম। তোমার সঙ্গে কথা ছিল যে তোমার চিঠি পেলে তবে তার উত্তর দেব, আজ তার ব্যতিক্রম করা হল তার কারণ বলি। কথা ছিল আমাদের জাহাজ ২৭শে মার্চ্চে ছাড়বে— তার পরে হঠাৎ শোনা গেল ২১শে মার্চ্চে। অর্থাৎ আর প্রায় সপ্তাহখানেকের মধ্যে। এই কয়দিন আমার সময় খুব অল্পই থাক্‌বে। আমাকে চেষ্টা করতে হবে চীনের জন্যে একটা লেকচার লিখ্‌তে। তা ছাড়া বিদায়ের পূর্ব্বে এই কয়দিন নানা রকম কাজের আর নানা রকমের লোকের ভিড় থাক্‌বে। সুবীর[১] এসেছে, তার কাছে শুন্‌লুম যে, তোমাদের পরীক্ষা আগামী ৩১শে তারিখে। নিশ্চয়ই এতদিন নানা গোলেমালে তোমার পড়াশোনার পক্ষে অন্তরে বাহিরে নানা রকম ক্ষতি হয়েচে। এই কয় সপ্তাহ বিনা বিঘ্নে, মনকে শান্ত রেখে পরীক্ষার জন্যে ভালরকম করে প্রস্তুত হতে পার এই হলেই ভাল হয়। আমাকে চিঠি লেখবার জন্যে তুমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হোয়ো না। যদি এর মধ্যে অল্প কিছু অবকাশ পাও এবং সহজেই লিখ্‌তে পার তা হলে ছোট্ট চিঠিতে তোমার যা কিছু মনের কথা বা গল্প বলবার আছে বল্‌তে পার। চিঠির আয়তন বড় হলেই যে বড় চিঠি তাকে বলে তা নয়। যে চিঠি সহজ স্বাভাবিক, যার ভিতর দিয়ে লেখকের কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাওয়া যায়, যার ভিতরে মুখ চোখের ইঙ্গিত পর্য্যন্ত যেন প্রকাশ পায় সেই চিঠিই চিঠি। আসল কথা যখন দূরের লোক চিঠির ভিতর দিয়ে সাম্‌নের লোক হয়ে দাঁড়ায় তখনি চিঠির কাজ হয়। কিন্তু যখন কেবল কথা শোনা যায় গলা শোনা যায় না, হাতের অক্ষরে দেখা যায় মুখের ভাব দেখা যায় না, তখন সে চিঠি মরা চিঠি। তোমার চিঠিতে তুমি ঠিক প্রকাশ পাও— তার কথা তোমাকে একটুও ছাপিয়ে ওঠে না। আমার চিঠি অনেক সময়েই কেবল রচনামাত্র। তার কারণ হচ্চে এই, আমি অনেক সময়েই কিছু না কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তা করি। এই যে এতকাল ধরে লিখে এসেছি সব লেখাতেই কিছু না কিছু বিষয় আলোচনা করেচি। এই জন্যে কলম হাতে লিখ্‌তে বস্‌লেই

১৮॥১৭

অভ্যাসক্রমে মানুষের চেয়ে বিষয়টাই বড় হয়ে ওঠে— তাতে করে চিঠিটা মারা যায়। সাধারণত মেয়েরা পুরুষদের [চেয়ে] ভাল চিঠি লেখে, তার কারণ, মেয়েরা আপনাকে প্রকাশ করে, পুরুষরা চিন্তাকে প্রকাশ করে। তুমি যখন যা' তা' নিয়ে গল্প করে যাও শুন্‌তে বেশ ভাল লাগে, কেননা, সেই কথার ধারা তোমার প্রাণের ধারা। তোমার চিঠিও সেই রকম। তাই বল্‌ছিলুম, তুমি যতটুকু সহজেই লিখ্‌তে পার, তাই লিখো ; যখন আমার সঙ্গে অল্প একটু সময়ের জন্যে কথা কয়ে নিতে ইচ্ছে হবে তখন লিখো। পড়াশুনো ফেলে তাড়াতাড়ি করে লিখ্‌তে যেয়ো না, আর বেশি লিখ্‌তে হবে তাও মনে কোরো না।

কাল সন্ধের সময় মঞ্জুর বিয়ে হয়ে গেল।[১] আজ সকালে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। বিয়ের কিছুদিন আগে থাকতেই ওর কান্না সুরু হয়েচে। ওর কান্না দেখে বুঝতে পারি মেয়েদের পক্ষে প্রথম শ্বশুর বাড়ি যাওয়া বল্‌তে কতখানি বোঝায়। স্বামীর উপর কতখানি ভালোবাসা থাক্‌লে এই বন্ধন ছেদনটা সহজ হয় তা ঠিক বুঝতে পারা পুরুষদের পক্ষে শক্ত। মঞ্জুর এই কান্নাটা নিশ্চয়ই ক্ষিতীশের মনকে খুব বেদনা দিচ্চে, তবে মনে হয়ত সংশয় হচ্চে মঞ্জু তাকে যথেষ্ট ভালোবাসে কি না। এই সংশয়ের উপর এই অনিশ্চয়ের উপরই মানুষের বড় বড় ট্রাজেডির পত্তন। আমরা জেনেশুনে যে সব দুঃখের সৃষ্টি করি তার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌তে পারি। কিন্তু কেই বা ঠিক করে অন্যের মন বুঝতে পারে, আর নিজের মনই বা নিশ্চিত বোঝে ক'জন। এই রকম আলো আঁধারে নিজের অগোচরেই যতরকম উৎপাতের সৃষ্টি হয়। আমি অনেকবার ভেবেচি মঞ্জু ক্ষিতীশকে ঠিক কতখানি ভালোবাসে? এ ত ভালোবাসার মরীচিকা নয়? মঞ্জুই কি তা ঠিক বল্‌তে পারে? উপস্থিতমত সে কি একটা মনে করে নিয়েছিল, তার পরে তার সত্যের পরীক্ষা ধীরে ধীরে হতে থাকবে। কিন্তু মোটের উপর এ কথা বলা যায় যে, দুজন মানুষের মধ্যে যদি অত্যন্ত

বেশি পার্থক্য না থাকে তাহলে ক্রমে ক্রমে সংসারবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধনও পাকা হয়ে উঠ্‌তে থাকে। যখন পরস্পরের সুখ দুঃখ ও সাংসারিক ক্ষতিলাভকে একান্তভাবে অন্তরঙ্গভাবে আপন করে নিতেই হয় তখন তারই যোগসূত্র দু'জনকে ধীরে ধীরে এক করে' আনে। জীবনের সম্মিলন থেকেই হৃদয়ের সম্মিলন হতে থাকে। দুজনের সম্মিলিত জীবনের ঐক্যের ভিত্তির উপরেই সংসারের সৃষ্টি হয়। এই সংসারটিই হচ্চে মেয়েদের সৃষ্টিক্ষেত্র, এইখানেই তাদের সমস্ত শক্তি আপনাকে কল্যাণের মধ্যে সুন্দরের মধ্যে প্রকাশ করতে পারে বলে এইখানে যে-মানুষকে মেয়ে আপনার একমাত্র অংশীরূপে পায় তার মূল্য আপনিই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। মঞ্জু আজও তার নিজের সংসারটিকে সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে নি বলেই তার মা বাপের সংসার ত্যাগ করে যেতে তার এত কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে তার আপন জীবন দিয়ে তার সংসার সৃষ্টি করতে পারবে, সেই মুহূর্ত্তেই তার বাপমায়ের সংসার তার কাছে ছায়ার মত হয়ে যাবে।

এবারে এখনো তেমন গরম পড়ে নি। যদিও এখন বেলা দুটো, তবু হাওয়া তেতে ওঠে নি। বাতাসটি বেশ মিষ্টি হয়ে বইচে, বেশ লাগ্‌চে। তুমি ত আমার এখানকার শোবার ঘরটা জান। সেইখানে বসে লিখচি। সামনে আমার পশ্চিম দিক। গগনদের বাড়ির সাম্‌নেকার সেই নিম গাছটির পাতায় পাতায় রোদ্দুর ঝিলমিল করে উঠ্‌চে। এ কয়দিন বিয়ের গোলমালের অবসানে আজ ক্লান্তিতে সবাই ঘরে ঘরে ঘুমচ্চে— লালবাড়িটার সামনে বাঁশের উঁচু মাচা করে যে নহবৎখানা তৈরি হয়েছিল সেটা শূন্য এবং নিঃশব্দ পড়ে আছে— ছাদের উপর বাঁশের খুঁটির উপর পাল খাটিয়ে খাবার জায়গা করা হয়েছিল সে সমস্তই অত্যন্ত নিরর্থকভাবে খাড়া আছে, কোথাও কোনো ব্যস্ততা নেই, জলের জালা, উদ্বৃত্ত কলা পাতা, খুরি, উৎসবসজ্জার নানা ভগ্নাবশেষ, আবর্জ্জনা হয়ে চারদিকে ছড়াছড়ি যাচ্ছে। মিনু[৫] শ্রীমতী[৬] রেখা[৭] প্রভৃতি মঞ্জুর সখীরা পাশের ঘরে বৌমা আর মীরার

সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত, পুপে তারও পরের ঘরটায় ঘুমচ্চে। কালকের ভোজের উচ্ছিষ্টের আকর্ষণে কাকের দল জড় হয়ে খুব কোলাহল বাধিয়ে দিয়েচে। শরীরটা অবসন্ন হয়ে আছে। কিন্তু এই শান্ত মধুর হাওয়ায় বেশ আরাম বোধ করচি। এইবার চিঠি বন্ধ করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করা উচিত হবে। কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুমোই নি। তুমি নিশ্চয়ই এখন তোমাদের কলেজে কোনো না কোনো লেকচারে মনোনিবেশ করে আছ— ঠিক এই সময়ে আমি যে তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি একথা তোমার কল্পনা করবারও অবসর নেই। [২৮ ফাল্গুন ১৩৩০]

ভানুদাদা

কাল ভোরের
গাড়িতে
শান্তিনিকেতনে
যাত্রা করব।

১৩৯
১৩ মার্চ ১৯২৪

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

আমাকে চীন থেকে যে নিমন্ত্রণপত্র[১] পাঠিয়েচে সে বোধহয় তুমি পড়ে দেখেচ। আমাকে ওরা কত আদর করে ডেকেচে আর আমার কাছে কত প্রত্যাশা করেচে। আমি তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণের যোগ্য কিনা জানি নে, কিন্তু স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি আমার উপর এই কাজেরই ভার

পড়েচে। আমাকে দেশে বিদেশে একটা বাণী বহন করে নিয়ে যেতে হবে আমার উপরে সেই হুকুম। সে বাণী যে কার সে আমি অনেক সময়ে নিজেই ভেবে পাই নে। কেন না আমি ত ইচ্ছে করে ভেবে বল্‌তে পারি নে। যেমন দক্ষিণের হাওয়ার মধ্যে যে অরূপ আনন্দ ভেসে বেড়ায় সেই আনন্দটি কেমন করে হঠাৎ বসন্তের লতার মধ্যে রূপ ধরে ওঠে তেমনি আকাশপথে যে অশ্রুত বাণী চলাচল করচে কেমন করে আমার অগোচরে সে আমার কথার মধ্যে স্বরগ্রহণ করে। সেই কথা আমাকে শোনাতে হবে এই হ'ল আমার একমাত্র কাজ। এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুবাবু' যখন আমাকে তিনটে বক্তৃতা' করতে বল্‌লেন আমি কিছুই ভেবে পাই নি আমি কি বল্‌ব। যখন সেনেট হলে গিয়ে দাঁড়ালুম দেখ্‌লুম অত বড় হল ঠাসাঠাসি ভর্ত্তি করি [য] লোক বাইরের বারান্দায় পর্য্যন্ত ভিড় করে দাঁড়িয়েচে। সবাই বলে চার পাঁচ হাজার শ্রোতা হয়েছিল। মনের মধ্যে ভয় হল, কিচ্ছুই ত তৈরি হয়ে আসি নি; এক টুক্‌রো কাগজে এক লাইনও নোট লেখা হয় নি। কিন্তু পালাবার পথ ত ছিল না। উঠে দাঁড়ালুম যেমন করে হোক বলতে আরম্ভ করলুম। দেখি বলবার কথা ত আপনিই জুটে যাচ্চে। সে সব কথা যেমন অন্যে শুনচে তেমনি আমি নিজেও শুনচি। সে ত আমারই বানিয়ে বলা কথা নয়। এর থেকে আমি এইটুকুমাত্র বুঝে নিয়েচি যে, আমি বাণীর বাহন— কাজেই এই বাণী ছড়িয়ে দেওয়াই আমার কাজ— আমাকে চুপ করে থাক্‌তে দেবে না, আমি একটা জায়গায় বসে থাক্‌তেও পারব না। কাজেই চীন আমাকে ডাক দিলে তখন আমাকে চীনে যেতেই হবে। অথচ আমি যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে' একটা পদার্থের দিকে তাকিয়ে দেখি তখন দেখ্‌তে পাই সে ত বিশেষ কেউ একজন নয়। তাকেই যদি কিছু একটা বল্‌তে হত তাহলে সে নেহাৎ বোকার মত বল্‌ত। তার বিশেষ কিছু জানাশোনাও নেই। হয় ত, জানাশোনার বোঝাই দিয়ে যদি তার মনের সমস্ত ফাঁক ভরা থাকত, তাহলে তার মধ্যে দিয়ে

আকাশবাণীর ধারা বইত না। বাঁশির সমস্ত ফাঁকটা যদি সোনা দিয়ে বোজানো হয় তাহলে কি বাঁশি বাজে?

তোমাকে যে এই কথাটা আজ লিখ্‌চি তার মানে হচ্চে এই যে, আমি বল্‌তে চাই এতে তুমি আনন্দিত হও। তুমি বিধাতার উপরে ঈর্ষা কোরো না। বোলো না, তোমার ভানুদাদাকে যদি নিজের কাজে দেশে বিদেশে ঘুরিয়ে না বেড়াতেন তাহলে তুমি তাকে আরো অনেকটা সময় কাছে পেতে। কিন্তু সেই ফাঁকা ভানুদাদাকে কাছে পেয়েই বা লাভ কি। বিধাতার বরখাস্ত করা সেই ভানুদাদা ত নিতান্তই বাজে লোক। সে তোমাদের কারো পরিচয়েরই যোগ্য হত না। সেই দীপ্তিহীন বাজে লোকটাকে আমি জানি। সে হচ্চে সকালবেলাকার আলো-নেবানো বাতি—নিতান্ত নিরর্থক। যাকে চীন ডেকেচে, আমার মধ্যে তাকে দেখে তুমি খুসি হও, রাণু। চীন আমাকে না ডাক্‌লে বেশ হ'ত এমন কথা তুমি মনে মনেও বোলো না। আমাকে খর্ব্ব করে' তা'তে ত তোমার লাভ নেই—বরঞ্চ তাতে তোমার ভানুদাদার অনেকখানিই বাদ গেল বলে তোমার সেটা লোকসান। আমাকে পৃথিবীতে কেবল একমাত্র যদি তুমিই পেতে তা হলে ত তুমি ঠক্‌তে— কেন না পৃথিবীর সেই একঘরে' হতভাগার মূল্যই বা কি। তোমার কাছে থাকার দ্বারাই তুমি যে আমাকে বেশি পাবে সে তোমার ভুল। আমাকে জগতের লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পাও যদি তাহলেই তুমি সব চেয়ে বেশি পাবে। আমি নিজে যখন কুঁড়েমি করে' আমার বারান্দার কোণ আঁকড়ে পড়ে থাকি, তখন অনেক সময় নড়তে গা লাগে না— ইচ্ছে করে এই রকম প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকি। তার প্রধান কারণ, সেই ছোট আমিটা যে কত বড় অভাজন তা' আমি জানি— মনে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না জগতের বড় ক্ষেত্রে সে কিছুই করতে পারবে—ভয় হয় যে, এবার তার ফাঁকি ধরা পড়বে। তাই ইচ্ছে করে চুপ করে' নিজের কাছে নিজে পড়ে থাক্‌তে। কিন্তু হঠাৎ পেয়াদা এসে জোর করে

ক জনসভায় নিয়ে আসে— তখন নিজের মধ্যে পূর্ণকে দেখে বিস্মিত হই। তখন বলি, ফাঁকি ত দেখ্‌তে পাইনে, ভয় কিসের। নিজেকে সেই সার্থক করে দেখার আনন্দ খুব বড় জিনিষ— তাতেই জীবনের সব গ্লানি চলে যায়, ছোট আমিটার সব অপরাধ মোচন হয়। তুমি যদি ভানুদাদাকে ভালোবাসো তা হলে তার এই সার্থকতাকে তুমি অভিনন্দন কর— যাতে সে সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে, ক্ষুদ্রতার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে, অবসন্ন হয়ে না থাকে সেই কামনা কর। যে কর্ম্ম সত্যই আমার, সেই কর্ম্মেই আমার মুক্তি— সেই মুক্তির মধ্যে যখন আমি নিজেকে দেখি তখনই আমার জীবনের আকাশ প্রসন্ন হয়ে ওঠে— আমার জীবনের সেই প্রসন্নতায় তোমার চিত্ত প্রসন্ন হোক্‌— আমার সঙ্গ পাওয়ার চেয়েও তাতে তুমি আমাকে অনেক বেশি করে পাও এই আমি কামনা করি।

অনেক রাত হল। ইতি ৩০ ফাল্গুন ১৩৩০

ভানুদাদা

১৪০

১৫ [১৬] মার্চ ১৯২৪

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

তুমি হয় ত ভাবচ এতক্ষণে আমি কলকাতায়। কারণ জাহাজ ছাড়বার সময় কাছে আস্‌চে। কিন্তু এখনো আশ্রম আঁকড়ে আছি। পর্শু মঙ্গলবার বিকেলের গাড়িতে কলকাতায় যাত্রা করব।[১] ইতিমধ্যে এখানে বসে যতটা পারি চীনের লেকচার লেখবার ইচ্ছে আছে। তোমাদের সেই দোতলার

ঘরের জানলার কাছে বসে তার প্রথম কয়েকটা পাতা লিখেছিলুম। মনে আছে তোমাকে ঘর থেকে কতবার তাড়া করেচি। কিন্তু খুব বেশিবার নয়। কেবল চার পাতা মাত্র লিখেছিলুম— তার বেশি আর এগোতে দাও নি। তুমি যেমন, তেম্‌নি তোমার একটি জুড়ি আছে সে থাকে আমার মস্তিষ্কের ভিতরে— সেটি হচ্চে আমার কবিতা, আমার গান। সেও যখন জানে আমি চীনের লেকচার লিখতে বসেচি অমনি বন্ধ দরজা ঠেলে ডাক দেয়, "কবি!"— আমি বলি— "থাক্, এখন থাক্, ব্যস্ত আছি।" সে আবার বলে, "কবি, একবার দরজা খোলো, আমি একটুখানি থেকেই চলে যাব।" তখন দিই দরজাটা খুলে— তার পরেই সে আমার মনটি দখল করে বসে, আর গুন্‌গুন্ তার গুঞ্জন চল্‌তে থাকে। সে তার কথা রক্ষা করে, একখানা গান হতেই সে চলে যায়। কিন্তু চলে গেলে হবে কি, মাথার মধ্যে গুন্‌গুন্ থামতে চায় না— চীনের লেকচারটার আর উপায় থাকে না। আসল কথা, বসন্তের আরম্ভ কালে এই সব গম্ভীর কাজ করা বড় শক্ত। অন্য সময়ে যে পাগলটাকে ভদ্রতার ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন করে রাখি, এই সময়টা সে আর বাঁধন মান্‌তে চায় না। সে বলে আমি অত্যন্ত ভদ্রলোকটির মত আমার কর্ত্তব্য কাজ করব না, চিঠি পেলে চিঠির জবাব দেবনা, লোক দেখা করতে এলে মধুর স্মিত হাস্যে তাকে অভ্যর্থনা করবনা, লীলমণি যখন এসে বল্‌বে স্নানের ঘরে গরম জল দিয়ে এসেচি তাকে তাড়া করে যাব। কিন্তু পাগলটাকে তার অজ্ঞাতবাস থেকে ছুটি দিয়ে একেবারে ছাড়া দিতে সাহস হয় না। তাহলে সভ্যলোকেরা অবাক্ হয়ে যাবে, বলবে, রবিঠাকুরের এই দশা? কাজেই জামার সব কটা বোতাম আঁটবার চেষ্টা করি, আর, কি কি উপায়ে মানুষের সদ্গতি হয় সেই সাধু প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে, খুব গম্ভীরভাবে তার সদ্যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়ে থাকি। এইগুলোই হচ্চে নিজের যথার্থ পরিচয় গোপন করা— কবিঠাকুরকে রবিঠাকুর করে প্রমাণ করা!

আজ নির্জ্জন মাঠের উপর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েচে। বেশ মধুর হাওয়াটি দিচ্চে। শালবীথিকায় ডালে ডালে শালের মঞ্জরী ধরেচে— চল্‌তে চল্‌তে এখানে ওখানে হঠাৎ তার গন্ধে চমক লাগিয়ে দেয়। যখন সমুদ্রে পাড়ি দিতে থাকব তখনি চাঁদ পূর্ণিমায় গিয়ে পৌঁছবে। নীল সাগরের উপর শুক্লরাত্রি খুব মধুর বটে— কিন্তু তবু, জ্যোৎস্না সেখানে যেন বিধবার মত। বড় বেশি নিরলঙ্কার, বড় বেশি নিঃসঙ্গ— সেখানে চাঁদ যেন তপস্বী শিবের ললাটের চাঁদের মত। গাছের ছায়াটি না হলে জ্যোৎস্নার ঠিক জুড়ি মেলে না। সেই যেন শ্যামের সঙ্গে রাধার মিলন।

মিস্ গ্রীন এবারে দেশে চলে যাচ্চে। আমাদের সঙ্গে চীন পর্য্যন্ত যাচ্চে। তার পরে যাবে আমেরিকায়। আজ তার বিদায়ের অনুষ্ঠান হ'ল।[২] লাইব্রেরি ঘরের বারান্দার পরে আলপনা কেটে, ফুল দিয়ে সাজিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করিয়ে, দামী একটি ময়ূরকণ্ঠী সিল্কের শাড়ি অর্ঘ্য দিয়ে বেশ একটু ধুমধাম করা হল। মেয়েরা গাইলে, "ভরা থাক্ ভরা থাক্"[৩] ইত্যাদি। শেষে একটা গান গাওয়ানো হল, তার আরম্ভটা হচ্চে এই রকম—

> "পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে'
> জানিয়ে দে তাই সাহস করে।"[৪]

ওটা আর কিছু নয়, নিজের পরিচয়টা ঘোষণা করে দিলুম।

আজ বোধ হয় অন্য দিনের চেয়েও বেশি রাত হয়েচে। আমার মগজটা ভিজে স্পঞ্জের মত ঘুমে একেবারে অভিষিক্ত হয়ে আছে তাহলে এবার শুতে যাই। কিন্তু দেখেচি শুয়েও ক্লান্তির অবসাদটা যেতে চায় না— ক্লান্তি আমার মেরুদণ্ডটার উপর ভর করে দিন রাত আমার সঙ্গ নিয়েচে। হয় ত জাহাজে চড়ে সমুদ্রের হাওয়ায় তাকে বিসর্জ্জন দিতে পারব। ইতি ২ [৩] চৈত্র ১৩৩০[৫]

ভানুদাদা

১৪১

[২২ মার্চ ১৯২৪]

*BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION CO.

S. S. [ETHIOPIA]

ওঁ

রাণু

রেঙ্গুনে পৌঁছিয়ে এই চিঠি ডাকে দিতে পারব। এখন সমুদ্রের মাঝখানে ভেসে চলেচি। কাল সকাল বেলায় গঙ্গার ঘাটে জাহাজে উঠ্‌লুম। তোমার বাবা ছিলেন আরো অনেক লোক আমাকে বিদায় করবার জন্যে ভিড় করেছিলেন। তার মধ্যে কিরণকে[১] অবলম্বন করে বুড়োও[২] এসেছিল। বোধ হয় তার বাবা তাকে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

জাহাজ প্রায় নটার সময় ছাড়ল। সেই আমাদের পুরোণো গঙ্গাতীর— এই তীর ছেলেবেলায় আমাকে কতদিন কি গভীর আনন্দ দিয়েচে। ধারে ধারে যখন সেই শান্ত সুন্দর নিভৃত শ্যামল শোভা দেখি আর এই উদার গঙ্গার কলধ্বনি শুনি তখন আমার সমস্ত মন এ'কে আঁকড়ে ধরে— ছোট শিশু যেমন মা'কে ধরে। আমি জীবনের কত কাল যে এই নদীর বাণী থেকেই আমার বাণী পেয়েছি— মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলব না। বস্তুত এই জীবনেই আমার সেই জন্ম কেটে গিয়েচে। ছেলেবেলায় যখন সমস্ত মনপ্রাণ নিয়ে এই জলস্থল আকাশের মহা-প্রাঙ্গণে আমার খেলা আরম্ভ করেছিলুম, সেই খেলার দিন আজ ফুরিয়ে গেচে— আজ এই বিপুল বিচিত্র মাতৃ অঙ্গন থেকে বহুদূরে এসেছি— সকালবেলাকার ফুলের সব শিশির শুকিয়ে গেছে— আজ প্রখর মধ্যাহ্নের [য] কর্ত্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করচি— আমার এই কর্ম্মের সঙ্গে পাখীর গান, নদীর কল্লোল, পাতার মর্ম্মর আপনার সুর যোগ করে দিতে পারচে না—

অন্যমনস্ক হয়ে আছি ; নীলাকাশে অনিমেষ দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে এসে তেমন অবারিত আত্মীয়তায় মিলচে না, কর্ম্মশালার জানলা দরজার ফাঁক দিয়ে এই বিশ্বের হৃদয় আগেকার মত তেমন সম্পূর্ণ করে আমার বুকের উপর এসে পড়ে না। মাঝখানে কত রকমের চিন্তার, কত রকমের চেষ্টার ব্যবধান। এই ত দেখ্‌চি, সেদিনকার লীলালোক থেকে আজকের দিনের কর্ম্মলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করেচি। তবু সেদিনকার ভোরবেলার সানাইয়ের সুরে ভৈরবী আলাপ এখনো ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে' মনকে উতলা করে দেয়। কাল গঙ্গার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্চিলুম, তখন কেবলি জলের থেকে আকাশ থেকে তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি থেকে এই প্রশ্ন আমার কানে আসছিল, মনে পড়ে কি? এবারকার এই দেহের ক্ষেত্র থেকে যখন বেরিয়ে চলে যাব তখনো কি এই প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়ের উপর হাওয়ায় ভেসে আস্‌বে? এবারকার এই জীবনের এই ধরণীঃ সমস্ত "জননান্তর সৌহৃদানি?" কাল দোলপূর্ণিমা গঙ্গার উপরেই দেখা দিল। জাহাজ বালির চরে আট্‌কে গিয়েছিল। তাই জোয়ারের অপেক্ষায় রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত আট্‌কা পড়ে ছিল। সমুদ্রে যদি দোল পূর্ণিমার আবির্ভাব হ'ত তা হলেই তার নাম সার্থক হত— তাহলে দোলনও থাকত, আর নীলের সঙ্গে শুভ্রের, সাগরের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলনও দেখ্‌তুম। আজ ভোরে উঠে দেখ্‌লুম জাহাজ কূলরেখাহীন জলরাশির উপরে ভেসে চলেছে— "মধুর বহিছে বায়ু।" আজ শনিবার। সোমবারে শুন্‌চি রেঙ্গুনে পৌঁছব। সেখানে দিনদুয়েক সভাসমিতি অভ্যর্থনা মাল্যচন্দন, বক্তৃতা, জনতার করতালিতে আমাকে চেপে মারবার চেষ্টা করবে। তারপরে বোধহয় বুধবারে কোনো একসময়ে মুক্তি পাব। ইতি [৯] চৈত্র ১৩৩০

ভানুদাদা

১৪২

[২৭ মার্চ ১৯২৪]

ওঁ

রেঙ্গুন

রাণু

আজ তিনদিন রেঙ্গুনে জাহাজ থেমে ছিল। তাই এখানকার জনসাধারণ হিড় হিড় করে' আমাকে ডাঙ্গায় টেনে আন্‌লে। এরা সকলে মিলে রিসেপ্‌শন কমিটি বলে একটা পদার্থ সৃষ্টি করেচে। সেই পদার্থ আমার কানের কাছে জয় কবিরাজ রবীন্দ্রনাথ টাগো-ও-ও-ওর কী জয় বলে চেঁচাচ্চে, আমার গলায় মালা দিচ্চে, আমাকে গল্‌দা চিংড়ির কালিয়া খাওয়াচ্চে, সহরের মাঝখানে একটা দোতলা বাড়ি ঠিক করে দিয়েচে, সেই বাড়িতে মানুষ আর মশা দিনরাত্রি ভন্‌ভন্‌ করচে। সেই পদার্থ আমাকে এক সভায় বিকেল চারটেয়, তার পরের সভায় সাড়ে পাঁচটায়, তারের [য] পরের সভায় সাতটায়, তার পরের ভোজে সাড়ে নটায় ঘুরপাক খাওয়াচ্চে। সেই পদার্থ আমাকে মাচার উপর চড়িয়ে বক্তৃতা করাচ্চে আর সভাপতিকে দিয়ে বলাচ্চে আমি একধারে কবি ঋষি তত্ত্বজ্ঞানী শিক্ষক স্বদেশপ্রেমিক ইত্যাদি ইত্যাদি— শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমে আমার বিশ্বাস হচ্চে যে, তারা যা বল্‌চে কথাটা সম্পূর্ণ আজগুবী নয়— নিশ্চয়ই সর্ব্বগুণ আমার মধ্যে মিলে আগুন হয়ে উঠেচে— এখন এর উপরে fire brigade লাগিয়ে দিয়ে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করলে বাঁচি। আজ অপরাহ্ণ দুটোর পর কমিটি রাহুর পূর্ণগ্রাস থেকে রবি বেরিয়ে আস্‌বেন। আজ বৃহস্পতিবারে জাহাজ ছাড়বে বেলা চারটের সময়— জাহাজের ঘাটে পৌঁছতে হবে দুটোর মধ্যে। কমিটি নামক পদার্থ— শতশতকণ্ঠকলকল নিনাদকরালা— আমার পিছন পিছন গলা ভাঙতে ভাঙতে চল্‌বে "জয় কবি-ই রা-আজ রবীন্দ্রনাথ টাগো-ও-ও-ওর কী জয়।" রবীন্দ্রনাথ তখন মালার ভারে

লজ্জার ভারে ঘাড় হেঁট করে অশ্বিনীকুমারদ্বয়বাহিতা ফিটন গাড়ির পরে নির্ব্বোধের মত বসে জনতাতরঙ্গবিক্ষুব্ধ অন্তরাত্মাকে সান্ত্বনা দেবার উপায় খুঁজে পাবে না।

যা হোক্ এ কয়দিন একমুহূর্ত্ত আমার শান্তি ছিল না, সময় ছিল না। কাল রাত্তির দুপুর পর্য্যন্ত হট্টগোলের অধিদেবতার আরতি করেচি। আজ ভোরের বেলা জনতা যখন তন্দ্রানিমগ্ন, যখন তার বহুসহস্রভুজৈঃধৃত খর করতালি নিস্তব্ধ, তখন সুখশয্যা ত্যাগ করে মাথায় জল ঢেলে ঢেলে দীপ্ত শিরার অভিষেক করলুম। তার পরে ভাবলুম সমুদ্রে পাড়ি দেবার পূর্ব্বে রাণুকে একখানা চিঠি লিখে যাই। এ চিঠি আমার পূর্ব্ব চিঠির এক সপ্তাহ পরে পাবে। এখান থেকে আর এক সপ্তাহ পরে পিনাঙের ঘাটে পৌঁছব। সেখান থেকে যে চিঠি ডাকে দেব, সে আরো এক সপ্তাহ পরে পাবে। তার পর সিঙ্গাপুর, তার পর হংকং, তার পর স্যাঙ্ঘাই। তার পরে ঘাটের থেকে বাটে উঠ্‌ব। রেলযান যোগে যাব পীকিনে। আজ হ'ল ২৭শে মার্চ্চ। আমার এ চিঠি যখন তুমি পাবে তখন তোমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেচে— নিশ্চয় অনুভব করতে পেরেচ যে তোমার পরীক্ষাপত্রীর মোটা মোটা মার্কাগুলি পয়লা বিভাগের ঘাটের অভিমুখে অনুকূল বায়ুতে পাল তুলে দিয়ে পাড়ি দিয়েচে। আগামী শীতে যখন ফিরে যাব তখন দেখব তৃতীয় বার্ষিকের উচ্চ গগনে তোমার বিদ্যাজ্যোতিষ্ক অধিরোহন করেচে।

এখানে আমাকে নিয়ে যে মথন কাণ্ড চল্‌চে তার বিস্তারিত বিবরণ হয় ত খবরের কাগজে পাবে। তার আলোচনা করতে আমার আর রুচি হয় না। আমি ক্লান্ত। এখানে দুটি জিনিষ আমার সব চেয়ে ভালো লেগেছে— কাল এখানকার চিনীয় (Chinese) সমাজ আমাকে যে অভ্যর্থনা করেছিল সে বেশ সংযত সুন্দর সরল সহৃদয়। আর পর্শু সন্ধ্যায় একটি ব্রহ্মানী মেয়ে আমাকে নাচ দেখিয়েছিল। তার নাচ ভারি মনোহর, ঠিক যেন পল্লবিত লতার উপরে কখনো পূর্ব্বদিক থেকে কখনো দক্ষিণ

দিক থেকে বাতাসের হিল্লোল লেগে তাকে লীলাচঞ্চল করছিল।— সূর্য্য উঠেচে— জনতাও শয্যাত্যাগ করেচে, তাদের পদধ্বনি দূর থেকে অনুভব করতে পারচি। ইতিমধ্যে কিঞ্চিত ফল ও মিষ্টান্ন ও এক পেয়ালা চা খাবার অভিপ্রায় করচি। তুমি নিশ্চয় এতক্ষণে প্রত্যূষের দিক্‌প্রান্তলগ্না চন্দ্রকলার মত শয্যাতলে বিলীনা। কারণ তোমাদের বারাণসীর আকাশে এখনো রাত্রির পালা শেষ হয় নি। [১৪ চৈত্র ১৩৩০]

তোমার ভানুদাদা

১৪৩

[২৮।২৯ মার্চ ১৯২৪]

ওঁ

*BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION CO LTD

S. S. [Ethiopia]

রাণু

পিনাঙের ঘাট কাছে আসচে। বোধ হয় পর্শু দিন পৌঁছব। সমুদ্র অতি শান্ত, তরল নীলাকাশের মত স্থির। কেবল জাহাজের কলের হৃৎস্পন্দন ধক্‌ধক করচে। সূর্য্যের কিরণ প্রখর। আমার ক্যাবিন পশ্চিমধারে— এতক্ষণ সেখানে বসে লেকচার লিখ্‌ছিলুম। কি গরম! মনে হচ্ছিল সমস্ত ঘরটার যেন জ্বর হয়েচে। যেন একটা সর্ব্বব্যাপী মাথাধরার মধ্যে বসে আছি। শিলাইদহে পদ্মার ধারে বালির চরে গরমের তাতে বড় বড় ফুটিগুলোকে পেকে ফেটে যেতে দেখেছি। আমার মনে হচ্ছিল কাপড়ের অন্তরালে

আমার দেহখানা ক্রমেই পেকে উঠ্‌চে, আর খানিক বাদেই ফাট্‌তে আরম্ভ করবে।

উপরে চলে এসেছি। সিঁড়ির কাছে এক কোণে একটা চিঠি লেখবার ডেস্ক আর কাগজ কলমের ব্যবস্থা আছে। মনে করলুম রাণুর সঙ্গে একটু গল্প করে আসি। কিন্তু লিখে লিখে মাথাটা ক্লান্ত আর ঘেমে ঘেমে শরীরটা অবসন্ন গায়ে খানিকটা ওডিকলোন্‌ মেখে এসেচি কিন্তু তার গন্ধ তোমার বেনারসের পড়বার ঘরে পৌঁছবেনা। আজ বোধ হচ্চে আটাশে কিম্বা ঊনত্রিশে। এখন নিশ্চয় কলেজের ক্লাসে তোমাকে যেতে হয়না। ঘরে বসেই ত্রিকোণমিতি অভ্যাস করতে লেগে গেছ। এখানে এখন বেলা পাঁচটা— সেখানে হয় ত দুপুর কিম্বা একটা হবে। আমাদের সঙ্গে এই জাহাজে সেই বেহালার ওস্তাদ প্রেমিস্‌লাভ্‌ এবং তাঁর স্ত্রী যাচ্চেন। ওঁদের সঙ্গে আমাদের খুব জমেচে। আরও অনেক নরনারী আছে কিন্তু তারা যেন সমুদ্রের ওপারে আছে বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে সকালে বিকালে একটুখানি মাথা-নাড়ানাড়ি এবং গুড্‌ মর্ণিং গুড্‌ আফটারনুন্‌ চলে।

রেঙ্গুনে কয়দিন খুবই ধুমধাম গোলমাল হাততালি ইত্যাদি চলেছিল। আসবার আগের দিন একটি চীনের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। সে পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তার ইচ্ছে বিশ্বভারতীতে গিয়ে অন্তত একবছর থেকে আমার কাছে সাহিত্য অধ্যয়ন করে। এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে সে আমার সঙ্গে এত ভাব করে নিলে যে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। ঘাটে এসে দেখি, সেখানে সে উপস্থিত। জাহাজ ছিল মাঝনদীতে কিছু দূরে। একটা ছোট স্টীমারে সব যাত্রীদের সেখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা ছিল। মেয়েটিও সেই জাহাজে উঠে পড়ল। আমার হাত চেপে ধরে বল্লে, আপনি চলে যাচ্চেন, আমার কষ্ট হচ্চে,— ফিরে এলে যেন আপনাকে দেখ্‌তে পাই। যখন ছোট জাহাজ আমাদের জাহাজে এসে পৌঁছল, আমি বল্লুম, এবার

গুড বায়। সে আমার বুকের উপর এসে পড়ল— চারদিকে সব লোকজন, তার তাতে খেয়াল নেই, সবাই হাস্‌তে লাগ্‌ল। জাহাজে আমার ক্যাবিনে মুখ ধুয়ে যখন জিনিষপত্র গোচাচ্ছি সে তার একটি আত্মীয় পুরুষের সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত। এল্‌মহর্স্টকে ডেকে বল্‌লে তুমি কবিকে খুব যত্ন কোরো, দেখো এঁর শরীর যেন কিছুতে ক্লান্ত এবং অসুস্থ না হয়। এল্‌ম্‌হর্স্ট্‌ বল্‌লে, আমি এত বড় দায়িত্ব নিতে পারব না, আমার বদলে তুমি না হয় এসো। ও বল্‌লে আমার যদি যাবার কোনো সুবিধে থাকত আমি নিশ্চয় যেতুম, দেখ্‌তে আমি কত যত্ন করতুম। ব'লে দুই হাতে আমার হাত চেপে ধরে রইল। জাহাজ যখন ছাড়ে ছাড়ে তার আত্মীয় তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল। তার পরে দূর থেকে রুমাল ওড়াতে ওড়াতে সেই ছোট জাহাজে করে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগ্‌লুম, আমার এ কি দশা! কেউ বা ভারতবর্ষে বলে, তুমি থাকো, যেয়ো না, কেউ বা বর্ম্মায় বলে, তুমি থাকে [য] যেয়ো না, কেউ বা হয় ত চীন দেশেও বল্‌বে। অথচ আমার যিনি কর্ণধার আমাকে একঘাট থেকে আরেক ঘাটে ভাসিয়ে নিয়েই চলেচেন, কোথাও আর থামতে দিলেন না— দূরের থেকে একটা রুমাল ওড়া দেখা যায়, আর চোখের কোণে দুয়েক ফোঁটা জল মুছ্‌তেও দেখ্‌তে পাই— যাই, ডেকের উপর এবার একটু হাওয়া খেয়ে আসিগে— সূর্য্য বোধ হয় এতক্ষণে নীলজলের মধ্যে সোনার ঘটে করে' দিবালোকের শেষ রশ্মিধারা নিঃশেষ করে ঢেলে দিচ্চেন।

তোমার ভানুদাদা

১৪৪

১৭ চৈত্র ১৩৩০

ওঁ

*P. K. NAMBYAR
ADVOCATE & SOLICITOR

3. UNION STREET

PENANG———192

S.S AND R.M.S.

—

TEL ADDRESS :
"NAMBYAR. PENANG"

রাণু

আজ জাহাজ পেনাঙে এসে পৌঁছেচে। জাহাজে থাকতে তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিলুম। সে চিঠি আজই ডাকে রওনা হবে। সুতরাং এ চিঠি নিতান্তই বাহুল্য হবে তবু নিশ্চয়ই তুমি সে বাহুল্য সইতে পারবে। এ চিঠি এখান থেকে না পাঠিয়ে এর পরের ঘাট থেকে পাঠাব। পরের ঘাট কোথায় তার ভূগোলবৃত্তান্ত হয়ত তুমি না জানতে পার— অন্তত আমি ত জানতুম না। সে এখান থেকে আরও কিছু দক্ষিণে, তার নাম Port Sweatenham। জানিনে বানানটা ঠিক হল কিনা। সেখানে হয়ত পর্শু পৌঁছব। জাহাজ রেঙ্গুন ত্যাগ করে অবধি ক্রমাগত দক্ষিণের দিকে চলেচে। তাই ক্রমেই গরম বেড়ে উঠেচে। কাল পর্শু দুইরাত্রি ভালো ঘুমোতে পারি নি। আজ সকালে উঠে ভারি ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল। আজই সকালে জাহাজ পিনাঙে এসে নোঙর ফেল্‌লে। এখানকার ভারতীয় ও চিনীয় অধিবাসীদের তরফে একদল লোক জাহাজে আমাকে গ্রেফতার করতে এল। নাবালে। বাস্ রে, কি কাণ্ড কি ভীড়। বোধ হয় পিনাঙের সহরে যত পুরুষ আছে সবাই সেখানে জমা হয়েছিল। আমার সামনে দাঁড়িয়ে

১৮॥১৮

বাজনদাররা শানাই ঢাক ঢোল বাজিয়ে আকাশ তোলপাড় করতে লাগল। এক একদল করে অভ্যর্থনার দল এসে মোটা মোটা গড়ে' মালা আমার কাঁধে চাপাতে লাগ্‌ল। কাঁধে আর জায়গা ছিল না— কাঁধ ছাপিয়ে মুখের অর্দ্ধেক ঢাকা পড়ে গেল— মালার ভারে আমার ত মাথা হেঁট। চষমা সামলানো দায়, নিঃশ্বাস নেওয়া কঠিন। বহুকষ্টে বিষম ভিড় ঠেলে মোটর গাড়িতে উঠে পড়লুম। কিন্তু মোটর চলে কি করে। হাজার হাজার লোক ডাইনে বাঁয়ে ঠেলাঠেলি বাধিয়ে দিয়েচে— তারা আমার পা ছুঁয়ে যাবে। তাদের তুফানের ভিতর দিয়ে মোটর অতিশয় ধীর গমনে চল্‌তে লাগ্‌ল। কোনোমতে একটা বাড়িতে এসে পৌঁচেছি।[১] আমার যারা সঙ্গী, যথা, এল্‌মহর্স্ট্‌, মিস্‌ গ্রীন, কালিদাস, নন্দলাল, ক্ষিতিবাবু সবাই দল বেঁধে গেছেন সহর ঘুরে আস্‌তে। বেশি কিছু দেখবার নেই। শুনেচি কোথায় এক চীনে মন্দির আছে, আর আছে একটা ঝরনা। আমি সম্পূর্ণ একলা। জানলার একদিক থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্চে, আর সামনেই আম বট কাঁঠাল তেঁতুল নারকেলের আন্দোলিত পাতাগুলির উপর সকালবেলার রোদ্দুর ঝল্‌মল্‌ করচে। ডানপাশের জানলার নীচে বড় রাস্তা। সেই রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেছে আমাকে দেখবার জন্যে। অনেকদিন পরে মাটির পৃথিবীর পরে আকাশের নীল, আর গাছের সবুজের উপর রোদ্দুরের সোনা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। মনে হচ্চে যেন নির্ব্বাসনের পর ঘরে ফিরে এসেচি। একটা জিনিষ আজও আমার কিছুতেই অভ্যেস হল না। কোনোকালেই হবে না। যখন ভিড় ঠেলাঠেলি করে' আমার পায়ের কাছে ভক্তির অর্ঘ্য আস্‌তে থাকে একেবারে যেন মুষলধারায় তখন আমি কিছুতেই তা গ্রহণ করতে পারিনে। এত অদ্ভুত অসঙ্গত মনে হয় যে কেমন যেন আমার মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবি আমাদের লোক কোনোমতে ভক্তি করতে পারলেই বাঁচে বলেই এমনতর অঘটন ঘটে— মুরগীকে পাথরের ডিম দিলেও সে তা দিতে বসে এও তেমনি। আমি মাঝে মাঝে আপত্তি করতে,

বাধা দিতে চেষ্টা করেচি— কিন্তু তাতে উল্টো ফল হয়— আমার বিনয় থেকে লোকের ভক্তি আরো বেড়ে যায়। মোটের উপর আমি ভেবে দেখেচি ভিড়ের জগৎ আমার জগৎ নয়। ভক্তি বল, খ্যাতি বল এতে আমাকে ঘূর্ণিঝড়ের মাঝখানকার পাখীর মত বড়ই ব্যাকুল করে' তোলে। ছোট ছিলুম যখন তখন আমার আত্মীয়েরা আমাকে চাকরদের জিম্মে করে দিয়ে একটি অতি ছোট্ট কোণে নির্ব্বাসিত করে দিয়েছিলেন। সেই কোণের আকাশটুকুকে আমি আমার নিজের মনের নানারঙের ভাবনা দিয়ে ভরে তুলেছিলুম, আমার সেই ভাবনাভরা আকাশটাই আমার নিজের সৃষ্টিক্ষেত্র। সেখান থেকে বেরিয়ে এলেই আমার মন উতলা হয়ে ওঠে। আজ সকালে অনেকদিন পরে নীল আকাশের সবুজ সোনার মিলন দেখে আমার সেই অবকাশভরা কোণের কথা মনে পড়চে। তাই মন উতলা হয়েচে— আকাশের সমস্ত ফাঁকটা যেন ভৈরবী রাগিণীর করুণরসে একেবারে অশ্রুপ্লুত হয়ে রয়েচে। তার উপর শরীর ক্লান্ত আর ঘুম কেবলি থেকে থেকে চেতনার সমস্ত জানলা দরজার পর্দ্দা টেনে টেনে দিচ্চে। একটা কেদারায় হেলান দিয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করিগে। ৩০শে মার্চ ১৯২৪

তোমার ভানুদাদা

১৪৫

[৩১ মার্চ ১৯২৪]

ওঁ

[Swellenham]

রাণু

আজ সকালে Swellenham বন্দরে জাহাজ পৌঁছল। এখানকার ভারতীয়গণ ধরে নিয়ে এলেন কুয়ালা লাম্‌পুর নামক সহরে। বন্দর থেকে

তিন মোটর গাড়ি বোঝাই করে বেরলুম। দুই ধারে কোথাও ঘন অরণ্য, কোথাও রবর গাছের চাষ, মাঝে মাঝে চিনেদের পাড়া, কোথাও বা মালয়দের গ্রাম। এত ঘন গাছপালা কোথাও দেখা যায় না। তার কারণ এখানে প্রায় সম্বৎসর বৃষ্টি হয়। ঘন সবুজ। নীল মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। সেই মেঘের ছায়া এখানকার অরণ্যের ছায়ার সঙ্গে যেন মালাবদল ও গ্রন্থিবন্ধনের উৎসবের মত দেখাচ্ছিল— শ্যামল পৃথিবীর আকাশের মিলন। অপরাহ্নে এই নিবিড় ধূসর ছায়া খুব ভাল লাগছিল। অনেকদিন এমন মেঘের ঘটা দেখি নি। ভারতবর্ষ থেকে বেরবার আগে বহুকাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশ বৃষ্টির জন্যে শূন্যের দিকে তাকিয়ে তার শুষ্কতপ্ত দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু আকাশ যেন দরিদ্র হয়ে গিয়েছিল। কোথাও মেঘের বা রসের লেশ ছিল [না]। কুমারসম্ভবের কথা মনে পড়ছিল। আকাশ যেন শিবেরই মত রুদ্র তপস্যায় আত্মবিস্মৃত। তাঁর তৃতীয় নেত্রের আগুনের তাপ তখনো দিকে দিক [য] ঝলক দিচ্ছিল। আর পৃথিবীও গৌরীর মত তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল— আমাদের আশ্রমের গাছগুলোর পাতা প্রায় [হলুদ] হয়ে এসেছিল— পৃথিবী যেন অপর্ণা হবারই উদ্যোগ করছিল। জানিনে এতদিনে রুদ্রতাপতপ্ত তপস্বিনীর কঠোর সাধনা সফল হয়েচে কিনা। শেষ পর্য্যন্ত দেখে এসেছিলেম তাপের সঙ্গে তাপের সংঘাত। তাই এখানে যখন আকাশে ঘন ঘোর মেঘে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগ্‌ল তখন সেই বনভূমির মাঝখান দিয়ে সেই সমারোহ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন ভরে উঠ্‌ছিল। যখন সহরের প্রায় কাছাকাছি এসেচি এমন সময় কি ঘোর বৃষ্টি। একেবারে অবিরল ধারা। এমন বৃষ্টি কতদিন দেখি নি। কি ভালো লাগ্‌ল বল্‌তে পারি নে। ভিজে গেলুম কিন্তু তাতে দুঃখ রইল না। তার পরে এই সহরে এসে পৌঁচেছি। এখনি আবার দুঘণ্টার মোটর রাস্তা ভেঙে আবার জাহাজে উঠ্‌তে চল্লুম। পর্শু সিঙ্গাপুরে পৌঁছব। তাড়াতাড়ি *এই* ঘনবর্ষণের খবরটা পাঠিয়ে দিচ্চি

তোমার ভানুদাদা

১৪৬

১৯ চৈত্র ১৩৩০

*BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION CO. LTD

রাণু

আজ হচ্চে ১লা এপ্রেল। জাহাজ চলেচে সিঙ্গাপুরের অভিমুখে। গত কাল গেছে ৩১শে মার্চ। কাল থেকে তোমার পরীক্ষা সুরু হয়েচে।[১] কত দিন চল্‌বে তা ঠিক জানিনে। আশা করি তোমার শরীর মন ভালোই আছে আর পরীক্ষায় তুমি জয়ী হয়ে আস্‌বে। আমার পরীক্ষা তোমার চেয়ে একটুও কম কঠিন নয়। আমি ঠিক পরীক্ষা প্রশ্নের জবাব লেখার মতই গড়গড় করে লিখে চলেচি। তুমি ত পরীক্ষাশালায় যথোচিত আরামে লিখ্‌তে পাও, আমি প্রায় সমস্ত দিন এই ক্যাবিনটার ভিতরে বিছানায় বসে লিখ্‌চি। সামনে একটা টেবিলও নেই। আর সকলে উপরে ডেকে আরাম কেদারায় বসে গল্পের বই হাতে নিয়ে চোখের উপর টুপি টেনে দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে কখনো ঘুমোচ্চে কখনো বা পার্শ্ববর্ত্তিনীদের সঙ্গে মধুরালাপ করচে। আমার সে অবসরও নেই, সঙ্গিনীও নেই। জাহাজের ক্যাবিন বল্‌তে কি বোঝায় তুমি তা ঠিক জান না। জাহাজের গর্ভের মধ্যে একটা ছোট খাঁচা। সমুদ্রের দিকে একটা গোলাকার কাঁচের গবাক্ষ আছে। যখন তুফান বাড়াবাড়ি করতে থাকে তখন সেটা এঁটে বন্ধ করে দেয়। ছোট ঘর আমার বাক্সে তোরঙ্গে বোঝাই করা। দিনরাত কানের কাছে এঞ্জিনের ধুক্‌ধুক্ ধক্‌ধক্ শব্দ চল্‌চে। বেড়াল ছানা তার খেলার জিনিষের উপর যেমন ক্ষণে ক্ষণে তার থাবা দিয়ে ঠেলা দেয়— সমুদ্র ঠিক তেমনি ক্ষণে ক্ষণে কখনো জাহাজের বাম পাশে কখনো ডান পাশে থাবা মেরে ঠেলা দিচ্চে, আর অমনি টলে পড়চি। পশ্চিমের রৌদ্রে ক্যাবিন তেতে উঠে রাত দশটা পর্যন্ত ভিতরের বাতাসটাকে অপ্রসন্ন করে রাখে। ভাগ্যে

একটা ইলেক্‌ট্রিক পাখা আছে, সেইটে দিন রাত মাথার উপর বোঁ বোঁ করে ঘুরচে— আর আমি কোনোমতে কোলের উপর কাগজ আঁকড়ে ধরে লিখে চলেচি। মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আস্‌চে, অক্ষরগুলো বেঁকেচুরে হেলে পড়চে, কোনোমতে ঘুমটাকে ঠেলে ফেলে কলম চালিয়ে যাচ্চি। তোমার পরীক্ষার কাগজ যদি এমন করে এমন জায়গায় লিখ্‌তে হত তাহলে প্রথম শ্রেণীতে পাস হতে কি না সন্দেহ। এত করে দুটো লেকচার শেষ হয়েচে। তৃতীয়টার অনেকখানি এগিয়েচে। সবসুদ্ধ ছটা লেকচার লিখ্‌তে হবে। অথচ আমার এতে কোনো দরকার ছিল না— বরঞ্চ আমার দরকার ছিল বিশ্রামের। সে জিনিষটা কবে পাব, কোথায় পাব আজ পর্য্যন্ত তার ঠিকানা হল না। যতবার ভাবি আর নয়, ততবার একটা না একটা তাগিদ আসে। কিন্তু আর ভাল লাগ্‌চে না। বারবার ইচ্ছে করচে, যে-নিরালা পৃথিবীতে বাঁশি হাতে একদিন এসেছিলুম সেইখানে আবার ফিরে যাই,— একটা জলের ধারা, একটা বালির চর, ওপারে সবুজ বনের ছায়া, উপরে নীলাকাশে সন্ধ্যার একটি তারা— মাঝে মাঝে গল্প করবার একজন লোক পাই ত ভালই, নিতান্ত না পাই ত আমার কল্পনা আছে, থেকে থেকে কলম নিয়ে বসে যাব— কখনো গল্প, কখনো কবিতা, কখনো যা তা বাজে কথা, কখনো বা এইরকম একখানা চিঠি— তার পরে গভীর রাত্রে নৌকোর খোলা জানলার কাছে বিছানার উপর আমার ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন, আর বাইরে অন্ধকারের মধ্যে নদীর কলধ্বনি— কাল যখন ঘন মেঘের ছায়ায় ঘন বনের মাঝখান দিয়ে মোটর চল্‌ছিল তখন এই রকমের একটা ছুটির জন্যে মন ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছিল।

কাল সিঙ্গাপুরে জাহাজ পৌঁছলে এই চিঠি ডাকে দেব। পর্শু দিনেই এক জাপানী জাহাজে চড়ে চীনের অভিমুখে পাড়ি দিতে হবে। সিঙ্গাপুর থেকে হংকং যেতে কিছু সময় লাগ্‌বে। বোধ হয় একসপ্তাহ। অতএব এর

পরের চিঠি পেতে তোমার অনেক দেরি হবার কথা। কিন্তু গেল কয়দিন যথেষ্ট ঘন ঘন চিঠি লিখেচি— অতএব এই ফাঁকটা হয়ত তোমার পক্ষে অবকাশের মতই লাগ্‌বে। বেশি পেলে মানুষের যে পরিমাণে আশা বাড়ে সে পরিমাণে তৃপ্তি বাড়ে না। কম পেলে পাওয়ার আনন্দ তীব্র হয়। আমার রেঙ্গুনের চিঠি তুমি হয় ত তোমার পরীক্ষার মধ্যেই পেয়েছিলে। তখন মন দিয়ে পড়বার সময় পাও নি। যাই হোক যখন চীনে যাব তখন থেকে নিয়মিত চিঠি পাবার নানা ব্যাঘাত ঘটবে। সে জন্যে প্রস্তুত থেকো। তোমাকে চিঠি লিখ্‌ব প্রতিশ্রুত ছিলুম। সে প্রতিশ্রুতি পালন করতে আমি কিছুমাত্র কুঁড়েমি করি নি তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছি। অতএব এখন থেকে যখন চিঠি পাবে না তখন মনে জেনো সেটার কারণ দৈবদুর্য্যোগ— আমার অনিচ্ছা বা ক্লান্তি নয়। পেকিনে তোমার কোনো চিঠি পাব কিনা জানিনে কিন্তু সে জন্যে তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। আমি ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেই চিঠি লিখচি।

তোমার ভানুদাদা

১৪৭

২৩ চৈত্র ১৩৩০

*N.Y.K. LINE ওঁ

S. S. ...ATSUTA...MARU

রাণু

সিঙ্গাপুরে এসে আরেক জাহাজে চড়েচি। নাম দেখেই বুঝবে এ হচ্চে জাপানী জাহাজ।[১] এখানে আমার আদরের সীমা নেই। আমি যা চাই তাই

প্রস্তুত। কাপ্তেন বলে গেল, আমার যখন যা দরকার তাকে জানালেই সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবে। সকালে চায়ের সঙ্গে অন্য যাত্রীরা যখন বরাদ্দমত কমলালেবু পায় আমি তখন আনারস দাবী করলে আনারস এসে হাজির। নিয়ম হচ্চে সাড়ে আটটার মধ্যে স্নান সারতে হবে— সকলে তাড়াতাড়ি করে স্নান করে নেয়। আমি খবর পাঠিয়ে দিলুম সাড়ে এগারোটার সময় নাইব। তাই সই। একজন লোক অন্য কাজ ফেলে সেই সাড়ে এগারোটার সময় স্নানের ব্যবস্থা করবার জন্যে উপস্থিত থাকে। যেমনি খবর পেলে যে আমার ডেক চেয়ারের দুই হাতার উপর একটা কাঠের তক্তা পাতা থাকলে আমার লেখবার সুবিধে হয় অমনি জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রিকে ডেকে তখনি একটা কাঠের তক্তা তৈরি করিয়ে দিলে। খ্যাতির উৎপাত অনেক আছে সত্য কিন্তু খ্যাতির কিছু কিছু সুবিধাও আছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। রেঙ্গুন পিনাং সিঙ্গাপুর যেখানে গিয়েচি সেখানেই ভিড়ের মধ্যে হাবুডুবু খেতে হয়েচে বটে কিন্তু তেমনি আবার দেখাশোনা আহার আমোদ অযাচিত অবধারিতভাবে পাওয়া গেছে। অল্প সময়ের মধ্যে অল্প খরচে তা পাবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। নতুন জায়গায় নিজের পরিচয় দিতে অন্য লোকের অনেক সময় লাগে, আমি আগেভাগেই সে কাজটা সেরে রেখেছি। তাই যেখানে যাই, দেখি, পাত পাড়াই আছে। তোমাকে চিঠি লিখতে লিখ্‌তে ঘুম পেয়ে এসেছিল সে আমার হাতের লেখার টল্‌মলে ভাব দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে। হয় ত এম্‌নি ঢুল্‌তে ঢুলতেই লেখা শেষ পর্য্যন্ত চল্‌ত। এমন সময় অপরাহ্নের রৌদ্র এসে আমাকে তাড়া লাগালে। পশ্চিমের ডেক থেকে পরের ডেকে আমার চৌকিটা টেনে আনতে হল। এ চৌকিটা তোমার খুব চেনা, পরিচয় দিলেই মনে পড়বে। জোড়াসাঁকোর বাড়ির দোতলার ঘরে সেই যে ঘাসের বুননি-করা মস্ত একটা চৌকি ছিল— মাঝে মাঝে আমার সান্নিধ্য লাভ করবার জন্যে যার হাতলের উপরে এসে তুমি বসতে, সেই বিরাট কেদারাটা আমার

সমুদ্রযাত্রার আসনের কাজ করচে। এটা নিতান্ত কম ভারি নয়। এটা ও ডেক থেকে এ ডেকে বহন করে আন্‌তে গিয়ে আমার চোখে যেটুকু ঘুম ছিল সমুদ্রপারে দৌড় মেরেচে। এ জাহাজটা যেমন বড় তেমনি এখানে যাত্রীর ভিড়ও খুব বেশি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিনগুলোতে একটি বিছানাও ফাঁক নেই। আমি কেবল একটা পুরো ক্যাবিন একলা পেয়েচি। এক ক্যাবিনের মধ্যে দু তিনজন বেগানা লোক নিয়ে বাস করা আমার দ্বারা কোনমতেই সম্ভব নয়। অন্য জাহাজের চেয়ে এ জাহাজের ক্যাবিনটা অনেক ভাল। যাত্রীরা নানা জাতের। কেউ জর্ম্মন কেউ নরওয়েবাসী কেউ ইংরেজ— তার পরে চিনী জাপানী প্রভৃতি নানা দেশের নরনারীর জটলা হয়েচে। প্রতিদিন সন্ধেবেলায় উপরের ডেকে গ্রামোফোন বাজিয়ে নাচ হয়। প্রথম দিন আমি ছিলুম। দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যার সময় একটুখানি নিরালা পাবার জন্যে আমি নীচের ডেকে একলা এসে বসেছিলুম। এমন সময় মিস্ গ্রীন্ এসে বল্‌লে, ওরা মনে করেচে ওদের নাচ দেখে আমি বিরক্ত হয়েচি— ওদের ইচ্ছে নয় যে আমাকে কোনো কারণে অস্থির করে। শুনে, আবার আমি উপরের ডেকে ওদের নৃত্যসভায় গিয়ে আসন নিলুম। এল্‌মহর্স্‌ট এখনো তার নাচবার সঙ্গিনী জোগাড় করতে পারে নি। তুমি থাক্‌লে নিশ্চয় তোমাকে নাচে টেনে নিত। শেষকালে নিরুপায় হয়ে একজন পুরুষকে নিয়েই ওকে নাচ জমাতে হয়েচে। সেই পুরুষটি হচ্চে কাঠিয়াবাড়ের লিম্‌ড়ির ছোট রাজকুমার।[২] ওদের দুজনের খুব ভাব। আজ রাত্রে ওদের চিত্রবেশী নাচ হবে। যাকে বলে Fancy dress ball। এল্‌মহর্স্‌টকে বলেচি ধুতি চাদর পরে বাঙালী সাজতে। কুমার তাঁর পাগ্‌ড়িপরা কুমার বেশেই আসবেন। মিস্ গ্রীনের ভাবনা নেই, সে সাড়ি থেকে আরম্ভ করে মালয় মেয়েদের বেশভূষা প্রভৃতি নানা জবড়জঙ্গ নানা জায়গা থেকে জোগাড় করে এনেছে। তারি মধ্যে একটা কিছু পরে' ও বোধ হয় সকলের উপর টেক্কা দেবে। দূর হোক্ গে আবার ঘুম পেয়ে

আস্‌চে। ঘুমের অপরাধ নেই। কাল রাত্তিরে শরীর ভাল ছিল না। যথেষ্ট ঘুম হয় নি। তার পরে উঠেচি ভোর সাড়ে তিনটের সময়। তার পরে আবার সমুদ্রের হাওয়াটি এসে মাথায় এসে লাগ্‌চে। এইবার চিঠি শেষ করে একবার কিছুক্ষণের জন্যে চোখ বুজি আর ত কলম চলচেনা। ইতি ৫ই এপ্রেল ১৯২৪

তোমার ভানুদাদা

১৪৮

[১০ এপ্রিল ১৯২৪]

ওঁ

[Atsuta Maru]

রাণু

চলেছি সাঙ্ঘাইয়ের ঘাটে। আজ বৃহস্পতিবার— পর্শু শনিবার সকালে পৌঁছব।[১] তার পর থেকে কিছুকাল ডাঙার পালা চল্‌বে। হংকং বন্দরে নেবে দু দিন কাটিয়েচি। জায়গাটি ভাল, কিন্তু আকাশ ছিল অপ্রসন্ন, মেঘে কুয়াশায় বৃষ্টিতে অবগুণ্ঠিত। বাতাসের তাপ পূর্ব্বের চেয়ে হঠাৎ প্রায় ২০ ডিগ্রি নেবে গিয়েছিল— গরমের থেকে শীতে এসে পড়লুম একেবারে হুস্ করে,— স্বেদ থেকে কম্প, বিজ্‌লি পাখা থেকে বিলিতি কম্বল। যত উত্তরে যাব শীত আরো বাড়বে। সাঙ্ঘাইয়ের চেয়ে অনেক উত্তরে পিকিন— সেখানে এই বৈশাখ মাসে পশ্‌মি কাপড়ের বোঝা বইতে হবে।

জাহাজে এতদিন আমি একটি নির্জ্জন ডেক্-এর কোণে কোণার্ক হয়ে বিরাজ করছিলুম। সেই মোটা কেদারায় ঠেসান দিয়ে প্রায় সমস্ত দিন সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর সূর্য্যের আলো দেখেছি। Shelleyর একটা

কবিতার প্রথম চারটে লাইন মনে পড়ত— মনে মনে মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতুম:

The sun is warm, the sky is clear,
The waves are dancing fast and bright,
Blue isles and snowy mountains wear
The purple moon's transparent light.[২]

তার পরে ভাবতুম সেদিন শেলির কাছে সূর্য্যের আলো আর সমুদ্রের ঢেউ এই রকমই প্রত্যক্ষ ছিল— সে ত কেবল কবিতার লাইন ছিল না। সেদিন সেই জলস্থল আকাশের মধ্যে আমি কোথাও ছিলুম না— আর আজ সেই শেলি কোথায়? আবার একদিন আস্‌বে যখন আমি থাকব আমার কবিতার ছন্দের মধ্যে— আর কোনোখানেই না— সেদিন ঠিক এই রকমই সূর্য্যের আলো পড়বে সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর। সেদিন যারা আমারই মত বসে তোমারই মত কোনো একজন মানুষকে চিঠি লিখ্‌চে তারা কি মনে ঠিক আনতে পারবে আমি তাদেরই মত সুখে দুঃখে অতখানিই সজীব ছিলুম?

যাক্‌ গে। আজ দিন চারেক থেকে কোণার্কের কোণের আকাশটুকু হারিয়ে গেছে। বাদলায় শীতে আমাকে তাড়া করে ক্যাবিনের ভিতর ঠেলে এনেচে। উপরে একটা সাধারণ বসবার ঘর আছে কিন্তু সে অত্যন্ত সাধারণ, চারদিকেই লোকচক্ষুর ঠেলা এসে লাগে। তাই এই ক্যাবিনে বিছানার উপর বসে লিখচি, বিশেষ আরামের অবস্থা নয়। রাতও হল— এগারোটা বেজে গেছে। এইমাত্র সাঙ্ঘাই থেকে একটা বে-তার বার্ত্তা আমার নামে এল— লিখচে Shanghai students send welcome।

উত্তর থেকে বাতাস এসে সমুদ্রে তুফান তুলেচে— জাহাজ দোদুল্যমান। আর বসে থাকা উচিত নয়। তোমাদের ওখানে বোধহয় এখন বেলা পাঁচটা, এবং গরম, এবং কোথাও কোনো দোলা লাগ্‌চে না, অতএব

আমার অবস্থা কল্পনাও করতে পারবে না। ইতি তোমার ভানুদাদা

১৪৯

২১ [২২] এপ্রিল ১৯২৪

ওঁ

[হংসনান্‌সু]

রাণু

পথে পথে বক্তৃতা দিতে দিতে আস্‌চি। আমি যেন দক্ষিণ পশ্চিমের হাওয়া— ভারতবর্ষ থেকে বসন্তের অভিবাদন ছড়িয়ে দিয়ে চলেচি। পর্শু গিয়েছিলুম ন্যান্‌কিঙে।[১] এই সহরের খবর নিশ্চয় তোমাদের ভূগোল বিবরণে পড়েচ। চীনের প্রাচীন রাজধানী। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাশালায় আমার সভা ছিল। প্রকাণ্ড ঘর। উপরে দেয়াল ঘিরে একটা গ্যালারি। বিষম ভীড়। তারস্বরে আমি যেই বক্তৃতা আরম্ভ করেচি, দু চারটে কথা বলেচি মাত্র এমন সময় ধড়াম করে একটা শব্দ; সভা কেঁপে উঠ্‌ল, সমস্ত লোক চঞ্চল হয়ে বেরিয়ে পড়বার দরজার দিকে মুখ করেচে। আমি যে-মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করচি ঠিক তারি মাথার উপরের গ্যালারি লোকের ভারে হঠাৎ বাঁধন ছাড়িয়ে চার পাঁচ ইঞ্চি নেবে পড়ল। ভেঙে পড়বার মত ভার। অতি অল্প একটুতে আট্‌কে গেল। যদি ভাঙত তাহলে সেই মুহূর্ত্তে আমারও কপাল ভাঙত। আমার মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টি না হয়ে নরনারী বৃষ্টি হত। এল্‌ম্‌হর্স্টের মুখ বিবর্ণ; কালিদাস ব্যস্ত হয়ে আমাকে টেনে বাইরে আনবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত। আমি নড়লুম না। হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে ইঙ্গিত করলুম। যদি আমি ভয়ে ব্যস্ত হয়ে পালাবার পথ দেখতুম তাহলে সেই তিন হাজার লোক পালাবার ঠেলাঠেলিতে সর্ব্বনাশ কাণ্ড ঘটাত। আমি জোর করে কালিদাসকে থামিয়ে দিয়ে বক্তৃতা করে চললুম।

আশ্চর্য্য এই আমার এই বক্তৃতা সবাই বল্‌লে আমার সব চেয়ে ভালো বক্তৃতা হয়েছিল। এল্‌ম্‌হর্স্ট বেরিয়ে এসে বল্‌লে, তোমার শুভগ্রহ আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিয়েচে। যতক্ষণ আমি বক্তৃতা দিচ্ছিলুম তার মন উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল, কখন্ ভেঙে পড়ে। আমার মনে পড়ল সেই বিসর্জ্জন অভিনয়ের কথা— পিঠের দিকে অগ্নিবৃষ্টি হচ্চে, আর আমি একটি ভয়ত্রস্তা বালিকার হাত চেপে ধরে অভিনয় করে যাচ্চি।[২] আমি সেদিন যদি পালাবার ভাব দেখাতুম তাহলে সেই মুহূর্ত্তেই মহাকালীর কণ্ঠহারের জন্যে নরমুণ্ডের অভাব ঘটত না। ন্যান্‌কিঙের বক্তৃতা অভিনয় প্রভৃতি সেরে কাল সকাল বেলায় রেল গাড়িতে চড়লুম। আমাদের জন্যে স্পেশল গাড়ি ছিল, বেশ আরামের। সঙ্গে একদল ফৌজ আমাদের রক্ষার জন্যে বরাবর ছিল।

আজ ভোরবেলায় এসেচি— ৎসিনান্‌সু নগরে।[৩] কিছুকাল পূর্ব্বে এই নগর জর্ম্মানির হাতে ছিল, তার পরে জাপানীর। এখন আবার চীনেরা ফিরে পেয়েচে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বিকেলে সেখানে অভ্যর্থনা ও বক্তৃতা হবে। কিন্তু বড় ক্লান্ত হয়ে আছি। বিকেলের হাঙ্গামের কথা মনে করে ভয় হচ্চে। আবার সেই ঠেলাঠেলি ভিড়, আবার সেই চিৎকার শব্দে বক্তৃতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত গোলমাল শেষ করে ফেলে কিছুকাল ষোলো আনা নৈষ্কর্ম্ম্যের মধ্যে বিশ্রাম করতে পারলে আমি বাঁচি। কিন্তু আমার কর্ম্মস্থানে শনি— অতএব আমাকে শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করাবেই। সুতরাং বিশ্রামের দরকার করে কোনো লাভ নেই, মঞ্জুর হবেনা।

কাল সকালে পিকিনে যাত্রা করব— সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছব।[৪] চিঠি ত লিখে যাচ্চি পৌঁছবে কিনা জানিনে— চীনের ডাকঘরের উপরে খুব বেশি ভরসা কেউ রাখে না— কখনো চিঠি যায় কখনো যায় না, অদৃষ্টের খেলার মত, লেফাফায় তিন আনার স্ট্যাম্প্ বসিয়ে অনিশ্চিতকে ঠেকিয়ে রাখা যাবেনা। ইতি ৮ [৯] বৈশাখ ১৩৩১

তোমার ভানুদাদা

১৫০

[২০ মে ১৯২৪]

ওঁ

[পিকিঙ]

রাণু

আজ প্রায় তিন সপ্তাহের উপর হল পীকিনে এসেচি। এসে অবধি লোকের, আর কাজের ভিড়ের অন্ত নেই। এই কয়দিনের মধ্যে অন্তত চল্লিশটা বক্তৃতা করেচি। কোনো কোনোবার দিনে তিনটে বক্তৃতাও হয়েচে। তার উপরে সমস্ত দিনই দেখাসাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ লেগেই আছে। কোথাও নিরালায় বসে মন স্থির করে চিঠিপত্র লিখব তার অবসর পাই নি। আমি স্বভাবত কুঁড়ে মানুষ, এত বেশি কাজের চাপ, এত জনতার দাবী আমি সইতে পারি নি। তিমি মাছ বেচারাকে জলের মধ্যে ডুবে থাক্‌তে হয় কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ভেসে তাকে হু হু শব্দে হাঁপ ছেড়ে নিঃশ্বাস নিতে হয়। আমিও যখন ভিড় সমুদ্রে একেবারে মগ্ন হয়ে থাকি তখন মাঝে মাঝে নির্জ্জন অবকাশের মধ্যে ভেসে উঠে খুব পেট ভরে হাওয়া খেয়ে নিতে ইচ্ছে করে। এবার কিন্তু একটুও ফাঁক পাই নি। তার থেকে একটা কথা বুঝতে পারবে এখানকার লোকের কাছ থেকে ষোলো আনা সমাদর পেয়েছি। তুমি ত জানো বহু শতাব্দী আগে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ সন্যাসীরা [য] গিয়ে চীনে ধর্ম্ম বিতরণ করেছিল— তখন সেই হৃদয়বিনিময়সূত্রে চীনের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের ইতিহাস ঘনিষ্ঠ যুক্ত হয়ে গিয়ে ছিল। এরা বল্‌চে এবার আমার আগমন উপলক্ষে আবার চীনভারতের যোগের নূতন ঐতিহাসিক অধ্যায় সুরু হল। শুনে সকল ক্লান্তি দূর হয়। যুদ্ধ বিগ্রহে রক্তপাতের রাঙা অক্ষরে মানুষের ইতিহাসের কত পরিচ্ছেদ লেখা হয়ে থাকে— কিন্তু হৃদয়যোগের নির্ম্মল বাণী ইতিহাসের যে পর্ব্বে লিখিত হয় সেইটে হচ্চে মহাপর্ব্ব। আর কিছুদিন

পরেই দেখতে পাবে চীন থেকে বিশ্বভারতীর ছাত্র শান্তিনিকেতনে চলেচে— ওখান থেকেও ছাত্র এবং আচার্য্য এখানে আস্‌চে। আমাদের শাস্ত্রীমশায়কে[১] দু বছরের জন্যে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় পাঠিয়ে দেব স্বীকার করেছি— শুনে এরা উৎসাহ প্রকাশ করে আমাদের ধন্যবাদ দিয়েচে। এখানকার একজন ছাত্র এমেরিকায় অধ্যয়নের জন্য ছাত্রবৃত্তি পেয়েছিল সে তার ছাত্রবৃত্তি ত্যাগ করেছে— সে স্থির করেচে শান্তিনিকেতনে গিয়ে সংস্কৃত, পালি, বৌদ্ধশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করবে। এখন থেকেই দিনরাত সে ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে লেগে রয়েচে। সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়তে আরম্ভ করেচে তার নিষ্ঠার অন্ত নেই, ব্যাকরণ তার হাতে সর্ব্বদাই আছে। ছোট ছোট সংস্কৃতবাক্য তৈরি করবার চেষ্টা করে। যেমন তার বুদ্ধি তেমনি অধ্যবসায়। গেল বারে কাশীতে যখন ছিলুম তখন বির্‌লা আমাদের আশ্রমে বিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন[২]— সেই টাকা দিয়ে ওখানে এসিয়াবাসী ছাত্র ও যাত্রীদের জন্যে বাড়ি তৈরি করতে বলে দিয়েচি। নইলে, এখন যে রকম স্থানাভাব তাদের কোথায় রাখব? তোমরা হলে হিন্দু বিশ্ববিদালয়ের ছাত্র— দশ বিশ লাখ টাকার কম কোনো অঙ্ক মুখে উচ্চারণ করতে তোমাদের লজ্জা হয়। আমাদের গরীব আশ্রমে বিশ হাজার টাকার ধরমশালার প্রস্তাব শুনে বোধ হয় তোমাদের ভয়ঙ্কর এক চোট হাসি পাবে। তা হেসো কিন্তু জেনো উপকরণ প্রাচুর্য্য দিয়ে প্রাণবান জিনিষ তৈরি হয় না, অমৃত দিয়েই হয়। সেই অমৃত যদি আমাদের সাধনার মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের দারিদ্র্যের নগ্নতার থেকেই ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হবে। মেঘের আড়ম্বরে দিনের আলোক উজ্জ্বল হয় না— রিক্ত মেঘের উপকরণবিরলতার ভিতর দিয়েই সত্যের সূর্য্য আপন মহিমা বিস্তার করে। সেই মহিমার দিকেই আমরা লক্ষ্য রাখব।

আজ রাত্রে পিকিন ছেড়ে যাব।[৩] ভারতবর্ষ ছাড়ার পর আজ প্রথম তোমার চিঠি পেলুম। পিকিনে পৌঁছবার আগে পর্য্যন্ত খুব ব্যস্ততার মধ্যেও

তোমাকে আমি নিয়মিত চিঠি লিখে এসেচি। মনের ভিতর অল্প একটু আশা ছিল যে পিকিনে এসে হয়ত তোমাদের খবর পাওয়া যাবে। কালিদাস, ক্ষিতিবাবু, নন্দলাল দেশ থেকে চিঠি পায় আর আমাকে জিজ্ঞাসা করে বেনারসের কোনো চিঠি পেয়েচেন। আমি বলেচি যে, না, আমি চিঠির প্রত্যাশা করিনে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিন্তু ওদের কাছে আমার গুমর নষ্ট করতে চাই নি। বিশেষত যখন Elmhirst আমাকে জিজ্ঞাসা করত, Why no news from Benares আমি বল্‌তুম রাণু জানে আমাকে চিঠি লিখ্‌লে আমি পাব না। এ'কেই বলে অহঙ্কার। যাই হোক্ পীকিনে এসে ঠিক করলুম, অনেক চিঠি ত লিখেচি, এবার চিঠি না পেলে আর লিখব না। সুতরাং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্যে এত দিন লিখি নি। তা ছাড়া সময় এত কম ছিল যে চিঠি লেখা দুঃসাধ্য হয়েছিল।

আজ বিশে মে তারিখ। ২৫শে বৈশাখের দিনে এখানে খুব ধুমধাম করে আমার জন্মোৎসব হয়ে গেল।[৪] দেশে ফিরে গিয়ে সে সব গল্প হবে। হয় ত কালিদাস ক্ষিতিবাবুরা তার সমস্ত বিবরণ পাঠিয়ে দিয়েচেন, হয়ত বা কোনো-না-কোন কাগজে ছাপা হয়ে গেচে। যাই হোক এখান থেকে আর একটা জায়গায় ভ্রমণ সেরে ৩১শে তারিখে সাঙ্ঘাই থেকে জাহাজ ধরে জাপানে যাত্রা করব। ৪ঠা জুনে কোবে পৌঁছব। চীন দেশের পালা এখনকার মত শেষ হল। জাপানে নিমন্ত্রণ পেয়েচি। সেখানে হয়ত জুনের শেষ পর্য্যন্ত কাটবে। জাপানে না পৌঁছলে ঠিক বল্‌তে পারচিনে। সেখানেও অনেক কাজ করবার আছে। হয়ত বক্তৃতা করে বেড়াতে হবে। তার পরে Indo-China, Siam এবং জাভা। তার পরে— ভারতবর্ষ।

আমি ফিরে গিয়ে তোমার বাব্‌জাকে বল্‌ব তোমাকে বিশ্বভারতীতে ভর্ত্তি করে দিতে। আশা বলেছিল তার পরীক্ষা শেষ হলে সে শান্তিনিকেতনে আসবে। তোমরা দুই বোনে এসে যদি থাক তা হলে খুসি হব। না হয় অশোক[৫] সুদ্ধ এসে ভর্ত্তি হবে। যাই হোক্ তুমি যদি ডিগ্রি পাবার মোহ

কাটিয়ে থাক তাহলে বিশ্বভারতীতে এলে তোমার উপকার হবে সন্দেহ নেই। তুমি মনে কোরো না তোমাকে বিশ্বভারতীর ছাত্রী করে নিতে আমার অনিচ্ছা আছে।

গত কয়দিন বক্তৃতা নিমন্ত্রণ প্রভৃতিতে দিন একেবারে ঠাসা [ছিল]। পর্শু শুতে রাত্রি সাড়ে দুপুর, কাল রাত্তির দুটো হয়েছিল। আজ কেবলি ঘুম পাচ্চে। অতএব এইখানেই শেষ করি। [৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১]

ইতি তোমার ভানুদাদা

১৫১

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

ওঁ

রাণু

ইয়াংসি নদীতে ভেসে চলেচি। সাঙ্ঘাইয়ের ঘাট অদূরে দেখা যাচ্চে। বোধ হয় আর আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছব। তার পরে আগামী ৩১শে তারিখে সমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে। জাপানে পৌঁছব ৪ঠা জুনে।[১]

নানা বক্তৃতা এবং নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ আদর সমাদরের আবর্ত্তের মধ্যে একটুও অবকাশ পাচ্চি নে। জীবনে এত খাটুনি খাটি নি, এত বক্তৃতা দিই নি, এত লেখা লিখি নি।

তোমার চিঠি হয়ত এক আধখানা সাঙ্ঘাইয়ে পৌঁছিয়ে পাব। কিন্তু এই চিঠি যখন পাবে তার পরে যদি আমাকে চিঠি লেখো তাহলে নিম্ন ঠিকানায় লিখবে :

C/o Dr. P. Sen
Tan Tok Seng Hospital
Singapur

জাহাজে [য] ঘাটে ঠেকল। আজ তবে আসি। ২৮ জুন ১৯২৪

তোমার ভানুদাদা

১৫২

[১৮ জুলাই ১৯২৪]

ওঁ

[কলকাতা]

রাণু

স্টীমার পৌঁছতে একদিন দেরি হয়ে গেল। তাই কাল ১৭ই এসেচি।[১]

তোমাকে কথা দিয়ে গিয়েছিলুম যে ঘাটে ঘাটে তোমাকে চিঠি লিখব। তাই লিখেও ছিলুম। তার পরে পিকিনে গিয়ে যখন তোমার কোনো চিঠি পেলুম না, তখন আমার আর লেখবার দায়িত্ব রইল না। এবার এত ব্যস্ত ছিলুম যে দেশে দুই একখানা ছাড়া কাউকে চিঠি লিখিই নি। কোনোমতে সময় করে তোমাকে লিখেছিলুম— এত অজস্র চিঠি পেয়ে তোমার বোধ হয় চিঠি পাবার ক্ষিদে মরে গিয়েছিল।

বৌমার কাছে আশা[২] আর তোমার পাস করার খবর পেয়েচি। শুনে খুসি হলুম।

আমি সেপ্টেম্বরেই আবার দূর দেশে যাত্রা করব[৩]— ফিরতে বোধ হয় দেরি হবে। তোমাদের কলেজে এখন কোনো ছুটি আছে কি না জানি নে। যদি থাকে, আর যদি তোমরা একবার আসতে পার তাহলে খুসি হব। নইলে দীর্ঘকাল তোমাদের সঙ্গে আর দেখাই হবে না। [২ শ্রাবণ ১৩৩১]

ভানুদাদা

১৫৩
[অগাস্ট ১৯২৪]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

আসচে শনিবারে[১] কলকাতায় যাব সেই খবরটা দেবার জন্যে তোমাকে এই চিঠি লিখচি। আজ আমাদের এখানে একটা চা-সভা স্থাপন হবে তার অনুষ্ঠানে ব্যস্ত আছি। চীন দেশ থেকে চায়ের সরঞ্জাম এবং চা ও নানা রকম খাবার তারা এইজন্যে দিয়েচে তাই আমার এক চীনবন্ধুর নামে এই সভার প্রতিষ্ঠা হবে[২] সময় প্রায় হয়ে এল— একটা গান তৈরি করেচি সেটা এই উপলক্ষে গাইতে হবে।[৩]

তোমার ভানুদাদা

১৫৪
[?২১ অগাস্ট ১৯২৪]

ওঁ

[কলকাতা]

রাণু

ধীরেনকে[১] যদি পাঠাই তোমাকে আনবার জন্যে তাহলে কি আস্‌তে পারবে? আমি বোধ হয় শীঘ্রই অর্থাৎ শনি রবিবারের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে যাব। যদি আসতে পার তাহলে সেখানেই তোমাকে নিয়ে আস্‌বে। এবার যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হলে খুসি হব— মোকাবিলায় সকল কথার আলোচনা হতে পারবে। আজ আর একটু

পরেই এণ্ড্রুজ সাহেব আসবে। যদি লোক পাঠালে তোমার আসা সম্ভব হয় তাহলে মাকে বোলো টেলিগ্রাফ করে দিতে। আজ বৃহস্পতি— কাল শুক্রবারে চিঠি পাবে। আমি বোধ হয় রবিবারে বোলপুরে যাব।[১] [?৫ ভাদ্র ১৩৩১]

তোমার ভানুদাদা

১৫৫

৪ আশ্বিন ১৩৩১

ওঁ

[মাদ্রাজ]

রাণু

এই মাত্র মাদ্রাজে এসে পৌঁচেছি।[১] আজ রাত্রে কলম্বো রওনা হব। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আঘাতে দেহমন ভেঙে ছিঁড়ে বেঁকে চুরে গিয়েছিল, ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলুম। গাড়ি যখন সবুজ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চলছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন নিজের কাছ থেকে নিজে দৌড়ে ছুটে পালাচ্চি। একদিন আমার বয়স অল্প ছিল— আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে— নীল আকাশ আর শ্যামল পৃথিবী আমার জীবন পাত্রে প্রতিদিন নানারঙের অমৃতরস ঢেলে দিত— কল্পলোকের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতই আমার বাঁশি হাতে বিহার করতুম। সেই শিশু সেই কবি আজ ক্লিষ্ট হয়েচে। লোকালয়ের কোলাহলে তার মন উদ্ভ্রান্ত, তারই পথের ধূলায় তার চিত্ত ম্লান,— সে আপন ক্লান্ত বিক্ষত চরণ নিয়ে তার সেই সৌন্দর্য্যের স্বপ্নরাজ্যে

ফিরে যেতে চাচ্চে। তার জীবনের মধ্যাহ্নে [য] সে কাজও অনেক করেছে ভুলও কম করেনি— আজ তার কাজ করবার শক্তি নেই, ভুল করবার সাহস নেই,— আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর একবার বিশ্বপ্রকৃতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শেষ বাঁশি বাজিয়ে যেতে চায়। যে রহস্যালোক থেকে এই মর্ত্ত্যালোকে একদিন সে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবার আগে শান্তিসরোবরে ডুব দিয়ে স্নান করতে চায়। তেমন করে ডুব দিতে যদি পারে তাহলে তার জীর্ণতা তার ম্লানতা সমস্ত ঘুচে যাবে। আবার তার মধ্যে থেকে সেই চিরশিশু বাহির হয়ে আসবে। সংসারের জটিলতায় ঘিরে ঘিরে আমাদের চিত্তের উপর যে জীর্ণতার আবরণ সৃষ্টি করে— সেটা ত ধ্রুব সত্য নয়, সেটা মায়া, সেটা যে-মুহূর্ত্তে কুহেলিকার মত মিলিয়ে যায় অমনি নবীন নির্ম্মল প্রাণ আপনাকে ফিরে পায়। এম্‌নি করে বারে বারে আমরা নূতন জীবনে নূতন শিশুর রূপ ধরি। সেই নূতন জীবনের সরল বাল্যমাধুর্য্যের জন্যে আমার সমস্ত মন আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেচে। আজ আমি চলেচি সমুদ্র পারে কাজের ক্ষেত্রে— যখন সেই কাজের ভিড়ে থাকব তখন হয়ত আমার ভিতরকার কর্ম্মী আর সকল কথা ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু তবু সেই সুদূর গানের ঝরনা তলার বাঁশির বেদনা ভিতরে ভিতরে আমাকে নিয়তই ডাকবে।— ডাকবে সেই নির্জ্জন নির্ম্মল নিভৃত ঝরনা তলার দিকেই। সেই ডাক আমার সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদের ভিতর দিয়ে আমার বুকের মধ্যে আজ এসে কুহরিত হচ্চে।— বল্‌চে সেখানে ফিরে যাবার পথ এখনো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি ; এখনো আমার সুরের পাথেয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় নি— এখনো সেই নব নব বিস্ময়ে দিশাহারা বালককে কোনো এক ভিতর মহলে খুঁজে পাওয়া যায়। তাই, যদিও আজ চলেচি পশ্চিম সমুদ্রের তীরে আমার মন খুঁজে বেড়াচ্চে আরেক তীরে সেই সকল-কাজ-ভোলা বালকটিকে। পূরবী গানে সে আপন লীলা শেষ করতে না পারলে সন্ধ্যা ব্যর্থ হবে— এখন

সে কোথায় ঘুরে মরচে। ফিরে আয়, ফিরে আয়, বলে ডাক পড়েচে। একজন কে তার গান শুনতে ভালবাসে, আকাশের মাঝখানে তার আসন পাতা— সেই ত শিশুকালে তাকে বাঁশির দীক্ষা দিয়েছিল, নিশীথরাতের শেষ রাগিণী বাজানো হলে তার পরে তার বাঁশি ফিরে নেবে। আজ কেবলি সেই কথাই আমার মনে পড়চে

ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

ভানুদাদা

১৫৬

[২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪]

ওঁ

কলম্বো

রাণু

ভারতবর্ষ ছেড়ে এই খানিকক্ষণ হল সিংহলে এসেছি।[১] কাল সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়বে। আকাশ অন্ধকার। ঘন বাদ্‌লার মেঘ সকালবেলার সোনার আলো গণ্ডূষ ভরে' পান করেছে, কেবল তার তলানি ছায়াটুকু বাকি আছে। দেশে থাক্‌লে সকালবেলায় দিনের এই ছায়াবগুণ্ঠন ভালই লাগ্‌ত। ইচ্ছে করত কাজকর্ম্ম বন্ধ করে মাঠের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নরাজ্যে মনটাকে পথহারা করে ছেড়ে দিই, কিম্বা হয়ত গুনগুন সুরে নতুন একটা গান ধরে মেঘদূতের কবির সঙ্গে যথাসাধ্য পাল্লা দিতে বসতুম। কিন্তু এখানে মনটা বিবাগী, তার একতারাটা কোথায় হারিয়ে গেছে। "গানহারা মোর হৃদয়তলে"[২] এই অন্ধকার যেন একটা স্তূপাকার মূর্চ্ছার মত উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সুদূর এবং সুদীর্ঘ যাত্রার দিনের মুখে আকাশ থেকে সূর্য্যের আলো দেবতার অভিনন্দনের মত বোধ হয়— আজ মনে হচ্চে

যেন আমার সেই জয়যাত্রার অধিদেবতা নীরব। তাঁর বীণার থেকে যে বাণী পাথেয়স্বরূপ সংগ্রহ করে সমুদ্রে পাড়ি দিতুম সেই আকাশভরা বাণী আজ কোথায়?

কলম্বোতে যে বাড়িতে এসে আছি, এ একজন লক্ষপতির বাড়ি।° প্রকাণ্ড প্রাসাদ। আরামে বাস করবার পক্ষে অত্যন্ত বেশি ঢিলে,— ঘরগুলোর প্রকাণ্ড হাঁ মানুষকে গিলে ফেলে। যে ঘরে বসে আছি তার জিনিষগুলো এত বেশি ফিটফাট্ যে, মনে হয় সেগুলো ব্যবহার করবার জন্যে নয়, সাজিয়ে রাখবার জন্যে। বসবার শোবার আস্‌বাবগুলো শুচিবায়ুগ্রস্ত গৃহিণীর মত, সন্তর্পণে থাকে, কাছে গেলে যেন মনে মনে সরে যায়। এই ধনীঘরের অতি পারিপাট্য, এও যেন একটা আবরণের মত। আমার সেই তেতলা ঘরের চেহারা মনে পড়ে ত? সমস্ত এলোমেলো। সেখানে শোবার বসবার জন্যে একটুও সাবধান হবার দরকার হয় না,— তার অপরিচ্ছন্নতাই যেন তার প্রসারিত বাহু, তার অভ্যর্থনা। সে ঘর ছোটো, কিন্তু সেখানে সবাইকে ধরে। ভানুদাদার মত এতবড় মানুষটাকে ধরে, আর রাণুর মত অতটুকু মেয়েকেও ধরেছিল। মানুষকে ঠিকমত ধরবার পক্ষে হয় ছোট্ট একটি কোণ, নয় অসীম বিস্তৃতআকাশ। ছেলেবেলায় যখন আমি পদ্মার কোলে বাস করতুম তখন পাশাপাশি আমার দুইরকম বাসাই ছিল। একদিকে ছিল আমার নৌকার ছোট ঘরটি, আর একদিকে ছিল দিগন্ত প্রসারিত বালুর চর। ঘরের মধ্যে আমার অন্তরাত্মার নিঃশ্বাস, আর চরের মধ্যে তার প্রশ্বাস। একদিকে তার অন্দরের দরজা, আর একদিকে তার সদরের দরজা। তোমার জীবনে রাণু, যদি আমার মধ্যে সেই সদর দরজাটা খুঁজে পেতে, তাহলে খোলা আকাশের স্বাদ পেয়ে হয়ত খুসি হতে। তোমার অন্দরের দরজার অধিকার দাবী আমার ত চল্‌বে না— এমন কি, সেখানকার চাবিটা তোমার হাতেও নেই, যার হাতে আছে সে আপনি এসে প্রবেশ করবে কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমি যা দিতে পারি তুমি যদি তা চাইতে পারতে

তাহলে বড় দরজাটা খোলা ছিল। কোনো মেয়েই আজ পর্য্যন্ত সেই সত্যকার আমাকে সত্য করে চায় নি— যদি চাইত তাহলে আমি নিজে ধন্য হতুম ; কেন না মেয়েদের চাওয়া পুরুষদের পক্ষে একটা শক্তি। সেই চাওয়ার বেগেই পুরুষ নিজের গূঢ় সম্পদকে আবিষ্কার করে— আমার একটি আধুনিক কবিতায়[৪] আমি এই কথা বলেছি। বলেছি, শঙ্কর যখন তপস্যায় থাকেন তখন তাঁর নিজের পূর্ণতা আবৃত হয়ে থাকে। উমার প্রার্থনা তপস্যা রূপে তাঁকে আঘাত করে যখন জাগিয়ে দেয়, তখনি তিনি সুন্দর হয়ে, পূর্ণ হয়ে, চিরনবীন হয়ে বেরিয়ে আসেন। উমার এই তপস্যা না হলে তাঁর ত প্রকাশের ক্ষমতা নেই। কতকাল থেকে উৎসুক হয়ে আমি ইচ্ছা করেচি কোনো মেয়ে আমার সম্পূর্ণ আমাকে প্রার্থনা করুক, আমার খণ্ডিত আমাকে নয়। আজো তা হল না— সেই জন্যেই আমার সম্পূর্ণ উদ্বোধন হয় নি। কি জানি আমার উমা কোন্ দেশে কোথায় আছে? হয়ত আর জন্মে সেই তপস্বিনীর দেখা পাব। ইতি
২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

ভানুদাদা

১৫৭

২২ পৌষ ১৩৩১

ওঁ

GIVLIO
CESARE

কল্যাণীয়াসু

দক্ষিণ আমেরিকার বন্ধন কাটিয়ে বেরিয়ে পড়েচি।[১] জাহাজ এখনো তারই কূলে কূলে চলেছে। আজ সকালে ব্রেজিলের এক সহরের সামনে

আমাদের জাহাজ এসে দাঁড়িয়েচে। আজ অর্দ্ধরাত্রে পৌঁছবে রিয়ো ডে জেনৈরোতে। তার পরে মাডেবা দ্বীপে, তার পরে বার্সেলোনা, তার পরে জেনোয়া। দেশ থেকে বহু দূরে ছিলুম, ডাক পৌঁছতে দেড় মাস লাগ্‌ত। এখন দেশের কাছের দিকে চলেচি বলে মন খুসি আছে। বুয়েনোস আইরেস থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে খুব চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু নানা চক্রান্তে কোনোমতেই ঘটে উঠ্‌ল না। এতদিনে হয়ত খবর পেয়ে থাক্‌বে এখানে আসবার পথে জাহাজে আমাকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ধরে ছিল, আমাকে কিছু অতিরিক্ত কাবু করেছিল; একে ত জাহাজের ক্যাবিনে বদ্ধ হয়ে বাস করাই একটা রোগবিশেষ তার উপরে ইনফ্লুয়েঞ্জা যেন ভূতের মত বুকের উপরে চেপে বসে ছিল— রাত্রে ঘুম ছিল না, দিনে শান্তি ছিল না। এই অবস্থায় একখানা খাতা হাতে করে কবিতা লেখা ছাড়া আমার আর কোনো সান্ত্বনা ছিল না। কত কবিতাই যে লিখেচি তার আর ঠিকানা নেই— খাতা ভরে গেছে।[২] অবশেষে জাহাজ ডাঙায় এসে পৌঁছল। আমার আসল নিমন্ত্রণ ছিল পেরুতে— আমাদের পথের খরচ তারাই জুগিয়েচে। ঠিক একশো বছর পূর্ব্বে পেরু স্পেনের রাজ্যপাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল— তারই শতবার্ষিকী স্মরণোৎসব সভায় আমার নিমন্ত্রণ।[৩] আর্জেন্টীন হয়ে তারই রাস্তা। মাঝখানে আণ্ডেস পাহাড়। তুমি জানো, আণ্ডেসের উচ্চতা হিমালয়ের ঠিক পরেই। এই আণ্ডেসের উপর দিয়ে রেলগাড়ির পথ— বোধ হয় ১৫০০০ ফিট উঁচু হবে; সেখানে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পাহাড় পার হয়ে চিলি, সেখানে ভাল্‌পারেজো বন্দরে আবার জাহাজ অবলম্বন করে পাঁচ ছয় দিন পরে তবে পেরুতে পৌঁছনো যায়। কম কাণ্ড নয়। দশই ডিসেম্বর তারিখে ওদের উৎসব। আমরা আর্জেন্টীনে পৌঁছলুম, নভেম্বরের শেষের দিকে।[৪] অতএব আর বিলম্ব না করে পেরু যাবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। কিন্তু শরীর বিগ্‌ড়ে আছে— বুকের পাঁজরের মধ্যে একটা দুর্ব্বলতা বাসা বেঁধে মাঝে মাঝে পাখা ঝাপটাচ্চে। অতএব ডাকো ডাক্তার।

এখানকার সবচেয়ে যিনি বিখ্যাত ডাক্তার তিনি আমাকে ভাজায়মান (?) কই মাছের মত উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ঠুকে টিপে পরীক্ষা করলেন, ঘড়ি বের করে নাড়ীর পদক্ষেপ গণনা করে দেখ্‌লেন— শেষকালে গম্ভীর মুখে বল্‌লেন দেহযন্ত্র বিকল হয় নি কিন্তু দুর্ব্বল হয়েচে অতএব এখন কিছুদিন এ'কে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য। তাছাড়া ওটাকে তাজা করে তোলবার জন্যে কিছু ওষুধও চাই। ডাক্তারের পরামর্শমত এখানকার একজন ধনী মহিলা সহরের থেকে দূরে একজায়গায় নদীর ধারে আমাদের জন্যে একটি বাগান বাড়ি খালি করে দিলেন।* এদিকে পেরু বলে পাঠালে, আচ্ছা ভাল, আমাদের উৎসবের দিনে নাই বা এলেন, বিশ্রাম করে শরীর সুস্থ করে নিয়ে তার পরে আসতে দোষ কি? খুব কষে কিছুদিন বিশ্রাম করে নিয়ে আবার ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো গেল— আবার এই দেহটার এ পিঠে ও পিঠে ঠোকাঠুকি, টেপাটুপি— আবার সেই পরামর্শ, আণ্ডেস্‌ পাহাড় লঙ্ঘন করবার মত আমার যোগ্যতা নেই। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তরীপ বেষ্টন করে সমুদ্রপথে যাবার প্রস্তাব করা গেল— ডাক্তার বল্লে, দক্ষিণ সমুদ্রে এত অত্যন্ত বেশি শীত যে ঠাণ্ডায় আমার হৃৎপিণ্ড একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে যাবে। অর্থাৎ পাহাড় পেরোতে গেলে হাঁপিয়ে মরব আর সমুদ্র পেরোতে গেলে কাঁপুনি ধরিয়ে মারবে। দুটোর মধ্যে কোনোটাই স্পৃহনীয় নয়। অতএব পলায়ন ছাড়া গতি নেই। জাহাজের সংবাদ নিয়ে জানা গেল, পর বৎসরে তৃতীয় জানুয়ারিতে আটলাণ্টিক পাড়ি দেবার জাহাজ পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস এর মধ্যে কিছু ষড়যন্ত্র ছিল। জাহাজ শীঘ্র পাওয়া গেলে আমাকে ধরে রাখবার মৎলব ব্যর্থ হত। আমার বন্ধু এল্‌ম্‌হর্স্ট্‌ও নানা কারণে বিলম্ব করার পক্ষপাতী। অতএব সুদীর্ঘকাল বিনা প্রয়োজনে আমি বন্দী হয়ে রইলুম। পাখীর খাঁচা যদি খুব করে ঢাকা দেওয়া যায়, তাহলে অবিরাম গান গেয়ে সে আত্মবিনোদন করে। আমিও প্রতিদিন পায়ের শিকল নাড়া দিয়ে সেই তালে কবিতা লিখ্‌তে লাগ্‌লুম।

অক্টোবর নবেম্বর ডিসেম্বর এই তিন মাসে আমি বোধহয় ৬০ খানা কবিতা লিখেচি।[৮] শুধু কলম চলেছিল তাও নয়, মুখও বন্ধ ছিল না। যদিও প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেওয়া ডাক্তারের নিষেধ ছিল। তবু দলে দলে যারা আমার বাড়িতে আস্‌ত, তারা বক্তৃতা আদায় করে যেত। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সুদূর দেশে আমাকে প্রায় সকলেই জানে, সকলেই ভালোবাসে। আমার লেখার এত বিবিধ তর্জ্জমা ও আলোচনা আর কোথাও হয়েচে কিনা জানি নে। এখানে আমি সকলের ঘরের লোকের মত ছিলুম। আমাকে ভালো করে দেখবার অবকাশ এরা পায় নি, কিন্তু এদের দেশে আমি যে ছিলুম এতেই এরা খুসি। বিদেশের কাছে আমি যে রকম প্রচুর আদর পেয়েছি এমন আমি দেশের লোকের কাছে পাই নি। আমার এই চিঠি ইটালিতে পৌঁছিয়ে ডাকে দেব। সেখানে পৌঁছব, ১৯শে জানুয়ারিতে,[১] অর্থাৎ মাঘ মাসের কাছাকাছি। ইতি ৬ জানুয়ারি ১৯২৫

ভানুদাদা

১৫৮

২১ চৈত্র ১৩৩১

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তুমি যে-দুঃখ পেয়েছ তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না— ভালোই হবে; এর আঘাত একদিন কাটিয়ে উঠে সুস্থ হয়ে সুন্দর হ'য়ে তোমার সংসারের মধ্যে ঠিক আসনটি পেতে পারবে। তোমার নূতন জীবনের জন্যে তোমার বিধাতা কঠিন দুঃখের দাবী করেচেন। সেই মূল্য চুকিয়ে

দিয়ে যা লাভ করবে তাই তোমার পক্ষে খুব বড় জিনিষ হবে। তোমার মস্ত সৌভাগ্য এই যে, তোমাকে তিনি যা দিচ্চেন তা শস্তায় দিচ্চেন না। মূল্যবান জিনিষ শস্তায় পেলে তার ঋণ থেকেই যায়। তাতে ঠিক পাওয়া হয় না। তোমার মধ্যে যা অসত্য ছিল তাই আজ এমন করে অপমানিত হল— এই ত ভালো হল। আজ অগ্নিস্নানে পবিত্র হয়ে তুমি বিশুদ্ধ নির্ম্মলস্বরূপে তোমার সংসারে আত্মোৎসর্গের বেদী রচনা কর'। সংসারের সকল কাজের মধ্য দিয়ে আপনাকে তোমার ভগবানের কাছে প্রতিদিন পূজার নৈবেদ্যের মতো সমর্পণ করতে হবে— সত্য হতে না পারলে সে নৈবেদ্য তো দেবতা গ্রহণ করতে পারবেন না। তাই তিনি নিজের জিনিষকে নিজের হাতে শোধন করে নিচ্চেন— তাঁর হাতে দুঃখের এই অভিষেক তুমি মাথা পেতে স্বীকার করে নাও, তাতে তোমার মঙ্গল হবে।

ইতিমধ্যে বীরেন[১] এসেছিল। যতবার তার সঙ্গে আমার আলাপ হচ্চে ততবারই আমি খুসি হচ্চি। তার ক্ষমা তার প্রেম তোমার পক্ষে অমূল্য সম্পদ। নিজের মধ্যে একদিকে যেমন তুমি দৈন্যের গ্লানি ভোগ করেচ বাইরে থেকে আর একদিকে তেমনি দুর্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করতে পেরেচ— এমন সার্থকতা তো সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেবল দুঃখই তো পেতে পারতে, কিন্তু তার চেয়ে আরো আক্ষেপের বিষয় হ'ত, যদি যা পাচ্চ তার মূল্য বোঝবার সুযোগ না পেতে। যদি আত্মাভিমান নিয়ে বিধাতার দানকে খর্ব্ব করতে।

বীরেনরা আরো দুটো চিঠি পেয়েছে। তাতে অপরপক্ষ ওদের অনেক শাসিয়ে লিখেছে।[২] কিন্তু তাতে কেবল তারা নিজেদেরই উত্তরোত্তর বেশি করে ঘৃণ্য করে' তুলচে। তোমার উপরে ওদের করুণা এবং স্নেহ আরো বেড়েই চলেচে। এই কথা মনে রেখে তুমি মনে সান্ত্বনা পেতে পারবে।

আমি আগামী বুধবারে শান্তিনিকেতনে যাব। সেখানে নববর্ষের উৎসব হবে— তার পরে ২৫শে বৈশাখে আমার জন্মোৎসব। আমার নূতন বা

তৈরি শেষ হয়েচে। তোমরা যখন আস্‌বে তখন আমার সমস্ত চিঠি সঙ্গে করে এনো। সকলের ইচ্ছা সে চিঠিগুলি রক্ষা করা হয়— এখানে যত্ন করেই রাখা হবে।[৩] ইতি ৪ এপ্রেল ১৯২৫

ভানুদাদা

১৫৯

[?৫ এপ্রিল ১৯২৫]

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তুই মনে করিস্‌নে[১] তোকে কেউ আমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করতে পারে— বিশেষত যখন তোকে অপমান আর দুঃখ এমন করে আক্রমণ করেচে। এই সব নিয়ে আমার এই ভাঙা শরীরে আমি কি কম বেদনা পেয়েছি— এই সব ব্যাপারে কিছুতে আমাকে সুস্থ হতে দিচ্চে না। সব চুকে গেলে তবে বিশ্রাম এবং শান্তি পাব। যদি স্নেহ মনে না থাক্‌ত তাহলে ভর্ৎসনাও করতুম না।

কাল চিঠির যে উত্তর দিয়েছি আজ রবিবারে পাবি নে। সোমবারে এই দুখানা চিঠি একসঙ্গে তোর হাতে পড়বে। যদি মঙ্গলবারের ডাকে চিঠি এখানে দিস তাহলে পাব— নইলে শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় জবাব লিখিস্‌। বুধবারে বিকেলে পাঁচটার গাড়িতে রওনা হব।

আজ শান্তা ও কালিদাসের এখানে নিমন্ত্রণ[২] আছে তারই উদ্যোগে ব্যস্ত আছি তাছাড়া শরীরও শ্রান্ত ২১ [২২] চৈত্র ১৩৩১

ভানুদাদা

১৬০

[? এপ্রিল ১৯২৫]

ওঁ

*SANTINIKETAN
BENGAL

কল্যাণীয়াসু

সেই প্রথমদিন তোর একখানি চিঠির পর আর চিঠি পাই নি। ডাকে মারা যাচ্চে— কিম্বা তোর অবকাশ হচ্চে না বুঝতে পারচি নে। তুই যদি এরকম অবস্থায় চিঠি না লিখিস তাহলেও আমি নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু চিঠিপত্র চুরি গেলে সেটা ভালো হয় না। চারুবাবু[১] এখানে এসেছিলেন আজ যাচ্চেন তাই তাঁর হাতে এই চিঠি তাড়াতাড়ি দিচ্চি। মীরার কাল সমস্ত রাত colic হয়েছিল তাই নিয়ে আজ সকালে ভারি ক্লান্ত হয়ে আছি— এ কয়দিন অত্যন্ত গরমও পড়েছে। কাল আশাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছি।[২]

আমার এখানে নতুন খবর বিশেষ কিছুই নেই। রথী বৌমা কলকাতায়।

ভানুদাদা

১৬১

[?এপ্রিল ১৯২৫]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু তোর চিঠিপত্র কিছু কিছু মারা যাচ্চে বুঝতে পারচি। তাই এ চিঠি রেজিস্ট্রি করে পাঠালুম। অনেকদিন তোর চিঠি পাই নি, সে কথা তোকে কাল লিখেচি।

বিয়ের আগে তোরা কিছুদিন এখানে এসে থাকবি না ত কি। যখন তোদের সুবিধা হয় আসিস্। আমার পক্ষে এখন কোথাও যাওয়া অসম্ভব— নড়চড়া করতে গেলে তখনি বুঝতে পারি— হৃদ্‌যন্ত্রটা পাঁজরের ভিতরে একটা বোঝা হয়ে আছে।

সমস্ত দিন কেদারায় বসে কাটাই। কি ভাগ্যি এবারে গরম এখনো পড়ে নি। মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টি হয়।

বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার বেলা চলে যায়। বেশ ভালোই লাগে। এই অসুখের ভিতর দিয়ে খুব বড় একটা মুক্তির ভাব সমস্ত ক্ষণ আমার মনের মধ্যে লেগেই আছে। দিনের আলো নিবে গেলে রাত্রের আকাশে সমস্ত জ্যোতিষ্কলোক যেমন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে— প্রাণের আলো ম্লান হয়ে এলে অমৃতলোকের আভাস তেমনি করেই মনের দৃষ্টির সাম্‌নে ফুটে ওঠে। যখন ছোট ছিলুম তখন বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মধ্যে আমার মুক্তির জায়গা ছিল— অনেককাল পরে অনেক পরিমাণে আমার সেইদিন যেন ফিরে এসেচে। সেইজন্যে আমার দুর্ব্বলতার বোঝা বুকে পিঠে বহন করেও মনে হচ্চে আমি ছুটি পেয়েছি।

ভানুদাদা

বীরেনের চিঠি পড়ে খুবই খুসি হয়েছি। বাঙালীর ঘরে এ রকম ছেলে প্রায় দেখা যায় না। ওর ভালোবাসা তোর পক্ষে কেবল সৌভাগ্য নয় সম্মান। আমার কামনা, তুই যেন কায়মনোবাক্যে এর যোগ্য হতে পারিস।

১৬২

[মে ১৯২৫]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোমাকে কাল জন্মদিনের বিবরণ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি।[১] কিন্তু আজকাল কেদারায় হেলান দিয়ে বসে থেকে থেকে এমন কুঁড়েমিতে পেয়েছে যে ভালো করে চিঠি লেখা কাকে বলে ভুলে গেছি। লেখা পড়া দুইই আজকাল বন্ধ আছে। প্রায় সমস্ত দিন খোলা আকাশের সামনেই পড়ে থাকি— সামনের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। সেটা ক্রমে বেশ ভালো লাগ্‌চে— অর্থাৎ আকাশটা যে শূন্য নয় তা বুঝতে পারচি। যখন ছোট ছিলুম তখন দিনের পর দিন এই আকাশ আমার মন ভুলিয়ে নিয়ে যেত— তারি ডাক শুনে আমি ইস্কুল পালিয়েছি। ইদানীং নানা প্রকারের হট্টগোলে এই ডাকটি আমার কাছে এসে পৌঁছত না। শরীর অসুস্থ হওয়াতে যেই কর্ম্মের দাবী কম হয়েচে অমনি নীলাকাশের বাঁশির স্বর সেইদিনকার মতই আবার আমার বুকের মাঝখানে এসে ছুটির নিমন্ত্রণ করে যাচ্চে। আমার উত্তরায়ণ ঘরের সাম্‌নেকার খোয়াইয়ের ধূসরবর্ণ নিস্তব্ধ তরঙ্গের পরপারের সুদূর তালগাছগুলি পশ্চিম দিগন্তের ভাষাহীন সঙ্কেতের মত অস্তাচলের উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী কোন্ অনির্ব্বচনীয়ের দিকে আমাকে পথ দেখিয়ে দিচ্চে। এবারকার জন্মদিন সেই পথযাত্রীর জন্মদিন। আজ চৌষট্টি বৎসর পূর্ব্বে মেঘমুক্ত আকাশের দীপ্ত আলোর নীচে এই পথিকই জন্মেছিল, বিদ্যার, ধনের, খ্যাতির তীর্থে যাবার জন্যে সে পর্‌ওয়ানা আনে নি— হাটের লোকে যা'কে অলক্ষ্য বলে জানে তাকেই লক্ষ্য করে সে যাত্রা আরম্ভ করেছিল। এবার পঁয়ষট্টি বছর বয়সের সুরুতে সেই অতি সাবেককালের কথাটা হঠাৎ আবার মনে পড়ে গেল। পথের সাথী

আমাকে বরণ করেচেন, আমার জন্যে ভোগ নয়, স্বার্থ নয়, কীর্ত্তি নয়, সঙ্গ নয়— একে একে বন্ধন ছিঁড়বে, ঘরের ভিৎ ভাঙবে, সঞ্চয় যাবে শূন্য হয়ে, ভিড়ের সভা হয়ে যাবে ফাঁক— তার পরে যখন সব চুকে বুকে যাবে তখন দেখ্‌তে পাব শূন্যতার পাত্রখানি রসে ভরে আছে।

ভানুদাদা

তোমার মাকে বোলো তাঁর
চিঠি পেয়েছিলুম।

১৬৩

১৫ মে ১৯২৫

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, উত্তরায়ণে যে বাড়িতে থাকতুম সেটা নতুন করে তৈরি হয়েচে।[১] মাঝের ঘরটার চারদিকে দরজা জানলা নেই, তার ছাদটা হয়েচে উঁচু আর পাকা। পশ্চিম দিকে কাঁকর-দেওয়া যে চাতাল আছে তার উত্তর কোণে একটা ছোট ঢাকা বারান্দার মত তৈরি হয়েচে। সকালে সেইখানে আমার কেদারা নিয়ে বসি। অনেকক্ষণ রোদ্দুর আসে না। সামনে আমার খোয়াই, আর সেটা ছাড়িয়ে দূরে সাঁওতাল পাড়া। বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত এইখানে আমার কেটে যায়,— তার পরে স্নান করতে যাই. স্নান করে খেয়ে মাঝের ঘরে বসি। সাম্‌নে উত্তর দিকের মাঠ, তার দূর প্রান্তে তালবন। মাঝখান দিয়ে ভুবনডাঙার রাস্তা চলে গেছে। অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত এইখানেই আমার দিন যায়। আজকাল প্রখর রৌদ্র— তপ্তবাতাস যেন তৃষ্ণাতুর পৃথিবীর দীর্ঘশ্বাসের

মত। আমি ঘর বন্ধ করে এই তাপ এড়াতে চাই নে। আমি চেয়ে থাকি— আকাশে চীল উড়ে যায় ; শালিখগুলো বারান্দায় এসে ঠোঁট দুটো খুলে হাঁপাতে থাকে, বুঝতে পারি আমার কাছে তারা জল ভিক্ষা করতে এসেচে— আমি তাদের জন্যে একটা হাঁড়িতে জল ভরে জলসত্র খুলেচি। বেলা যখন চারটে বাজে— সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়ে' আমার একতলা ঘরটার মধ্যে তার দীর্ঘ করপ্রসারণ করে। তখন পূবদিকের বারান্দায় গিয়ে বসি, যথাসময়ে চা আসে। চা খাওয়া হলে পরে পূবদিকের কাঁকর বেছানো রাস্তায় আমার চৌকি পড়ে। তখন ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ আসে আমার কাছে কবিতা পড়বার জন্যে। এখন বিদ্যালয়ের ছুটি— ছাত্রছাত্রীরা প্রায় কেউ নেই। মেয়েদের মধ্যে আসে লাবী[২] অমিতা[৩] গৌরী[৪], আর তাদের মায়েরা[৫]; ছেলে কেবল দু জন। আমার সেই বৈকালিক ক্লাস কেবল দুদিন আরম্ভ হয়েচে। Wordsworth[৬] থেকে পড়াতে সুরু করেছি, প্রথম দিন পড়িয়েছিলুম সেই হাইল্যাণ্ড মেয়েটির কবিতা[৭]— কাল পড়িয়েছি "She was a phantom of delight!" আমি এমন করে পড়াই যে, ওরা বোধ হয় কখনো ভুলতে পারবেনা। আমি যদি কবিতা ইত্যাদি বাজে জিনিষ লিখে সময় নষ্ট না করতুম তাহলে নিশ্চয়ই ইস্কুলমাস্টার হতে পারতুম। পড়ার ক্লাস হয়ে গেলে পর ক্রমে যখন সন্ধ্যা অন্ধকার নেমে আসে তখন আবার একদল আমার কাছে গান শিখ্তে আসে। এখন দিনু নেই— সে গেছে পুরীতে চলে, কাজেই গান শেখাবারও একমাত্র কর্ত্তা আমি। ভুল শেখাই কি ঠিক শেখাই তা অন্তর্যামী জানেন। কিন্তু শিখিয়ে ত যাই। ক্রমে রাত্তির হয়ে আসে— মেয়েরা চলে যায়। সেই বাইরে বসেই রাত্রের খাওয়া খেয়ে নি। তার পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঐখানেই পড়ে থাকি। আমার জন্মদিনেই শুক্লপক্ষ শেষ হয়ে গেছে। এখন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির ভূমিকা হয় অন্ধকারে। কি গভীর নির্ম্মল স্বচ্ছ অন্ধকার!— অসংখ্য তারার সভায় প্রহরগুলি নিঃশব্দচরণে তাদের প্রণাম জানিয়ে জানিয়ে চলে যায়। আমি

কেদারায় হেলান দিয়ে কখনো ঘুমোই কখনো জাগি। আশ্রমের কুটীরে কুটীরে সব আলোগুলিই নিবে যায়, চারিদিক নিস্তব্ধ— আকাশে যেন শান্তনিঃশ্বাস শিবের তপস্যা; নন্দী যেন অবারিত প্রান্তরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ঠোঁটের উপরে তর্জ্জনী তুলে। রাত একটা হয় কি দুটো হয় জানতে পারিনে— শোবার ঘরে উঠে গিয়ে মশারির মধ্যে প্রবেশ করি। দিনরাত্রির মধ্যে সেই আমার প্রথম বন্ধনদশা; তার পরে ভোরের আলোর কাছ থেকে আবার মুক্তির আহ্বান আসে। তোকে ত আগেকার চিঠিতেই লিখেচি আমি আবার যেন আমার [ছেলে] বেলাকার যুগে এসে পৌঁচেছি, নিখিল তার আঁচলের মধ্যে আমাকে ঘিরে নিয়েচে। [তা]র নিশ্বাস আমার নগ্ন চিত্তের উপর এসে লাগ্‌চে। সত্তার সহজ স্রোতে গা-ভাসান দিয়ে চলেচি। বাইরের আকাশ পূর্ণ করে একটি বাণী আছে— "এই যে আমি"— সেই বাণী [...]' হয়ে উঠেচে; আমার মধ্যেও তারি সঙ্গে মেলে এমন একটি বাণী আছে, সেও হচ্চে— "এই যে আমি"— সেই বাণীই বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলে আজ আর-সব কথা ছাড়িয়ে উঠ্‌চে। এতদিন ছিল নানা প্রয়াস, [নানা] কাজ; অর্থাৎ তখন করাটাই আমার হওয়াকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। এখন সে সমস্ত সরে যেতে আমি যে হয়ে আছি এই সত্যটাই নিখিল-হওয়ার সত্যের মধ্যে ডুব দিয়েচে। [মে] মাসে য়ুরোপে যাওয়া ঠিক করেচি। মনের মধ্যে বারবার আশঙ্কা হচ্চে পাছে [...]র আমি ঢাকা পড়ি। কিন্তু আমার বিধাতা আমার জীবনপ্রবাহিণীকে পদ্মার চরে সৃষ্টি করেচেন। এর এক কূলে অনাবৃত নির্জ্জন চর, আর এক কূলে ছায়ালোকে [...] সজন লোকালয়। হওয়া এক কূলে গান ধরেচে, করা আর এক কূলে মৃদঙ্গে[তাল] দিচ্চে। শেষ পর্য্যন্ত কোনোটাকেই বাদ দেবার হুকুম নেই। সেইজন্যেই আমার জীবন [...] ত কঠিন— সুর মেলাতে গিয়ে তাল কাটলে নিষ্কৃতি নেই। ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

ভানুদাদা

১৬৪

১০ জুন ১৯২৫

ওঁ

*SANTINIKETAN
BENGAL

কল্যাণীয়াসু

রাণু, প্রশান্তর[১] হাতে তোর একখানা চিঠি পাওয়া গেল। বোঝা গেল এখনো কালীর বোতল জোটে নি— তা ছাড়া আমার দফ্‌তর থেকে সেই যে চিঠিকাগজের বই সংগ্রহ করেছিলি তার প্রচুর ব্যয় হয়ে গিয়ে একখানাও বাকি নেই। যে হেতু তার সদ্ব্যয় হয়েছিল এই জন্যে আমি আপত্তি করতে চাইনে— কিন্তু আমি আগে থাকতে নোটিস্ দিয়ে রাখচি যে বিল্ পাঠাব।

আমার জীবনযাত্রা পূর্ব্ববৎ চল্‌চে। মাঝের খোলা ঘরেই মধ্যাহ্নকাল[য] কাটে— এক একদিন যখন প্রখর তাপে গায়ের রক্ত শুকিয়ে ভিতরে ভিতরে আমসত্ত্বর মত হয়ে যায় তখনো রুদ্ধ ঘরের স্নিগ্ধছায়ার আশ্রয় নিই নে। আমি রবি, আমি আলোকপিপাসু।

প্রশান্ত সাম্‌নে বসে আমার প্রুফ নিয়ে বানান সম্বন্ধে তুমুল তর্ক করচে। আমি সে আলোচনাতে যোগ দিচ্চি অথচ চিঠিও লিখে যাচ্চি। কারণ ওরই হাতে এ চিঠি পাঠাব— গরীব মানুষ, চার পয়সার ডাকখরচ বাঁচাতে চাই। বড় দুঃসময় পড়েছে।

আমাকে তোরা বিবাহ নিমন্ত্রণে সশরীরে উপস্থিত দেখবি আশা করচি[স]— কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে আশা না করলে নৈরাশ্যের হাত থেকে রক্ষা পাবি। রেল গাড়িযোগে নড়াচড়া করা আমার পক্ষে বিভীষিকা। দূরে থেকে সমস্ত মন দিয়ে তোদের আশীর্ব্বাদ করব। আর যদি মিষ্টান্ন এখানে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিস তাহলে তোদের ভোজেও যোগ দিতে পারব।

চা এসেচে— প্রশান্ত যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেচে। কাজেই এইখানেই ক্ষান্ত হলুম। ইতি ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

ভানুদাদা

১৬৫

১৫ জুন ১৯২৫

ওঁ

*SANTINIKETAN
BENGAL

কল্যাণীয়াসু

"আবার আহ্বান?" আমি ভাব্‌ছিলুম, হয় এতদিনে তুই নিজের ভাবী সংসারের ভূমিকা রচনা করতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিস্ নয় কোনো মুখোস্-পরা গুণ্ডা পিস্তল হাতে করে অর্দ্ধরাত্রে তোকে ঝুলিতে পুরে মোটোর গাড়ির মধ্যে ফেলে ঘণ্টায় ৭৫ মাইল বেগে হাঁকিয়ে ডেরা ইস্মায়েল খাঁতে মাটির নীচেকার একটা ঘরে কুলুপ বন্ধ করে রেখেছে, দরজায় খোলা তলোয়ার হাতে হাব্‌সির পাহারা বসে গেছে। সেখানে আমাকে কেউ নিমন্ত্রণ করবে বলে আশঙ্কা করি নি তাই এখানে আমার কেদারার উপরে কুশন পেতে বেশ গুছিয়ে বসেচি। যাই হোক্ তোর বিয়ের লগ্নে রবি কোন্ কক্ষে থাকবেন এখনো পঞ্জিকায় তার খবর পাকা হয় নি অতএব ও আলোচনা থাক্।

আমাদের এখানে মাঝে মাঝে ঘন ঘোর ঘটায় দিগন্ত অন্ধকার করে প্রান্তরে প্রান্তরে ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব চল্‌চে। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসঃ এসে পড়ল— এ সময়ে আমার মত কবির উচিত হচ্চে যথানিয়মে বিরহ যাপন করা। মেঘদূতের যক্ষের যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে শুনেছি সে এই

সময়টাতে হয়েছিল, "কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ"— আমিও হয় ত হতে পারতেম কিন্তু কনক বলয়ের বিল্ শোধবার মত আমার সামর্থ্য নেই— তবে কিনা কিছুকাল থেকে প্রকোষ্ঠের পরিধি একটু যেন কমে আসচে। আর আর সব লক্ষণ ভালোই— আহার সেই রকম জল দিয়ে নেবু দিয়ে ভাত দিয়ে, নিদ্রার বারো আনাই শয্যার বাইরে তারালোকিত আকাশের নীচে— অন্যবিধ ভোগের যে ব্যবস্থা সেও অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং স্বল্পমাত্র, অর্থাৎ একটি ত্রিবার্ষিকী আছেন[১] তাঁর সঙ্গে যে রসালাপ করে থাকি সে গণ্ডার কিম্বা ভাল্লুকের জীবনচরিত নিয়ে— তাতে অলঙ্কারশাস্ত্র লিখিত প্রথম রসটির ছিটেফোঁটাও নেই।— এই পত্র আজ রাত্রে জগদানন্দবাবুর[২] হাত দিয়ে রওনা করে দেব— আশা করি কাল যথাসময়েই পাবি। ইতি
১ আষাঢ় ১৩৩২

ভানুদাদা

১৬৬
১৮ জুন ১৯২৫

ওঁ

*SANTINIKETAN
BENGAL

রাণু

এই মাত্র তোর চিঠি পেলুম। লিখেছিস অনেকদিন আমার চিঠি পাস্ নি। এটা আমার উপরে উল্টো চাপ দেওয়া হল। যা হোক্ এ কথা নিয়ে ঝগড়া করতে চাই নে। তুই যদি আমাকে চিঠি লেখবার সময় না পাস সেটা ভালো লক্ষণ। আমি আশাকে জানিয়ে রেখেছি যে যদি তোকে অমাবস্যার বাদলা রাত্রে ইলেক্ট্রিক মশালের আলোকে দস্যুদল সুখশয্যা থেকে বলপূর্ব্বক আড়কোলা করে তুলে নিয়ে যায় তাহলে সেই খবরটা

যেন তার পরের দিন কাজকর্ম্ম ও আহারাদি সেরে আশা আমাকে পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করে। আজকাল আমি সংহিতা আলোচনা করে বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি সবই জেনে নিয়েচি।[১] এই রকম হরণ করে বিবাহকে ভগবান মনু অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে অন্যতম বলে স্বীকার করেন। এর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, কন্যাপক্ষে কোনো খরচপত্র লাগেনা; প্রণামী দেবার জন্যে ভালো বেনারসী সাড়ি কিন্‌তে হয় না— আর যাদের বলে ইতরে জনাঃ wedding present সম্বন্ধে তাদের চিন্তা ও চেষ্টার দরকার থাকে না। এই সকল কারণে সবদিক চিন্তা করে আমি এই প্রণালীর বিবাহটাকেই সমাজে প্রচলিত করবার জন্যে একটা সভা স্থাপন করব মনে করচি। কন্যাপণপীড়িত ভদ্র পরিবারের পক্ষে এটা খুবই উপাদেয় হবে। তোর বিবাহে যদি এই সাধুপ্রণালীর দৃষ্টান্ত কোনো তরুণ সমাজসংস্কারকে দেখাতে পারেন তাহলে তার সংবাদটা নিশ্চয়ই আশার কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ। ৪ আষাঢ় ১৩৩২

ভানুদাদা

১৬৭

২৭ জুন ১৯২৫

*Rabindranath Tagore

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু আশীর্ব্বাদসহ কিছু উপহার পাঠালুম।[১] তোর কোনো কাজে লাগ্‌বেনা জানি। কিন্তু আমার যা সব-চেয়ে দেবার জিনিষ তাই দিলুম।

হয়ত স্বরলিপির বইগুলো কখনো কখনো দরকার হতে পারে। এগুলো তোরা একবার দেখে তার পরে সার্ রাজেনের[২] ওখানে পাঠিয়ে দিস্— কারণ সেখানে ওঁর য়ুরোপীয় আমন্ত্রিতরা হয়ত এর মূল্য বুঝবে।
ইতি ১৩ আষাঢ় [১৩৩২]

ভানুদাদা

১৬৮

২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬

*RABINDRANATH TAGORE

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, আমার যতই বয়স বাড়চে ততই আমার ধৈর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য এতই বাড়চে যে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই। কেউ গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলে আমি অবিচলিত থাকতে পারি, কেউ যদি সপ্তম সুরে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাহলে নিতান্ত ভালোমানুষের মত নিরুত্তর থাকা আমার পক্ষে আজকাল দুঃসাধ্য নয়, কেউ যদি কেবলমাত্র গলার জোরে প্রমাণ করতে বসে যে আমার মত হৃদয়হীন নির্ম্মম মানুষ বিধাতার সৃষ্টিতে আজ পর্য্যন্ত হয় নি, সুদূর ভবিষ্যতেও যে হবে এমন সম্ভাবনামাত্র নেই তাহলেও হাস্যমুখে সেই দুর্ব্বিষহ অপবাদবাক্য নির্ব্বাক হয়ে পরিপাক করতে পারি এমন অমানুষিক শক্তি আমার হয়েচে আজই এই পত্রেই তার প্রমাণ হাতে হাতে হবে, জগৎ বিস্মিত হয়ে উঠ্‌বে— কেবল একটি সন্দিগ্ধহৃদয়া পরদোষানুসন্ধানপরা বালিকা ছাড়া।

কলকাতায় পা দিয়েই কি রকম ভিড়ের আবর্ত্তে সম্পূর্ণ তলিয়ে গিয়েছিলুম নিশ্চয়ই তার বিবরণ তোর অগোচর নেই।[১] সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত বিষম গোলমালের মধ্যে এমনি আপাদমস্তক হারিয়ে গিয়েছিলুম নিজেকে নিজে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়েছিল। সম্মুখেই ছিল ৭ই পৌষের উৎসব— ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে তার নাগাল পাওয়া গেল। তার পরে গতকাল পর্য্যন্ত অতিথি অভ্যাগত ও নানা অনুষ্ঠানের চাপে আমাকে ঠেসে ধরে ছিল। আজ বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের মত চীৎ হয়ে পড়ে বিশ্রাম করচি— তবু লোকসমাগমের সম্পূর্ণ বিরাম নেই। আমার আধুনিক ইতিহাস এইরকম। এতেও যদি অবলা নারীর মনে দয়া না হয় তবে নিঃসন্দেহে তার হৃদয়— কথাটা শেষ করব না।— বীরেনকে আশীর্ব্বাদ জানাস আর তোর শ্বশুর শাশুরিকে আমার নমস্কার। ইতি ১২ পৌষ ১৩৩৩

ভানুদাদা

১৬৯

১৭ পৌষ ১৩৩৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

১ জানুয়ারি ১৯২৭

এতদিনের বহু
আনন্দপরিপূর্ণ
পুনরাবর্ত্তন।

কল্যাণীয়াসু

রাণু, ভেবেছিলুম প্রথম দিনের চিঠিতে খুব খানিকটা কোঁদল করে নিয়ে মনের ঝাঁজ তোর কতকটা মিটে গেছে। এ যে দেখি একেবারে

উল্টো— কথার টেম্পেরেচর ক্রমেই চড়ে যাচ্চে— প্রায় প্রলাপের ডিগ্রি পর্য্যন্ত এসে ঝাঁ ঝাঁ করচে। বয়স তোর যখন অল্প ছিল তখন দেখেচি খুব ঘোরঘনঘটায় ঝগড়া জমিয়ে তুলে বেশি ক্ষণ তার জের রাখতে পারতিস্ নে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাদল কেটে গিয়ে প্রসন্ন হাস্যে আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ত। সেই ভরসাতেই তোর চিঠির চড়া সুরে তত বেশি ভয় পাই নি। এখন দেখ্‌তে পাচ্চি আবহাওয়া একেবারে বদ্‌লে গেছে। দুর্যোগ কিছুতে আর মিট্‌তে চায় না। এর কারণ কি এতক্ষণ তাই চিন্তা করছিলুম। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে আজকাল তুই খুব অতিরিক্ত পরিমাণে আদর পাচ্ছিস্। এটি বীরেনের কীর্ত্তি। আমি তাকে বুঝিয়ে বলব তাতে তারও সুবিধা হবেনা, মাঝের থেকে আমাদের উপর পর্য্যন্ত এর ঝাপ্‌টা এসে লাগ্‌বে। তোর সাহস ত কম নয়! আমার মত এত বড় লোককেও খোঁটা দিতে শিখেছিস! এই সেদিন দেখলুম বেণী দুলিয়ে পুতুলখেলায় মেতেছে— আর আজ! বাস্‌রে, হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান নেই, ছোটবড় ভেদ নেই— কি প্রচণ্ড মুখনাড়া! কলকাতায় গিয়ে মোকাবিলায় বোঝাপড়ার চেষ্টা করব ইতিমধ্যে মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা করে নে— তার উপায় হচ্চে বীরেনের সঙ্গে খুব ঝগড়া করে একটা দামী রকমের নেকলেস আদায় করে নেওয়া। তার পরে যখন আমার আবির্ভাব হবে তখন মুখের কথা মধুর হয়ে আস্‌বে আর ওষ্ঠাধর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত হাসিতে ভরে যাবে, কোমল গান্ধার সুরে অভ্যর্থনা করবি, আসুন আসুন ভানুদাদা— বড় খুসি হলুম। ভানুদাদা

১৭০

১৬ এপ্রিল ১৯২৭

ওঁ

*SANTI-NIKETAN
BENGAL, INDIA

কল্যাণীয়াসু

রাণু তোর চিঠি ভারতের নানা প্রদেশ ঘুরে আজ ফিরে এল। আমিও কিছুদিন পূর্ব্বেই ফিরেছি।[১] তোর বাবা মার সঙ্গে পথেই দেখা হয়েছিল। আমি গার্ডন পার্টির কার্ড পেয়েছিলুম কিন্তু নিতান্তই ঢিলে মানুষ বলে উত্তর দিতে ভুলেচি। পার্টি প্রভৃতিতে প্রায়ই যাই নে, তাই এইরকম দুর্গতি ঘটে। কবি বদ্‌নাম থাকাতে লোকে অপরাধ ক্ষমা করে— ক্ষমা করে বলেই অপরাধ বেড়ে চলতে থাকে।

এবার গরমের সময় কোথায় থাকব এখনো সম্পূর্ণ ঠিক হয় নি— কিন্তু এটা স্থির যে শান্তিনিকেতনে থাকব না। এক একবার কথা উঠ্‌চে যে, শিলঙ পাহাড়ে যাব। সেখানে একজন[২] আমাকে নিমন্ত্রণ করেচেন। কিন্তু কারো বাড়িতে থাকতে গেলে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে তাই দ্বিধা করচি। দিনু কমল কাল শিলঙের অভিমুখে চলে গেল। আমার শরীর বড়ই ক্লান্ত আছে বলে কোনো ভালো জায়গায় যাওয়া কর্ত্তব্য বোধ করি— কিন্তু ক্লান্ত আছে বলেই নড়তে উৎসাহ বোধ করচি নে। আগামী ২৫শে বৈশাখে আমি ৬৭ বৎসরে পড়ব— সুতরাং বুঝ্‌তেই পারচিস্‌ ওপারের খুব কাছ ঘেঁষেই এসেচি— বায়ু পরিবর্ত্তনের পক্ষে আয়ু পরিবর্ত্তনের মত কিছুই নেই— সব ক্লান্তি সব বালাই এক নিশ্বাসেই চুকে যায়। রথী বৌমা কাল সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতায় যাচ্চে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে টেলিফোন করলে পরস্পর সংবাদ বিনিময় করতে পারবি। কলকাতায় যখন যাব আমার যে বই তুই পড়তে চাস্‌ দেব। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩৪

[স্বাক্ষরহীন]

১৭১

১০ মে ১৯২৭

[শিলঙ]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, শিলঙে এসে পৌঁচেছি।[১] কিন্তু এ আর এক শিলঙ। আগে যেখানে ছিলুম কেমন নিরিবিলি,— আসবাবপত্র ছিল না, ঘর দুয়ার অপরিপাটি কিন্তু কেমন খোলা— দু পা বাইরে গেলেই সেই নির্জ্জন রাস্তা, ঘন বনের ছায়া— একটু করে লিখচি আর সেই রাস্তায় বেরিয়ে পায়চারি করে আসচি— দিনগুলোর মধ্যে কোথাও একটু ফাঁকা ছিলনা। এখন যেখানে আছি, ইংরেজের বাড়ি, ফিট্‌ফাট্, কার্পেট পাতা, চারদিকে পরদা টানা, ছিটের ঢাকা দেওয়া চৌকি, সোফা; পালিস করা মস্ত বড় ডিনার টেবিল ইত্যাদি ইত্যাদি— কিন্তু শিলঙ পাহাড় এখানে বোবা। একরকম লেবু আছে যার প্রায় সমস্তটাই খোসা, খুব মস্ত বড় কিন্তু ভিতরে শাঁস নেই বল্‌লেই হয়। এবারকার এ শিলঙটাকে সেইরকম মনে হচ্চে। একটা কোনো বই লেখবার ইচ্ছে আছে[২] কিন্তু এখনো মন বসাতে পারি নি। দু চার দিন সময় লাগ্‌বে। এদিকে বৃষ্টি দেখা দিয়েচে— খুব বেশি নয়— কিন্তু আমি সূর্য্যোপাসক, রোদ্দুর না হলে বাঁচিনে।

এখানে বোধ হচ্চে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত আছি। তার পরে নেবে গিয়ে খুব সম্ভব সমুদ্রপারে কোথাও চলে যাব। তোর বাবার চিঠিতে দেখলুম তাঁরা সিম্‌লে পাহাড়ের দিকে যাচ্চেন— সুতরাং তাঁদের সঙ্গে শীঘ্র দেখা হবার সম্ভাবনা নেই— তোদের সঙ্গেও বোধ করি তথৈবচ। ইতি ২৭ বৈশাখ ১৩৩৪

ভানুদাদা

১৭২
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

Uplands
Shillong

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোর চিঠি পেয়েচি, ভয় নেই— শুধু "India" ঠিকানায় লেখা চিঠিও আমি মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি— খ্যাতির এই রকম দুই একটা সুবিধা আছে; অসুবিধাও বিস্তর, নিরিবিলিতে থাকবার জো নেই। সর্ব্বদাই লোকসমাগম হচ্চে— আমাকে দেখবার জন্যে কৌতূহল— সার্কাসে যেমন সিংহ দেখতে আসা— তাতে সিংহের মন খারাপ হয়ে যায় কিন্তু দর্শকের মন খুসি থাকে। ভাবচি পাঁচ টাকা করে দর্শনীর টিকিট করব।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি মাঝে মাঝে রোদ্দুর— এইভাবে চল্‌চে। লিখ্‌তে যাই, ক্লান্তি আসে, কেদারায় ঠেস দিয়ে পড়ি, হঠাৎ আসে ভিজিটার— হাসিমুখে অভ্যার্থনা করি, বলি, চা খেয়ে যাবেন না? আবার একটু সময় পাই, একখানা বই নিয়ে বারান্দায় আরেকটা কেদারায় গিয়ে বসি, হঠাৎ আসে একদল ছাত্র। বলি, শিলঙ কেমন লাগচে? কোন্‌দিকে তোমাদের বাসা? তারা বড় কথা কয় না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, চলেও যায় না। খানিক বাদে আবার একটু সময় পাই— এবার ঘরে এসে সোফায় পা তুলি, হঠাৎ আসে খবরের কাগজের রিপোর্টার— বলে Dr. Tagore, what is your opinion about আর জায়গা নেই। ইতি ২০মে ১৯২৭

ভানুদাদা

১৭৩

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

ওঁ

[শিলঙ]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোর এবারকার চিঠিতে একটুমাত্রও উত্তাপ না দেখে আশ্চর্য্য হলুম। বুঝতে পারচি দার্জ্জিলিঙের হাওয়াটা ঠাণ্ডা এবং সেটা তোর স্বাভাবিক উষ্ণ মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী। তোর মাথাটাকে ঠিক মতো প্রকৃতিস্থ করতে গেলে কবিরাজী তেল প্রভৃতি হার মানবে— কিছুকাল একটা রেফ্রিজারেটরের মধ্যে ওটাকে দিনরাত রেখে দেওয়া দরকার। আগামী গরমে যখন বেড়াতে যাবি গ্রীনল্যাণ্ড কিম্বা নর্থ পোলে যাস। আমার বিশেষ কোনো খবর নেই— তার কারণ একটা গল্প লিখতে বসেচি— সেই একটা খবরেই আমার আর সব খবর তাড়িয়ে রেখেচে। কোথাও বড়ো বেরোই নে বলে মোটর চাপা পড়ি নে, খদে প'ড়ে পা ভাঙে না, বৃষ্টিতে ভিজে ন্যুমেনিয়া হয় না, পথে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে চায়ের নিমন্ত্রণ জোটে না— অর্থাৎ এমন কোনো মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে না যেটা বর্ণনা করে বললে ক্ষণকালের জন্যে লোকের আমোদ হতে পারে— এক কথায় ভারি uninteresting হয়ে আছি। ইতি ৩১শে মে ১৯২৭

ভানুদাদা

১৭৪

৪ চৈত্র ১৩৩৪

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

জ্বরে পড়ে ছিলুম— কাল থেকে ভালো আছি— কিন্তু শরীরটা খুব ক্লান্ত। তোকে দেখবার জন্যে ইচ্ছে করে— সেরে উঠলে যাব। কাল সকালে লর্ড সিংহের[১] শ্রাদ্ধসভায় একবার যেতে হবে— বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। আজ তবে আসি। ইতি ১৭ মার্চ্চ ১৯২৮

ভানুদাদা

১৭৫

১৯ বৈশাখ ১৩৩৫

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

রাণু, কাল যাব ঠিক করেছিলুম পারব না— শরীর ক্লান্ত— Ultra-violate rays লাগাবার জন্যে সকালটা কেটে যাবে— পর্শু দশটার মধ্যে জাহাজে আমার আসবাবপত্র পাঠানো চাই— তাই নিয়ে বিষম ব্যস্ত থাকতে হবে।[১] এবারকার মতো কিছুদিনের জন্যে বিদায় নিই— ফিরব অঘ্রাণে,— তখন এসে দেখা করব। এখন রইল আশীর্ব্বাদ। ইতি ২মে ১৯২৮

ভানুদাদা

১৭৬

৬ মে ১৯২৮

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত লোকের ও কাজের ভিড় থাকাতে ভাল ঘুম হয় নি— আজ সকালে খুবই ক্লান্ত ছিলুম। তার উপরে গোছানো এবং চিঠি লেখা। তার উপরে পুনশ্চ লোক সমাগম। এখন প্রায় দুটো বাজে— উচিত ছিল বিছানায় চিৎ হয়ে পড়া। কিন্তু সে সুযোগও ছিল না— এখনো ছোটখাটো নানাবিধ খুচরো কাজ চল্‌চে। কথা রাখতে পারলুম না বলে বড়ো খারাপ লাগ্‌চে— লক্ষ্মীটি কিছু মনে করিস্ নে।

আমি যে য়ুরোপে কোথায় গিয়ে উঠব তার কিছুই ঠিক নেই— একবার ভাবচি দক্ষিণ ফ্রান্সে একবার সুইজারল্যাণ্ডে, একবার হাঙ্গেরিতে। যেতে ইচ্ছে করছে না— কোথাও নির্জ্জন কোণে যদি পড়ে থাকতে পারতুম তাহলে বাঁচতুম। সে জিনিষটা খুব যে দামী তা নয়, তবুও দুর্লভ।

একান্ত মনে কামনা করি তুই যেন সুস্থ থাকতে পারিস। বীরেনকে আশীর্ব্বাদ। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩৩৫

ভানুদাদা

১৭৭

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

ওঁ

*Srabasti
Colombo

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। এবারকার বিচিত্রাতে ভানুদাদার যে চিঠি বেরিয়েচে[১] সেটা আর একদিন এই কলম্বো থেকেই লিখেছিলুম য়ুরোপ যাত্রার মুখে। এবারো সেইখান থেকেই লিখ্‌চি কিন্তু যাত্রা বন্ধ হয়ে গেচে। কলকাতা থেকে আর এই কলম্বো পর্য্যন্ত বারেবারে আমার শরীর ভেঙে পড়ল, অবশেষে বিলেত থেকে চিঠি এল যে আগামী বছরের এপ্রিলে আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। শরীরের এমন দশা হয়েচে এবারে কিছুতেই পারতুম না। এখন দেশে ফিরে গিয়ে একেবারে সম্পূর্ণ নির্জ্জনতার মধ্যে কিছুকাল ডুব মারব— কারু সঙ্গে দেখা করবনা। চিঠিপত্র লিখব না— নিজের ধ্যান নিয়ে থাক্‌ব, অবিচ্ছিন্ন বিশ্রাম করে শরীরটাকে খাড়া করে তুলব। এখান থেকে আর ৫। ৬ দিনের মধ্যে বেরিয়ে পড়ব— কলকাতায় পৌঁছতে জুনের শেষাশেষি।— গিয়ে তোদের কাছে বিদায় নিয়ে একেবারে গা-ঢাকা দেব। এ রকম ভাঙা শরীর নিয়ে বিদেশে বা পরের বাড়িতে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না। এখানে এ কয়দিন বিছানায় পড়ে পড়েই দিন কাটাচ্ছি। আমাকে এখন চিঠি লিখিস্‌ নে, লিখ্‌লে সহজে পাব না— কারণ এখান থেকে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ থেকে ওয়ালটেয়রে[২] ঠিকানা বদল হবে। ইতি ৫ জুন ১৯২৮

ভানুদাদা

১৭৮

২০ জুলাই ১৯২৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার নড়াচড়া বন্ধ তাই কলকাতায় এসে তোদের ওখানে যেতে পারি নি। শান্তিনিকেতনে আসতে হলে স্টেশন ছাড়া গতি নেই তাই ঐ দুঃখটুকু স্বীকার করতে হয়— কিন্তু তাতে যথেষ্ট ক্লান্ত করে। নীলরতনবাবু[১] আমাকে দীর্ঘকাল একটা বিশেষ চিকিৎসায় রাখতে চান— তিনি আমার কাছে লোকজনের যাওয়া আসা, চিঠিপত্র লেখা ইত্যাদি সবই বন্ধ করে দেবেন। কথা আছে দুচার দিনের মধ্যে সহরে গিয়ে সেই বন্ধন দশায় ধরা দেবার। কিন্তু এখানকার ভরা বর্ষার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ছেড়ে সেখানে যেতে ইচ্ছা করচেনা। দেখা যাক্ কপালে কি আছে।

কাল এখানে বর্ষা উৎসব হবে।[২] ছেলেমেয়েরা গান ইত্যাদি নানা কাণ্ড করবে। সবাই তাই নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু কাল থেকে যে রকম ঝড়বৃষ্টির নাচন চলেছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উৎসব করা সহজ হবে না।

তোর শরীর ভালো থাকুক এই কামনা করি— যদি আমার শারীরিক অবস্থা অনুকূল হয় তাহলে তোকে দেখে আসব— নইলে দূর থেকেই আশীর্ব্বাদ করব। ইতি ৪ শ্রাবণ ১৩৩৫

ভানুদাদা

১৭৯

১৬ শ্রাবণ ১৩৩৫

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, কলকাতায় ডাক্তার হিড়হিড় করে টেনে এনেচে।[১] বলচে দেড়মাস তাদের হাতে নিয়ত থাকতে হবে। বসে আছি জোড়াসাঁকো বাড়ির এক কোণে— মাঝে মাঝে বৃষ্টিতে গলি ভেসে যাচ্ছে, বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

তুই কেমন আছিস শোনবার জন্য উদ্বিগ্ন রইলুম। তোর মা ১০ই তারিখে আসবেন খবর পেলুম। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তোদের সকলের কথা জানতে পারব। ইতি ১ অগস্ট ১৯২৮

ভানুদাদা

১৮০

১৭ অক্টোবর ১৯২৯

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

তোর চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম।

আমি এইখানেই স্থির হয়ে আছি। ছুটিতে আপন বাঁধা আশ্রয় ছেড়ে অন্য কোথাও ছুটোছুটি করবার চেষ্টাতেই ছুটির অনেকখানি টুকরো টুকরো হয়ে যায়। চিরাভ্যস্ত আরাম কেদারার মতো রাঁচি হাজারিবাগ কোথাও

নেই। বৌমারা গেছেন রাঁচিতে— বোধ হয় মোটর রথে— জানিনে এতদিনে পৌঁচেছেন কি না। আমার পরামর্শ যদি শুনিস সেখান থেকে সোজা চলে আয় শান্তিনিকেতনে। এখানে শরৎকাল খুব সুন্দর। চারদিকের মাঠ সবুজ হয়ে উঠেছে, শিউলি গাছে ফুল ফোটানো অক্লান্ত। তোদের বাড়ির সবাই ছুটিতে এখানে আসবেন এমন একটা জনরব উঠেছিল। কিন্তু সেদিন আশার একখানা চিঠি পেলুম তাতে আছে তোর বাবা কলকাতার হাঁসপাতালে— বাকি সবাই কানপুরে শান্তির ওখানে। আশা লিখেচে ছুটির পরে সে এখানে আসবার সঙ্কল্প করেচে।

আজ কোজাগর পূর্ণিমা। কিন্তু কাল থেকে বাদলার আবির্ভাব। আকাশ ভরে খুব মেঘ জমে আছে। আজ রাত্রে চাঁদের মুখ দেখা যাবে বলে আশা হচ্চে না। পৃথিবীতে তার অভাব যদি পূরণ করতে পারতুম তাহলে বিশেষ আক্ষেপের কারণ থাকতনা।

ইতি ৩১ আশ্বিন ১৩৩৬

তোর ভানুদাদা

১৮১

২৫ কার্তিক ১৩৩৬

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু কাজের তাগিদে হঠাৎ এখানে চলে আসতে হল। বীরেনকে লিখেছিলুম তোকে একদিন জোড়াসাঁকোয় নিয়ে আসতে। বীরেন রাজি হয়ে চিঠি লিখেছিল কিন্তু অদৃষ্টক্রমে ধরণীতে চাঁদ দেখা আমার ঘটল না।

বৌমা এখন আছেন জোড়াসাঁকোয়— এখন তাঁর হাঁপানির জন্যে ইলেকট্রিক চিকিৎসা চলচে, খবর পেলুম তাতে তাঁর উপকার হয়েচে।

শরৎকাল শেষ হয়ে এল— ফুলঝরানো কাজে শিউলি গাছ ক্লান্ত হয়ে এসেচে— এখন ছাতিমের ডালগুলো খুব উৎসাহিত— ছাতিম ফুলের তীব্র গন্ধে সন্ধ্যাবেলাকার বাতাস মাতাল হয়ে ওঠে। এখানকার তেতলা ঘরের ছাদে আমি একলা একটা কেদারায় বসে মাঠের দিকে তাকিয়ে বসে আছি— আকাশে শাদা শাদা মেঘ যাচ্চে ভেসে, আর কোথা থেকে সমস্ত দুপুর বেলা ঘুঘু ডাকচে।

একবার তোরা যুগলরূপে শান্তিনিকেতনে দেখা দিবি নে কি? অনেক বদল হয়েচে। ইতি ১১ নবেম্বর ১৯২৯

ভানুদাদা

১৮২

১০ ফাল্গুন ১৩৩৬

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

শিউলির পালা গেছে। উত্তরে হাওয়া দক্ষিণের দিকে মুখ ফেরালো। আমের বোল দেখা দিয়েচে, শালের বনে নবমঞ্জরীর সমারোহ, কাঞ্চনশাখা কুসুমাবনম্রা, কিন্তু রবি ঠাকুর পাড়ি দিতে চল্‌ল পশ্চিম সাগরের কূলে।[১]

কুশলে থাক এই আশীর্ব্বাদ রেখে গেলুম। ইতি ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

ভানুদাদা

১৮৩

[? ? মে ১৯৩০]

ওঁ

[লন্ডন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোর কুলপ্রদীপের[১] জন্ম বিবরণ পূর্ব্বেই শুনেছি। চিঠি লিখব স্থির করেছিলুম কিন্তু বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলচে এতদিন মুহূর্ত্তের জন্যে ছুটি পাই নি। অক্সফোর্ডের পালা শেষ হওয়াতে[২] এই অবকাশবিরল দেশে অল্প একটু ফাঁক পেয়েছি। দূরের থেকে নবকুমারকে আশীর্ব্বাদ পাঠাচ্চি। তোরই মত আকার প্রকার হয়েচে শুনে অবধি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি এই দুর্দ্দান্ত মানবকে সামলাবি কী করে। এখন থেকে মাথায় কবিরাজি তেল মাখাতে থাকিস্। দেশে ফিরে গিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করবার চেষ্টা করব। তোর ভানুদাদাকে সে মানবে কি না সন্দেহ করি— তার একাধিপত্যে কোথাও একটুমাত্র কম পড়লে বোধ হয় সে অনর্থপাত করবে। অত্যন্ত গোলমাল যদি দেখি তো হার মানব— দূরে দূরেই থাকব। তোর কন্যা[৩] যদি এখন থেকে ছড়া কাটতে আরম্ভ করে তাহলে একদিন এই প্রবীণ ছড়া-কাটিয়ের সঙ্গে নবীনার বিরোধ বাধবে। আমি তো এতদিন দেখে আসচি দেশে যে-কেউ ছড়া কাটতে আরম্ভ করেছে আমাকে গাল না দিয়ে জল গ্রহণ করেনা। তাই কিছু দিন থেকে ছড়া কাটা একেবারে বন্ধ করে দিয়েচি। তার বদলে ছবি আঁকা ধরেছি। ভয়ে ভয়ে দেশের লোককে দেখাই নে— পাছে ছবি-আঁকিয়েদের মহলেও ভ্রূকুটির সৃষ্টি হয়। আজ এই পর্য্যন্ত। [জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭]

ভানুদাদা

১৮৪

১৩ আষাঢ় ১৩৩৭

ওঁ

[ডার্টিংটন হল, টটনেস]

কল্যাণীয়াসু

রাণু তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। অচেনাদের দেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াই হঠাৎ আপন লোকদের একটু আভাস পেলেই সমস্ত মনটা সাড়া দিয়ে ওঠে। বিধাতা আমাকে পথিক করেই রেখেছেন, ঘরের ঘেরের মধ্যে ধরা দেবার সময় বা সঙ্গতি পেলেম না— কেবলি চল্‌তি পথের অব্যবস্থার ভিতর দিয়েই ক্ষণিক আশ্রয়ের জগতে আমার চলা ফেরা আদর অভ্যর্থনার অভাব ঘটে না, খ্যাতি কীর্ত্তি জমেছে ঢের কিন্তু মনের ভিতরকার ক্লান্তি কিছুতেই দূর হয় না। দূর আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখা দেয় কিন্তু ঘরের সন্ধ্যাপ্রদীপ তার সাড়া দেয় না। সঙ্গী যারা আছে তারা চলনসই অর্থাৎ পথ চলবার যোগ্য— কেবলি যেমন-তেমন করে কাজ চলে যায়— এলোমেলো ছড়াছড়ির মধ্যে দিয়েই দিন কাটে। এমনি করেই এত দিন তো হয়ে গেল কিন্তু আজো সম্পূর্ণ অভ্যেস হল না।

কিছুদিন কাট্‌ল এখানে এল্‌ম্‌হর্স্টের বাড়িতে।[১] আবার তল্পী বাঁধচি। ডাক পড়েচে জর্ম্মনিতে। সঙ্গে আমার সহায় আছে আরিয়াম্‌,[২] তাকে হয় তো চিনিস্ নে— লঙ্কাদ্বীপে তার জন্ম, শান্তিনিকেতনে তার কর্ম্ম, আপাতত আমার সঙ্গে সঙ্গে তার গতি। একবার তোরঙ্গ বন্ধ করচে, একবার তোরঙ্গ খুলচে— একবার রেলগাড়িতে টেনে তুল্‌চে, একবার পরের বাড়িতে টেনে নামাচ্চে, কিছু হারায় ছড়ায় কিছু সংগ্রহ করে,— এ যেন, পাত্র নেই, ঘাটে ঘাটে অঞ্জলিতে জল খাওয়া। কিন্তু ভাগ্যের বিরুদ্ধে নালিশ করা অন্যায়। অনাহূত যা পেয়েছি অল্প লোকেরই ভাগ্যে তা জোটে। বিশ্বাস হয় না যতটা পেয়েছি তার যোগ্যতা আমার মধ্যে আছে— বাঁধা মাইনে

আমার নেই, উপরি-পাওনাতেই তহবিল ভরে উঠ্‌চে— একবার এ দেশে, একবার সে দেশে, আমার জরিমানার পালাটা কেবল আমার স্বদেশেই।

দেশে ফিরব সেই পৌষ মাসে। তখন তোর সন্তান দুটিকে এবং সন্তান দুটির জননীকে দেখবার ইচ্ছে রইল।

ভানুদাদা

জুন ২৮শে

১৯৩০

১৮৫

২৯ মাঘ ১৩৩৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

এক বছর হয়ে গেল— আজ তোর চিঠি পেলুম। পাবার পূর্ব্বেই তোকে লিখ্‌তে যাচ্ছিলুম এখানে আস্‌তে। এখানে আশা ভক্তি অশোক আছে— ওদের নিয়ে বেশ আছি। একবার কোনো একটা অবকাশে এক আধ দিনের জন্যেও কি আসতে পারিস নে? সপরিজনে এলেও তোদের আশ্রয় দিতে পারব। তোর খোকার সঙ্গে তাহলে আমার পরিচয় হয়ে যাবে।

ডাক্তার আমাকে নড়তে চড়তে পরিশ্রম করতে নিষেধ করে। কলকাতায় লোকের ভিড়ে সারা দিন এম্‌নি আমাকে উৎপাত করেছিল যে ক্লান্ত দেহে পরদিন সকালের ট্রেনেই আমি পালিয়ে এসেচি।[১] আমার শীঘ্র আর কলকাতায় যাবার আশা নেই। তোরা তো গরম পড়লেই দার্জ্জিলিঙে দৌড় দিবি— তোদের নাগাল পাওয়া শক্ত হবে।

এবারে আমেরিকায় একদিনের জন্যে ডাক্তার আমার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল।[১] আবার কিছু দিনের জন্যে মেয়াদ বেড়ে গেল— কতদিনের জন্যে ঠিক বলতে পারিনে কিন্তু খুব বেশি দিন হতেই পারে না। অতএব সুযোগ পেলে একবার দেখাশুনো করে যাবার চেষ্টা করিস।

এবারে প্যারিস বর্লিন কোপেনহেগেন বর্ম্মিংহ্যাম মস্কৌ প্রভৃতি নানা দেশে আমার ছবি খুব খ্যাতি লাভ করেচে সে কথা মনে রাখিস কেননা যদি কোনোদিন আমার ছবি তোর চোখে পড়ে সাবধানে সমালোচনা করিস— ভালো যদি না লাগে তাতে তোরই অখ্যাতি হবে। ইতি ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

তোর ভানুদাদা

১৮৬

১৫ বৈশাখ ১৩৩৮

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম। আমার শরীরের জন্যে বেশি কিছু ভাববার নেই। মোটের উপর ভালোই আছি। বাইরে গরম যথেষ্ট। কিন্তু রাতে খুব হাওয়া দেয়, সকালে ঠাণ্ডা থাকে।

তুই শুনে আশ্চর্য্য হবি, আমি খুব সম্ভব খুব শীঘ্র পারস্যে যাব— রাজার নিমন্ত্রণ পেয়েছি।[১] য়ুরোপ তো আগাগোড়া দেখা হয়েচে— এসিয়ার পূর্ব্ব দিকটার সঙ্গে পরিচয় মন্দ হয়নি— এবারে পারস্যটা হলে অনেকখানি পৃথিবী আয়ত্ত করা হবে।

ইতিমধ্যে এখানে জন্মোৎসবের একটা হাঙ্গামা আছে।[২] ভালো

লাগচেনা। রথীরা সবাই দার্জ্জিলিঙে। আমাকে ডাকাডাকি করে কিন্তু আমার দার্জ্জিলিঙ ভালো লাগেনা।[৩] জন্মোৎসবের পরে যদি কলকাতায় যাওয়া হয় তাহলে তোর সঙ্গে দেখা হবে।

আশা ভক্তি এখানে বেশ আনন্দে আছে— ওদের শরীরও ভালো আছে। ইতি ২৮ এপ্রেল ১৯৩১

ভানুদাদা

১৮৭

২২ আশ্বিন ১৩৩৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, যে ছেলে আমার ছবি তুলেছিল তার কাছ থেকে পেতে দেরি হোলো বলে তোর চিঠির উত্তর দেওয়াও পিছিয়ে গেল। ছবি দুটোর মধ্যে টুক্‌রো ছবিটা দার্জ্জিলিঙের তোলা।

কলকাতা থেকে এসেছিলুম আধমরা অবস্থায়। এখনো সম্পূর্ণ সজীব হয়ে উঠিনি। দিনটা প্রায় শয়ান অবস্থাতেই কাটে। মাঝে মাঝে এখানেও লোক সমাগম হয়। রাধিকা যেমন পায়ের শব্দ শুনলেই চমকে উঠতেন আমারও সেই দশা। দ্বার অবারিত, লোককে নিরস্ত করার উপযুক্ত মেজাজের অভাব সুতরাং ঘরের মধ্যেই চতুষ্পথের সৃষ্টি হয়েচে।

রীতিমত গরম চলচে। রথীরা দার্জ্জিলিং পালিয়েচে। সেখান থেকে আমাকে ডাকাডাকি করচে। এখানকার গরমের তাড়নাতেই বোধ হয় সেখানকার নিমন্ত্রণ সফল হবে।[১] ইতি ৯ অক্টোবর ১৯৩১

ভানুদাদা

১৮৮

২১ অক্টোবর ১৯৩১

Glen Eden
Darjeeling

কল্যাণীয়াসু

রাণু, দার্জ্জিলিঙে এসে পড়েচি। ইচ্ছে ছিল না, দার্জ্জিলিং আমার ভালো লাগেনা। বিশেষত এই শরৎ কালে শান্তিনিকেতন ভারি সুন্দর। ছুটিতে সবাই চলে গেছে, শিশির-ছোঁওয়া বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের আকাশে পরশমণি ছুঁইয়ে দিয়েছে, সোনার রঙে রঙীন দিগন্ত। চলে আসতে হোলো, এবার শরীরটা যেমন ক্লান্ত এমন আর কোনোদিন হয় নি— দেহ মনটা যেন প্রকাণ্ড একটা বোঝা হয়ে উঠেছে,— দু পা চলতে পারি নে, দু'লাইন লিখতে ইচ্ছে করেনা, সমস্ত কাজের দায় থেকে দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করে। এই কাজ পালানো মনটাকে নিয়ে কোথায় যে যাব তাই ভাবি। নানা প্রকার ছোটোখাটো দাবীর ভিড় এবং লোকের ভিড় আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলে। আমি যেন শনিগ্রহের মতো, আমার চারদিকে একটা চক্র চলেচে হাজার হাজার টুক্‌রো উপগ্রহের। যখন লোকে আমাকে চিনত না তখন ছিলেম ভালো, আপন সৃষ্টির ক্ষেত্রে আপন মনের লীলা নিয়ে ছিলেম আরামে, কোথাও বাধা ছিল না। আজ নানা লোকের নানা ফরমাসে কেবলি ঠোকর খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্চি। নালিষ [য] করে লাভ নেই— এই রকমই চলবে শেষ অধ্যায়ের শেষ ছত্র পর্য্যন্ত। বিজয়ার আশীর্ব্বাদ। বিজয়াদশমী ১৩৩৮ [৪ কার্ত্তিক ১৩৩৮]

ভানুদাদা

১৮৯

১১ মার্চ ১৯৩২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

তোর চিঠিখানি কলকাতা ঘুরে শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছল, ওদিকে ছবির হাটে[১] লোকের ভিড়ে আমার শরীর পড়ল ভেঙে। দৌড়ে পালিয়ে এলেম নিজের কোটরে। আবার আগামী ৪ঠা এপ্রিলে উড়ো জাহাজে চড়ে পারস্যে যেতে হবে।[২] ইতিমধ্যে শরীরটাকে সবল রাখবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাই যথাসাধ্য চুপচাপ বসে আছি। রেলগাড়িটার সঙ্গে আমার একটু বনে না। এমন কি, কলকাতা থেকে এ পর্য্যন্ত আসতে প্রাণপুরুষ উদ্ভ্রান্ত হয়। কাশী পর্য্যন্ত যেতে হলে যবনিকা পতনের খুব কাছাকাছি পৌঁছবার আশঙ্কা ঘটে। নইলে তোদের ওখানে যাবার প্রলোভন খুবই প্রবল। যখন বয়স ২৭ ছিল তখন ভাবনা ছিল না, জোর ছিল দেহে মনে। এখন দেহটা হরতাল করে বসেচে। ইতি ২৭শে ফাল্গুন ১৩৩৮

ভানুদাদা

১৯০

[? জুন ১৯৩২]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

দোতলার এই জানলার কাছে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসে আছি। এইখানেই বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার দিনরাত্রির অধিকাংশ সময়

কেটে যায়। শান্তিনিকেতনের এ জায়গাটা তোর চেনা নয়। তুই আমাকে এখানকার নানা বাসায় দেখেছিলি।— একে একে কত বাসাই বদল হল। শিলঙের সেই বাড়ি মনে পড়ে? জোড়াসাঁকোয় তেতলার সেই ঘর? শান্তিনিকেতনে কখনো এ কুটীরে কখনো ও কুটীরে। এখন এখানকার চেহারা আর একরকম। আগেকার চেয়ে সমারোহ অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু আগেকার সাদাসিধে সেই সংসারটা ছিল ভালো। যদি কোনো একদিন আর একবার শান্তিনিকেতনে এসে দেখে যাওয়া তোর পক্ষে সম্ভব হয় হয়তো তোর ভালো লাগ্‌বেনা। সেই সব চেনা জায়গাগুলোও এখন অচেনার মুখোষ পরে আছে। কেবল সেই আকাশ, সেই মাঠ, সেই রাঙা মাটির পথ তেমনই আছে। আর তোর ভানুদাদা? তখন যে পরিমাণ জায়গার মধ্যে তার কাজের এবং ভাবের বাসা বেঁধে ছিল তার চেয়ে অনেক ছড়িয়ে পড়েচে, সমুদ্রের এপারে ওপারে, দেশ থেকে দেশান্তর।

কিন্তু নিজেকে নিয়ে এতখানি ছড়াছড়ি আর ভালো লাগেনা। কাজ খাটো করে ছোট একখানি জায়গায় আসন পেতে বসতে ইচ্ছে করে— একটুখানি ছবি আঁকি, গান বাঁধি, বাগান করি, আর সঙ্গে, কিছু দেখাশুনো গল্প স্বল্প হাসি তামাসা। কিন্তু সে আর ঘটে উঠ্‌বেনা। একেবারে রাস্তার চৌমাথায় চৌকি পড়েচে— ঘোরতর হট্টগোলের মাঝখানেই জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটবে।

এখানে দিনগুলো ভালোই যাচ্চে। আকাশে একদল অকেজো মেঘ কেবলি পূব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূবে অকারণে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্চে— দিনরাত হু হু করে বাতাস বইচে— চারদিক সবুজ— জ্যৈষ্ঠমাসের রুক্ষ চেহারা কোথাও নেই।

কলকাতায় যাবার মতো জোর এখনো পাই নি। যদি যাওয়া ঘটে নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে দেখাও ঘটবে। ইতি [? জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯]

ভানুদাদা

১৯১

[২৭ আশ্বিন ১৯৩৯][১]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু তোর চিঠিখানি পেয়ে খুসি হয়েচি। এখানে এখন প্রায় নির্জ্জন। বৌমারা খড়দহে।[২] আমি বাসা নিয়েচি সেই কোণার্কে। এখানে তোর কথা কতবার মনে পড়ে। যদি আসতিস তবে দেখতিস সে বাড়িটা অনেক বদল হয়ে গেছে— তবুও সেদিনকার ছবি অলক্ষ্যে লুকিয়ে আছে এর মধ্যে।

ছুটির আকাশ সোনার রঙের রৌদ্রে এক একবার মনটাকে উদাস করে দেয়— টানে দূরের দিকে, বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে— কিন্তু কোথায় বা যাব— যেখানে যাব সেখান থেকেও বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হবে। "আমি সুদূরের পিয়াসী" কিন্তু সেই সুদূর তো কোনো জায়গাতেই নিকট হবে না। তাই দূরের বাঁশরী শুনে যাত্রা করি মনে মনে, সে যাত্রার আর অবসান নেই।

শরৎকালটা প্রতিদিন সুন্দর হয়ে উঠ্‌চে। ঈষৎ ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার সামনেকার ঐ বীথিকায় গাছের পাতাগুলো রৌদ্রে ঝিলমিল্ করে কাঁপচে, বসে বসে চেয়ে দেখি কুঁড়েমি করে কাটাই অথচ কাজের তাড়া আছে। য়ুনিভার্সিটিতে চাকরি জুটেচে, লেকচার লিখ্‌তে হবে[৩] মনে করলে প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় ইস্কুল পালাবার জন্যে যেমন মন ছট্‌ফট করত এখনো সেই দশা হয়েচে। কিন্তু পালানো তখনকার মতো এত সহজ নয়। এখন পালাই বাজে কাজ করে[৪]। যখন গম্ভীর লেকচার লেখা নিতান্ত উচিত তখন গল্প বানিয়ে লিখি। মনকে বলি আগে এইটে শেষ হোক তারপরে অন্যটাতে হাত দেব।

ঐ লেকচার দিতে যেতে হবে পূজোর ছুটির পরে।[৫] তখন যেন একবার তোর সঙ্গে দেখা হয়। সঙ্গে আনিস্ তোর খোকাকে, ভাব করবার চেষ্টা করব। আমার চেহারা দেখে হয়তো ভয় পাবে, তার মায়ের মতো অমন নির্ভয় প্রকৃতি হয়তো তার না হতেও পারে। ইতি ১৩ অক্টোবর ১৯৩৯ [১৩৩৯ : ১৯৩২]

ভানুদাদা

১৯২

২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

ওঁ

•"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

রাণু, কাল অর্থাৎ ৯ই তারিখে প্রাতে কলকাতায় রওনা হচ্ছি। দশই কোনো সময়ে তোর খোকাকে কোলে করে যদি জোড়াসাঁকোয় আসতে পারিস খুব খুসি হব। ১১ই থেকে নানা এন্‌গেজ্‌মেণ্টের জালে জড়িয়ে পড়ব।

অনেকদিন দেখিনি তোদের। ৮ ডিসেম্বর ১৯৩২

ভানুদাদা

১৯৩

১৫ মাঘ ১৩৩৯

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু তুই নিশ্চয় আসবি। ইতিমধ্যে আবার মন বদলাস নে। তোকে আমার কোণার্কের এক কোণে জায়গা দেব।[১] তোর ছেলেদের জন্যে দু সের দুধ দাবী করেছিস— আমি তিন সেরের বন্দোবস্ত করব কেননা এখানে এলে তাদের ক্ষিদে বাড়বে। অনেক বদল হয়েচে দেখতে পাবি কিন্তু আমার কিচ্ছু বদল হয় নি। ইতি ২৮ জানুয়ারি ১৯৩৩

ভানুদাদা

১৯৪

৩০ ফাল্গুন ১৩৩৯

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

রাণু

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছি। এখন তুই কল্পনা করতে পারবি কোথায় আমার দিন কাটে এবং কোথায় কাটে রাত। সেই কোণার্কের কোণে থাকি পড়ে'। লেখাপড়া করতে চেষ্টা করি, বাধা পাই পদে পদে। কাজ এসে পড়ে, লোকেরও উপদ্রব। বরানগরে থাকতে একটা গল্প[১] লিখতে সুরু করেছিলুম আরামে লেখা এগোচ্ছিল— চারদিকের গাছপালা বাগান আর

রাণীর[২] শুশ্রূষায় লেখার মধ্যে রস সঞ্চার করছিল। এখানে রৌদ্র করছে ঝাঁঝাঁ, গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে বাগানটা গরীবের মতো হয়ে আসচে। তা ছাড়া লোকের সঙ্গ আর কাজের তাগিদ বেড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাড়ের উপর এসে পড়চে, গল্পটাকে কনুয়ের ঠেলা মেরে এক পাশে সরিয়ে দিয়েচে।

এবারে গরমের সময় এখানে থাকা যদি নিতান্ত দুঃসহ হয় তবে পুরীতে যাব মনে করচি। রথীরা দার্জ্জিলিং যাবে, সেখানে ওর শরীর ভালো থাকে। তোদের কোথায় গতি? বীরেন বলেছিল জার্ম্মাণী থেকে ফুলের, সব্জির, ভালো বীজ সস্তায় পাওয়া যায়, যদি ঠিকানা পাই তবে আমরাও আনিয়ে নিই এবং ফল ভোগ করি। ফল যদি বেশি ফলে কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যস্বরূপ কিছু অংশ তোদের দ্বারেও পৌঁছিয়ে দিতে পারি। ভেবে দেখিস। ইতি
১৪ মার্চ্চ ১৯৩৩

ভানুদাদা

১৯৫
১ ফাল্গুন ১৩৪০

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়াসু

রাণু এবার শান্তিনিকেতন থেকে হাবড়ার প্ল্যাটফর্‌মে এসে দেখলুম শরীরটা চল্‌তে চায় না, দশ পা চল্‌লেই বুকে পিঠে ব্যথা ধরে এ অবস্থায় তার প্রতি অনাবশ্যক জবরদস্তি আত্মঘাতের পন্থা। এখানে এসে দুই তিনটে বক্তৃতা করতে হয়েচে তাতেও ক্লান্তির বোঝা বাড়িয়ে তুলেচি।[১] এর উপরে আর চল্‌বেনা— কাশীতে যাওয়ার সঙ্কল্প ছাড়তে বাধ্য হতে হোলো।

সঞ্জীবরাওয়ের ঠিকানা জানলে এইখান থেকেই তাঁকে জানাতুম। অনিলের[১] উপর ভার দিয়েচি তাঁকে টেলিগ্রাফ করে দিতে— অনিল আছে শান্তিনিকেতনে। আশাকে বলিস্ তাঁকে অবিলম্বে যেন এই খবরটা জানিয়ে দেয়। তোকে দেখ্‌তে পাব বলেও যাবার ঔৎসুক্য ছিল কিন্তু যে হেতু এখনো দু চার বছর এই দেহটাকে ব্যবহার করতেই হবে তাই সাবধান হওয়াই কর্ত্তব্য মনে করি। প্রত্যেক বারের অত্যাচার ক্রমে ক্রমে জমে উঠেছে তাই একেবারে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ছাড়া আর কোনো কারণেই জীর্ণ দেহের পরে নির্ম্মম হতে পারবনা। তুই ফিরে আয় তার পরে যদি সুযোগ পাই দেখা হবে। ১লা মার্চ্চ দোলের দিন, সেদিন শান্তিনিকেতনে উৎসব হবে— যদি আসতে পারিস তো আসিস। তোরা সবাই আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস্ ইতি ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪

ভানুদাদা

১৯৬

২৫ ভাদ্র ১৩৪২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

রাণু

অনেকদিন পরে তোর চিঠিখানি পেয়ে ভালো লাগল। বহুকাল তোকে দেখিনি।

শরীর মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়— শরীরের দোষ দিতে পারি নে— ৭৪ বৎসর তাকে নির্দ্দয়ভাবে খাটিয়েছি— আজও আমার উপরে লোকের দাবীর অন্ত নেই। সবাই নিজের নিজের প্রয়োজনকেই গুরুতর মনে করে—

অথচ আমার প্রয়োজনের কাছ দিয়েও ঘেঁষে না। এইটে বাংলা দেশের বিশেষত্ব।

পূজোর ছুটির সময় কলকাতার দিকে যাব কি না খুবই সন্দেহ। প্রধান কারণ জীর্ণ দেহের বোঝা নিয়ে নড়তে চড়তে ইচ্ছে করেনা— দ্বিতীয়ত শরৎকালটা এখানে খুব সুন্দর— ছুটির সময় লোকের ভিড় কাজের দায় থাকবেনা তখন চুপচাপ করে কাটাতে পারব।

তোরা তখন বোধ হয় দার্জ্জিলিঙের দিকে ছুট্‌বি। যদি এখানে [আসতে] পারতিস খুব খুসি হতুম। কিন্তু সম্ভাবনা বিরল। এখন এখানে অনেক বদল হয়েচে। বোধ হয় শুনে থাকবি একটা মাটির বাসা বেঁধেচি।[১] তার দেয়াল ছাদ সমস্তই মাটির। এইখানেই আমার শেষ আশ্রয়।

যদি কোনো উপলক্ষ্যে কলকাতায় যাওয়া ঘটে নিশ্চয় তোর সঙ্গে দেখা করব। ইতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

ভানুদাদা

১৯৭

১৭ এপ্রিল ১৯৩৬

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

তোর চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। দার্জ্জিলিঙে [য] তুই আছিস এ ছাড়া দার্জ্জিলিঙে যাবার আর কোনোই আকর্ষণ নেই। অথচ কোথাও যাওয়া দরকার, শরীরটা নেহাৎ বেমেরামৎ হয়ে পড়েচে। হয় তো শিলঙ নয় তো পুরীতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তুই প্রশ্ন করতে পারিস তাই যদি হোলো

তাহলে দার্জ্জিলিং কী অপরাধ করেচে। সহজ উত্তর এই, দার্জ্জিলিং যেতে খরচ আছে। অন্য দুটো জায়গায় হয় তো বিনাব্যয়ে কাটিয়ে আসতে পারি। বর্ত্তমান অবস্থায় এ কথাটা সুগম্ভীরভাবে চিন্তনীয়।

নানা দেশে ঘুরতে হয়েছে, শরীরটা নারাজ ছিল।[১] কিন্তু শরীরের সম্মতি নিয়ে কাজ করবার অবস্থা আমার নয়। শরীরের প্রতি দায়িত্বের চেয়ে বড়ো দায়িত্ব আছে, তাকে উপেক্ষা করবার জো নেই। যত দিন প্রাণ আছে ছুটি মিলবে না, দেহটার প্রতি মমতা করবারও অবকাশ জুটবে না। বাইরের মনিবের কাছে ছুটি মেলে, ভিতরের মনিব আজও ছুটি মঞ্জুর করলেন না।

বুড়ির বিয়ের দিন[২] আগামী ১২ বৈশাখে— শান্তিনিকেতনেই। তারই উদ্যোগে ব্যস্ত হয়ে আছি। আয়োজনের উপলক্ষ্যে কয়েকদিন কলকাতায় ছিলুম, কাল রাত্রে এসেছি আশ্রমে। গরম নিশ্চয়ই— কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করে লাভ নেই— জন্মেছি গরম দেশে। কবিতা লেখবার সময় লিখতে হয়েছে, "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে"— যত গরমই হোক কথাগুলো আর ফিরিয়ে নেবার জো নেই।

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ। ইতি ৪ বৈশাখ ১৩৪৩

ভানুদাদা

১৯৮

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়াসু

রাণু তোর শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ হঠাৎ কাগজে পড়ে চমকে উঠেছিলুম।[১] যদিও তাঁর বয়স হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল দুর্ব্বলতায় ভুগছিলেন তবু মৃত্যু

সকল অবস্থাতেই অপ্রত্যাশিত।

এই শোকের দিনে তোদের সমস্ত পরিবারের জন্যে শান্তি ও সান্ত্বনা কামনা করি। ইতি ১৭মে ১৯৩৬

স্নেহরত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৯

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

ওঁ

*"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL.

[চন্দননগর]

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এবারে কিছু দীর্ঘকাল ছিলুম বরানগরে,[১] তুই তখন দার্জ্জিলিং। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমের কল্পনায় ভীত হয়ে নানা প্রকার ঠাণ্ডা জায়গার কথা ধ্যান করছিলুম। ডাক্তার বিধান রায়ের[২] সঙ্গে পরামর্শ চলেছিল শিলঙে যাবার। কিন্তু ভাগ্যে কোথাও যাই নি— এবার জ্যৈষ্ঠ মাস তার রুদ্রমূর্ত্তি লুকিয়েচে অকাল বর্ষার মেঘে। এখানে প্রায় ক্ষণে ক্ষণে চলচে ঝোড়ো হাওয়া, আর মুষলধারে [য] বর্ষণ। আমি আজকাল বাস করি আমার নতুন মাটির ঘরে— এই বাসাটা তোর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। যদি কখনো আসা সম্ভব হয় এটা দেখতে পাবি— ভালো লাগবে। কলকাতার দিকে হয় তো আমি যাব জুলাই মাসের কোনো এক সময়ে— তোকে জানাব টেলিফোন যোগে— অনেকদিন দেখা হয় নি— তোকে দেখতে ইচ্ছে

করে। কবে হয় তো দেখবার দিন হঠাৎ যাবে শেষ হয়ে। ইতি ১২ জুন ১৯৩৬

ভানুদাদা

২০০

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

ওঁ

[আলমোরা]

রাণু

এই দুঃসহ গরমে তোকে কলকাতায় কাটাতে হোলো। যত চিঠি পেয়েছি ও দিক থেকে, সবগুলিতেই পালাই পালাই রব আছে। আমরা গোড়াতেই বেরিয়ে পড়েছি। পথটা গিয়েছে অত্যন্ত কষ্টে। বেরিলিতে ৭।৮ ঘণ্টা মশার কামড়ে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল, তার পরে সমস্ত দিন উঁচু নিচু আঁকাবাঁকা রাস্তায় মোটরের ঝাঁকানি খেতে খেতে আধমরা হয়ে গম্যস্থানে পৌঁছই।[১] পাহাড়ের হাওয়ার গুণ এই ক্লান্তি সেরে নিতে দেরি হয় না। এখন দিনগুলো চলচে ভালোই। মাঝে ঝড় ও শিলবৃষ্টি হয়েছিল, এ রকম উৎপাতে আরামের স্বাদ বাড়ায়। পাহাড়ের পক্ষে শীতের মাত্রা এখন খুবই কম। তোরা যাচ্ছিস সমুদ্রপারে, ভালোই লাগবে— হঠাৎ একটা লড়াইয়ের মধ্যে আট্‌কা পড়ে যাস্‌নে যেন। ফিরে এলে দেখা হবে। ইতি ৩০ মে ১৯৩৭

ভানুদাদা

২০১

১০ শ্রাবণ ১৩৪৪

ওঁ

*"ST. MARKS"
ALMORA. U.P.

রাণু

তোর ছবিখানি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি।[১] বেশ ভালো ছবি। তুই তো এখন উড়ে চলেছিস। এতদিনে ওড়ার পালা নিশ্চয় শেষ হয়েচে। কেমন লাগল? গা কেমন করেছিল কি? আমার কোনো কষ্টই হয় নি। যখন বেলুচিস্থানের মরুভূমির উপর দিয়ে যাচ্ছিলুম তখন আকাশযান অনেক উঁচুতে উঠেছিল— কেন না নিচের হাওয়া গরম হয়ে উঠে তোলাপাড়া করতে থাকে, তারও উপরে উঠলে শান্ত হাওয়া পাওয়া যায়। এত উপরের হাওয়ার অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে আমার কিছুই হয় নি দেখে ডাচ্ পাইলট ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল।— কিছুকাল পাহাড়ে পাঠানো [কাটানো] গেল। পালা শেষ হয়ে এসেছে— পর্ত্ত যাব নেবে— গোলমাল লোকজন কথাবার্ত্তা তর্কবিতর্কের আবর্ত্তে— গরমকে ভয় করি নে, কিন্তু মানুষের রচিত অশান্তি এখন আর একটুও ভালো লাগেনা, ভারতবর্ষে কোথাও ভালো রকম লুকিয়ে থাকবার জায়গা পাওয়া যায় না। মশা ম্যালেরিয়া মানুষ, হাজার রকমের অসুবিধে লেগেই আছে। তবু— লিখেছিলুম সার্থক জনম আমার ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাল চলেছি স্ববাসে।[২] তোরা ফিরে এলে দেখা হবে।

২৬।৭।৩৭

ভানুদাদা

২০২

[?১ অগাস্ট ১৯৩৮]

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোর চিঠি অনেকদিন পরে পেয়ে খুসি হলুম। আমি আজ কাল চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সকল রকম উৎপাত থেকে ছুটি পাবার জন্যে পাব্‌লিকের কাছে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলুম।[১] কেউ যে সেটা মঞ্জুর করেচে এমন কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্চি নে। পাব্‌লিক বলতে রাণুকে বোঝায় না সে কথা মনে রাখিস্‌

আজকাল কোনো রকম কাজ করতে একটু ইচ্ছে করে না। মস্ত একটা অবকাশ ফাঁদতে যদি পারতুম তাহলে আমার কোনো নালিস থাকত না— সেই সঙ্গে এ কথা বলাও দরকার যে সেই অবকাশটাকে রসে ভর্ত্তি করতে পারে এমন মানুষেরও প্রয়োজন। কোনোমতে অবকাশ যদি বা জোটে মানুষ জোটে না— হাঁড়িটা হয় তো মেলে অন্ন মেলে না।

বেনারসে পূজোর ছুটিতে যাবি। আমার পূজো নেই, ছুটি নেই, বেনারস নেই। তখন কোথায় আমার অবস্থান ঠিক বল্‌তে পারি নে— খুব সম্ভব বক্তৃতা [দিতে] যাব অন্ধ্র য়ুনিভার্সিটিতে।[২]

কিছুকাল খুব বৃষ্টিবাদল হয়ে গেছে— সম্প্রতি আকাশ পরিষ্কার— চারদিকে সবুজে সোনায় মিলন দেখচি।

ভানুদাদা

২০৩

১০ কার্তিক ১৩৪৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

রাণু

এতদিন পরে অকৃত্রিম ঠাণ্ডা পড়েছে। সেও তিন ভাগে বিভক্ত। সকালে বেশ ঠাণ্ডা, দুপুর বেলায় গরম, সন্ধ্যা বেলায় ঠাণ্ডা হবার মুখে। ভাদ্রমাসটা এখন তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভেগেছে। বৌমারা বোধ হয় ওখান থেকে শীতের তাড়া খেয়ে এবার নামবার উদ্যোগ করছেন। তিনি না থাকলে আমি থাকি অসহায়। ভাগ্যে দুই একটি নাৎনী আছে, তারাই নির্জন দিনে রসসঞ্চার করছে।

২৭। ১০। ৩৮ ভানুদাদা

২০৪

[? ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯]

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণু, তোর সম্বন্ধে কিছুদিন থেকে আমার মন অত্যন্ত পীড়িত এবং উদ্বিগ্ন হয়েছে। আমাদের জগৎ থেকে তুই বহু দূরে গিয়ে পড়েছিস সেখানকার রুচি এবং আচার আমাদের থেকে এত অত্যন্ত পৃথক যে তার

ঘৃণ্যতাকে আমি ক্ষমা করতে পারছি নে— মন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। তোকে ভালোবাসি ব'লেই আমার এই ধিক্কার এবং উদ্বেগ থেকে থেকে উদ্দাম হয়ে ওঠে। সবচেয়ে আমার এটাই অদ্ভুত লাগে যে বিদেশী মহলে এই রকম অশুচি উন্মত্ততা প্রচলিত আছে ব'লেই তুই এ'কে এত সহজে মেনে নিতে পেরেছিস।[১] আমাদের দেশের কোনো নিন্দনীয় আচরণকে তুই এমন হাসতে হাসতে স্বীকার করে নিতে পারতিস নে। নিজেকে তুই দিনে দিনে এমন করে অপমানিত করছিস এ আমার পক্ষে বড়ো দুঃখের আর তোর পক্ষে বড়ো দুর্গতির। আর কেউ হোলে আমি উদাসীন থাকতে পারতুম— কিন্তু তোর সম্বন্ধে আমার মন উদাসীন থাকতে পারে না— বিশেষত যখন বুঝতে পারছি তোর অভ্যাস প্রতিদিন নেশার মতো তোকে জড়িয়ে ধরছে এবং তুই বুঝতে পারছিস নে অভ্যস্ত পঙ্কিলতার হেয়তা। তোকে আমি এই নিয়ে দুঃখ দিয়েছি নিজে দুঃখ পেয়েছি এই কথা মনে রাখিস। ইতি [? ফাল্গুন ১৩৪৫]

ভানুদাদা

২০৫

১৩ ফাল্গুন ১৩৪৫

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

রাণু তোর চিঠি পেয়ে মন নিরুদ্বিগ্ন হোলো। বিলেতে Night Club-এর নানা রকম বিবরণ পূর্ব্বেই শুনেছিলুম— তার থেকেই বুঝেছিলুম এ জাতীয় প্রমোদভবনের হাওয়া বিশুদ্ধ নয়। অর্থাৎ যাদের ধন আছে

অথচ যাদের উপভোগের রুচির মধ্যে সৌকুমার্য নেই এ সব জায়গা তাদেরই ভোগের নিকেতন। এখানে কেবল যে সময় নষ্ট হয় তা নয় সময় কলুষিত হতে থাকে, মনের অভ্যাস শুচিতা হারিয়ে ফেলে এবং সেজন্যে অনুশোচনা বোধ করে না। তুই বলচিস নেশায় নেশায় [য] তোকে ধরে নি— তাহলেই হোলো।[১]

সেদিন অভিনয়ের[২] মাঝখানে তোকে চলে আসতে হয়েছিল বলে আমি রাগ করেচি এমন অদ্ভুত ধারণা তোর কী করে হোলো। আমার মধ্যে কি তোর মতো ছেলেমানুষি আছে? তিলমাত্র আমি বিরক্ত হই নি— এ কথা নিশ্চিত মনে রাখিস্।

আশ্রমে আওয়াগড়ের রাজা[৩] এসেছেন— তাঁকে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। ইতি ২৫।২।৩৯

ভানুদাদা

২০৬

২০ মাঘ ১৩৪৬

ওঁ

*"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়াসু

রাণু রাঁচিতে তোর নিমন্ত্রণ লোভনীয় কিন্তু গ্রহণ করা সহজ সাধ্য নয়। এখন থেকে মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত নানা ব্যাপারে আমি জড়িত। এর মধ্যে ফাঁক দেখতে পাচ্চি নে। মন ছুটি পাবার ইচ্ছে করে কিন্তু অদৃষ্টের জাল জটিল। অবকাশ দৈবাৎ আসে, তার পরে অন্তর্ধান করে

দৈবাৎ, তার উপরে নির্ভর করতে পারি নে। অতএব আপাতত তোর নিমন্ত্রণটা মুলতবী রইল।

আমার শরীরটা যে বিশেষ কর্মক্ষম অবস্থায় আছে তা নয়, মনটা রয়েছে কর্মবিমুখ হয়ে, তবুও কাজের দাবি থামতে চায় না। তহবিল যখন ভর্তি ছিল তখন যারা অজস্র দান করে এসেছে শূন্য তহবিলের দিনে তাদের বদান্যতার প্রতিপত্তিটা একটা ট্র্যাজেডি। যাই হোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে শেষ পর্য্যন্ত চলবে— তার পরে রাস্তার মাঝখানটায় হঠাৎ বাস্— ইতি ৩।২।৪০

ভানুদাদা

২০৭

৩ শ্রাবণ ১৩৪৭

ওঁ

UTTARAYAN

১৯।৭।৪০

রাণু

তোর ঠাণ্ডা হাওয়ার দান এই গরমের দিনে কাজে লাগচে।[১] এই ঘরটার বাইরে সবাই হাঁস ফাঁস করচে তখন আমি শান্ত হয়ে প্রহর কাটাচ্চি। এ যেন একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার দ্বীপ। একবার এসে হাওয়া খেয়ে যাস্। বহুৎ বহুৎ সেলাম

ভানুদাদা

২০৮

১৯ কার্ত্তিক ১৩৪৭

১৫। ১১। ৪০

জোড়াসাঁকো

রাণু

খুশি হলুম

আমার অনুচরগণ

নৃত্য করচে

তাঁদের মধ্যে

একজন একসঙ্গে

খাওয়ার পর

সকলে ধরে বেঁধে

নিরস্ত করলে

আজকের তার কী দশা হবে কী জানি

ভগবান তাকে রক্ষা করুন[1]

ভানুদাদা।

তোর দুষ্টু মেয়ে[2]

সুস্থ হয়ে

আবার চারদিকে

পূর্ব্ববৎ লাথি বর্ষণ

করতে থাকুক

এই প্রার্থনা করি

অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীকে লিখিত
রবীন্দ্রনাথের পত্র

১

১৫ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণ মেতৎ

আপনারা যথাসময়ে পৌঁছিয়াছেন সে সংবাদ রাণুর চিঠিতেই পাইলাম।[১] আশা করি কাশীর গরমে এবং কর্ম্মের ক্লান্তিতে পুনরায় আপনার শরীর খারাপ হইবেনা। যথাসম্ভব সতর্ক থাকিবেন। আপনারা চলিয়া যাওয়ার পর আমাদের আনন্দধারা[য়] অনেকখানি ভাঁটা পড়িয়া গেছে। কেবল আমি নয় সকলেই তাহা অনুভব করিতেছেন। আর আমার ত কথাই নাই। আমার সেই ছাদটি এবং কোণটুকু বিমর্ষ হইয়া আছে। বিশেষত আমার চুলের অবস্থা এমন হইয়াছে যে আয়না দেখিলে আয়নার উপরে রাগ ধরে— আর আমার বয়স যে সাতাশ সে কথাটাও, ইতিহাসের বহুতর মিথ্যা তারিখের মত, আজকাল আমার মনে করিয়া রাখা শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূজার ছুটিতে রাণু আসিয়া যদি এ সম্বন্ধে আমার পরীক্ষা [নেয়] তবে হয় ত বা একেবারে ফেল করিব। [...] সে চলিয়া যাওয়ার পর মনে হইতেছে অনেকগুলা বছর দুই তিন দিনের মধ্যেই পার হইয়া গেছে। পশুপতি[২] কলিকাতায় আসিতে সম্মত না হইলে আমি বিশেষ দুঃখিত হইবনা কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ সন্ধ্যাবেলা রাণুদের গান বাজনা শিখাইবার ব্যবস্থা করিবেন। আনন্দ আমাদের সব চেয়ে বড় খাদ্য— এই খাদ্য ছোট ছেলে মেয়েদের বাড়িবার বয়সে যত বেশি আবশ্যক এমন বড় বয়সে নয়। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যাবেলাটায় আপনার নীড়ের শাবকদের জন্য এই গীতামৃত বরাদ্দ করিয়া দিবেন— সেই সময়টা যেন নীরবতার ভারে নিস্তব্ধ হইয়া না

থাকে। পশুপতিকে না পান যাহাকে হউক ধরিবেন, নিতান্তই গানের যদি ব্যবস্থা করিতে না পারেন, কবিতা পাঠ ও আবৃত্তির চেষ্টা করিবেন। ইতি ৩১ আষাঢ় ১৩২৫

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

২৫ এপ্রিল ১৯১৯

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

শরীরে আমার ক্লান্তি এসেচে। এই ক্লান্তির প্রয়োজন ছিল। নানা কর্ত্তব্যে নানা চিন্তায় জীবনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। আমাকে ভাবতে হবে আমাকে করতে হবে নইলে বিধাতার বিধান টিক্‌বে না এই মনে করে আমরা কেবল কাজটাকেই বড় করে দেখি আপনাকে খাটো করে নিই। তাই বিধাতা মাঝে মাঝে কানে ধরে আমাকে বিছানায় টেনে এনে বলেন, অত ভাব্‌তে হবে না তোমাকে, তুমি চুপ করে থাক।— এই চুপ করে থাকাটা যে কত বড় জিনিস তা বেশ বুঝতে পারচি। চুপ করে থাকতে পাই নে বলেই বিধাতার কত দান গ্রহণ করি নে তার ঠিক নেই; তিনি নিজে যা চোখের সাম্‌নে ধরেচেন তাকে দেখিনে, তিনি নিজে যা কানের কাছে বল্‌চেন তা মর্ম্মের মধ্যে নিই নে। আজ আমি দায়ে পড়ে কেদারা আশ্রয় করে জানলার কাছে পড়ে আছি তাই আলোয় ভরা সমস্ত নীলাকাশ আমার শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েচে— আর তাই এতকাল পরে ঐ রাস্তার ধারের বটগাছটিকে ভাল করে চোখ তুলে দেখ্‌তে পেলুম।

আমি বোধ হয় ছুটির সময়ে এই জান্‌লাটার কাছেই চুপ করে পড়ে থাকব। কোনোখানে যাওয়া আমার ঘটবে না।[১] যাওয়া ব্যাপারটা যে একটা বাস্তব কাণ্ড, ওটা ত স্বপ্ন নয়। যেখানে আছি সেখানটা ত্যাগ করতে হয়, জিনিসপত্র বাঁধতে হয়, রেলগাড়ি চড়তে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি [।] তার পরে আবার কিছুদিন পরেই উল্টোরথের কাণ্ড। কাজের সময় যেখানে আছি ছুটির সময়ে সেইখানে থাকাটাই একটা যাত্রা— কেননা তখনি তার উপরে নূতন করে নজর পড়ে, তখনই কর্ম্মের স্টেশন পার হয়ে ছুটির স্টেশনে এসে পৌঁছন যায় অথচ পথখরচ লাগে না। মেয়েদের সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবেন। ইতি ১২ বৈশাখ ১৩২৬

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

২৫ অক্টোবর ১৯২১

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

আমাদের আশ্রমে মেয়েদের দেখবার জন্যে স্নেহলতা দেবী আসচেন। ইনি আমাদের সুপরিচিতা, বিদুষী, B. L. Gupta যিনি সিভিলিয়ান ছিলেন, তাঁরি মেয়ে। কিছুকাল থেকে ইনি লণ্ডন কলেজের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, শান্তি ও বিশ্রাম চান বলেই এখানে আস্‌চেন।[১] এঁর মত যোগ্য লোক এত সহজে পাব না। এই জন্যেই যাঁর কথা লিখেচেন তাঁকে এখন নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা।[২]

অধ্যাপক লেভির পত্র পেয়েচি। তিনি অগ্রহায়ণের আরম্ভে এখানে

পৌঁছে তাঁর ক্লাস নিতে সুরু করবেন।[৫] যদি তোমার কাশীবাসী ছাত্র এই চারমাসের জন্যে এখানে ছাত্ররূপে তাঁর ক্লাসে ভর্ত্তি হতে চান তার ব্যবস্থা করতে পারি। ব্যবসায়ীরা যাকে বিজ্ঞাপনে লিখে থাকে "সুবর্ণ সুযোগ" এও তাই। আপনার উচিত ঐ কয়মাস কাজে ছুটি নিয়ে এখানে ভর্ত্তি হওয়া। আশা[৬] যদি পাশ করবার প্রলোভনপাশে বাঁধা না পড়ত তাহলে তাকে ডাকতুম।

আজকাল আমাকে পত্রাতঙ্ক পেয়ে বসেচে— ডাক ঘরের পেয়াদাকে দূর থেকে দেখ্‌লেই আমার স্বেদ স্তম্ভ বেপথু প্রভৃতি নানা প্রকারের বিকার উপস্থিত হয়। অতএব এইখানে বিদায়গ্রহণ করি। ইতি ৮ কার্ত্তিক ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

লেডি সাহেব শীঘ্রই কাশীতে যাইবেন, তাঁহাকে সেখানকার সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখাইবেন— রাণুর সঙ্গেও পরিচয় করাইয়া দিবেন।[১] আমার যাওয়া এ যাত্রায় ঘটিল না। নেপাল হইতে ফিরিবার পথে একবার যাইবার ইচ্ছা আছে।[২]

সুরেন্দ্রনাথকে[৩] পত্র লিখিয়া দিলাম।

রাণুর শরীর ভাল নাই শুনিয়া আমার মন উদ্বিগ্ন আছে। বোধহয়

অজীর্ণই তাহার palpitation-এর কারণ— পরীক্ষার ভূতে পাইয়া বসিলে এই সমস্ত উপসর্গ ঘটে। ইক্ষুদণ্ডই জাঁতাকলে নিষ্পেষণ করিতে হয়, পদ্মের মৃণাল নয়। পরীক্ষার চাপ মেয়েদের শরীরের পক্ষে খাটে না। ইতি ২৯ মাঘ ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫
১৯ অগাস্ট ১৯২২

ওঁ

*Santiniketan
Beerbhum (Bengal)
1922.
[কলকাতা]

কল্যাণীয়েষু

এবার আর তোমাদের সম্মেলনে[১] আমার যাওয়া ঘট্‌ল না। সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই আমাকে বম্বাই যেতে হবে। তাই বলে' এ বৎসরে তোমাদের সভাধিবেশন ঠেকিয়ে রাখা উচিত হবে না। অতুলপ্রসাদ সেনকে[২] সভাপতি করতে বাধা কি?

বর্ষামঙ্গল হয়ে গেল।[৩] তার একখানি গানসংগ্রহ ও আমার নূতন প্রকাশিত "লিপিকা"[৪] রাণুকে আজ পাঠিয়ে দিয়েচি— তাকে দিয়ো। আজ শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। ইতি ২ ভাদ্র ১৩২৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল প্রত্যূষের গাড়িতে বোলপুরে যাব।

৬

নভেম্বর ১৯২২

ওঁ

[বোম্বাই]

কল্যাণীয়েষু

আগামী ৭ই ডিসেম্বরে এখান থেকে যাত্রা করে বারাণসী ধামে দুই একদিন অবসর গ্রহণ করব।[১] তার পরে মীরাদের নিয়ে আশ্রমে যাত্রা করতে হবে।[২] অধ্যাপক বিণ্টর্‌নিট্‌সকে[৩] নিয়ে যাব মনে করেছিলুম কিন্তু সে সঙ্কল্প দূর করে একা যাওয়াই স্থির করেছি। এণ্ড্রুজ আরো কিছুদিন এখানে আমার ভিক্ষার ঝুলি বহন করে বেড়াবেন। আমার বাহন স্বরূপ সঙ্গে যাবে মরীচি।[৪] ইতি অগ্রহায়ণ ১৩২৯

পথক্লান্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

২১ এপ্রিল ১৯২৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আজ সকালে ডেস্কে বসে একটা নতুন গান নিয়ে তার উপর সুর চড়াচ্ছিলুম, এমন সময়ে হঠাৎ আমার চৌকির পিছনে রাণুর আবির্ভাব। জিজ্ঞাসা করলুম, বাড়ি থেকে পালিয়ে আস নি ত? সে বল্‌লে হাঁ পালিয়ে এসেচি, কিন্তু সম্মতি নিয়ে এবং সঙ্গিনী সহযোগে, অতএব পুলিসে খবর

দেবার দরকার হবে না। ওকে দেখে খুসি হলুম। কিন্তু ওকে আশার সঙ্গে কাশীতে ফিরিয়ে দেব না। আমরা দেরাদুনে যাচ্চি সেখানে ওকে নিয়ে যাব।[১] বলা বাহুল্য ওর নিজের তাতে অসম্মতি নেই, আমার প্রতি ওর "জন্মান্তর সৌহৃদদানি"র দাবী আছে। তোমরা ত আশাকে প্রত্যাহরণ করে নিচ্চ, আবার কাশি স্টেশনে পৌঁছলে রাণুকেও যেন বিচ্ছিন্ন করে নিয়ো না। আশার আশা আমরা সম্পূর্ণ ছাড়ি নি। ও বলেচে মাঝে এক বৎসর এম এ পাস করবার জন্যে ও মেয়াদ নেবে তার পরে ওকে আমরা পেতে পারব। ও চলে গেলে আশা দিদির অভাবে এখানে ভারি একটা ফাঁক পড়বে। বিশ্বনাথের[২] মুখে ফোড়া হওয়াতে আমরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম। কলকাতায় পাঠিয়ে অপারেশন করিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। কাল বোধহয় ফিরে আসবে। দেরাদূন যাবার আগে তোমাদের সময়মত সংবাদ দেব। এখানে তাপ প্রতিদিন বেড়ে উঠ্‌চে। আমার শরীর এবার বড়ই ক্লান্ত। মনে হচ্চে আমার এপারের তীরে এইবার ভাঙন লেগেচে, প্রতিদিন ছোটখাটো ফাটল ধরবার পূর্ব্বেই খেয়ায় পাড়ি দিতে পারলে ভাল হয়— জীর্ণ হয়ে ধসে পড়তে আমার খুব আপত্তি। ইতি ৮ বৈশাখ ১৩৩০

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

[মার্চ ১৯২৪]

শীঘ্রই রাণুর বিবাহ দিয়ে সমস্যা সমাধানের[১] যে চিন্তা করচ আমার কাছে সেটা ভালো বলে ত ঠেকচে না, তাতে সামাজিক সমস্যার

মীমাংসা হতেও পারে, কিন্তু রাণুর নিজের পক্ষে সেটা সুখকর কিম্বা কল্যাণকর হবে কিনা সেটাই বিশেষ করে ভাববার কথা। দুঃখ পাবার শক্তি ওর এত তীব্র যে ও যদি অস্থানে গিয়ে পড়ে তাহলে ভিতরে ভিতরে ও নিজেকে দগ্ধ করে মারবে। যতক্ষণ খুব নিশ্চিত করে না বুঝবে ততক্ষণ উপস্থিত সঙ্কট কোনমতে এড়াবার জন্য একটা ঠেকা দেবার চেষ্টা কোরো না। আমার বিশ্বাস, রাণুর মা রাণুর নিজের পক্ষের কথাটা তোমার চেয়ে ঠিক বুঝতে পারবেন। তিনি এ সম্বন্ধে কি ভাবছেন আমি জানতে ইচ্ছা করি। সুসঙ্গের সুহৃদ' রাণুর কথা আমার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে। আমি তাকে উৎসাহ দিই নি। কেননা কি হলে রাণুর পক্ষে ঠিকটি হয় বা নিশ্চিত না জেনে কতকগুলো কথা জমিয়ে তুলতে আমার আর সাহস হয় না। আমার ত মনে হয় আরো কিছুদিন পড়াশোনার ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে বর্ত্তমান এই সমস্ত জঞ্জালের চিহ্ন মুছে ফেলা সর্ব্বপ্রথমে দরকার। তারপরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ শান্ত হলে ওর সম্বন্ধে সুব্যবস্থা সহজ হবে। এখন ওর মনে আলোড়ন হচ্ছে, সেটা আর কিছুদিন পরে নিশ্চয়ই অনেকটা পরিমাণ ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। আমার যদি সময় থাকত রাণুর সঙ্গে আর রাণুর মার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কয়ে ভিতরকার অবস্থাটা ভালো করে বোঝবার এবং রাণুকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতুম। [ফাল্গুন ১৩৩০]

৭ ফাল্গুন ১৩৩১

ওঁ

[বোম্বাই]

কল্যাণীয়েষু

কাল বোম্বাই এসে পৌঁচেছি।[১] রাণুর বিবাহের সম্বন্ধের খবর পেয়ে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হলুম। তার জন্যে আমার মনে বিশেষ উদ্বেগ ছিল। নিশ্চয়ই পাত্রটি ভালই এবং তাকে যখন রাণুর পছন্দ হয়েচে তখন কোনো কথাই নেই। যতগুলি সম্ভাবনা ঘটেছিল তার মধ্যে এইটেই যে সব চেয়ে ভালো তা নিঃসন্দেহ। ওরা দুজনে সুখী হোক এবং সর্ব্বতোভাবে ওদের কল্যাণ হোক্ এই আমার কামনা।

দক্ষিণ আমেরিকায় যাবার পথে আমি বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম। জাহাজে পড়ে পড়ে মনে হয়েছিল যাত্রা শেষ হ'ল বুঝি। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেচেন যে আমার দুর্ব্বল হৃদ্‌যন্ত্র যথেষ্ট বেগে কাজ করতে পারচে না, সেইজন্যে রক্তপ্রবাহ ক্ষীণ হয়ে চল্‌চে। শরীরে কোনো বিকলতা নেই কেবল প্রাণশক্তির দৈন্য।

কিন্তু সকলের কাছ থেকে এত আন্তরিক সমাদর পেয়েছি যে, ছেড়ে এত শীঘ্র যে আমাকে চলে আস্‌তে হল এতে আমি দুঃখ বোধ করচি। আমি বুঝতে পেরেছি আমার দেশে আমি বিশেষ কিছু কর্ত্তে পারি আমার তেমন সাধ্য নেই। যা করবার তা প্রাণপণেই করেছি, সফলতার দিকে তাকিয়ে বসে থাকা ভুল। সেখানে আমাকে অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে চাচ্চে, তার অর্থই হচ্চে সেখানেই বিধাতা আমাকে ডেকেচেন। জীবনের অপরাহ্ণ এসেচে, বেলা আর বেশি বাকি নেই— এখন এই শেষের প্রহর পশ্চিম দিগন্তকেই অবলম্বন করবার জন্যে আয়োজন হচ্চে। তাই আজই জাহাজ ঠিক করতে পাঠিয়েছি— আগামী ১৫ই এপ্রেলে ইটালি

যাত্রা করন।[২] সেখানকার সকলকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলুন— রক্ষা করতে হবে।

জুন মাসে যদি রাণুর বিবাহ হয় তাহলে উপস্থিত থাক্‌তে পারব না— কিন্তু আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ তাকে বেষ্টন করে থাক্‌বে।

রবিবার বোম্বাই মেলে শান্তিনিকেতন যাত্রা করব।[৩] রাত্রি তিনটের সময় কুড়ি মিনিটের জন্যে কাশী থেকে মোগলসরাইয়ে আসবার দুঃখ দিতে চাই নে।[৪] যদি ঈস্‌টারের ছুটি বা অন্য কোনো উপলক্ষ্যে দুই একদিনের জন্যেও আশ্রমে আসতে পার খুব খুসি হব। যদি সম্ভবপর না হয় তাহলে য়ুরোপে যাবার পথে তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করে' রাণুকে আশীর্ব্বাদ করে' যাব।

তুমি আমাকে চিঠি লিখেছিলে কিন্তু পাই নি। তোমাদের খবর এতদিন পরে এই প্রথম জান্‌লুম। ইতি ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০

[?৮ এপ্রিল ১৯২৫]

ওঁ

[কলকাতা]

কল্যাণীয়েষু

তোমার ব্রণ তোমাকে এখনো কষ্ট দিচ্চে শুনে আমার মন উদ্বিগ্ন আছে। ছুটি নিয়ে কিছুদিন কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে থাক্‌লে ভালো হত।

অনেক দিন পরে মোগলসরাইয়ে আশা ও রাণুর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুসি হলুম। রাণুর অনুরোধ, তার বিবাহের পূর্ব্বে যেন য়ুরোপে না যাই। তার অনুরোধ এড়ানো কঠিন। কিন্তু বিবাহের দিন পরিবর্ত্তন কি অসম্ভব? শুনেছি পাত্রের ইচ্ছা ছিল নভেম্বরে বিবাহ হয়। যদি তদনুসারে দিন স্থির কর তাহলে আমি তার পূর্ব্বেই ফিরে আস্‌তে পারি। আমার য়ুরোপে যাবার তাড়া কিসের একটু খোলসা করে বলি।

আমার শরীর ভেঙে গেছে— ডাক্তারের মতে আমার প্রাণশক্তির ভাণ্ডার দেউলে। দেহের যন্ত্র ঠিক আছে কিন্তু তার কাজ চালাবার সম্বল ফুরিয়ে গেছে। অনেকদিন জড়ের মত পড়ে থেকে সেই শক্তি আবার সঞ্চয় করে নিতে তারা পরামর্শ দেয়। যাই হোক্ এটা বুঝতে পারচি যে, আমার যা কাজ বাকি খুব শীঘ্র তা সেরে নিতে হবে।— ভারতবর্ষে ৫০ বৎসরের উর্দ্ধকাল অকৃপণভাবে কর্ম্মসাধনা করে এসেচি। তার মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে তাহলে একদিন দেশ তা গ্রহণ করবে। অতএব রইল তা কালের হাতে, আমার তার জন্যে তাড়া নেই। তাড়া অসমাপ্ত কাজের জন্যেই, কেননা সময় সঙ্কীর্ণ। তোমরা হয়ত ঠিকমত বুঝতে পারবে না, কিন্তু নিশ্চয় জেনো, য়ুরোপে আমার কাজ আছে। আমার মেয়াদ ফুরোবার আগেই সে কাজ আমাকে সেরে যেতে হবে। তাই ঠিক করেছিলুম দুই মাস বিশ্রাম করে নিয়ে মে মাসের আরম্ভে সেখানে গিয়ে শীতের পূর্ব্বে ফিরে আসব— আগামী বৎসরের গ্রীষ্মে ফের গিয়ে ছয় মাস কাটিয়ে আসব। জাহাজের কামরা রিজার্ভ করাই আছে।

রাণুর বিবাহ যদি আমার যাত্রার আগে বা ফিরে আসার পরে হয় তাহলে সব সহজ হয়। কিম্বা যদি রাণু মত করে তাহলে রাণু ও বীরেনকে একত্র দেখে বিবাহের পূর্ব্বেই ওদের আশীর্ব্বাদ করে বিদায় নিতে পারি। রাণু আমাকে সত্য করিয়ে নিয়েচে ওর বিবাহকালে আমাকে উপস্থিত থাক্‌তে হবে। যদি সত্য বা ত্রেতা যুগে জন্মাতুম তাহলে এবারকার পাঁজিতে

আষাঢ় মাসকে হয় এগিয়ে আনতুম নয় মে মাসকে পিছিয়ে দিতুম, কিন্তু কলিযুগে সত্য পালন সঙ্কটে বিশ্বনিয়মকে বিচলিত করা যায় না। যা হোক এ সম্বন্ধে তোমাদের পরামর্শের অপেক্ষায় রইলুম। আজ ডাক্তারকে দিয়ে দেহযন্ত্র পরীক্ষা করিয়ে কাল শান্তিনিকেতনে যাব।'

আশা আশ্বাস দিয়েছিল রাণুকে নিয়ে সে একবার শান্তিনিকেতনে আসবার চেষ্টা করবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে খুব খুশি হব। এবার আমাকে স্থাণুর মত নিষ্কর্ম্ম হয়ে পড়ে থাকতে হবে— ওরা যদি আসতে পারে তবে আমার কর্ম্মহীন অবকাশের বোঝা অনেকটা হাল্‌কা হবে। [?২৫ চৈত্র ১৩৩১]

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১
১৭ এপ্রিল ১৯২৫

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

মাঝে আলিপুরে নানাবিধ দুর্য্যোগে শরীরটা অত্যন্ত অসুস্থ হয়েছিল। ডাক্তার তাই আমাকে তাঁদের চিকিৎসার বেষ্টনীতে খুব কড়া করে' রাখবার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু এখানে বর্ষশেষ ও নববর্ষের উপাসনায় না এসে থাকতে পারলুম না। তাতে শরীরেও কিছু উপকার হয়েচে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারচি স্বাস্থ্যের জন্য অতি শীঘ্রই আমার যুরোপে যাওয়ার খুবই দরকার। যখন রাণুর বিবাহে বাধাবিঘ্নের আশঙ্কা প্রবল হয়েছিল তখন আমার যাত্রার তারিখ পিছিয়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু সে বাধা এখন যখন সমূলে দূর হয়ে গেছে তখন আমার শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকা

অনাবশ্যক। বিশেষত আমার উপর নানা উপদ্রব চল্‌চেই, শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় সেটা বিশেষ পীড়াজনক। যতদিন এ দেশে থাকব আমাকে নিষ্কৃতি দেবে না। ১লা মে তারিখে জাহাজে ক্যাবিন ঠিক ছিল, সেটা ছেড়ে দিয়েছি— এই গরমের দিনে জাহাজে স্থান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন— ১৫ই মে-তে যাত্রার চেষ্টা করতে ইচ্ছা করি, কিন্তু হয় ত ক্যাবিন পাব না। তাহলে অন্তত ১লা জুনে ছাড়তে চাই— তার পরে থেকে দীর্ঘকাল মন্‌সুনের উৎপাত, সেই দোলায় সমুদ্রে যেতে আমার ডাক্তার হয়ত অনুমতি দেবেন না। য়ুরোপে আমার কাজও ঢের আছে— সেইজন্যে এখানে বৃথা বসে বসে শরীরটাতে ক্রমাগত ভাঙন ধরাতে আর ইচ্ছা করচে না। য়ুরোপের আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতে পারব বলে খুবই আশা আছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে বীরেনের বোনের কাছে শুনেছিলুম ২৮শে জুনে রাণুর বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ওদের অনেকের সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে, রাণুকে ওরা খুব অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করে দেখে আমি ভারি নিশ্চিন্ত হয়েছি। বিশেষত রাণুর প্রতি বীরেনের মনের ভাব ও ব্যবহার দেখে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। সন্দেহমাত্র নেই যে এর চরিত্রে অসামান্য ঔদার্য্য আছে এবং রাণুকে এর মত এমন বড় করে ভালোবাসতে আর কেউ পারে নি। মধ্যে শত্রুপক্ষ নানা বিঘ্ন ঘটিয়ে যে সব দুঃখ সৃষ্টি করেছিল তাতে শুভ ফলই ফলেছে, তাতে সকল পক্ষেরই যে উপকার করেছে এমন আর কিছুতেই হতে পারত না। সেই জন্য এখন আমি নিজের কাজে প্রবৃত্ত হবার আর কোনো বাধা দেখ্‌চিনে। কর্ত্তব্যে অনাবশ্যক শৈথিল্য করা আমার উচিত হবে না। তোমরা সকলেই আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ৪ বৈশাখ ১৩৩২

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২
[১৯২৫]

কল্যাণীয়েষু

ইটালি ঘুরে তোমার দুখানি চিঠি আমার হাতে এসে পৌঁছল।— রাণুর বিবাহ নিশ্চয়ই আমার বিচিত্রা বাড়িতেই হবে।[১] তোমরা ওখানে যতদিন খুসি থেকো— কারো তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। ইতিমধ্যে বিচিত্রা আমরা চুনকাম করিয়ে পরিষ্কার করে রাখব। আমি ভেবে দেখ্‌লুম— রাণুর বিবাহের পূর্ব্বে ইটালি যাত্রা আমার দ্বারা সম্ভবপর হবে না— সুতরাং কন্যাকর্ত্তাদের দলে আমাকে যোগ দিতে হবে। এবারে পাহাড় প্রভৃতি কোথাও যাওয়ার মত আমার শরীরের অবস্থা নয়— গরমের সময় সম্ভবত কলকাতাতেই আমাকে থাক্‌তে হবে।— আপাততঃ এখানে একটা আরামকেদারা আশ্রয় করে' চুপচাপ পড়ে আছি। এখনো হেঁটে বেড়াবার অবস্থা হয় নি। তোমার শরীর ভালো ত?

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩

আশা এখন এলাহাবাদের কর্ম্মে যোগ দিক।[১] তার যে শক্তি আছে তাতে সে সব জায়গাতেই আপন কর্ত্তব্যক্ষেত্র তৈরী করে নিতে পারবে। সেখানকার মেয়েরা ওর সঙ্গে থেকে প্রীতি ও উপকার দুইই পাবে। সেখানকার অপ্রশস্ত কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে ও হয়ত যথোচিত স্বাধীনতা

পাবে না কিন্তু সেই নিয়মের বন্ধন দুঃখ থেকে মেয়েদের ও অনেকটা বাঁচাতে পারবে।

১৪

বীরেন[১] সংবাদ দিয়েছিলেন যে, আশা অনতিকালের মধ্যে আশ্রমে আসবে। বলা বাহুল্য খুব খুশী হয়েছিলাম। আজ তোমার পত্রে বোঝা গেল, আশা সুদূরপরাহত।

আশা যদি আমাদের আশ্রমে যোগ দিতে পারত আমরা খুব খুশী হতুম। তার জন্যে তাহলে আমরা একটা Fellowship ঠিক করে দিতে পারতুম। আমার আশঙ্কা হয় অশোককে[২] ছেড়ে আসা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হবে এবং অশোককে নিয়ে এলে তোমাদের পক্ষে সুখের হবে না।

১৫

ছুটির সময় আশ্রমে গুটিকয়েক ছাত্র ও শিক্ষক থাকেন— ঐ সময় তাঁদের নিয়ে আমার মন্দ জমে না। আশাকে বন্দী করে রাখতে চেষ্টা করব— কিন্তু অশোককে কাছে না পেলে আশার আশা নেই। অতএব অশোক সনাথ হয়ে তোমরা যদি আশ্রমে আসতে পারো তাহলে আমার নৈরাশ্যের আশঙ্কা থাকে না।

১৬

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

[শান্তিনিকেতন]

আশ্রমে এসে[১] আশাকে দেখে মন প্রসন্ন হল, ভক্তি রোগশয্যা থেকে সম্প্রতি উঠেছে। দেখা হল। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে আলাপের সুবিধা এখনো হয় নি। আশা সমস্ত বিদ্যালয়ের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করে বসে আছে, দেখে আনন্দ হয়। চেষ্টা করব যাতে অতিশ্রমে নিজেকে পীড়িত না করে। চেষ্টা করে যথেষ্ট ফল পাওয়া যাবে বলে আশা হয় না। নিজেকে দেউলে না করে ও দান করতে পারে না। যাই হোক ওকে পেয়ে খুব একটা নির্ভর পেয়েছি। অশোককে দেখলাম দিদির স্নেহে পরিপুষ্ট শ্যামল রূপে বিরাজ করছে।[২] একটা কথা বলে রাখি তোমরা কন্যে দান করে পুণ্য কর্ম্ম করেছ। [১৯ মাঘ ১৩৩৭]

১৭

৩ মে ১৯৩১

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এ চিঠিটা নিতান্তই তর্ক করবার জন্যে। এবং সে তর্কটা সম্পূর্ণ অহৈতুক। সুরেন[১] ও নুটুর[২] বিবাহ[৩] সম্বন্ধে তুমি যে মন্তব্য প্রকাশ করেচ সেইটেই এর বিষয়। বিবাহ কোন্ হিন্দুমতে হবে সেটা তুমি বুঝতে পারচনা।

তার প্রশস্ত উত্তর হচ্চে এই যে, পূর্ব্ববঙ্গে যে হিন্দুমতে কায়স্থে বৈদ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে সেই মতে। অপূর্ব্ববঙ্গে এ বিবাহের প্রচলন নেই কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের বিবাহকে এ অঞ্চলের লোক অবজ্ঞা করলেও অহৈতুক বলেন না, অতএব এ রকম বিবাহ একেবারে মূলতই অহিন্দু, যেমন অহিন্দু সগোত্রবিবাহ, একথা ঠিক নয়। যাই হোক্ এটা হোলো ফ্যাক্ট নিয়ে কথা এ নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাইনে। কিন্তু এক জায়গায় তুমি প্রিন্সিপল্ অর্থাৎ শ্রেয়ঃ পথের দোহাই দিয়েচ, সেখানে চুপ করে থাকা অন্যায়। শ্রেয়ঃ কথাটা মস্ত বড়ো কথা, উপনিষদ্ বলেন, শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরাঃ। তুমি বলেচ সমাজবিধি শ্রেয়ের বিধি। পত্রাংশ উদ্ধৃত করি :— বিবাহ ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি বা অনুরাগের জিনিষ নয়, সেজন্যে তাকে সংযত করতে সমাজ বিধিনিয়মাদি করেচেন; কাজেই সমাজানুমোদিত একটা প্রচলিত পথে চলাই শ্রেয়ঃ। আহার সম্বন্ধেও বোধ হয় সে কথা খাটে; বৈজ্ঞানিক বিধিসঙ্গত স্বাস্থ্যকরতা বা স্বাভাবিক রসনাতৃপ্তির অনুগত স্বাদুতাকে সমাজ আহার সম্বন্ধে শ্রেয়ের পন্থা বলে গণ্য করে না,— তার বিশেষবিধি প্রাচীনকালীন প্রথা সঙ্গত, সে প্রথার অনুকূল যুক্তি নির্দ্দেশও অনাবশ্যক। শুধু তাই নয় সেই অন্ন কে রেঁধেছে বা কে এনেছে তার নির্ম্মলতা বা শোভনতার দিক থেকে নয়— অবিচারিত প্রথার দিক থেকে তার শ্রেয়স্করতা বিচার করাই সমাজের মতে বিহিত। এক্ষেত্রে অনুসংস্কারের দোহাই দিলে চুপ করে থাকব কিন্তু শ্রেয়ের দোহাই দিলে স্তব্ধ থাকা কঠিন। সহবাসসম্মতি আইন পাস হবার পূর্ব্বে বালিকাবধূ সম্বন্ধে দুরাচার হিন্দুসমাজ স্বীকার করেছিল উক্ত আইনকে হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলে তুমুল আন্দোলন উঠেছিল। সেই রকম বিবাহ হিন্দুসমাজসম্মত একথা মানতে পারি কিন্তু তাই বলেই শ্রেয়স্কর একথা মানতে পারিনে। সমুদ্রপারে যাওয়া একদা সমাজে অবৈধ ছিল এখনো অনেক পরিমাণে আছে। একথা বলতে দোষ ছিল না যে, সমুদ্রপারে যাত্রা করলে হিন্দুসমাজে বর্জ্জনীয়

হবার কারণ ঘটত, কিন্তু সেই জন্যই সেটা শ্রেয় নয় এমন কথা বলা অন্যায় হত। যক্ষ্মারোগে পিতার মৃত্যু হলে সমাজ পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য করে; যুক্তি এই যে— পূর্ব্বজন্মে পিতা পাপ করেছিলেন— দুর্ভাগা পিতার এই অপমান হিন্দুসমাজসম্মত কিন্তু সেটা শ্রেয়স্কর এমন কথা স্বীকার করলেও প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। সুরেন মানুষ হিসাবে অধিকাংশ সৎকুলীনের চেয়ে নির্ম্মলস্বভাব বুদ্ধিমান সহৃদয় ও প্রতিভাসম্পন্ন তথাপি নুটুকে তার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও অনুরাগ সংযত করতেই হবে অর্থাৎ বিনা কারণে নিজের ও সুরেনের ধর্ম্মসঙ্গত ইচ্ছাকেই অপমানিত করতে হবে এটা হিন্দুসমাজসম্মত তা মানি কিন্তু শ্রেয়স্কর তা কিছুতেই মানিনে। সামাজিক অসতীত্ব ও স্বাভাবিক অসতীত্বের মধ্যে প্রভেদ আছে— নুটু সমাজনির্ব্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করার দ্বারা মনে মনে অশুচি হলেও সমাজ সেই নিষ্ঠুর বীভৎসতাকে প্রশ্রয় দেয়— এটা একটা তথ্য মাত্র কিন্তু এটাকে শ্রেয় বলব কি করে? সংস্কারের দোহাই দাও, সামাজিক অসুবিধার দোহাই দাও তার কোনো উত্তর নেই কিন্তু শ্রেয়ের দোহাই দিলে কেমন করে মেনে নেব? অত্যাচারের অস্ত্র সমাজের হাতে, বিধাতৃবিহিত মানবধর্ম্মকে অন্যায় নিপীড়ন করবার শক্তি আছে সমাজের, অক্ষমতাবশত সমাজের অযৌক্তিক অস্বাস্থ্যকর বিধান মেনে নিতে পারি কিন্তু সমাজ-কর্ত্তৃক অনুমোদিত মূঢ়তা ও অধর্ম্মকে শ্রেয় বলে মানতে পারব না। সৌভাগ্যক্রমে আমরা চিরদিন আছি সমাজের বাইরে কিন্তু তবু অত্যাচার দেখলে উদাসীন থাকতে পারিনে, পরসমাজের ব্যূহে অনধিকার প্রবেশ করে প্রতিবাদ না করে থাকতে পারিনে।

যাই হোক আমার এ চিঠি অহৈতুক তর্ক মাত্র— এর পিছনে কোনো তাগিদ নেই।

তোমার শরীরের জন্যে উদ্বিগ্ন আছি। আশা করি দুঃসহ চিকিৎসা-দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে। আমার সামনে আশু একটি দুর্ভোগ আছে, সে

হচ্চে আমার জন্মোৎসব।[৪] জন্মান্তরের দুষ্কৃতিজনিত এই জন্মের প্রখর রৌদ্রতাপ আমাকে অতিক্রম করে আমার বন্ধুবান্ধবদেরও তাপিত করবে এটা আমি অপরাধের বিষয় বলে মনে করচি— নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু স্নিগ্ধ জনেরা তাপকে তাপ বলে গণ্য করবেন না। ইতি ২০ বৈশাখ ১৩৩৮

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

এই মাত্র পত্রসহ মোরব্বার রসিদ পাওয়া গেল। দানের প্রতিশ্রুতি বিস্মৃতি হওয়াই মানবধর্ম্ম। দাক্ষিণ্য যাদের স্বাভাবিক তাদেরই স্মৃতিচ্যুতি ঘটে না।

আজ অপরাহ্নে কলকাতায় যাচ্চি। ইতিমধ্যে তোমার আমলক যদি করতলন্যস্ত হয় তাহোলে সমভিব্যহারেই যাবে— নইলে ফিরে এসে আশীর্ব্বাদসহ ভোগ শুরু করব।

সেই বইটার ব্যবহার শেষ হোলে ফিরে পাঠিয়ে দিয়ো, অনেক পাঠেচ্ছু আছে। অমিয়চন্দ্র[১] বোধ করি অধ্যাপক উইন্টরনিট্‌স্‌কে শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ শ্লোকটির উল্লেখ করে আমাদের শাস্ত্রে শ্রেয়োনীতির সমর্থন জানিয়েছেন। অধ্যাপক তদুত্তরে প্রাচীন টীকাভাষ্যসহ বুঝিয়েছেন

এখানে শ্রেয়ঃ শব্দ বিশেষ ভাবে আধ্যাত্মিক পন্থা হিসাবেই ব্যবহৃত। যে চারিত্রনীতি একান্ত মানবসমাজের হিতার্থে সেটা ওর লক্ষ্য নয়। অর্থাৎ এসমস্ত উপদেশ ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনের পক্ষেই মুখ্যভাবে খাটে, লোকহিতের পক্ষে নয়। এর থেকে বোঝা যায় লোকহিতকেই চরম করে তার সাধনা আমাদের দেশে ছিল না, এইজন্যে সাধকেরা লোকহিতের প্রতি ঔদাসীন্য করে সমাজের অনেক অনিষ্টকে উপেক্ষা করেছেন। এমন কি, প্রত্যেক জনসম্প্রদায় আপন আপন আচারকে আপন সংস্কারের মধ্যে বদ্ধ করে সার্ব্বজনিক মানবশ্রেয়কে সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত করতে পেরেছে এই কারণেই। আমাদের মুক্তি আত্মসম্ভোগেরই বিরাট আদর্শ, জনসেবা তার নেপথ্যে পড়ে গেছে। একথা যদি যথার্থ হয় তবে সত্যের অনুরোধে তা স্বীকার করাই উচিত হবে। মিথ্যা আত্মশ্লাঘা নিন্দনীয় এবং লজ্জাকর।

আশা করি তোমরা সপরিজনে ভালো আছ। রথী বৌমা শরীর শোধনের জন্যে গিয়েছেন গিরিডিতে। সেখানকার জলে অগ্নিবর্দ্ধন করে এমন একটা স্বতোবিরোধী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

এবারকার জলপ্লাবন তোমাদের আক্রমণ করে নি তো? আমার তিরোভাব ঘটবার পূর্ব্বেই একদা এখানে তোমাদের আবির্ভাব হবে এই প্রত্যাশায় রইলুম। ইতি ভাদ্র ২০, ১৩৪৩

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

২১ আশ্বিন ১৩৪৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার লেখাটি সম্পাদকের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছি।[১] ভালো হয়েছে সন্দেহ মাত্র নেই। কোনো ধর্ম্মকেই শাস্ত্র বচনের মধ্যে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। তার আত্মিক প্রাণ তার বাক্যদেহকে অতিক্রম করে আপন কাজ করে। জলদান অন্নদান বিদ্যাদান প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে নিঃস্বার্থ চেষ্টা অনেকদিন প্রবর্ত্তিত ছিল তার মূল প্রেরণা মহাপুরুষদের জীবনের গভীরে ছিল। যদি দেখা যায় আমাদের দেশের জলবায়ুতে তার উদ্যম মিইয়ে আসে সেটা প্রকৃতির ত্রুটি। পশ্চিম দেশে খৃষ্টধর্ম্মের উপদিষ্ট meekness ঐ প্রাকৃতিক কারণে ব্যবহারে পরিণত হোতে পদে পদে বাধা পায়, মূল ধর্ম্মের বাণী সত্ত্বেও। বিষয়টা জটিল— আরো জটিল হয়ে ওঠে যখন বিচার করবার সময় বিচারকের নিজের সংস্কার তার মধ্যে গ্রন্থি পাকাতে থাকে।

দুই তিন দিনেই যাব কলকাতায়— যাত্রার দলের অধিকারী হয়ে।[২] তদুপলক্ষে রাণুর সঙ্গে দেখা হবে আশা করছি।

কয়দিন ধরে নিরন্তর দুর্য্যোগ চলেছিল। আজ প্রাতে দেবতার প্রসন্নমূর্ত্তি দেখা দিয়েছে। তোমাদের ওখানে আকাশের মেজাজ বোধ করি এমন ভ্রূকুটিকুটিল নয়।

সকলে মিলে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি ৭।১০।৩৬

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

১০ ফাল্গুন ১৩৪৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু

তোমার কাছে আমার একটি সানুনয় নিবেদন আছে, ধৈর্য্য ধরে শুনতে হবে। আমাদের বিদ্যাভবনের গবেষণা বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার তোমাকে নিতেই হবে, দ্বিধা করতে পারবে না।[১] প্রস্তাবটা আবেদনের চেয়ে আদেশের মতো শোনাচ্চে— সেটার কারণ আগ্রহ। জুলাই মাস থেকে এই পদ গ্রহণ করা চাই। আগন্তুক ছাত্রদের জুলাই পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছি। কোনোমতে কাজ যদি আরম্ভ করতে না পারি তাহলে যাঁদের পরে আমাদের ভরসা তাঁরা সন্দিহান হবেন তাতে আমাদের ক্ষতি হবে।

গবেষণা বিভাগের দুটি চারটি ছাত্রদেরকে পথনির্দেশ ও পরিচালনা করা শ্রমসাধ্য কাজ নয়। তা ছাড়া যদি কখনো বিদ্যার্থী কেউ কেউ তোমার সহায়তা প্রার্থনা করে তুমি স্বভাবতই তাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। বানপ্রস্থ আশ্রমের উপযোগী যেটুকু কাজ কর্তব্য বলেই গণ্য হয়েছে তার বেশি তোমাকে কিছু করতে হবে না। চিরদিন তোমরা কর্মসাধনা করে এসেছ একান্ত নৈষ্কর্ম্য তোমার পক্ষে যথার্থ বিশ্রাম হতে পারে না— আশী বছরের কাছে পৌঁছিয়েও তার প্রমাণ পাচ্চি। কিন্তু কর্মভারের যথোচিত লাঘব হবে।

এ কাজে যে বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে অর্থাৎ মাসিক একশত টাকা— সে তোমার পক্ষে যৎসামান্য। কিন্তু অর্থের পরিমাণ সম্মানের মাপকাঠি নয়।

গরীবের ঘরে অর্থের দৈন্য থাকতে পারে কিন্তু শ্রদ্ধার অভাব নেই একথা তোমাকে বলা বাহুল্য।

প্রতিকূলে মাথা নেড়ো না। ইতি ২২।২।৩৮

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ তুমি বোধ হয় জানো সম্পূর্ণ বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষতা ক্ষিতিমোহন বাবুর হাতে— তাঁর সঙ্গে তোমাকে সহযোগিতা করতে হবে। তিনি তোমার সাহচর্য পেলে আনন্দিত হবেন।

সরযূবালা অধিকারী

ও

লেডি যাদুমতী মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

রবীন্দ্রনাথের পত্র

১

৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৩

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আমাদের পালা সাঙ্গ হল। রাণু যাচ্চে এণ্ড্রুস সাহেবের সঙ্গে। মাঝে ওর ডেঙ্গু জ্বর হয়েছিল কিন্তু আমার বিশ্বাস আমারই ওষুধের গুণে তাড়াতাড়ি সেরে উঠ্‌ল। প্রথম দিনে অভিনয়ে যোগ দিতে পারেনি, বাকি তিনদিন গিয়েছিল।[১] ওর অভিনয়ের খুবই সুখ্যাতি হয়েছে, ওকে সাজেসজ্জায় খুব ভালই দেখাচ্ছিল। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস এ রকম অভিনয় ওর পক্ষে একটা বড় শিক্ষা। এবার দীর্ঘকাল আমি কলকাতায় আবদ্ধ ছিলুম। কাল নিষ্কৃতি পেয়েচি, এখানে এসে আরাম পাওয়া গেল।[২] কিন্তু অনেকদিন রাণু আমাদের খুব কাছে কাছে ছিল, সে চলে যাচ্চে বলে আমাদের ফাঁকা ঠেকচে। শুধু আমার নয়, আমাদের জোড়াসাঁকো অঞ্চলে গগন প্রভৃতি সবাই ওর অভাব অনুভব করবে; ওর হাসিতে গল্পে ও সমস্ত পাড়া জমিয়ে রেখেছিল। যা হোক্, এখন ওকে ওর কর্ত্তব্যের মধ্যে নিমগ্ন হতে হবে, আমারও কর্ত্তব্যের পালা আবার সুরু হল। আমাকে চীন দেশে যেতে হবে, তার জন্যে লেকচার তৈরি করা চাই, দুই একদিনের মধ্যেই স্থির হয়ে বসে লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হব।

আশাদিদির শরীর মাঝে খারাপ হয়েছিল, এখন ভালো আছে ত? আশাদিদি সমস্ত আশ্রমবালক বালিকার আশাদিদি হয়ে উঠেচে, তারা এখনো তাকে ভুল্‌তে পারে নি। তোমরা সকলে এখন আশা করি ভালো আছ। আমি একান্ত মনে তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। এবার ক্রিষ্টমাসের ছুটির সময় যদি এ দিকে আস তা হলে তোমাদের সঙ্গে চীনযাত্রার পূর্ব্বে দেখা হবে। পূজোর ছুটির সময় কাঠিওয়াড়ে যাব, সেখানে দু তিন মাস কাটবে,

যদি ফেরবার সময় পশ্চিমের রেলপথে ফিরি তাহলে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসব। ইতি ১৭ই ভাদ্র ১৩৩০

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১৩ [?১৫] মার্চ ১৯২৪

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আমি কেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে রাণুর বাবাকে একটা টেলিগ্রামের তাড়নায় উত্তেজিত করে তুলেছিলুম তার বিবরণটা বোধ হয় রাণুর কাছ থেকে শুনেচ।[১] কাশীতে এত রকম বেরকমের মারীর দল তীর্থযাত্রা করে যে অকস্মাৎ একটা আশঙ্কা আমার মনকে আক্রমণ করেছিল। যা হোক্ সে সব চুকে গেছে।

কিন্তু শুধু ত মারী নয়, আরো অনেক ভাববার কথা আছে। আমি চীনে রওনা হবার পূর্ব্বে কিছু একটা মীমাংসার মত হয়ে গেলে কতকটা মাথা ঠাণ্ডা করে কয়েক মাসের মত দৌড় দিতে পারি। সুসঙ্গের সুহৃদের[২] কথা ইতিপূর্ব্বেই তোমাকে বলেচি। বেশ বুঝতে পারচি তার মনটা রাণুর জন্যে ব্যাকুল হয়েচে কিন্তু ওর মধ্যে খুব একটা ভদ্রোচিত সংযম আছে বলে ধৈর্য্য ধরে আছে। কেবল আমাকে দৈবাৎ দুয়েকটা বেফাঁস কথায় ধরা দিয়ে ফেলে। তার চিঠি তোমাকে পাঠাই। ছেলেটি সকলদিকে ভালো তার সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভালোকেই যে সব সময়ে ভালো লাগে এমন

কোনো বাঁধা নিয়ম নেই। পৃথিবীতে সত্যকার ভালোবাসা দুর্লভ সে কথাও ভেবে দেখা চাই। ও রাণুকে ভালোবাস্‌বে সুতরাং ওকে ভুল বুঝবেনা— ওর মধ্যে যে দুর্দ্দামতা আছে তার সম্বন্ধেও অসহিষ্ণু হবে না। তা ছাড়া সুহৃদ আমাকে সত্যই শ্রদ্ধা করে সুতরাং আমার সম্বন্ধে রাণুকে বোধ করি বেদনা দেবে না। মুস্কিল এই যে রাণুর জীবনের মাঝখানে কেমন করে আমি একটা কেন্দ্র দখল করে বসে আছি, সুতরাং ওর যেখানেই গতি হোক্ আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চলবে না। তাতে সমস্ত ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠেচে। সেই জটা যদি ছাড়ানো সম্ভব হত তাহলে সবই সোজা হ'ত। কিন্তু বেদনা পেতে ও যেরকম অসাধারণ রকম পটু তাতে ওকে কাঁদাতে আমার মন সরে না। ওকে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা দেবার পথ আমার হাতে নেই— তবে কি না আমার অন্দরের স্নেহ পাবার পক্ষে ওর কোনো ব্যাঘাত না হয় এই সম্ভাবনার কথাই আমি আশা করতে পারি। রাণুর জন্যে আমার মনে খুব একটা উৎকণ্ঠা আছে— সেইজন্যে একটি যথার্থ ভদ্রলোকের হাতে ওকে দিতে পারলে আমি সুখী হই। তোমাকে আমি সুহৃদের চিঠি এইজন্যে পাঠাচ্চি যে তুমি রাণুর সুখদুঃখের কথা ঠিকমত বিবেচনা করে দেখ্‌তে পারবে। আজ শনিবার।* আগামী শুক্রবারে জাহাজ ছাড়বে অতএব মঙ্গলবারে কলকাতায় পৌঁছতে হবে। যদি উত্তর দাও কলকাতার ঠিকানায় দিয়ো। ইতি ৩০ ফাল্গুন [?২ চৈত্র] ১৩৩০

তোমাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৩ মার্চ ১৯২৫]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

চিঠি পেয়ে বজ্রাহত হলুম। কিন্তু ভয় পেয়ো না। আমার যা সাধ্য তা করব। Lady Mukherjiকে আজই চিঠি লিখে দিলুম।[1] Sir Mukherjiকে[2] নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছি। খুব সম্ভব দুজনেই এখানে আসবেন। রাণুকে বোলো। বেশি উদ্বিগ্ন না হয়। সমস্তই ঠিক হয়ে যাবে।

[১৯ ফাল্গুন ১৩৩১]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেডি যাদুমতী মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

ওঁ

শান্তিনিকেতন

মাননীয়াসু

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

কোনো এক গুপ্তনামা নিন্দুক রাণুর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া আপনাকে যে পত্র দিয়াছে রাণুর মা আজ তাহা আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন।[1]

বিদেশ হইতে বোম্বাই ফিরিয়া আসিয়াই সংবাদ পাইলাম আপনাদের ঘরে রাণুর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে।[2] শুনিয়া বড় আহ্লাদে রাণুকে আশীর্ব্বাদ

করিয়া পত্র পাঠাইলাম শ্রীমান বীরেনকেও লিখিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় রাণুর মার চিঠি পাইয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি।

রাণুকে তাহার শিশুকাল হইতে জানি এবং একান্তমনে স্নেহ করি। ইহা জানি তাহার চরিত্র কলুষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার বয়সে বাঙালীর ঘরের মেয়েরা যে সাধারণ অভিজ্ঞতা সহজে লাভ করে তাহার তাহা একেবারেই ছিল না। সে এমনি শিশুর মত কাঁচা যে তাহার কথাবার্ত্তা ও আচরণ অনেক সময় হাস্যকর হইত। এইরূপ অদ্ভুত অনভিজ্ঞতাবশত লোক ব্যবহার সম্বন্ধে তাহার কোনো ধারণা ছিল না। এই কারণে রাণুর বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ উদ্বেগ ছিল। আমি তাহার জন্য এমন সৎপাত্র কামনা করিতেছিলাম যে তাহার একান্ত সরলতার যথার্থ মূল্য বুঝিবে এবং লৌকিকতার ত্রুটি ক্ষমা করিবে।

এমন সময়ে প্রফুল্লনাথের পুত্র পূর্ণেন্দু আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দৈবক্রমে রাণুকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহের জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। সগোত্রে বিবাহে তাহার পিতার সম্মতি হইবেনা আশঙ্কা করিয়া প্রথমে বাধা দিই। তখন প্রফুল্লনাথ কলিকাতায় ছিলেন না। পূর্ণেন্দু ও তাহার একজন গুরুস্থানীয় আত্মীয় আমাকে বারবার আশ্বাস দিলেন যে আপত্তি গুরুতর হইবে না এবং বিবাহ নিশ্চয়ই ঘটিবে।

পূর্ণেন্দু ছেলেটি ভাল, তাহার হাতে রাণু কষ্ট পাইবেনা নিশ্চয় ভাবিয়া আমি তাহাদের পরিচয়ে বাধা দিই নাই। কিন্তু পরিচয় বলিতে একবারমাত্র শান্তিনিকেতনে দেখা হইয়াছিল। রাণু তখন আমার কন্যা মীরা ও বউমার কাছে ছিল। পূর্ণেন্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা হওয়া তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল।

আপনি আমার কন্যা বেলাকে জানিতেন। তাহার ছোটভাই শমী* বাঁচিয়া নাই। আমি অনেকবার ভাবিয়াছি যে, সে যদি বাঁচিয়া থাকিত তবে রাণুর সঙ্গে নিশ্চয় তাহার বিবাহ দিতাম। তাহার কারণ রাণুর

মধ্যে অসামান্যতা আছে। বুদ্ধিতে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণতা— কিন্তু তাহার চেয়ে বড় কথা তাহার মনের নিষ্কলুষ সরলতা। ঠিক এমনটি আমি আর কোথাও দেখি নাই। এ কথা আমি আপনাকে জোর করিয়া বলিতে পারি রাণুর চরিত্রে কলঙ্কের রেখা মাত্র পড়ে নাই— যদি তাহার কোনো দোষ থাকে ত সে কেবল সমাজ ব্যবহারের— তাহা পাপ নহে তাহা অজ্ঞতা। এমন পাত্রী সহজে পাওয়া যাইবেনা ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

আমাদের দেশে বয়ঃপ্রাপ্ত কুমারীদের বিবাহকালে গুপ্ত নিন্দাপ্রচার ইহার পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছি, সুতরাং এই ঘটনায় বিস্মিত হই নাই। কিন্তু এমনতর মর্ম্মান্তিক অন্যায় নিষ্ঠুরতায় যাহাদের প্রবৃত্তি হইতে পারে তাহাদের মনের কুটিল গতি আজও বুঝিতে পারি না। যদি রাণুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত আপনারা গ্রহণ করিতে না পারেন তবে তাহার ও তাহার পরিবারদের কি অবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে।

আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ নতুবা নিশ্চয়ই আপনাদের সহিত দেখা করিয়া সকল কথার আলোচনা করিতাম। আমার নড়াচড়া বন্ধ। সার রাজেন্দ্রনাথ ও আপনি যদি শান্তিনিকেতন দেখার উপলক্ষ্যে একবার এখানে আসিতে পারেন তবে সর্ব্বতোভাবে খুসি হইব। বৌমাকে আপনি ত ঘরের মেয়ের মতই জানেন— আশা করি তাঁহার আতিথ্যে আপনার কোনো কষ্ট হইবে না।[৪] দুর্ব্বল শরীরে ভাল করিয়া লিখিতে পারিলাম না। ৩ মার্চ্চ ১৯২৫

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

২১ এপ্রিল ১৯২৫

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আমার কেয়ারে রাণুর একটা চিঠি এসেছে।[১] আমার মনে হচ্চে বেনামী চিঠিতে তাকে কেউ ভয় দেখিয়ে লিখেচে। আমার চিঠির মধ্যে পাঠিয়ে দিলুম। বোধ হয় রাণুকে দেখাবার প্রয়োজন হবে না। যদি বুড়ো লিখে থাকে তাহলে যথাকর্ত্তব্য কোরো। ইতিমধ্যে বোধ করি রাজেন্দ্র মুখুজ্জেদের ওখানেও চিঠি যাচ্চে— জানি নে। আমাকে লিখ্‌লেও আমার হাতে পৌঁছবার পথ রাখি নি। বিবাহের পূর্ব্বে রাণুকে কোথায় রাখ্‌লে আন্দোলনের সৃষ্টি হবে না সেটা ভালো করে বিবেচনা করে দেখো। ইতি ৮ বৈশাখ ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[মে ১৯২৫]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়াসু

আমি এখানে গোলমাল থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে এসে একটু ভালো বোধ করচি। এখনো চলতে ফিরতে হাঁপিয়ে উঠি— চৌকিতেই সমস্ত দিন আবদ্ধ হয়ে আছি।

একজিমা প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগে ইন্‌জেক্‌শন একমাত্র চিকিৎসা। অতএব এ জন্যে রাণুর বাবার কলকাতায় কিম্বা এলাহাবাদে যেখানে উপযুক্ত চিকিৎসক আছেন এমন জায়গায় যাওয়া উচিত।[১] আমার আশঙ্কা এই যে, কলকাতায় ওঁকে পেলে ওঁর উপর উৎপাত করবার চেষ্টা চল্‌বে। যদি বাধ্য হয়ে আসতে হয় তাহলে প্রশান্তর বাড়িতে থাকলে কতকটা নিরাপদে থাকতে পারবেন। গরমের সময় কার্সিয়াং কিম্বা দার্জ্জিলিঙে প্রায় সব বড় বড় চিকিৎসক গিয়ে থাকেন অতএব সেখানেও খুব সম্ভব সুচিকিৎসার ব্যবস্থা সহজ হবে।

ডাক্তার আমাকে শিলং পাহাড়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু এখানে আমার নতুন বাড়িতে একরকম গুছিয়ে বসেছি কোথাও নড়তে ইচ্ছে করচেনা। য়ুরোপ যাত্রার পূর্ব্বে বৃথা নড়াচড়ার হাঙ্গাম করে আরো ক্লান্তি বাড়িয়ে তুলে কোনো ফল নেই। এখানে এখনো কিছুমাত্র গরম পড়ে নি বল্‌লেই হয়। এমন কি, রাত্রে গায়ে কাপড় দিতে হয়। প্রায় মাঝে মাঝে মেঘ করচে। আজ সকালে বৃষ্টি হয়ে গেচে— এখনো সূর্য্য দেখা দেয় নি— ঠাণ্ডা বাতাস বইচে। আমি সমস্ত দিনই প্রায় বাইরে খোলা হাওয়াতে থাকি। লেখাপড়া বেশি কিছু করিনে— আমার মনটা যেন এই আকাশ দিয়েই ভরে আছি।

শরীরের উপর বিরক্ত হয়ে আরেকবার সকাল সকাল য়ুরোপ বেরিয়ে পড়বার ইচ্ছা করেছিলুম। কিন্তু সেই ইচ্ছা চুকিয়ে দেওয়া গেল। রাণুর বিয়েটা হয়ে যাক্, তার পরে জুলাই কিম্বা অগষ্ট যখন হোক্ যাত্রা করা যাবে। তখন ভারতসমুদ্র বর্ষার হাওয়ায় বড় অশান্ত হয়। আশা করি আমাকে তাঁতে বেশি দুঃখ দেবেনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশা অধিকারীকে লিখিত
রবীন্দ্রনাথের পত্র

১

১৫ আশ্বিন ১৩৩৭

ওঁ

বার্লিন

কল্যাণীয়াসু

আশা, রাশিয়া ঘুরে এসে আজ আমেরিকার মুখে চলেচি এমন সন্ধিক্ষণে তোমার চিঠি পেলুম। রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদ্‌লে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েচে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল, আজ তারা সমাজের অন্ধ কুটুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এককালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েচে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন। এদের সাম্‌নে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত— সর্ব্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়।

এরা তিনটে জিনিষ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে। শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্ম্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করচে। আমাদের দেশের মতোই এখানকার মানুষ কৃষিজীবী। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষি একদিকে মূঢ় আর এক দিকে অক্ষম, শিক্ষা এবং শক্তি দুই থেকেই বঞ্চিত। তার একমাত্র ক্ষীণ আশ্রয় হচ্চে প্রথা— পিতামহের আমলের চাকরের মতো, সে কাজ করে কম অথচ কর্ত্তৃত্ব করে বেশি। তাকে মেনে চল্‌তে হলে তাকে এগিয়ে চলবার উপায় থাকে না। অথচ শত শত বৎসর থেকে সে খুঁড়িয়ে চল্‌চে।

আমাদের দেশে কোনো এক সময়ে গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণ বোধ হয় ছিলেন কৃষির দেবতা, গোয়ালার ঘরে তাঁর বিহার; তাঁর দাদা বলরাম, হলধর। ঐ লাঙল অস্ত্রটা হোলো মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক। কৃষিকে বল দান করেচে যন্ত্র। আজকের দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কিনারায় বলরামের দেখা নেই— তিনি লজ্জিত— যে দেশে তাঁর অস্ত্রে তেজ আছে সেই সাগরপারে তিনি চলে গেছেন। রাশিয়ার কৃষি বলরামকে ডাক দিয়েচে, দেখ্‌তে দেখতে [য] সেখানকার কেদারখণ্ডগুলো অখণ্ড হয়ে উঠল, তাঁর নূতন হলের স্পর্শে অহল্যা ভূমিতে প্রাণসঞ্চার হয়েচে। একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, রামেরই হলযন্ত্রধারী রূপ হচ্চে বলরাম।— ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এদেশে শতকরা ৯৯ জন চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখে নি। তারা সেদিন আমাদেরই চাষীদের মতো সম্পূর্ণ দুর্ব্বলরাম ছিল, নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্ব্বাক। আজ দেখ্‌তে দেখতে [য] এদের ক্ষেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেচে। আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব— আজ এরা হয়েছে বলরামের দল।

কিন্তু শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয় না যন্ত্রী যদি মানুষ হয়ে না ওঠে। এদের ক্ষেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্চে। এখানকার শিক্ষার কাজ সজীব প্রণালীতে। আমি বরাবর বলে এসেচি শিক্ষাকে জীবযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানো উচিত। তার থেকে অবচ্ছিন্ন করে নিলে ওটা ভাণ্ডারের সামগ্রী হয় পাকযন্ত্রের খাদ্য হয় না। এখানে এসে দেখলুম এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেচে। তার কারণ এরা সংসারের সীমা থেকে ইস্কুলের সীমাকে সরিয়ে রাখে নি। এরা পাস করবার কিম্বা পণ্ডিত করবার জন্যে শেখায় না— সর্ব্বতোভাবে মানুষ করবার জন্যে শেখায়। আমাদের দেশে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়ো, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়ো, পুঁথির পংক্তির বোঝার

ভাবে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকেনা। কতবার চেষ্টা করেচি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্নও নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার যে যোগ আছে সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনো দিন জানতে চাইতে শেখে নি,— প্রথম থেকেই কেবলি বাঁধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তার পরে সেই শিক্ষিত বিদ্যার পুনরাবৃত্তি করে' ওরা পরীক্ষার মার্কা সংগ্রহ করে। আমার মনে আছে শান্তিনিকেতনে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মহাত্মাজির ছাত্রেরা ছিল তখন একদিন তাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের ছেলেদের সঙ্গে পারুল বনে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করো কি? সে বললে, জানি নে।— এ সম্বন্ধে সে তাদের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করতে চাইলে। আমি বললুম, জিজ্ঞাসা পরে কোরো কিন্তু বেড়াতে যেতে তোমার ইচ্ছা আছে কিনা আমাকে বলো। সে বললে আমি জানি নে। অর্থাৎ এ ছাত্র কোনো বিষয়ে স্বয়ং কিছু ইচ্ছা করবার চর্চ্চাই করে না— তাকে চালনা করা হয় সে চলে, আপন থেকে তাকে কিছু ভাবতে হয় না। এ রকম সামান্য বিষয়ে মনের এতটা অসাড়তা যদিও সাধারণত আমাদের ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় না কিন্তু এর চেয়ে আরো একটুখানি শক্তরকমের চিন্তনীয় বিষয় যদি পাড়া যায় তবে দেখা যাবে সে জন্যে এদের মন একটুখানিও প্রস্তুত নেই। এরা কেবলি অপেক্ষা করে থাকে আমরা উপরে থেকে কি বলতে পারি তাই শোনবার জন্যে। সংসারে এ রকম মনের মতো নিরুপায় মন আর হতে পারে না।

এখানে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা চলচে, তার বিস্তারিত বিবরণ পরে দেবার চেষ্টা করব। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে রিপোর্ট এবং বই পড়ে অনেকটা জানা যেতে পারে কিন্তু শিক্ষার চেহারা মানুষের মধ্যে যেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায় সেটাই সব চেয়ে কাজের। সেইটে সেদিন দেখে

এসেচি। পায়োনিরর্স্ কম্যুন বলে' এ দেশে যে সব আশ্রম স্থাপিত হয়েচে তারি একটা দেখতে সেদিন গিয়েছিলুম। আমাদের শান্তিনিকেতনে যে রকম ব্রতী বালক ব্রতী বালিকা আছে এদের পায়োনিয়র্স্ দল কতকটা সেই ধরণের।

বাড়িতে প্রবেশ করেই দেখি আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সিঁড়ির দু'ধারে বালক বালিকার দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে আস্তেই ওরা আমার চারদিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে এসে বস্‌ল, যেন আমি ওদেরই আপন দলের। একটা কথা মনে রেখো এরা সকলেই পিতৃমাতৃহীন। এরা যে শ্রেণী থেকে এসেচে একদা সে শ্রেণীর মানুষ কারো কাছে কোনো যত্নের দাবী করতে পারত না, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে নিতান্ত নীচবৃত্তির দ্বারা দিনপাত করত। এদের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, অনাদরের অসম্মানের কুয়াষা-ঢাকা চেহারা একেবারেই নয়। সঙ্কোচ নেই, জড়তা নেই। তা ছাড়া সকলেরই মনের মধ্যে একটা পণ, সাম্‌নে একটা কর্ম্মক্ষেত্র আছে বলে মনে হয় যেন সর্ব্বদা তৎপর হয়ে আছে, কোনো কিছুতে অনবধানের শৈথিল্য থাকবার জো নেই।

অভ্যর্থনার জবাবে আমি ওদের অল্প যা বলেছিলুম তারই প্রসঙ্গক্রমে একজন ছেলে বল্‌লে, পরশ্রমজীবীরা (bourgeoisie) নিজের ব্যক্তিগত মুনফা খোঁজে, আমরা চাই দেশের ঐশ্বর্য্যে সকল মানুষের সমান স্বত্ব থাকে। এই বিদ্যালয়ে আমরা সেই নীতি অনুসারে চলে থাকি।

একটি মেয়ে বল্‌লে, "আমরা নিজেরা নিজেদের চালনা করি। আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে কাজ করে থাকি যেটা সকলের পক্ষেই শ্রেয় সেইটেই আমাদের স্বীকার্য্য।"

আর একটি ছেলে বল্‌লে, "আমরা ভুল করতে পারি কিন্তু যদি ইচ্ছা করি যারা আমাদের চেয়ে বড়ো তাদের পরামর্শ নিয়ে থাকি। প্রয়োজন হলে ছোট ছেলেমেয়েরা বড়ো ছেলেমেয়েদের মত নেয় এবং তারা যেতে

পারে তাদের শিক্ষকদের কাছে। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্রের এই বিধি। আমরা এখানে সেই বিধিরই চর্চ্চা করে থাকি।"

এর থেকে বুঝতে পারবে এদের শিক্ষা কেবল পুঁথি পড়ার শিক্ষা নয়। নিজের ব্যবহারকে চরিত্রকে একটা বৃহৎ লোকযাত্রার অনুগত করে' এরা তৈরি করে তুলচে। সেই সম্বন্ধে এদের একটা পণ আছে এবং সেই পণরক্ষায় এদের গৌরব বোধ। আমার ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের আমি অনেকবার বলেচি, লোকহিত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ববোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবী করে থাকি শান্তিনিকেতনের ছোট সীমার মধ্যে তারি একটি সম্পূর্ণরূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার— সেই ব্যবস্থায় যখন এখানকার সমস্ত কর্ম্ম সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন এইটুকুর মধ্যে আমাদের সমস্ত দেশের সমস্যার পূরণ হতে পারবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সাধারণ হিতের অনুগত করে তোলবার চর্চ্চা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে হতে পারে না, তার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়— সেই ক্ষেত্র আমাদের আশ্রম। একটা ছোটো দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। আহারের রুচি এবং অভ্যাস সম্বন্ধে বাংলা দেশে যেমন কদাচার এমন কোথাও নেই। পাকশালা এবং পাকযন্ত্রকে অত্যন্ত অনাবশ্যক আমরা ভারগ্রস্ত করে তুলেচি। এ সম্বন্ধে সংস্কার করা বড়ো কঠিন। স্বজাতির চিরন্তন হিতের প্রতি লক্ষ্য করে আমাদের ছাত্ররা ও শিক্ষকেরা পথ্য সম্বন্ধে নিজের রুচিকে যথোচিত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার পণ গ্রহণ করতে যদি পারত তাহলে আমি যাকে শিক্ষা বলি সেই শিক্ষা সার্থক হোত। তিন নয়ে সাতাশ হয় এইটে মুখস্থ করাকে আমরা শিক্ষা বলে গণ্য করে থাকি, সে সম্বন্ধে ছেলেরা কোনোমতেই ভুল না করে তার প্রতি লক্ষ্য না করাকে গুরুতর অপরাধ বলে জানি কিন্তু যে-জিনিষটাকে উদরস্থ করি সে সম্বন্ধে শিক্ষাকে তার চেয়ে কম দাম দেওয়াই মূর্খতা। আমাদের প্রতিদিনের খাওয়া সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত

দেশের কাছে দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব অতি গুরুতর— সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে এটাকে মনে রাখা পাসের মার্কার চেয়ে অনেক বড়ো।

আমি এদের জিজ্ঞাসা করলুম, "কেউ কোনো অপরাধ করলে এখানে তার বিধান কি?"

একটি মেয়ে বল্‌লে, "আমাদের কোনো শাসন নেই কেননা আমরা নিজেদের শাস্তি দিই।"

আমি বল্‌লুম, "আর একটু বিস্তারিত করে বলো। কেউ অপরাধ করলে তার বিচার করবার জন্যে তোমরা কি বিশেষ সভা ডাকো? নিজেদের মধ্যে থেকে কাউকে কি তোমরা বিচারক নির্ব্বাচন করো? শাস্তি দেবার বিধিই বা কি রকমের?"

একটি মেয়ে বল্‌লে— "বিচার সভা যাকে বলে তা নয়, আমরা বলা কওয়া করি। কাউকে অপরাধী করাই শাস্তি, তার চেয়ে শাস্তি আর নেই।"

একটি ছেলে বল্‌লে, "সেও দুঃখিত হয় আমরাও দুঃখিত হই, বাস্ চুকে যায়।"

আমি বল্‌লুম, "মনে করো কোনো ছেলে যদি ভাবে তার প্রতি অযথা দোষারোপ হচ্চে তা হলে তোমাদের উপরেও আর কারো কাছে কি সে ছেলের আপিল চলে?"

ছেলেটি বল্‌লে, "তখন আমরা ভোট নিই— অধিকাংশের মতে যদি স্থির হয় যে সে অপরাধ করেছে তাহলে তার উপরে আর কথা চলেনা।"

আমি বল্‌লুম, "কথা না চল্‌তে পারে কিন্তু তবু ছেলেটি যদি মনে করে অধিকাংশেই তার উপরে অন্যায় করচে তাহলে তার কোনো প্রতিবিধান আছে কি?"

একটি মেয়ে উঠে বল্‌লে, "তাহলে হয় তো আমরা শিক্ষকদের পরামর্শ নিতে যাই কিন্তু এ রকম ঘটনা কখনো ঘটে নি।"

আমি বল্‌লুম, "যে একটি সাধনার মধ্যে সকলে আছ সেইটেতেই

আপনা হতেই অপরাধ থেকে তোমাদের রক্ষা করে।"

ওদের কর্ত্তব্য কি প্রশ্ন করাতে বল্‌লে, "অন্য দেশের লোকেরা নিজের কাজের জন্য অর্থ চায় সম্মান চায় আমরা তার কিছুই চাইনে আমরা সাধারণের হিত চাই। আমরা গাঁয়ের লোকদের শিক্ষা দেবার জন্যে পাড়াগাঁয়ে যাই, কি করে পরিষ্কার হয়ে থাকতে হয়, সকল কাজ কি করে বুদ্ধিপূর্ব্বক করতে হয় এই সব তাদের বুঝিয়ে দিই। অনেক সময়ে আমরা তাদের মধ্যে গিয়েই বাস করি। নাটক অভিনয় করি, দেশের অবস্থার কথা বলি।"

তার পরে আমাকে দেখাতে চাইলে কাকে ওরা বলে সজীব সংবাদপত্র। একটি মেয়ে বল্‌লে, "দেশের সম্বন্ধে আমাদের অনেক খবর জানতে হয়, আমরা যা জানি তাই আবার অন্য সবাইকে জানানো আমাদের কর্ত্তব্য। কেননা ঠিকমতো করে তথ্যগুলিকে জানতে এবং তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারলে তবেই আমাদের কাজ খাঁটি হতে পারে।"

একটি ছেলে বল্‌লে, "প্রথমে আমরা বই থেকে, আমাদের শিক্ষকের কাছ থেকে শিখি, তার পরে তাই নিয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করি, তার পরে সেইগুলো সাধারণকে জানাবার জন্যে যাবার হুকুম হয়।"

সজীব সংবাদপত্র অভিনয় করে আমাকে দেখালে। বিষয়টা হচ্চে এদের পঞ্চবার্ষিক সংকল্প। ব্যাপারটা হচ্চে এরা কঠিন পণ করেচে পাঁচবছরের মধ্যে সমস্ত দেশকে এরা যন্ত্র-শক্তিতে সুদক্ষ করে তুলবে, বিদ্যুৎশক্তি বাষ্পশক্তিকে দেশের এক ধার থেকে আর এক ধার পর্য্যন্ত কাজে লাগিয়ে দেবে। এদের দেশ বলতে কেবল য়ুরোপীয় রাশিয়া বোঝায় না, এসিয়ার অনেকদূর পর্য্যন্ত তার বিস্তার। সেখানেও নিয়ে যাবে এদের শক্তির বাহনকে। ধনীকে ধনীতর করবার জন্যে নয়, জনসমষ্টিকে শক্তিসম্পন্ন করবার জন্যে— সেই জনসমষ্টির মধ্যে মধ্য এসিয়ার অসিতচর্ম্ম মানুষও আছে। তারাও শক্তির অধিকারী হবে বলে ভয় নেই ভাবনা নেই। এই কাজের জন্যে এদের প্রভূত টাকার দরকার— য়ুরোপীয় বড়োবাজারে এদের হুণ্ডি

চলে না— নগদ দামে কেনা ছাড়া উপায় নেই। তাই পেটের অন্ন দিয়ে এরা জিনিষ কিন্‌চে, উৎপন্ন শস্য, পশু মাংস, ডিম মাখন সমস্ত চালান হচ্চে বিদেশের হাটে। সমস্ত দেশের লোক উপবাসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েচে। এখনো দেড় বছর বাকী। অন্যদেশের মহাজনরা খুসি নয়। বিদেশী এঞ্জিনিয়াররা কলকারখানা অনেক নষ্টও করেচে। ব্যাপারটা বৃহৎ ও জটিল, সময় অত্যন্ত অল্প। সময় বাড়াতে সাহস হয় না, কেননা সমস্ত ধনী জগতের প্রতিকূলতার মুখে এরা দাঁড়িয়ে, যত শীঘ্র সম্ভব আপন শক্তিতে ধন উৎপাদন এদের পক্ষে নিতান্ত দরকার। তিন বছর কষ্টে কেটে গেছে, এখনো দু বছর বাকী।

সজীব খবরের কাগজটা অভিনয়ের মতো— নেচে গেয়ে পতাকা তুলে এরা জানিয়ে দিতে চায় দেশের অর্থশক্তিকে যন্ত্রবাহিনী করে ক্রমে ক্রমে কি পরিমাণে এরা সফলতা লাভ করচে। দেখাবার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। কেননা যারা জীবনযাত্রার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে বহুকষ্টে কাল কাটাচ্চে তাদের বোঝানো চাই অনতিকালের মধ্যে এই কষ্টের অবসান হবে এবং বদলে যা পাবে তার কথা স্মরণ করে যেন তারা আনন্দের সঙ্গে গৌরবের সঙ্গে কষ্টকে বরণ করে নেয়। এর মধ্যে সান্ত্বনার কথাটা এই যে, কোনো একদল লোক নয়, দেশের সকল লোকই একসঙ্গে তপস্যায় প্রবৃত্ত। এই সজীব সংবাদপত্র অন্য দেশের বিবরণও এইরকম করে প্রচার করে। মনে পড়ল পতিসরে দেহতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব নিয়ে এক যাত্রার পালা শুনেছিলুম— প্রণালীটা একই, লক্ষ্যটা আলাদা। মনে করচি দেশে ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে সুরুলে সজীব সংবাদপত্র চালাবার চেষ্টা করব।

(এই চিঠিগুলি যেন শান্তিনিকেতনের লোকে পড়তে পায়। তা ছাড়া প্রবাসীতে বের করারও প্রয়োজন আছে। প্রশান্ত' যদি ইচ্ছা করে এই চিঠিগুলি ইংরেজিতে তর্জ্জমা করে বিশ্বভারতীতে' চালাতে পারে।)*

ওদের দৈনিক কার্য্যপদ্ধতি হচ্চে এই রকম— সকাল সাতটার সময় ওরা বিছানা থেকে ওঠে। তার পরে পনেরো মিনিট ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ। ৮টার সময় ক্লাস বসে। একটার সময় কিছুক্ষণের জন্যে আহার ও বিশ্রাম। বেলা তিনটে পর্য্যন্ত ক্লাস চলে। শেখবার বিষয় হচ্চে, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রাথমিক প্রাকৃত বিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ণ, প্রাথমিক জীববিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য, হাতের কাজ, ছুতোরের কাজ, বই বাঁধাই, হাল আমলের চাষের যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার ইত্যাদি। রবিবার নেই প্রত্যেক পঞ্চম দিনে ছুটি। তিনটের পরে বিশেষ দিনের কার্য্যতালিকা অনুসারে পায়োনিয়ররা (পুরোযায়ী দল) কারখানা, হাঁসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়। পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করতে যাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। মাঝে মাঝে নিজেরা অভিনয় করে, মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখ্‌তে সিনেমা দেখ্‌তে যায়। সন্ধ্যাবেলায় গল্প পড়া, গল্প বলা, তর্ক সভা, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সভা। ছুটির দিনে পাওনিয়ররা কিছু পরিমাণে নিজেদের কাপড় কাচে, ঘর পরিষ্কার করে, বাড়ি এবং বাড়ির চারদিক পরিষ্কার করে, ক্লাসপাঠ্যের অতিরিক্ত পড়া পড়ে, বেড়াতে যায়। ভর্ত্তি হবার বয়স ৭।৮, বিদ্যালয় ত্যাগ করবার বয়স ষোলো। এদের অধ্যয়নকাল আমাদের দেশের মতো লম্বা লম্বা ছুটি দিয়ে ফাঁক করে দেওয়া নয়, সুতরাং অল্প দিনে অনেক বেশি পড়তে পারে।

এখানকার বিদ্যালয়ের মস্ত একটা গুণ, এরা যা পড়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকে। তাতে পড়ার বিষয় মনে চিত্রিত হয়ে ওঠে, ছবির হাত পেকে যায়— আর পড়ার সঙ্গে রূপ সৃষ্টি করার আনন্দ মিলিত হয়। হঠাৎ মনে হতে পারে এরা বুঝি কেবলি কাজের দিকে ঝোঁক দিয়েচে, গোঁয়ারের মতো ললিতকলাকে অবজ্ঞা করে। একেবারেই তা নয়। সম্রাটের আমলে তৈরি বড়ো বড়ো রঙ্গশালায় উচ্চ অঙ্গের নাটক ও অপেরার অভিনয়ে বিলম্বে টিকিট পাওয়াই শক্ত হয়। নাট্যাভিনয় কলায় এদের মতো ওস্তাদ

জগতে অল্পই আছে, পূর্ব্বতন কালে আমির ওম্‌রাওরাই সে সমস্ত ভোগ করে এসেচে— তখনকার দিনে যাদের পায়ে ছিল না জুতো, গায়ে ছিল ময়লা ছেঁড়া কাপড়, আহার ছিল আধপেটা, দেবতা মানুষ সবাইকেই যারা অহোরাত্র ভয় করে করে বেড়িয়েছে, পরিত্রাণের জন্যে পুরুৎপাণ্ডাকে দিয়েচে ঘুষ, আর মনিবের কাছে ধূলোয় মাথা লুটিয়ে আত্মাবমাননা করেচে তাদেরই ভিড়ে থিয়েটারে জায়গা পাওয়া যায় না। আমি যেদিন অভিনয় দেখ্‌তে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টল্‌স্টয়ের রিসারেক্‌শন্‌। জিনিষটা জনসাধারণের পক্ষে সহজে উপভোগ্য বলে মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শুনছিল। এংলো স্যাক্‌সন্‌ চাষী মজুর শ্রেণীর লোকে এ জিনিষ রাত্রি একটা পর্য্যন্ত এমন স্তব্ধ শান্তভাবে উপভোগ করচে এ কথা মনে করা যায় না, আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দাও। আর একটা উদাহরণ দিই। মস্কো সহরে আমার ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এ ছবিগুলো সৃষ্টিছাড়া সে কথা বলা বাহুল্য। শুধু যে বিদেশী তা নয়, বলা চলে যে তারা কোনো দেশীই নয়। কিন্তু লোকের ঠেলাঠেলি ভীড়। অল্প কয় দিনে পাঁচহাজার লোক ছবি দেখেচে। আর যে যা বলুক, অন্তত আমি তো এদের রুচির প্রশংসা না করে থাকতে পারব না। রুচির কথা ছেড়ে দাও, মনে করা যাক্‌ এ একটা ফাঁকা কৌতূহল। কিন্তু কৌতূহল থাকাটাই যে জাগ্রত চিত্তের পরিচয়। মনে আছে একদা আমাদের ইঁদারা থেকে [জল তোলার জন্যে] একটা বায়ুচলচক্র যন্ত্র এনেছিলুম, তাতে কূয়োর গভীর তলা থেকে জল উঠেছিল কিন্তু যখন দেখ্‌লুম ছেলেদের চিত্তের গভীর তলদেশ থেকে একটুও কৌতূহল টেনে তুল্‌তে পারলে না তখন মনে বড়োই ধিক্কার জেগেছিল। এই তো আমাদের ওখানে আছে বৈদ্যুৎ আলোর কারখানা, ক জন ছেলের তাতে একটুও ঔৎসুক্য আছে? অথচ এরা তো ভদ্র শ্রেণীর ছেলে। বুদ্ধির জড়তা যেখানে সেখানে কৌতূহল দুর্ব্বল।

এখানে ইস্কুলের ছেলেদের আঁকা অনেকগুলি ছবি আমরা পেয়েছি— দেখে বিস্মিত হতে হয়— সেগুলো রীতিমতো ছবি— কারো নকল নয়, নিজের উদ্ভাবন। এখানে নির্ম্মাণ এবং সৃষ্টি দুইয়ের প্রতি লক্ষ্য দেখে নিশ্চিন্ত হয়েচি। এখানে এসে অবধি স্বদেশের শিক্ষার কথা অনেক ভাবতে হয়েচে। আমার নিঃসহায় সামান্য শক্তি দিয়ে কিছু এর আহরণ এবং প্রয়োগ করতে চেষ্টা করব। কিন্তু আর সময় কই— আমার পক্ষে পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পও হয়তো পূরণ না হতে পারে। প্রায় তিরিশ বছর কাল যেমন একা একা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লগি ঠেলে কাটিয়েছি— আরো দু চার বছর তেমনি করেই ঠেলতে হবে— বিশেষ এগোবে না তাও জানি— তবু নালিশ করব না। আজ আর সময় নেই। আজ রাত্রের গাড়িতে জাহাজের ঘাটের অভিমুখে যেতে হবে, সমুদ্রে কাল পাড়ি দেব। ইতি ২ অক্টোবর ১৯৩০

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

আশা আর্যনায়কম্

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আশা, তোমরা দুজনে যদি আর একবার এখানে আসতে পারো তাহোলে খুব খুসি হব। যখন তোমরা এখান থেকে চলে গিয়েছিলে তখন আমি মনে স্থির করেছিলুম আর একদিন তোমাদের এখানেই ফিরে আসতে

হবে।[১] সেই দিনটি আজ যদি আসন্ন হয়ে থাকে তাহোলে অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করব। রথী তোমাকে শ্রীনিকেতনের কর্ম্মের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়েছে। ওখানকার শিক্ষাকেন্দ্রকে সম্পূর্ণভাবে গড়ে তোলবার কর্ত্তৃত্ব অনেকটা হাতে পাবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

২৩ মে ১৯৩৮

শ্রীআশা দেবী

ওয়ার্দ্ধা

[মংপু]

কল্যাণীয়াসু,

ঠিক আমার কাছে কী চাচ্চ বুঝতে পারলুম না— কী বিষয়, কী ভাষা, কোন্ উদ্দেশ্য, কাদের লক্ষ্য করে।[১]

লিখ্‌তে এখন কষ্ট পাই, একটুতেই শরীরকে মনকে ক্লান্ত করে। সবচেয়ে অসুবিধে হয়েচে চোখ নিয়ে। দৃষ্টি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এসেছে— সেই জন্যে নিতান্ত জরুরি না থাকলে লিখ্‌তে মন যায় না। ভাষার ধারাও এখন বাধাগ্রস্ত। যদি পূর্ব লিখিত কোনো একটা রচনা থেকে তোমাদের কাজ চলা সম্ভব হয় তা হলেই ভালো। পুরোনো ঝুলি সন্ধান করা এখান থেকে অসাধ্য। এমন একদিন ছিল যখন কারো প্রার্থনা অপূর্ণ রাখি নি— এখন আলো কমে এসেছে, এখন দ্বারী [? দ্বারে] প্রার্থী এলে নিঃশেষিত

সম্বল হাৎড়ে বেড়াতে হয় তাতে ফল পাই কম, কষ্ট পাই যথেষ্ট এবং লজ্জাও বোধ হয়। মনে রেখো তোমরা অসময়ে এসেছ সেজন্যে আমি দোষী নই— এখন আমার ভাগ্য হয়েছে কৃপণ।

কিছু দিনের জন্যে গিরিরাজের আশ্রয় নিয়েছি।[২] ছুটিটা এইখানেই কাটাব। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে তোমাদের আভাস পাই— মনে হচ্চে কাজ ভালোই চল্‌চে। ইতি ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

২১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬

শ্রীআশা দেবী

ওয়ার্ধা

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আশা, তোমাদের সংসারের আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদ এইমাত্র পেলুম।[১] এমন কোনো ভাষা নেই যা বাইরে থেকে এই দুঃখের সান্ত্বনা দিতে পারে। জানি তোমার নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে তাই হবে তোমার ধৈর্যের অবলম্বন। যে যায় সে তো সুখদুঃখের অতীত লোকে চলে যায়, যারা থাকে সে তাদের কিছু দিয়ে যায়। সে হচ্ছে বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে মহৎ দুঃখের অভিজ্ঞতা। তাতে করে আসক্তির বন্ধনকে শিথিল করে দেয়। সংসারে এই শিক্ষাকে আমরা কঠিন দুঃখ দিয়ে

কিনি— দুঃখের সেই দান তোমার জীবনে সার্থক হোক এই আশীর্ব্বাদ করি— আমাদের আর তো কিছুই বলবার নেই।

ইতি ৭।১২।৩৯

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভক্তি অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

১

১৯ ভাদ্র ১৩৩৭

ওঁ

বর্লিন

কল্যাণীয়াসু

ভক্তি, তুমি শান্তিনিকেতনে আমার কাজে এসে বসেচ শুনে কতো খুসি হয়েচি বল্‌তে পারি নে।[১] কত করবার আছে অথচ লোক কত কম, হৃদয় কত অসাড়। য়ুরোপে দেখ্‌তে পাই ডাক পড়লেই দলে দলে মানুষ এসে পৌঁছয়— কোনো কর্ম্মেই কোনো দিন কর্ম্মীর অভাব হয় না। আমাদের দেশে দূরে থেকে হাততালি দেয় অনেকে, কিন্তু হাতে হাত মেলাতে কেউ আসে না। এই জন্যেই কর্ম্মের ভার গুরুতর হয়ে ওঠে, মেরুদণ্ড ভেঙে পড়তে চায়। এই সময়ে তোমাদের মধ্যে থাকতে পারলে খুব খুসি হতুম কিন্তু আমার তো ছুটি নেই। ওখানকার কাজেই সমুদ্রের এক পার থেকে আর এক পারে আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। এবারে মনে সঙ্কল্প করে এসেচি মেয়ে-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে কিছু সম্বল করে নিয়ে যাব। ভারতবর্ষে যে শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষাব্যবস্থা আছে তার পঙ্গুতা আমরা সবাই জানি। কিন্তু উপায় নেই। পেটের দায়ে ছেলেরা এই ব্যর্থতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য— কিন্তু জীবিকার জন্যে শিক্ষা মেয়েদের তেমন অপরিহার্য্য হয় নি এইজন্যে বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে বিদ্যাদানের উৎকৃষ্ট প্রণালী মেয়েদের জন্যেই প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর; যদি করে তুলতে

পারি তবে এবারকার মতো এইটেই আমার শেষ সার্থকতা হবে। ভাব গতিক দেখে আশা হচ্চে হয় তো ব্যর্থ হতে হবে না।

ভানুসিংহের পত্রাবলী[২] সেদিন আমার হাতে এসে পৌঁচেছে। পড়তে পড়তে শান্তিনিকেতন আমার চারিদিকে মূর্ত্তিমান হয়ে উঠ্ল। ভুলে গেলুম যে আছি পশ্চিম সমুদ্রের পারে। আমার কোনো লেখাতেই শান্তিনিকেতনের রূপ এমন রসপূর্ণ হয়ে জাগেনি। নিজের কীর্ত্তি নিয়ে অহঙ্কার করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে তবু সত্যের খাতিরে বল্তেই হচ্চে এই চিঠিগুলির পরিধি দুই ডাকঘরের দুই কিনারার মধ্যেই পরিসমাপ্ত নয়— আর, কালের যে সীমানা আমার আকস্মিক সাতাশ বছর বয়সের মধ্যেই কিছু দিনের জন্যে আবদ্ধ ছিল পত্রাবলী তাকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। রাণুকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলুম বঙ্গবাণীর নিত্য ঠিকানায় সেগুলি পৌঁচেছে।

আশাদিদিকে আমার আশীর্ব্বাদ। হয় তো পৌঁছব পিঠেপার্ব্বণের মাসে, সেদিনের জন্যে মন উৎসুক হয়ে আছে। ইতি ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

১৬ আশ্বিন ১৩৩৭

ওঁ

Williamstown
Massachusetts

কল্যাণীয়া

ভক্তি, তুমি এসেচ আমাদের আশ্রমে, ভারি খুসি হয়েচি। এই সময়ে আমি আছি বহুদূরে, একটুও ভালো লাগচে না। বর্ষার সমারোহ বনে বনে আকাশে আকাশে জমেছিল, কদম্ববন নতুন করে প্রফুল্ল হোলো। কিন্তু আমি নতুন গানের ডালি নিয়ে দাঁড়ালুম না। শারদোৎসবের সময় হয়েছে— শিউলিতলায় সৌন্দর্য্যের সদাব্রত, আকাশে শুভ্রমেঘের আলস্যমন্থরতা, বাতাসে হিমের আভাস, তালবনের শিখরে শিখরে আলোকের পরশপাথর ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেচে। আমি শারদার কাছে সঙ্গীতের বায়না নিয়ে বসে আছি অথচ আসরে পৌঁছতে পারলুম না। আমার এক বছরের পার্ব্বণী সব বাদ পড়ে গেল। যদি হত পরের চাকরী, তাহলে চাকরী আটলাণ্টিকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যেতেম, কিন্তু নিজের কাজে ছুটি মেলেনা— কড়া মনিব ভিতরে বসে আছে, তার চোখ এড়াব সাধ্য কি। তবুও দিনের পরে দিন যায়— এগিয়ে আসে খালাসের দিন— অবশেষে একদা রাঙা রাস্তার উপর দিয়ে পৌঁছব শালবনের ছায়া-বীথিকায়। হতভাগা ভিক্ষুকের পথ ক্রমেই যেরকম লম্বা হয়ে চলেচে তাতে বোধ হচ্চে মাঘ মাসের আগে দেশে পৌঁছতে পারব না।[১] অর্থাৎ এখনো প্রায় আড়াই মাস আছে। প্রবাসের পঞ্জিকায় আড়াই মাসের ছন্দটা মন্দাক্রান্তা, হতাশ বিরহীর ছন্দ। এখন শান্তিনিকেতনের ছুটির দিন, তোমরা কোথায় আছ কে জানে। জনশ্রুতি, তোমার বাবা চলেচেন চীনের মুলুকে। টিঁকতে পারবেন কী করে বুঝতে পারচিনে। এই

কি চীনদেশে পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব আলোচনার সময়? আমাদের শাস্ত্রের সঙ্গে সেখানকার নামগুলোর অনুস্বার ছাড়া আর কিছু মিলবে না, যথা সিং, চুং, চ্যাং ইত্যাদি। ১৩ অক্টোবর ১৯৩০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট ১

রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)-র পত্র

রবীন্দ্রনাথকে

১
[জুলাই ১৯১৭][১]

[কাশী]

প্রিয় রবিবাবু

আমি আপনার গল্পগুচ্ছের সব গল্পগুলো পড়েছি, আর বুঝতে পেরেছি কেবল ক্ষুধিত পাষাণটা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা সেই বুড়োটা যে ইরাণী বাঁদীর কথা বলছিল, সেই বাঁদীর গল্পটা বললনা কেন? শুনতে ভারী ইচ্ছে করে। আপনি লিখে দেবেন। হ্যা?

আচ্ছা জয়পরাজয় গল্পটার শেষে শেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হল। না? কিন্তু আমার দিদিরা বলে শেখর মরে গেল। আপনি লিখে দেবেন যে, শেখর বেঁচে গেল আর রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হল। কেমন? সত্যিই যদি শেখর মরে গিয়ে থাকে, তবে আমার বড় দুঃখ হবে। আমার সব গল্পগুলোর মধ্যে মাষ্টারমশায়[২] গল্পটা ভাল লাগে। আমি আপনার গোরা, নৌকাডুবি, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, রাজর্ষি, বৌ ঠাকরুণ-এর হাট, গল্প সপ্তক সব পড়েছি। কোন কোন জায়গায় বুঝতে পারিনি কিন্তু খুব ভাল লাগে। আপনার কথা ও ছুটির পড়া থেকে আমি আর আমার ছোটবোন কবিতা মুখস্ত করি। চতুরঙ্গ ফাল্গুনি ও শান্তিনিকেতন সুরু করেছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না। ডাকঘর, অচলায়তন, রাজা, শারোদোৎসব এসবো পড়েছি। আমার আপনাকে দেখতে খু উ উ উ উ উ উব ইচ্ছে করে। একবার নিশ্চয় আমাদের বাড়িতে আসবেন কিন্তু। নিশ্চয় আসবেন কিন্তু। না এলে আপনার সঙ্গে আড়ি। আপনি যদি আসেন তবে আপনাকে আমাদের শোবার ঘরে শুতে দেব।

আমাদের পুতুলও দেখাব। ও পিঠএ আমাদের ঠিকানা লিখে দিয়েচি।
[? শ্রাবণ ১৩২৪]

রাণু।

235 Agast-kund
Benares city.

আমার চিঠির উত্তর শিগ্গির দেবেন।
নিশ্চয়।

২
[অগাস্ট ১৯১৭]

প্রিয় রবিবাবু

আপনি এতদিন আমাকে চিঠি দেননি বলে খুব রাগ হয়েছিল কিন্তু আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি।[১] আমার ভাল নাম কি জানেন? প্রীতি। বেশ সুন্দর নাম না। ইস্কুলে সবাই আমাকে প্রীতি বলে ডাকে। কিন্তু আপনি আমাকে রাণু রাণু বলেই ডাকবেন। আপনার ও নামটা সুন্দর লাগে কিনা তাই বলচি। আমার আরো নাম আছে শুনবেন। রাণী রাজা বাবা। সব নাম গুলোই বেশ না? আপনি যে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম[২] বলে একটা সুন্দর লেকচার দিয়েছিলেন না, সেটা ভারতী আর প্রবাসী তে বেরিয়ে ছিল। মা বাবজা বাবু আশারা সেটা পড়ে বল্লেন যে খুব সুন্দর হয়েছে। আমিও তাই পড়তে গেলাম কিন্তু কিচ্ছুই বুঝতে পারলাম না। বোধহয় সেটা খুব শক্ত। কিছুদিন আগে আমার খুব অসুখ করেছিল। এখন ভাল আছি। আপনি নিশ্চয় একদিন আমাদের বাড়ী আসবেন আমরা

এ বাড়ী ছেড়ে যাবনা। এ বাড়ী আমাদের নিজের বাড়ী। ভাড়ার বাড়ী নয়। আপনি আসবার সময় আমাদের জানাবেন। আমি ইস্কুলের ছুটি নিয়ে আপনাকে ইষ্টিসানে আনতে যাব। এ চিঠির উত্তর শিগ্গির দেবেন যেন, হারিয়ে ফেলবেন না যেন। আমি কেমন সুন্দর ফুল আঁকা কাগজে চিঠি লিখচি। [ভাদ্র ১৩২৪]

রাণু।

আমাদের বাড়ীর ঠিকানা আবার লিখে দিচ্ছি।
235 Agast Kundo
Benaras City
আপনি আর গল্প লেখেন না কেন।

৩
[সেপ্টেম্বর ১৯১৭]

প্রিয় রবিবাবু

এবার আপনি ও বারের চাইতে শীঘ্র চিঠি দিয়েছেন।[১] খবরের কাগজের অনেক জায়গায় আপনার নাম থাকে, সেখানে আপনার নামের আগে স্যর লেখা থাকে। আবার কোন ২ জায়গায় কবি সম্রাটও লেখা থাকে। আপনি খুব ভাল কবিতা লিখতে পারেন কিনা, তাই। আপনাকে রোজ অনেক লোককে চিঠি লিখতে হয় বুঝি? কজন লোককে? ছি ২ আপনি কুঁড়ে। আমি কিন্তু কুঁড়ে নই। আমরা যদি আপনার বাড়ির কাছে থাকতাম ত বেশ হত। আমি রোজ আপনার কাছে গিয়ে গল্প শুনতাম। আমিও আপনাকে বলতাম। আপনাকে দেখে আমার একটু ভয় করবে না। আপনি ত খুব সুন্দর দেখতে। আপনি বুঝি ভাবেন আমি আপনার ফটো দেখিনি। তাতে ত আপনাকে খুব সুন্দর লাগে। আমাদের শোবার ঘরের মাঝখানে

আপনার একটা সুন্দর ফোটো আছে। মা আর একটা মাসিক পত্রতে আপনার একটা সুন্দর ফোটো পেয়েছিলেন সেটাও বাঁধিয়ে রেখেচেন। আপনি যদি নারদমুনির মত ঝগড়াটে হন তবে নিশ্চয় আপনি নারদমুনির মত গানও গাইতে পারেন, বীনাও বাজাতে পারেন। আপনার যখন সুবিধে হয়, তখন আমাদের বাড়িতে আসবেন। আসবেন কিন্তু। প্রত্যেক বারেই ত আপনি লেখেন আসব, কিন্তু আসেন না। আমি এবার কেমন বাসন্তি রঙের কাগজে চিঠি লিখ্‌চি। খামটাও বাসন্তি। মিসেস্ বেসেন্টএর ফর্স্ট অক্টোবারে জন্মদিন কিনা, তাই ওঁর গার্লস্-স্কুলের মেয়েরা লক্ষ্মীর পরিক্ষা অভিনয় করবে। আমার মা শেখাচ্ছেন। আশা ক্ষীরো, শান্তি রাণী কল্যাণী। জন্মাষ্টমীর দিন ওঁর ইস্কুলে বোর্ডিং হাউসের মেয়েরা তিনটী ছোট ২ ড্রামা করিয়াছিল। আমি দেখতে পাইনি। আমার খুব অসুখ করেছিল। আজকে সারাদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে। বিকেলে এত বৃষ্টি হয়েছিল যে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমি আর ভক্তি ওদের অভিনয় দেখতে যাব। আমরা যে অন্য স্কুলে পড়ি। আমাদের ইস্কুলের নাম C. H. C. Girls school.[১] এবার আর বারের মত একটা মস্ত বড় চিঠি লিখবেন। ঠিকানা আর লিখে দেবনা। ভুলে যাবেন না। এবার তবে শুতে যাচ্চি। [ভাদ্র ১৩২৪]

রাণু॥

মেয়েটার নাম মিনা
একহাথে হাঁসকে খাওয়াচ্ছে

আরএকটা হাত একটা
জিনিষে রেখেছে।

ছবিটা কেমন সুন্দর। আমি এঁকেচি।

আচ্ছা, কৃপা করে ঠিকানা লিখে দিচ্চি। যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তবে আর লিখতে পারবেন না।

235 Agust kund.
Benares city.

৪

[১৫ অক্টোবর ১৯১৭]

প্রিয় রবিবাবু,

আমি এতদিন চিঠি দিইনি বলে রাগ করবেন না। আমার খুব অসুখ করেছিল কিন্তু এখন ভাল আছি। লক্ষীটী রাগ করবেন না। আজকে থেকে আমাদের পূজোর ছুটী সুরু হয়েছে। 31st Octoberএ খুলবে। আচ্ছা আপনার চিঠি লেখা ছাড়া আর কি কাজ। আর কোই গল্পও লেখেন না। ইস্কুলেও যাননা আমার আপনার চাইতে ঢের বেশী কাজ। সকালে নটা পর্য্যন্ত মাষ্টারমশায়ের কাছে পড়ি তারপর চারটে পর্য্যন্ত ইস্কুলে থাকি। ইস্কুল থেকে এসে পণ্ডিতজীর কাছে হিন্দী পড়ি। আর রাত্রে লেখা, টাস্ক করি। আপনাকে দেখে বিশ্রী বলবনা। ছবিতে তো আপনাকে সুন্দর করে আঁকে। আপনি নিশ্চয় ছবির চেয়ে বেশী সুন্দর। আমার বেশ একটী সুন্দর বন্ধু। না। আপনার বোধহয় কোন সুন্দর বন্ধু নেই। আপনাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগবে। আপনাকে এসে কিন্তু আমাদের বাড়ীতে থাকতে হবে। আর কোথাও থাকতে পাবেন না। আচ্ছা আপনি পদ্মার উপর নদীতে নৌকায় থাকতেন না নদীর ধারে বাড়ীতে থাকতেন। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে করে। আজকে যে সোমবার[১] তার আগের সোমবারে এখানে মিসেস্ এনি বেসেন্ট[২] এসেছিলেন। তিনি থিওসফিকল্ গার্লস্ স্কুলের যে নতুন বাড়ী তৈরী [য] হচ্চে তার দরজা খুললেন। ভক্তি আগেই ইস্কুলে চলে গিয়েছিল। শান্তি, আশা আগেই ওদের নতুন ইস্কুলে গিয়েছিল। আমার আর মার অসুখ করেছিল। কিন্তু তবুও আমরা দুজনে গেলাম। মিসেস্ এনি বেসেন্টএর সঙ্গে মিষ্টর্ ওয়াড়িয়া[*] আর মিষ্টর আরেন্ডেল[*]ও ছিলেন। অনেক ছেলে স্কাউট্ হয়েছিল। তারা সব হাতে প্রকাণ্ড ২ লাঠী নিয়েছিল। মিসেস্ বেসেন্ট বক্তৃতা দিলেন। আর কেমন মেয়েদের হাত তুলে আশীর্ব্বাদ

করলেন। ছি, ছি, আপনি হাঁস আঁকতে যানেন্ না। আমি কেমন আঁকতে পারি। এবার একটা গল্প লিখ্‌বেন। আপনার গল্প পড়তে বেশ লাগে॥ ফিরে বারের চিঠিতে লিখবেন কিন্তু কবে আসবেন। আচ্ছা, আপনার হাঁসগুলোর সঙ্গে কি করে বন্ধুত্ব হল। তারা আপনাকে দেখে পালিয়ে যেতনা। তারা নিশ্চয় আমার হাঁসটার চেয়ে সুন্দর ছিলনা। তাদের মধ্যে সকলেই কি শাদা ধব্‌ধবে ছিল। এবারে ছবি আঁকলাম না। আর বারে এঁকে দেব। [২৯ আশ্বিন ১৩২৪]

রাণু।

কেমন মজা আপনার নামো র দিয়ে সুরু আমারও নাম র দিয়ে সুরু।

৫

[অক্টোবর ১৯১৭]

প্রিয় রবিবাবু,

আপনি এবার বেশ বড় চিঠি দিয়েছেন।[১] আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। আপনার ভয় নেই আমি আপনার সঙ্গে আড়ি করবনা। কিন্তু আপনাকে আমার সব চিঠির উত্তর দিতেই হবে। আমারও আপনার ঠিকানা পষ্ট মনে আছে। আপনি কখন হাঁসের বাচ্চা দেখেছেন। তাদের কোলে করেছেন। আপনি আমাকে আপনার একটা সুন্দর ফোটো দেবেন। সেটা যেন খুব ছোট্টো আর বাঁধান হয়। বাধানটাও যেন খুব চকচকে হয়। আপনি যখন আমাদের বাড়ী আসবেন, তখন আমার ফোটো দেখাব একটা আমাদের চার বোনের। আমি আর ভক্তি একটা চেয়ারে বসে। আর আশা শান্তি

চেয়ারের পেছনে দাড়িয়ে আছে আর একটা ফোটো বাব্‌জা আর আমরা। বাব্‌জা একটা চেয়ারে বসে। ভক্তি বাব্‌জার কোলে বসে। আমি আর শান্তি দুজনে দুপাশে। আশা চেয়ারের পেছনে। আমার একটা একলা ফোটো আছে। আপনি এলে সেইটেও দেখাব। যিনি তুলেছিলেন তিনি বল্লেন আমার দিকে তাকাও। আমার ভারী রাগ হল। তাই সেই ফোটোটাতে বোধ হচ্চে যেন আমি রেগে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি যে লিখেচেন আপনার সময় কম তো কি কাজ? এবারে লিখবেন যে কি কাজ।[২] আপনি আমাকে ছোট চিঠি লিখতে পাবেন না। এখানে পণ্ডিতজী[৩] এসেছিলেন। উনি কাশীতে এসে পর্য্যন্ত রোজ আমাদের বাড়ীতে আসতেন। কেবল চতুর্থীর দিন উপোষ করেছিলেন বলে আসেননি। আর একদিন ওঁর গঙ্গা নেয়ে অসুখ করেছিল তাই আসেননি। উনি আপনার প্রায় সব গানই জানেন। পণ্ডিতজী আপনাকে গুরুদেব বলেন। আপনার অনেক গল্পও করেন। উনি বলছিলেন, আপনাকে উনি পৃথিবীর মধ্যে বেশী ভাল বাসেন। উনি বেশ সুন্দর গান করিতে পারেন। আমি 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে' এই গানটা শিখেছি। এই গানটা আমার সব চাইতে বেশী ভাল লাগে। উনি কিন্তু কিছুতেই জল খাবার খেতে চাইতেন না। আমরা ধরেবেঁধে খাওয়াতাম। পণ্ডিতজী এখন বোধহয় বোলপুরে। তাঁকে আমার নমস্কার দেবেন। আচ্ছা, আপনি আমাকে বেশী ভালবাসেন, না পণ্ডিতজীকে? যদি পণ্ডিতজীকে বেশী তবে আপনার সঙ্গে আড়ি। আচ্ছা আপনার নাইতে ভাল লাগে। আমার ভারী খারাপ লাগে। কিন্তু মা জোর করে নাইয়ে দিলেন। আপনি এখানে আসেননা কেন? শিগ্গির ২ আসবেন। আপনি ইচ্ছে করে দেরী করে আসেন। এবার আমি কি সুন্দর ছবি এঁকেছি। আপনাকেও আঁকতে হবে। আমি কি সুন্দর কাগজে প্রকাণ্ড চিঠি লিখেচি। আমার আপনার গান শুনতে খুব ইচ্ছে করে। আসবার সময় বলবেন। [কার্তিক ১৩২৪]

রাণু।

৬

[ডিসেম্বর ১৯১৭]

প্রিয় রবিবাবু,

অনেকদিন হোলো আপনার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু দুটো কারনের জন্য উত্তর দেওয়া হইনি। প্রথম তো আপনি যেমন দেরী করে দিয়েছিলেন আমিও তেমনি দিচ্চি। দ্বিতিয় তোঁ আমার Half yearly এগজামিন হচ্চিল। এখন এগজামিন শেষ হয়ে গেছে। আমাদের বড় দিনের ছুটি হয়েছে। আমার ছুটি ভাল লাগেনা। আপনি তো আগের চিঠি কেবল লিষ্টেই ভরে দিয়েছিলেন।[১] প্রায় বলতে গেলে কোন কথাই লেখেন নি। আবার একটা কথা যেমন জানলায় বসে থাকা তিন চার বার করে কেন লিখেছেন। একবারেই তো অনেকক্ষণ বসে থাকেন না একবার ওঠেন আর একবার বসেন। এবারে নিশ্চয় খুব বড় চিঠি লিখবেন। আপনি লিখেছেন আমার সময় হয়না। কিন্তু আপনার ছিন্নপত্রয় তো সব বড় ২ চিঠি। আমাকে চিঠি দিতেই যেন সময় থাকেনা। তখন কি করে সময় পেতেন? আপনার বইটার নাম ছিন্নপত্র কেন? সে চিঠিগুলো কি সব ছেঁড়া? এবার আমার জন্মদিনে মা সাতটী গল্প[২] উপহার দিয়েছেন। হৈমন্তি আর শেষের রাত্রির শেষটা বড় দুঃখের। বানোয়ারীলাল নামটা ভারী বিচ্ছিরি। আপনি কোথায় এই রকম নামটা পেলেন। বোষ্টমীটা বাব্‌জা বড় ভাল বলেন। কিন্তু আমি বুঝিতে পারিনা। আমার গল্পগুচ্ছটা একজন লোক নিয়ে গেছে। আর ফিরিয়ে দিচ্চেন না। আর আটটী গল্পও দিয়েছিলাম তাও দিচ্চেন না। এবার কিছু করে তাঁর কাছ থেকে সেগুলো পেতে হবে। আপনি কবে আসবেন। এখন কি আপনার খুব কাজ। কই আপনি তো ছবি আঁকেন নি। অনুসুয়া আশাকে লিখেছে যে আপনি খুব লম্বা আর সুন্দর। আমার লম্বা লোক বেশ ভাল লাগে। অনুসূয়া আশার একজন মরাঠী বন্ধু। আমি জানি আপনি

খুব সুন্দর গান করতে পারেন। যখন আসবেন তখন আপনাকে অনেক গান করতে হবে। শিগ্গির আসবেন কিন্তু। আমরা শুক্রবারে নৌকা করে গঙ্গার ওপারে গিয়েছিলাম। সেখানে বালির চড়া আছে। সেইটে প্রথমে পার করতে হয়। আর তার পেছনে কত ক্ষেত্ পেয়ারাগাছ বাগান আকের গাছ।। আর দুটা কুঁওয় আছে।

আমরা বালির চড়া পার করবার সময় হয়েছিলাম বেদুয়িন। আর ছাতা গুলো হয়েছিল বর্শা। আর ক্ষেত গুলো হয়েছিল ওয়েসিস্। আমরা একটা কুঁওর কাছে বসে খেজুর খেলুম। ঠিক মরুভূমীর মত হয়েছিল, না? আমরা একটা কৃষকের কাছে আক্ কিনলাম। সে আমাদের নিজের বাড়ী নেমতন্ন করছিল। আর বলছিল গরুর দুধ আর নতুন আকের গুড় তৈরী করে খেতে দেবে। আমরা বললাম আর একদিন আসব। আমরা সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এলাম। আপনি যখন আসবেন তখন আপনাকেও নিয়ে যাব। কিন্তু আপনি আসেন কই। [পৌষ ১৩২৪]

রাণু।।

আপনাকে লিখেছিলাম কোলকাতার ঠিকানা লিখতে তা লেখা হল না। আপনি ভারী দুষ্টু।

[ফেব্রুয়ারি ১৯১৮]

প্রিয় রবিবাবু,

আপনি এতদিন চিঠি দেন্নি বলে রাগ হয়েছিল। কিন্তু খবরের কাগজে রয়েছে যে আপনি নাকি যে মোটরটাতে যাচ্ছিলেন, সেটা ভেঙে

গেছে।[১] আপনার লাগেনিত? তাই আপনাকে কৃপা করে চিঠি দিচ্চি। কেমন আছেন শিগ্গির লিখে পাঠাবেন। নিশ্চয়। তা নাহলে আড়ি॥ যদি ছবি আঁকতে কষ্ট হয় তো না হয় আঁকবেন না॥ [ফাল্গুন ১৩২৪]

রাণু

আপনি কল্‌কাতায় তো প্রায়ই থাকেন কিন্তু ওখানকার ঠিকানা কেন দেননা? আপনি ভারী দুষ্টু॥

৮

[? ফেব্রুয়ারি ১৯১৮]

প্রিয় রবিবাবু,

আমি আপনাকে দুখানা চিঠি লিখেছি। কিন্তু আপনি একখানারও উত্তর দিলেন না। আমি কখনই এবার দিতাম না। কিন্তু আপনার অসুখ হয়েছে বলে কৃপা করে দিচ্চি। আপনি নিশ্চয় আমাকে ভালবাসেন না তাই চিঠি দেন না। যদি এবারও চিঠি না দেন তো আপনার সঙ্গে আড়ি। আপনি তো চিঠি, চিঠি অনেক লিখেছিলেন কিন্তু আমাকে তো একখানাও লেখেন না। আচ্ছা আপনার কি অসুখ করেছে? একখানা চিঠি লিখতেও কি পারেন না? আপনার অসুখএর সময় কি খুব কষ্ট হয়? আমি আপনার কাছে থাকলে গল্প বলে ভুলিয়ে রাখতাম।[১] আপনি কোথায় আছেন? এবার আমায় নিশ্চয় চিঠি দেবেন। হ্যাঁ। [? ফাল্গুন ১৩২৪]

রাণু॥

[২৮ মার্চ ১৯১৮]

প্রিয় রবিবাবু,

অনেক দিন হল আপনার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু একটা কারণে উত্তর দিইনি। এতদিন আমার এগজামিন হচ্ছিল। সেটা স্কুলের yearly এগজামিন। আজ থেকে হোলির ছুটি সুরু হয়েছে।[১] তাই আজ উত্তর দিচ্ছি। দু সপ্তাহ পরে Goverment এর একটা এগজামিন দেব। বেশ মজা। আপনি বড় অসাবধান আমার চিঠি হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু আমি এতদিন জবাব দিইনি। কিন্তু চিঠিটা ত হারায়নি। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন যে আমার এগজামিন। তবুও আর একটা চিঠি দিতে পারলেন না। আমি বরং একবার দুটো পরে ২ দিয়েছিলাম। আপনার অসুখ করেছে, আজকাল তো আর কুড়ি ঘন্টা ধরে ছাতে কিম্বা জানলায় বসতে পাননা আর কেউ কাজ করতেও বলে না, তবে ইচ্ছে করলেই লিখতে পারেন। এবার আপনাকে প্রকাণ্ড অ অ অ অ অ অ একটা চিঠি লিখতে হবে।। আপনাকে আমাদের এই এগজামিন শেষ হলে নিশ্চয় আসতে হবে। আপনি চান যে কিছু করে যাতে না আসতে পারি। কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে। আশার এগজামিন একুশ তারিখে শেষ হল। ভক্তির এগজামিন হোলির পরই সুরু হবে। আমি আজ একটা নতুন খেলা বার করেছি। আজ সকালে ওতে আমাতে সেইটে খেলেছি। সে খেলাটা খুব শক্ত। আপনি আশাদের ইস্কুলে 'গঙ্গা'র নামে একটা ফোটো পাঠাতে পারলেন আর আমাকে একটা দিতে পারলেন না। আপনি তো বড় দুষ্টু। আপনাকে আমাকে একটা খুব সুন্দর ফোটো দিতে হবে। সেটার যেন একটা সুন্দর ফ্রেম থাকে। আপনি গান গাইতে পারেন? আমাদের বাড়ী এসে আপনাকে অনেক গান গাইতে হবে। আপনি সবুজ পত্রয় তোতাকাহিনী[২] বলে যে

গল্পটা লিখেছেন, সেটার শেষটা বড় দুঃখের। শেষ্টা দুঃখের করলেন কেন। পাখীটা একমাস দুমাস কাগজ খেয়ে বেঁচেছিল কি করে। আপনি এবার একটা সুখের গল্প লিখবেন। [১৪ চৈত্র ১৩২৪]

রাণু॥

আজ হোলি কিনা, তাই আপনাকে একটু ফাগ পাঠাচ্চি। আপনি মুখে মাখবেন। আপনি সুন্দর কিনা তাই আপনাকে বেশ সুন্দর দেখাবে॥

১০

[এপ্রিল ১৯১৮]

প্রিয় রবিবাবু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হয়েছি।[১] আপনার কি হয়েছে। হটাৎ অস্টেলিয়াতেই বা যাচ্চেন কেন? আপনি নিশ্চয় ওখানের লোকদের বেশী ভাল বাসেন। কেননা তারা যেই ডাকল অমনি সেখানে গেলেন। আমি যে ডাক্‌চি তা আসাই হয়না। আপনি ভারী অকৃতঘ্ন। আবার লেখা হয়েছে যে রান্না শিখে নাও তারপর আসব। রান্নার দোহাই দেওয়া হয়েছে। আমাদের সব এগজামিন শেষ হয়ে গেছে। আজকাল কোনও পড়া নেই। আপনি এলে যে রান্না পারি করে দিতে পারি। আমরা বোধহয় শীঘ্রই কোথাও বাব্‌জার হাওয়া বদলের জন্য যাব। চার জায়গা ঠীক হয়েছে তার মধ্যে একটী যায়গায় যাওয়া হইবে। ডেরাডুন, ভীমতাল গিরিডি কিম্বা চুনার বেশ মজা লাগছে। আপনি বোধহয় পনের শোলো দিনের মধ্যেই রওনা হবেন। শান্তি দু তিন দিন হল সীড়ি থেকে পড়ে গিয়েছে তাই ওর পায়ে খুব ব্যাথা হয়েছে। এখনও সোজা হয়ে শুতে পারেনা। এখানে আশাদের

ইস্কুলে National weekএ তিনটে থিয়েটার হয়েছিল। থিয়েটার গুলির মধ্যে একটী ছিল বাঙলা। সেটা আপনারই লেখা। তার নাম হচ্চে প্রকৃতির প্রতিশোধ। আর একটী ছিল হিন্দী। হিন্দীটীর নাম হরিশ্চন্দ্র। হিন্দী থিয়েটারএর দিনও আমরা গিয়েছিলাম। আর একদিন একটী মরাঠী প্লে হয়েছিল। এদিন আমরা যাইনি। এই National weekএ নানা রকমের অনেক জিনিষ বিক্রি করা হয়েছিল। আপনি চিঠি আমাদের বাড়ীর ঠিকানাতেই দেবেন। আমরা এমনতর বন্দোবস্ত কর্‌ব যাহাতে সব চিঠি আমাদের যেখানে যাওয়া হবে তার ঠিকানায় আসবে। [বৈশাখ ১৩২৫]

রাণু॥

১১

[মে ১৯১৮]

প্রিয় রবিবাবু,

মা বাবজা কোল্‌কাতায় গিয়েছিলেন, কিন্তু পরশু ফিঁরে এসেছেন। আমরাও রবিবার[১] কল্‌কাতায় যাব। আর সোম্‌বারে সেখানে পৌঁছাব। বেশ মজা। আপনাকে কিন্তু কল্‌কাতায় কিছু দিন থাক্‌তে হবে। আপনার বেশ হয়েছে। যেমন আমার সঙ্গে না দেখা করে যাচ্ছিলেন তেমনি যাওয়া হল না। আপনি মঙ্গলবার দিন[২] সন্ধ্যাবেলা নিশ্চয় আমাদের বাড়ী আস্‌বেন। নয়ত জন্মের মতন আড়ি। আমাদের বাড়ীর ঠিকানাও লিখে দেব। আপনি হেরে গেলেন ছি, ছি। কেননা আপনি এলেন্‌ না। আমি কেমন আগে

যাচ্ছি। আমার আপনাকে দেখতে বেশ লাগ্‌বে। সে চিঠিটার জবাব দেন্‌নি কেন? আপনাকে আমায় গান শোনাতেই হবে। [বৈশাখ ১৩২৫] রাণু।
ঠিকানা,

35 Lansdown road.
Vabanipur.

১২

[মে ১৯১৮]

[কলকাতা]

প্রিয় রবিবাবু,

আপনি কেন আমাকে আগে চিঠি দেন্‌নি। আপনার নিশ্চয় আমাকে চিঠি লিখ্‌তে ভাল লাগে না। অন্য সবাইকে তো বেশ্‌ লেখা হয়। আমরা 4th Juneএ বিকেল বেলা বোলপুরে এসে পৌঁছুব। কোল্‌কাতা ভারী গরম হয়েছে। বোলপুরে বোধ হয় ঠাণ্ডা। আপনার সেখানে নিশ্চয় ভাল লাগে। আমরা যেদিন যাব আপনি সেদিন সেজে থাক্‌বেন্‌। আপনি পাহাড়ে যাননি বেশ মজা হয়েছে।[১] আর ভক্তির বন্ধু হেরে গেছে। কেন জানেন? সে প্রায় আসেই না। এবারে কেমন ছোট্ট চিঠি লিখেছি। [জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫]

রাণু।

১৩
[জুলাই ১৯১৮]

[শান্তিনিকেতন]

প্রিয় রবিবাবু

আজ কি আপনি গান্ধারীর [য] আবেদন পাঠ করবেন? কোথায় পাঠ করবেন? আপনি জগৎবিখ্যাত কবিতাটী শোনালে আমি খুসী হব। আপনি প্রস্তুত হয়ে থাক্‌বেন্। আমিও অভিসারটী বল্‌ব। শান্তিও বল্‌বে।[১] বল্‌বেন্।
[আষাঢ় ১৩২৫]

রাণু।

রবিবাবু সেজে[২] বল্‌বেন। যাতে ভাল দেখায়।

রাণু।

১৪
[১০-১১ জুলাই ১৯১৮]

[বোলপুর থেকে কাশীর পথে ট্রেনে][১]

প্রিয় রবিবাবু,

এখন গাড়ী চল্‌ছে। আমি খুব কাঁদছি। আপনার জন্যে খুব মন কেমন করছে। আপনি বোধহয় এখন নাইছেন। এখন একটু ২ মেঘলা একটু ২ রোদ। দুটো ছোট ২ ইষ্টিষান পার হয়েছি। আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। এখন গাড়ী খালী। খুব কাঁপছে গাড়ী। এই এখনি একটা ছোট ইষ্টিষানে গাড়ী থাম্‌ল। এই আবার চল্‌ছে। আমার আবার খুব কান্না পাচ্ছে।

দুধারে জলে ভরা খেত আর মাঠ। খানিকক্ষণ পরে লিখছি। আপনার নাওয়া হয়ে গেছে কে চুল আঁচড়ে দেবে আপনাকে। একটা ইষ্টিষানে গাড়ী থেমেছে অনেক মেয়ে বউ দেখলাম। আমাদের গাড়ী খালী আছে।

আপনার এখন খাওয়া হয়ে গেছে। রোজ বিশ্রাম কর্‌বেন্। একটুও ভাল লাগ্‌ছেনা। চুপ করে বসে আছি। গাড়ী খুব নড়ছে।

রামপুরহাট। বেশী লোক নেই। কতকগুলি মেয়েমানুষ নথ পরে গেলেন। আমি চুপ করে বসে। সামনেই একটা ইঞ্জিন মালগাড়ীর ওপর। আপনি বোধহয় এখন বিশ্রাম কর্‌ছেন। নলহাটীতে গাড়ী থাম্‌ল। একজন খুব মোটা বাঙালী মেয়েমানুষ গাড়ী উঠ্‌লেন। বাব্‌জাদের গাড়ীতে।

চাৎরা। আপনি কি করছেন এখন এসময়। মন কেমন কর্‌ছে।

বাজগাঁও। হিন্দুস্থানী গ্রাম সুরু হল। বাড়ীর টাইলের ছাত্। লোক প্রায় উঠ্‌লই না। প্রায় মেঘ্‌লা। সবুজ মাঠ। আর জলে ভরা খেত। তার পেছনে জঙ্গল।

পাকুড়। এখানে নথ পরা মেয়েমানুষটী নাম্‌ল। এটা একটু বড় ইষ্টিসান। আর একজন নথ পরা মেয়ে মানুষ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। আমার সন্ধ্যেবেলা ভাল লাগ্‌বে না। আপনারও বোধহয় ভাল লাগবে না।

বারহাবরা। এটা বেশ বড়। অনেক লোক। কতকগুলি ক্রিশ্চান সাঁওতালী মেয়ে গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে। একপাশে একটা বড় পুকুর রয়েছে। তার চারিধার গাছে ঢাকা। খুব সুন্দর দেখতে। এখন মেঘলা। আমি এতক্ষণ আপনার কথাই ভাব্‌ছিলাম। দূরে একটু ২ সবুজ পাহাড় দেখা যাচ্ছে। গাড়ী দুটো পাহাড়ের ভেতর দিয়ে গেল।

তিন পাহাড়। এখানে একটা পাহাড়ের তলায় কেমন একটা হিন্দুস্থানী গ্রাম। এখন পাঁচটা বেজেছে। আপনার বোধহয় লেখাপড়া এখ্‌খুনি শেষ হল। যদি কিছু সভা হয় তো বেশী জোরে লেকচার দেবেন না।

সাহেবগঞ্জ। এ ইষ্টিসানটা তো বেশ্ বড়। আমাদের সাম্‌নে টিকিট্

কলেক্টার দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে খুব হাঁসি পাচ্চে। এখনো আমাদের গাড়ীতে কেউ আসেনি। আমাদের গাড়ীর সামনে কল। সবাই জল খাচ্ছে। এখন আপনি বোধহয় খাচ্চেন। আজ সন্ধ্যেবেলা তো আমি আর আস্‌ব না আপনি বোধ হয় সভা কর্‌বেন। এবার যেদিন ছাতে বস্‌বেন্ সেদিন নিশ্চয় আপনার আমার জন্যে মন কেমন করবে। আপনি একলাটী চুপ করে বসে থাক্‌বেন।

কহলগ্রাম। এখানে একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। সেটা রাত্তির ১।২টায় ঝেলপুর পৌঁছোবে। এখনো মেঘলা। দু ধারে উচু ২ ঘাস। খানিকক্ষণ আগে আমরা সব জল খাবার খেয়েছি। আমি অনেক খেয়েছি। আপনিও বেশী করে দুধ খাবেন।

গাড়ীতে কারোর সঙ্গে কথা হয়নি।

সবোরএ একটা কলেজ দেখ্‌লাম। তার পাশে মাঠে ছেলেরা খেল্‌ছে দেখ্‌লাম্।

ভাগলপুর। এ ইষ্টিসানটা খুব বড়। বাব্‌জা খাবার কিন্‌ছেন। একজন লোক সেজেগুজে গলায় মালা দিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আম কিনছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ক্রমে অন্ধকার হচ্চে। সব্বাই বলছেন এখন শান্তিনিকেতনের কথা মনে আসছে। এ সময়েই তো আমার সবচেয়ে বেশী আপনার জন্যে মন কেমন কোরবে। কাশীতে গিয়েও কোর্‌বে। একটা ছোট্ট টনেলের ভেতর গাড়ী গেল। এই বার জামালপুর আস্‌বে। কে জানে কেন হটাৎ বনে গাড়ী থামল আবার চল্‌ছে। অন্ধকার। এখন রাত ৮।৯, আপনি বোধ হয় ছাতে কিম্বা কোণের বিছানায় শুয়ে। জামালপুর। কাল এসময় আপনি গান গাইছিলেন। আমার এখানে ভাল লাগছে না। তাইত কাঁদছি। এবার শুতে যাচ্চি কিন্তু ঘুম হবে না।

রাত ২।১। রাত্তিরে খুব বৃষ্টি হচ্চে। আমার ঘুম আস্‌ছেনা। আপনি এখন বোধহয় ঘুমুচ্ছেন। আরায় ভোরে গাড়ী পৌঁচেছে। অনেক ঘুমটা

পরা হিন্দুস্থানী মেয়ে নামল তারা সব কা কি, না নী নে এই সব বলে ঝগড়া বাঁধিয়েছে। আমার গাড়ীতে একটুও ভাল লাগেনি। আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে। এ চিঠিটা মোগলসরাএ ফেল্‌বো। কাশী গিয়ে কি হল আর এক্‌টাতে লিখ্‌ব। দেখুন আপনাকে কত বড় চিঠি দিলাম। আমাদের ঠিকানা
২৩৫ অগস্ত কুণ্ড। দেখ্‌বেন যেন ২৩৬, ৩২৫ কিম্বা ৫৩২ না হয়। আর অগস্ত কুণ্ডাটাও যেন না ভুলে যান। কেমন বুঝলেন ত। চারপাতা হয়ে গেছে। আর আঁট্‌ছে না। [২৬-২৭ আষাঢ় ১৩২৫]

রাণু। দেবী নয়।

পুঃ সকাল বেলা ৯টা। এখন আপনি ছেলেদের পড়াচ্ছেন, আমার পড়তে ইচ্ছে কর্‌ছে।

১৫

১২ জুলাই ১৯১৮

[কাশী]

প্রিয় রবিবাবু,

কাল আপনাকে কেমন একটা চিঠি দিয়েছিলাম্।[১] সে চিঠিটা মোগলসরাইএ ডাকে দিয়েছি। কতবড় চিঠি লিখেছিলাম। আপনি যেন একটা ছোট্ট চিঠি দেবেন না। বাবু[২] ইষ্টিষানে আমাদের নিতে এসেছিলেন। বাড়ী এসে প্রথমেই লিলুকে[৩] দেখলাম্। এখানে খুব গরম। আজ ঘুম থেকে উঠেই আপনাকে চিঠি দিচ্ছি। আমি কি লক্ষ্মী। আজ আমি ইস্কুলে যাব কিন্তু শিগ্গিরই চলে আস্‌ব। প্রায় বল্‌তে গেলে পড়বই না। শুনুন, আপনি ভাল করে চুল টুল আঁচড়াবেন। কাপড়ও বেছে ২ পর্‌বেন। দিনরাত

লিখ্‌বেন না। দুপুরবেলা ঘুমুবেন। আর রাত্তিরে শিগ্গির ঘুমুতে যাবেন। বেশী জোরে কিচ্ছু পড়বেন্ না যেন বলে দিলাম্। আমার আপনার জন্যে খুব মন কেমন করে। কাল সন্ধ্যেবেলা আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল। আপনি তখন কি করছিলেন? কিন্তু পূজোর ছুটীর সময় বেশ্ মজা হবে।[৮] আপনি আজকালও কি তিন্‌টে ক্লাশ পড়ান্? আমার পড়তে যেতে খুব ইচ্ছে করে। সে খাতাগুলো আমি রেখে দিয়েছি। আজকাল কি গাছের তলায় পড়ান হয়? আমি কাল ভাব্‌ছিলাম আপনি কি কর্‌ছেন। বৌমা[৫] ওখানেই আছেন না শিলাইদা গেছেন? অ্যানড্রুস্ কেমন আছেন? উনি নিশ্চয় আপনাকে খুব ঘরে বাইরে করান।[৮] ওঁকে বল্‌বেন রাণু বলেছে যে ঘরে বাইরে যেন খুব কম করে করান হয়। আপনার কোনেতে আজকাল প্রায় কেউই আসেনা বোধহয়। হ্যাঁ শুনুন্ কেউ বয়েস জিজ্ঞেস করলে বল্‌বেন্ সাতাশ।[১] কাশীতে এখনো ঘরটর গোছানো হয়নি। আমার সব পুতুল বার করেছি। ছোটবউ[৮] রোগা হয়ে গেছে। ওর গায়ে খুব ধূলো হয়েছে। গাব্‌লোর বউ[৮] মোটা হয়েছে। সে খুব সেজে গুজে রয়েছে। ছোটবৌএর কতক্‌গুলো হার আর কাপড় হারিয়ে গেছে। লিলি, লটি, সোনালি, টগর, জুঁই গোলাপ[৮] ভাল আছে। খানিকক্ষণ পরে ওদের নিয়ে থিয়েটার কর্‌ব। মন থেকে বানিয়ে। এবার আর ছবি আঁকলাম না।

কাল ট্রেন থেকে এসেই চতুরঙ্গ শেষ করেছি। আচ্ছা দামিনী বেশী সুন্দর ছিল না ননীবালা। আমার বোধহয় দামিনী। শচীশ নিশ্চয় ভাল ছিল। শ্রীবিলাস নামটা যেমন বিচ্ছিরি ও নিশ্চয় বিচ্ছিরি দেখ্‌তে ছিল। কেমন রঙ্গীন কাগজে চিঠি দিয়েছি। একটা বড় চিঠি লিখ্‌বেন। [২৮ আষাঢ় ১৩২৫]

রাণু॥

ঠিকানা ভুল্‌বেন্ না যেন। আগের চিঠিতে লিখেচি।
নম্বর হচ্ছে ২৩৫

রাণু॥

১৬

[জুলাই ১৯১৮]

প্রিয় রবিবাবু,

পরশু আপনার চিঠি পেয়েছি। পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। ইস্কুল থেকে এসেই দেখি আপনার চিঠি রাখা রয়েছে। আপনি কেন বড় চিঠি লেখেন নি আমি আপনাকে কত বড় চিঠি দিয়েছি। আপনার চিঠিটা পড়েই সেই বাক্সটাতে রেখে দিয়েছি কাউকে দিইনি। আপনার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে। মাঝে ২ কাঁদি। আমার যখন মন কেমন করে তখন আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারেন। এবার আপনি বেশ চিঠির সুরুতে রাণু লিখেছেন। আমি আজকাল রোজ দু তিন বার করে দুধ খাই। আপনাকেও খেতে হবে কিন্তু বলে দিলাম। অ্যান্‌ড্রুস্ সাহেব আমাকে একটা ছোট্ট চিঠি দিয়েছিলেন, তাতে লিখেছিলেন যে আপনি রাত্তিরে ভাল করে ঘুমোন আর দিনেও শোন্। আপনি বেশ লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাক্‌বেন্, খুব কম পড়বেন্। আমি আজকাল ইস্কুলে একটুখানি পড়া করি। বেশী পড়িনা। আপনিও তাই অনেক পড়তে পাবেন না বলে দিলাম। সুভার গল্প নিশ্চয় এখনো শেষ হয়নি।[১] যেদিন শেষ হবে সেদিন আমায় তার কর্‌বেন্। হ্যাঁ। আমি এবার পূজার ছুটি হওয়ার আগেই যে সব আপনার বই পড়িনি সেগুলো পড়্‌ব। আমার চতুরঙ্গ, বলাকা আর ঘরে বাইরে হয়নি। তারমধ্যে বোলপুর থেকে এসেই চতুরঙ্গ পড়েছি। এইবার বলাকা পোড়্‌ব। তার পর ঘরে বাইরে পড়্‌ব। আমি ভাবি যে একদিন ট্রেনে করে বোলপুর গিয়ে ধীরে ২ চুপি আপনার সিঁড়ি দিয়ে উঠে হটাৎ আপনার কাছে যাব। আপনি তখন নিশ্চয় কোনে বসে লিখ্‌বেন। আমায় দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন তা হলে কি মজা হয়। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

দেখুন আমি কেমন ওড়না পরা মেয়ে করেছি এর নাম নীলা। বেশ সুন্দর হয়েছে। না? আপনাকেও আঁকতে হবে।

রাণু॥

১৭

[জুলাই ১৯১৮]

আমার প্রিয় রবিদাদা,

আমার কেন লিখেছি জানেন আপনি আমায় যে চিঠিটা দিয়েছিলেন সেইটে[তে] তোমার রবিদাদা লিখেছেন।[১] তাহলে তো আপনি আমার হয়ে গেলেন, তাই আমার লিখেছি। আমি কালও ইস্কুল থেকেই এসেই আপনার চিঠি পেলাম। ... চিঠিটা ... আর সব চাইতে ... হয়েছি। কেননা এ চিঠিটা আমার খুব [ভাল লা]গে। আর এ চিঠিটা সব চেয়ে বড়। তাই। [আমি] চিঠিটার সবটা বুঝতে পেরেছি। আপনার [জন্যে] আমার খুব মন কেমন করে। আপনারও নিশ্চয় করে। এখানে আজকাল খুব চাঁদের আলো হয়। আমি রোজ সন্ধ্যেবেলায় বিছানায় শুয়ে আপনার [কথা ভাবি] তখন আপনার জন্যে সব চেয়ে বেশী মন কেমন করে। কান্না পায়। মাঝে ২ ভক্তিকে গল্প বলি। শান্তিনিকেতনে আপনার ছাতে নিশ্চয় খুব আলো হয়। আপনি বুঝি তখন চুপ করে একলা বসে থাকেন? আমি থাকলে আপনাকে গল্প বলতাম। আপনি বেশ লক্ষ্মী। কথা শোনেন। কিন্তু বেশী করে দুধ খাবেন। কিন্তু আপনি কেন অত করে ঘরে বাইরে করেন। আমি অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে এক্ষুনি অত করে ঘরে বাইরে করাতে বারণ করে দিচ্ছি। উনি যেন ছুটীর দিন দু ঘন্টার বেশী না [ঘরে বাইরে করান]। আমিও আজকাল

দুধ খাই। ইস্কুলের বাঙলা আমি [পড়ি না]। বাড়ীতে বলাকা ঘরে বাইরে চয়নিকা পড়ি। যেটা [না] বুঝতে পারি আ[শা]কে জিজ্ঞাসা করি। পূজার ছুটির সময় যখন আপনার কাছে যাব তখন দেখ্‌বেন আপনার সব বই আমার পড়া হয়ে গেছে। আমি বাড়ীতে ইস্কুলের বই পড়িনা। তখন বেশ হবে। আশা এবার কলেজে পড়বে কিনা তাই শিম্লিরি বোর্ডিঙে যাবে। বাবুর খুব জ্বর হয়েছে। অজ্ঞানের মতন থাকেন। আর শুনুন একটা কুঁজো এত বিচ্ছিরি দেখ্‌তে হিন্দুস্থানী বুড়ী দিন রাত [পাখা] করে। আর শুনুন সে এত অসভ্য যে ... ... পরে। আর সে অসভ্য হিন্দি কথা ব[লে]। ... চাইতেও ঢের খারাপ।

আমি রোজ ইস্কুল থেকে এসে রঙ দিয়ে বৌমার মতন করে ছবি আঁকি। কিছুদিন পরে যখন আরো ভালো করে আঁক[তে] পারব তখন আপনার একটা [রঙ] দিয়ে ছবি এঁকে পাঠিয়ে দেব। আপনার কাপড়ের রঙ্‌ আঁকব লাল আর চুল কর্ল করে দেব। তার বয়স হবে সাতাশ। আপনি ছবিটা রেখে দেবেন। এবার আর একটা পাঠাচ্ছি। আপনিও একটা আঁকবেন। দেখ্‌ব কার্‌টা বেশী ভাল হয়। আপনি আমাদের যে আপ[না]র ফোটোটা দিয়েছেন সেটাকে আমি আদর করি। ছু[টি]র সময় গিয়ে আপনাকেও চুমু খাব। দেখুন আমি কি লক্ষ্মী। আপনাকে রবিদাদা লিখেছি। কিন্তু দিনুবাবুরাও যে আপনাকে রবিদাদা বলেন। আমি বাব্‌জার সঙ্গে পূজোর সময় নিশ্চয় আস্‌ব। তখন আপনাকে ক্লাসের পড়াও লিখ্‌তে হবেনা আর ... ... তখন অনেক গল্প ... ... যারা বিচ্ছিরি ... তাদের ... আপনাকে রোজ সাজিয়ে দেব। ... ... ওখানে খুব গরম। তাই ভারি কষ্ট। মা বাবুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ... ... [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু ॥

১৮

[জুলাই ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা,

কাল আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হয়েছি। অন্যদিন খুলে সকালে তার উত্তর দী কিন্তু আজ থেকে morning ইস্কুল ছিল। ভোর পাঁচটায় উঠেই ইস্কুলে গেছি। আর যখন ফিরে এলাম তখন ডাক চলে গেছে। তাই জন্যে দুপুর বেলা প্রায় বিকেলে লিখছি। আপনাকে আর ও কাগচে চিঠি দিতে হবেনা। ওর রঙটা বেশ কিন্তু কাগচ তো ছোট্ট। ওতে আর দিতে পাবেন না। আপনি ও রকম দুটোতে কেন দেন না। আপনার চিঠি লিখতে খুব বেশীক্ষণ লাগে না। আমি যে বুধবার দিন আপনি কি করছিলেন আমাদের যাবার দিন, তাই, ভাবছিলাম। আর শুনুন্ আপনি কেন আবার দুষ্টু হয়েছেন। বেশী দুষ্টুমি করলে আপনার সঙ্গে আড়ি করে দেব। বৌমা আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন যে আপনি খুব জোরে গান করেন, দুধ খেতে চান না আর ভাল করে চুল আঁচড়ান না। কেন আপনি এইসব করেন। আবার লিখেছেন দিনুবাবুর মতন মোটা হবেন।[১] আপনি যদি আরো দুষ্টুমি করেন তো আপনার সঙ্গে একেবারে আড়ি করে দেব। রবিদাদা বলব না আর, রবিবাবু বল্‌ব। তখন বেশ হবে। এই দেখুন, এক্ষুনি আমি দুধ খেলাম। প্রায় সবটা। আপনার চাইতে আমি ঢের লক্ষী আপনি লিখেছেন আমি দুধ খেলে আপনি খুসী হন কিন্তু আপনি কেন খান্ না। আপনার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে। সন্ধ্যে বেলায় ভক্তি খেলা করে আমার কিন্তু ভাল লাগে না। আপনি নিশ্চয় সে সময় চেঁচিয়ে ২ গান করেন। আর করতে পাবেন না, সে সময় তারার গল্প ভাব্‌বেন। কেমন। আমি পূজোর সময় গিয়ে আপনাকে একটা তোড়া বেঁধে দেব। মালীর চাইতে তোড়াটা ঢের ভাল হবে।[২] আমিও একটা খুব সুন্দর মালা

আপনাকে গেঁথে দেব। আচ্ছা শুনুন্ আমি যখনি আপনার কথা ভাবি তখনি কি আপনার গায়ে হাওয়া লাগে?° কি ভাবে বুঝতে পারেন? সেই হাওয়া আপনার কেমন লাগে। দেখুন রোদ কমে গেছে বিকেল হয়েছে। লু বন্দ হয়েছে প্রায়। আপনি যে ছবিটা এঁকেছেন সেটা বেশ্ সুন্দর হয়েছে। সেটা কার? মঞ্জুলিকার। আপনি তো বেশ ছবি আঁকেন। শেখেন না কেন। আমি যে ছবিটা পাঠিয়েছি সেটা কেমন হয়েছে লিখ্বেন। দেখুন আমি আপনার চাইতে বড় চিঠি লিখেছি আর একটুও ধরে ২ লিখিনি। আজ কেমন একটা খাতা ছেঁড়া কাগচে চিঠি লিখ্ছি। কেমন হয়েছে। বুধবারে উপাসনার পর এ্যানড্রুস জ্বালাতন করেন নি। উনি যদি আপনাকে বেশী ঘরে বাইরে করান তো ওঁকে বল্বেন যে আমি আর কখনো ওঁর কাছে পড়ব না। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু ॥

১৯

[জুলাই ১৯১৮]

আমার রবিদাদা,

আজকাল কি মজা হয়েছে। প্রায় রোজই ইস্কুল থেকে এসে আপনার চিঠি পাই। আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হয়েছি। বাব্জার চিঠিও পড়েছি। আপনি আজকাল বেশ লক্ষী। যে দিনই চিঠি পান সে দিনই তার উত্তর দেন। কিন্তু ওখান থেকে চিঠি ফেল্লে এখানে তিন দিনের দিন এসে পৌঁছোয়। এত দেরী হয় কেন। যদি আপনার কাছে আমার চিঠি যায়, আমার কাছে আপনার চিঠি আসে আর দুজনের যদি পথে দেখা হয়ে যায়

আর আমাদের মতন খুব ভাব হয় ত কি মজা হয়। আপনি যে কাগচে চিঠি দিয়েছেন তার রঙ্‌টা বেশ্ কিন্তু ভারী ছোট্ট কাগচ। আপনার নিশ্চয় ছোট চিঠি দিতে ভাল লাগে। বড় চিঠি লিখ্‌বেন। আপনি তো চিঠি বেশ শিগ্গির লিখ্‌তে পারেন। আমার চাইতেও। বৌমা কে হাসতে বারণ কর্‌বেন। আর বল্‌বেন্ যে রাণু আপনাকে নিশ্চয় রঙীন কাগচ দিতে বলেচে। দিনুবাবুও বোধহয় আজকাল হাসেন। আজকাল তো আমি নেই তাই বোধহয় বলেন রবিদাদা হাঁসাচ্চে। ওদের অত হাসি পায় কেন? আপনি বেশ লক্ষী ছেলে হয়ে থাক্‌বেন। আর চুল মন দিয়ে আঁচড়াবেন্। আর বয়স ছাব্বিষ কর্‌বেন না। যারা সাতাশকে সাতাশী শোনে তাদের জন্যে আবার অন্য বয়স রাখ্‌তে হবে কেন।[১] আপনার বয়স সাতাশই থাক্‌বে। যারা ঐ রকম শুন্‌বে তাদের আমি খুব বকে দেব। আমি কাল রাত্তিরে আপনার একটী স্বপ্ন দেখেছি। তাতে আপনি আমার হাত ধরে একটা বারাণ্ডায় খুব জোরে জোরে বেড়াচ্ছিলেন। খুব প্রকাণ্ড লম্বা বারাণ্ডা। আমার বর্ষশেষ কবিতাটা খুব সুন্দর লাগে। সেটা প্রায় রোজ পড়ি। আমি সেটা এবার মুকুস্ত কর্‌ব। আপনি যে ছবিটা এঁকেছেন সেটা বেশ সুন্দর হয়েছে। ছবিটা পেয়ে আমি খুসী হয়েছি। আর কদম্ ফুলও পেয়েছি। আপনি তো ছবিটা আগে পেন্সিল দিয়ে এঁকে তারপর তাতে কালী দিয়েচেন আমি তাই করি। আমি এবার একটা খুব সুন্দর কাগজে চিঠি দিচ্চি। তার রঙ্ লাল। আপনি লিখেছেন মন কেমন কোরোনা। তবুও আমার মন কেমন করে। আমার সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্‌লেই আপনার কথা মনে পড়ে। আপনার মন কি সত্যিসত্যিই আমার কাছে আছে। আর আপনি তলায় শুভানুধ্যায়ী রবিদাদা লিখ্‌বেন্ না তোমার রবিদাদা লিখ্‌বেন। আজ নিশ্চয় ইস্কুল থেকে এসে আপনার চিঠি পাব। রাণু॥

মা, বাব্‌জা, বাবু, আমি, আশা, শান্তি, ভক্তি সব আপনাকে ভক্তি পূর্ণ প্রণাম দিয়েছেন। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

২০

[অগাস্ট ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা,

আপনার চিঠি পেয়েছি। কাল। আপনি চিঠিতে লিখেছেন যে আমার চিঠি পান্নি। কিন্তু সেই রেগে চিঠি লেখার পর আমি আপনাকে আরো তিন্টে চিঠি দিয়েছি। এইটে নিয়ে চার্টের্ টা। দেখুন ডাক পিয়নরা কি দেরী করে চিঠি দেয়? ওদের শিগ্গির দেওয়া উচিত। চিঠি যদি খুব শিগ্গির যেত তো কি মজা হোত। আপনারও নিশ্চয় মজা লাগ্ত। আপনি এবারকার চিঠিতে শুধু সারাদিন কি করেন তাই লিখেছেন।[১] কিন্তু তবুও বেশ্ সুন্দর হয়েছে। আর আপনি আজকাল লক্ষী হয়েছেন। বেশ্ বড় বড় চিঠি লেখেন। আপনাকে আজকাল বুঝি morning ইস্কুলের মতন খুব ভোরে উঠতে হয়। আজকাল যে গান হয় সেই গান কি আপনিও গান? বেশী জোরে বল্বেন্ না। আমি ভাব্তাম যে এখানে পড়ার আগে কোন গান কেন হয়না কেন। কাশীর ইস্কুলে আগে থেকেই হত। আপনার কি কাশী আস্তে ইচ্ছে করে? আপনি কেন সব জিজ্ঞেসের জবাব দেননা।।।। দেবেন। আর আপনি যখন অত ভোরে ওঠেন তখন সকাল সকাল শুতে যাবেন। কেমন? আর সেই বিষয়ে ভাল হবেন। হ্যাঁ। আমি আজকাল এখানে আপনারই মতন ভোরে ঘুম থেকে উঠি। উঠেই তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে কাপড় পড়ে ঠাকুর প্রণাম করে ইস্কুলে যাই। আর খাইও। ইস্কুল থেকে এগারোটার সময় বাড়ী আসি। এসে খেয়ে আপনাকেই আমি প্রায় চিঠি লিখি। কিম্বা গল্পের বই পড়ি। তারপর জিয়োমেট্রি অ্যাল্জেব্রা এইসব পড়া করি। আর সন্ধ্যেবেলা বাড়ীর বাইরে কিম্বা ছাতে চুপটী করে বসে থাকি। আপনার কথা ভাবি। আপনি তখন নিশ্চয় ছাতে একলা বসে থাকেন্। আর সব ভালো হবার কথা ভাবেন্। আমিও তাই ভাবি। মাঝে মাঝে। আর তারপর

ঠাকুর প্রণাম করে বাব্জার উপদেশ বলার পর এ জীবন পুন্য কর গানটা গাই। এর মানে সব বুঝ্তে পারি। তার পর শুতে যাই। কাশীতে আজকাল খুব গরম। আর গুমট্। তাই একবার্ বাইরে আস্তে হয় একবার্ ভেতরে। আর আমি আজকাল প্রায় একলা শুই। ভয় করেনা। আপনার কি করে। আমি আগের চাইতে ভাল হব। দেখ্বেন্।

আমি আজকাল ইস্কুলের কাজ সব লাল খাতায় করি। আপনি তো লাল রঙ্ ভালবাসেন। তাই বৌমা জামা বানিয়ে দেবেন। এই রঙের। আজ সন্ধোবেলা থেকে পশুপতির কাছে গান, আর বাজ্না শিখ্তে হবে। আমার কিন্তু ওঁকে দেখে ভারী ভয় করে। আপনি এখন কি কর্ছেন? শুয়ে আছেন? রোজ শোবেন। ঘরে বাইরে দুপুরে কর্বেন্ না। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

এখন খুব মেঘলা কালো।

রাণু॥

২১

[জুলাই ১৯১৮]

আপনার চিঠি পেয়েছি। খুব রাগ হয়েছে। আপনি কেন আমার চিঠি উত্তর সব চাইতে আগে লেখেন নি। মাঝে কেন লিখেছেন আর কেন আমার দুটো চিঠির উত্তর অত ছোট্ট লিখেছেন।[১] ওরকম কাগজে আপনি

আর লিখতে পাবেন না। আর আপনি কেন আমার দুটো চিঠি পাননি তার আগেই আশাদের চিঠি লিখেচেন। আপনার সঙ্গে আড়ি। কেমন বিচ্ছিরি কাগচে চিঠি লিখছি। আর রবিবাবু লিখেছি। আমারও না প্রিয়ও না রবিদাদাও না। বেশ হয়েছে। দেখ্‌বেন এবার আপনার কি হবে। আপনাকে আর কেউ চিঠি লিখবেনা। আপনি আজকাল নিশ্চয় এণ্ড্রুজকে বেশী ভালবাসেন।
[শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

আপনি ভারী দুষ্টু। সবচাইতে।
যদি এবার একটা খুব বড় চিঠি না রাণু।
দেন তো আড়ি করে দেব একেবারে। রাণু॥

২২
[জুলাই ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা,

আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হয়েছি। আপনি কি যেই আমার চিঠি পেলেন অমনি তার উত্তর দিলেন। আমি এখুনি চারটের সময় আপনার চিঠি পেয়েই তার জবাব দিচ্চি। কাল ভোর পাঁচটায় আপনার চিঠি ইস্কুল যাবার আগেই আপনার চিঠি ডাকে দিতে দেব। আমাদের আজকাল খুব ভোরে ইস্কুল যেতে হয় খুব গরমের জন্যে। আমি বৌমাকে চিঠিতে লিখেছি যে আপনাকে একটা সুন্দর লাল জামা করে পরিয়ে দিতে যেদিন আমি আস্‌ব। আর বলেছি যে আপনার চুলের জট ছাড়িয়ে ভাল করে আঁচড়ে

পাউডার মাখিয়ে আর গালে হাল্কা করে রুজ মাখিয়ে দিতে। আপনি পূজো পর্য্যন্ত তো চুল কাটাবেন না তখন বেশ্ বড় চুল সুন্দর দেখতে হবে। কিন্তু তখন আপনি লক্ষী ছেলে হয়ে থাক্‌বেন্। যাতে সুন্দর দেখায়। আর সেদিন কখনো ছেলেদের পড়া কর্‌তে পাবেন্ না। আর অন্য কিছু জিনিষ লিখ্‌তে পাবেন না। তাহলেই আপনি চুলের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে চুল খারাপ করে দেবেন। আপনি এবার থেকে রোজ আমায় একটা চিঠি দেবেন। কেন দেননা। আমার চিঠি না পেলেও দেবেন। মামা আমাদের জিয়োমেট্রীর ১৬টা অঙ্ক কসতে দিয়েছেন। আরো অনেক। আপনার চিঠি যখন পেলাম তখন জিয়োমেট্রী কস্‌ছিলাম্। কিন্তু যেই আপনার চিঠি পেলাম তক্ষুণি খাতা টাতা বন্ধ করে চিঠি লিখ্‌ছি। আর আপনি ও কাগচে চিঠি লিখ্‌বেন্ না। ভারী ছোট্ট কাগচ আগের মতন বড় কাগচে লিখ্‌বেন্।। নিশ্চয় বলে দিলাম। বৌমা দেখুন কিছুতেই বড় রঙীন কাগজ আনিয়ে দিচ্চেন না। আবার বল্‌লে বলেন এখানে রঙীন কাগচ পাওয়া যায়না। যখন কল্‌কাতায় যাব তখন কিনে দেব। ধরুন উনি যদি কল্‌কাতায় নাই যান্ তো। আপনি রথীবাবুকে আনিয়ে দিতে বল্‌বেন্। বৌমা তো ইচ্ছে কর্‌লেই পার্শেল কর্‌তে আনাতে পারেন। রথীবাবুকে পার্শেলে আনতে বল্‌বেন। যদি আপনার কথা শোনেন্। আপনি ছেলেদের যে কবিতা শুনিয়েছেন তা কি জোরে পড়েছেন। ওরা আবার কি অসভ্য আপনাকে দিয়ে দুটো পড়িয়েচে।[১] আপনি আর কখনো ওরা বল্লেও পড়্‌বেন্ না। আর চেঁচিয়ে তো পড়্‌তে পাবেনই না। বৌমা বারণ করেন নি। আপনি কি আজকাল সন্ধ্যে বেলা ছাতে একলা বসে থাকেন? আমার জন্যে কি মন কেমন করে। আমার কিন্তু করে। আপনার কি তখন ভাল লাগে? আমার লাগেনা।

আমি আজকাল ছবি আঁকিনা। এবার তাই ছবি আঁকিও নি। এবার আপনি ছবিতে কাকে এঁকেছেন। নিজেকে? আপনার চাইতে ছবিটা ঢের

বিচ্ছিরি হয়েছে। আপনি এবার লক্ষী ছেলে হয়ে থাক্‌বেন। কেমন? [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

এ কাগচের রঙটা কেমন সুন্দর। আমি নিজে বেছেছি।

রাণু॥

২৩

[অগাস্ট ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা

কাল দুপুরবেলা আপনার চিঠি পেয়েছি। আর যেই আপনার চিঠি পেলাম অমনি ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হল। কাল থেকে তাই এখানে বেশ্‌ ঠাণ্ডা হয়েছে। শান্তিনিকেতনেও কি বিষ্টি হয়েছে। আপনি সন্ধ্যেবেলায় কোথায় চুপটী করে বসে ছিলেন? কালও আপনি বেশ্‌ বড় চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি সারা চিঠিটা অনেক বার পড়েছি। আমার খুব সুন্দর লেগেছে। আপনি তো বেশ্‌ সুন্দর চিঠি লিখ্‌তে পারেন। এদিকে আপনি তো ছোট প্রায় আমারিই মতন। আমাদের সেই লোহার বাক্সটাতে অনেক আপনার সব চিঠি রেখে দিয়েছি। আমি মাঝে মাঝে সেইগুলো পড়ি। আমি আপনার ওপর আর আড়ি করিনি। ভাব করেছি। এবার থেকে আর বেশী রাগ কর্‌বনা। আর আপনিও কিনা খুব লক্ষী হয়েছেন ঠাকুর যা বলেন তাই করেন, আর আমার চিঠি না পেয়েও বেশ্‌ আর একটা বড় চিঠি লিখেছেন তাই। আপনি ছোট্ট ছবি এঁকেছেন বলে আমার রাগ হয়নি।

আপনার ছবির চাইতে আমার চিঠি বেশী ভাল লাগে। আমি এবার থেকে ভাল হব আর ঠাকুর যা বল্‌বেন তাই করব। তখন আপনি খুসী হবেন আর সকলেও? তখন আপনি আমার কথা শুন্‌বেন, আর লক্ষী ছেলে হয়ে থাক্‌বেন। আমি আপনাকে পুতুল ভাবিনা।[১] পুতুলের চাইতে ঢের ভাল ভাবি আর বেশী ভালবাসি। আর আজকাল আমার পুতুল নিয়ে খেল্‌তে ভাল লাগেনা। আমাদের শোবার ঘরে আপনার যে ফোটা [য] ছিল সেটা বদ্‌লে সেই যেটাতে আপনি নাম লিখে দিয়েছিলেন সেইটে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেইটে বেশী সুন্দর দেখ্‌তে তাই। আমার আপনার জন্যে মন কেমন করে। আমি আপনাকে চুমু দিচ্চি। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

আপনি এখন কি করছেন।

রাণু॥

আমাদের পূজোর ছুটী সাড়ে সাত সপ্তাহ পরে আরম্ভ হবে। মামা বলেছেন তখন বেশ্‌ মজা হবে। আবার আমি আপনাকে গল্প বল্‌ব। সব বল্‌ব যা হয়েছে। আর আপনি তারার গল্প ভেবে রাখবেন। কেমন।

প্রবাসীতে ছিন্নপত্র পড়েছি।[২] যাতে মনুর গল্প আছে। মনু কে? সে এখন কোথায়? আপনি সত্যি কি তার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছেন? আপনার দুঃখ হয়েছে? মনু কত বড়?

রাণু।

২৪

[অগাস্ট ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা,

এখন অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। আশা আলো জ্বেলে বসে পড়্চে। আর আমি সাম্নে বসে চিঠি লিখ্চি। আর দুপুর বেলা আপনার চিঠি পেয়েছি। তখন আমি অঙ্ক কস্‌ছিলাম্। আপনার চিঠি পেয়ে খাতা টাতা বন্ধ করে একটা ঘরে গিয়ে প্রথমে পড়্লাম্। আপ্নার এ চিঠিটা সব চাইতে বড় কিন্তু আমার কেমন লাগল। খুব সুন্দর। আমি প্রথমে চিঠি বুঝতে পারিনি। কিন্তু শেষে বুঝতে পার্লাম্। আপনি বলেছেন আমি বুঝতে ভাল করে পার্বনা। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি লিখেছেন আমি খুব ভাল হলে আপনি আমায় বেশী ভাল বাস্‌বেন। পূজোর সময় আপনি দেখ্বেন যে আমি ভাল হয়ে গেছি। আগের চাইতে। আমি যখন আপনার চিঠি টিঠি লিখে দেব তখন দেখ্বেন আমি ভাল হয়ে গেছি। আর আপনি আমায় রাণু সুন্দরী বল্‌তে পাবেন্ না।[১] বেশ্ হবে। তখন আমায় আপনি বৌমার মতন বেশী ভালবাস্‌বেন্। হ্যাঁ। আজ আমি সন্ধ্যেবেলা বর্ষশেষ কবিতাটা মুখুস্ত করছিলাম্। আমার এটা খুব শিগ্গির মুখুস্ত হয়ে যাবে। বেশ্ মজা হবে। আশা কাল বোর্ডিঙে যাবে। মন কেমন কর্‌ছে। এবার সবাই শুয়েছে। আমিও শুতে যাই। হ্যাঁ। আপনি বোধহয় এখন ছাতে চুপ্‌টী করে বসে আছেন আর ঠাকুরকে ভাব্‌ছেন। রাণু।

সকাল বেলা লিখ্‌ছি। আজ কিনা রবিবার তাই ইস্কুলে যাইনি। তাই সকাল বেলা চিঠি লিখ্‌ছি। এখন বেশ্ মেঘ্‌লা আমি আপনার চিঠি আবার পড়েছি। আপনি বুঝি ভাবেন আমি শুধু আপনার চুল আঁচড়াতেই ভালবাসি। আপনার চাইতে। তবে আপনিও বুঝ্‌তে পারেন নি। আমি আপনার চিঠি এবার

থেকে রোজ পড়্ব। আপনি কি যাকে ভালবাসেন তারাই খুব ভাল? আমিও তো ভাল হয়ে যাব।

রাণু॥

আপনি কি করে জান্তে পার্লেন আমি আপনাকে গম্ভীর বুঝ্তে পারি না।[২] আপনার উপাসনার সময় আমার আপনাকে খুব ভাল লাগ্ত। আপনি আপনার ঠাকুরের যে কাজ করেন আমিও সেই সব করব। আমিত আগেই বলেছি। আমিও আপনাকে সাহায্য কর্ব। তখন আপনাকে বেশী কাজ কর্তে হবেনা। আমি বেশীর ভাগ কাজ করে দেব। তখন আমি বেশী ভাল হব তাই ঠাকুরের পূজোও বেশী ভাল হবে। তখন বেশ্। আমি আর আপনার ওপর রাগ কর্ব না। ভাল হব কিনা তাই আর বৃহস্পতি বারে থেকে পশুপতির কাছে গান শিখ্ব। হ্যাঁ। পশুপতি বলেছে। আপনাকে আমি চুমু দিচ্চি। আপনার কাছে যেতে খুব ইচ্ছে করে। ভাবি। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

আপনি বেশী করে খাবেন। কেমন। লক্ষী হবেন।

রাণু॥

২৫

[অগাস্ট ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। আপনি বেশ্ সুন্দর চিঠি লেখেন। আর আপনি এবার বেশ্ সুন্দর কাগচে আর খামে চিঠি দিয়েছেন

তাই ভাল দেখাচ্ছে। আপনি উপাসনা থেকে এসেই বুঝি আমার চিঠি পেলেন।[১] তখনিই কি জবাব দিয়েছিলেন। এ্যান্‌ড্রুস্ ঘরে বাইরে করতে আসেন্ নি? আপনি বেশী কর্‌তে পাবেন না। আপনার উপাসনায় আমার যেতে ইচ্ছে করে। আপনি কি সেদিনও সেই লালরাস্তায় একলাটী বেড়াচ্ছিলেন। আপনি কি উপাসনার কথা ভাব্‌ছিলেন? আমি আজকাল ভাল হই। তাই আপনার বেশীর ভাগ কবিতা বুঝ্‌তে পারি আজকাল। আমি আজকাল শুধু একটু রাগ করি। তাই এ্যান্‌ড্রুস্ সাহেবকে চিঠি দিয়েছি। আমিও আপনাকে খুব ভালবাসি। আর দেখ্‌বেন্ তাই খুব ভাল হয়ে যাব। তখন আপনি দেখ্‌বেন্ আমি আপনাকে বেশী কাজ কর্‌তে দেবনা। আমি আপনার মতন ভাল করে কাজ করে দেব। আপনি তখন বুঝি খুসী হবেন? আপনি দেখ্‌বেন্? আপনি এখন কি কর্‌ছেন। ছেলেদের পড়াচ্ছেন বোধহয়।

রাণু॥

আপনি আজকাল লক্ষী ছেলে হয়ে থাক্‌বেন্। কেমন? আমার আপনার জন্যে মন কেমন করে। সন্ধ্যেবেলায় আপনার কথা ভাবি। আজ রবিবার। তাই সকালে চিঠি লিখ্‌ছি। আর morning ইস্কুল হবেনা এখানে খুব বৃষ্টি হয় তাই। আমার চুমু আপনাকে দিচ্চি। রাণু॥

শুনুন্ যেমন আপনার ইস্কুলের ছেলেরা তেমনি বাব্‌জার কলেজের ছেলেরা পৌষ পার্ব্বনের দিন পিঠে খেতে চেয়ে ছিল।[২] রাত্তিরে ত্রিশ চল্লিশ জন ছেলে খেতে এল। তারা খুব শিন্নির যত পিঠে পরমোন্ন খেয়ে ফেল্‌ল। তারপর আমাদের যত খাবার ছিল সব খেল। তারপর লুচি তরকারী খেতে চাইল। তারা এত লুচি খেল যে সব ঘী শেষ হয়ে গেল। তখন আবার ঘী আনিয়ে লুচি দেওয়া হল। সব ফুরিয়ে গেলে সকাল

বেলার বাসী তরকারী আর অম্বল খেল কাড়াকাড়ী করে। সেদিন কি মজা হয়েছিল।

এক্ষুনি একজন স্ত্রীলোক এসেছিলেন্। তিনি খুব কাঁদছিলেন তার ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে চলে গেছে। আজকাল আমাদের বাড়ী অনেক লোক আসেন। তাঁদের সব ছেলেদের ১৫/১৬ বছরের ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। তাঁরা খুব কাঁদেন। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

ভারী দুঃখ হয়। না?।

২৬

[অগাস্ট ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা,

আপনার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু কাল কেন উত্তর দিইনি বলি। কাল আমার মাথা ধরেছিল। আপনি নিশ্চয় রাগ করেন নি। আর আপনি ভালও হয়েছেন। দুপুরে লক্ষী হয়ে শুয়ে থাকেন। আপনি যখন শুয়ে থাকেন তখনি বুঝি এইসব দেখেন। ওখানে তো বেশ্ দেখা যায় কিন্তু কাশীতে ওসব কিছুই দেখা যায়না। কিন্তু আমার দেখতে বেশ্ সুন্দর লাগে। আপনি কি চিঠি লিখেছিলেন এই সব দেখতে দেখতে। সেই দরজাটা থেকে যেটা ছাতের দিকে। আমি আপনার সেই চিঠিটা পড়েছি আর সুন্দর লেগেছে। আমি সকালে চিঠি লিখ্তে সুরু করেছিলাম কিন্তু ৯টা বেজে গেল। তাই খারাপ লাগ্ছিল এত। তাই শেষ করিনি। এখুনি ইস্কুল থেকে এসেই খেয়ে উত্তর দিচ্চি। আপনি আজকাল আমার চাইতে বেশী একটু

ভাল হয়েছেন। বেশ্ শিগ্গির উত্তর দেন কিন্তু আমি আপনার চাইতে বেশীক্ষন ইস্কুলে থাকি। আপনি কি বিশ্ব প্রকৃতিকে বেশী ভালবাসেন।[১] খুব। যদি বাসেন তাহলে ওর ভেতর নিশ্চয় আপনার ঠাকুর আছেন। আর আপনি তো বলেন ঠাকুরকে বেশী ভালবাস্‌তে চেষ্টা করেন। তবে নিশ্চয় বিশ্ব প্রকৃতিকেও কেবল চেষ্টা করেন। বোধ হয় বিশ্বপ্রকৃতি আপনাকে আমার চাইতে কম ভালবাসে। আমিও কোর্‌ব। কিন্তু এখানে ভাল করে দেখা যায়না। কিন্তু আমরা রোজ সন্ধ্যে বেলা ঠাকুরকে ডাকি। ঠাকুর প্রণাম হয়ে গেলে বাব্‌জা রোজ্ আপনার কথা বলেন। তবে নিশ্চয় আপনি ঠাকুরকে বেশী ভালবাসেন। আজকাল আশা বোর্ডিঙে গেছে তাই আমাদের সঙ্গে থাকেনা। আর বাব্‌জাও কলেজে যান্‌না। আপনি কাশীতে একটুখানি ছুটী নিয়ে আসুন্ না। আপনার আস্‌তে ইচ্ছে করেনা। আসুন্ না। আমার আপনার জন্যে মন কেমন করে। কিন্তু আজকাল প্রায় কাঁদিনা। আপনারও কি মন কেমন করে বিছানায় লুকিয়ে। এখানে আজকাল খুব বৃষ্টি হয় তাই ছাতে বসিনা।। আমি আজকাল ভাল হই। আপনিও হবেন ভাল। আর চুল ভাল করে আঁচড়াবেন। আমি ইস্কুলে যাবার সময় চুল বেঁধে যাই। এখনি বাঁধতে হবে। আজ আমাদের বাড়ী এখনি কতকগুলি অতিথি আস্‌বেন। আমি আপনাকে চুমু আর আদর দিচ্ছি।
[শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু।।

আপনি এখন কোণে বসে লিখ্‌ছেন।

রাণু।।

আমি স্বপ্ন দেখেছি যেন আপনার অসুখ করেছে। এখন কি সেরে গেছেন?

রাণু।।

২৭
[অগাস্ট ১৯১৮]

প্রিয় রবিদাদা,

আমি কাল ইস্কুল থেকে এসেই আপনার চিঠি পেলাম কিন্তু বিকেল হতে না হতেই যিনি আমাদের গান শেখান এসে গেলেন। তাই সেই জন্যে কাল উত্তর দিইনি। আজ ইস্কুল থেকে এসেই দেখি আমার বিছানার ওপর আপনার চিঠি রাখা। কি মজা। তাই আমি খুসী হয়েছি। কিন্তু চিঠি কাশী থেকে ওখানে যেতে ভারী দেরী লাগে। আর ডাকহরকরারা ওখানকার নিশ্চয় আপনাকে দেরীতেও চিঠি দেয়। ওরা ভারী দুষ্টু আর আপনিও। আপনি কখ্খনো চিঠি দেখে তার উত্তর দেননা। যা জিজ্ঞেস করি কেন তারও উত্তর দেননা। কেন। আপনি ভারী দুষ্টু।

আপনি যেমন লিখেছেন ওখানে খুব বৃষ্টি হয় তেমনি এখানেও হয়। কিন্তু আজ সারাদিন বিষ্টি হয়নি। তাই আজ একটু গরম। বিষ্টির দিন ইস্কুল যাবার সময় এত মজা হয়। মাঝে মাঝে কাপড়ও ভিজে যায়। আমি কিন্তু ইচ্ছে করে ভিজিনা আপনিও ভিজ্‌বেন না। না ত অসুখ হবে আর ভাল হবেন। এইবার সেই গানের মাষ্টার হির্‌লেকর আস্‌বেন। উনি আমাদের দুটো হিন্দী ভজন শিখিয়েছেন। একটা ভূপালী একটা ঝিঁঝোটী। নামটা কিছুতে মনে থাকেনা। উনি এমন মুখ করেন যে খুব হাসি পায়।

এখন সকাল। রাত্তির থেকেই খুব বিষ্টি হচ্ছে। আপনার গল্প কেন মনে আসেনা। শুনুন, আপনি একটা খুব বড় গল্প মনে করে রাখ্‌বেন্। আর আমায় তখন বল্‌বেন্ খন্। আপনার শিন্নির ঘরে বাইরে শেষ হয়ে যাবে। বেশ্ হবে। আর বয়স সাতাশই থাকবে। বাড়াবেন না যেন। বেশী পড়া কর্‌বেনেনা যেন আমি আজকাল রাত্তিরে পড়িনা। কিন্তু দিনে সকাল বেলা থেকে পড়ি। আমি আজ্‌কাল ভাল হই। আপনি বিদায় অভিশাপ

বেশী করে করবেন না।[১] আর আপনি কি কোন নতুন কবিতা লিখেছেন।? আমি কাল রাত্তিরে, মামা একটা কবিতা পড়তে বলেছিলেন সেই পড়ছিলাম। তার নাম 'New Year's eve'. এই কবিতাটা এত দুঃখের যে কান্না আসে। অনেকটা বিদায় বলে কবিতার মতন। এটা মেয়ের একটী গল্প। সেটা পড়ে অনেক বার কান্না আস্‌ছিল তাই আশা বই নিয়ে নিল। আপনাকে চুমু দিচ্চি। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

২৮

[? অগাস্ট ১৯১৮]

... আর শুনুন আপনি অজানা গানটা[১] আমায় লিখে পাঠাবেন। আলাদা ও গানটা কিনা আমার সব চাইতে ভাল লাগে। তাই। আমার কল্পনা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আরো সব পড়ব। আর আমি যাবার পর কি কোনো নতুন কবিতা লিখেছেন? যদি লিখে থাকেন তো বেশ হয়। আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আপনি একটা ছোটগল্প প্রবাসীর লিখবেন। তাতে একটা খুব সুন্দর নামের মেয়ে যেন থাকে। হ্যাঁ। [? শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

এবার একটা মস্ত বড় চিঠি দেবেন।

রাণু॥

ওপিঠে ছবি আছে॥

২৯

[অগাস্ট ১৯১৮]

প্রিয় দাদারবি,

কেমন আপনাকে দাদারবি লিখেছি। আমি আপনার অনেক নাম ভেবেছি।[১] পরে তখন বল্‌ব খন। আমি আপনার চিঠি পেয়েছি। আর আপনি আজকাল বেশ্‌ বড় চিঠি লেখেন। আর আপনি যে রকম লেখেন আমার বেশ্‌ ভাল লাগে। আপনার চিঠি অনেক বার পড়েছি। আপনি ডাকহরকরাদের বল্‌বেন চিঠি আপনাকে শিগ্গির দিতে। আমিও রোজ দেখি যখন ওরা আসে। ওরা ভারী দেরী করে। আপনি আবার বিশ্বপ্রকৃতির কথা লিখেছেন। আপনি কি যখন ছোট্ট ছিলেন দুপুর বেলা সেই জানলায় যেটা উত্তরদিকে বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখ্‌তেন। আজকাল বেশীরভাগ বোধহয় মেঘই দেখ্‌তে পান। আপনি প্রত্যেক চিঠিতে ভাল হতে বলেন। কিন্তু আজকাল আমি আগের চাইতে ভাল হই। আমি আপনার মতন ভাল কাজ করব। আমি তো বলি। কিন্তু আপনি আমায় চিঠিতে ভাল হতে বল্‌বেন। আমার ভাল লাগে। আপনি বলেছেন আমি পান্থ।[২] আপনি কোন রাস্তা দিয়ে ঠাকুরের কাছে যাচ্ছেন। আপনি কত কাছে গেছেন। আমিও তো সেই পথে যাচ্চি। কিছুদিন বাদেই আমি আপনার কাছে যাব। কি মজা হবে। আপনি ঠাকুরকে কত ভালবাসেন।। আর আপনি সেই জন্যেও ভাল হবেন। আপনার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে। আজ সন্ধ্যেবেলা অনেক আপনার কথা মনে হচ্ছিল। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু।।

অনেক সুন্দর এবার ছবি আঁকবেন। অনেক দিন আঁকেন নি।। রাণু।।

মা, বাব্‌জা আমি আর ভক্তি বোধহয় আল্‌মোরায় যাব। বোধ হয়

বুধবারে। আশা আর শান্তি বোর্ডিঙে থাক্‌বে। তাহলে। সেখানে গিয়ে আপনাকে ঠিকানা বল্‌ব। চিঠি দেবেন। তাহলে। [শ্রাবণ ১৩২৫]

রাণু॥

এ চিঠির উত্তর দেবেন এই ঠিকানাতেই। এও ভুলে যাবেন না যেন।

রাণু॥

৩০

[অগাস্ট ১৯১৮]

[আলমোরা]

প্রিয় রবিদাদা,

যখন আমি আপনার চিঠি পেলাম তখন তার পরদিনই আমরা চলে এলাম। সেইজন্যে চিঠি দিতে দেরী হয়ে গেছে। আপনি রাগ করবেন না। এখন আমরা আলমোরায়। এখানে কাশীর চাইতে বেশী ঠাণ্ডা। আমরা কাল সন্ধ্যেবেলা এখানে এসেছি। এখন সকাল। খুব রোদ হয়েছে। আমার সামনেই নানা রঙের ফুল রয়েছে। এখানে অনেক লাল ফুল আছে। যেখানে বসে আপনাকে চিঠি লিখছি তার সামনেই লিলি ফুলের পাতা ঝরে পড়েছে। আর ডাণ্ডিতে আসবার সময় ছোট্ট ২ অনেক লাল ফল দেখেছি। আপনাকে পাঠাব সেই ফল আর ফুল আপনি বলবেন যে সেই রকম লাল কি আপনার ভাল লাগে? সেই ফল তুলতে গিয়ে আমার হাতে কি জানি কি ফুটেছিল কিম্বা কামড়েছিল। খুব লাগছিল। আমার নাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখনি আমাদের বাড়ীর সামনে ব্যাঁকা রাস্তায় নেপালীরা মার্চ্চ

কর্‌ছিল। মার্চ্চ হয়ে যাবার পর চেঁচিয়ে ২ কি সব বল্‌ছিল। এখন একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। আমাদের সামনের দেবদারু গাছ নড়্‌ছে আমাদের বাড়ীর সামনে পাহাড় দেখা যায়। কেবল এত দেবদারু গাছ না থাক্‌লে আরো স্পষ্ট দেখা যেত। আমি আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। তাই আমি আপনার সব্‌ শেষের চিঠি সঙ্গে করে এনেছি। অন্য সব আনিনি আন্‌লে যে বাক্সয় ভাল কাগচ আছে সে বাক্স এখনো এসে পৌঁছোয় নি। আমি উল্‌ দিতে জানি না কিন্তু সুনেছি।[১] আপনি কি উলু দিতে জানেন? না জানলে বেশ্‌ হয়। আর মামাও বোধহয় জানেন না। আপনি এখানে যদি আসেন তো বেশ্‌ হয়। দু তিন সপ্তাহ কেবল একটু ছুটী নেবেন। যদি আসেন তো আমি আপনাকে অনেক লাল ফুল এনে দেব। আর আপনাকে গল্প বলব। আর আপনিতো আরো এসেছেন রাস্তায় চেনেন। আসবার সময় রাস্তা কি সুন্দর। আল্‌মোরার কাছেই এত ভীষণ নদী আছে একটা যে তার কাছ দিয়ে যাবার সময় ভয় কর্‌ছিল। সে এত জোরে চল্‌ছে যে খুব দূর থেকে তার শব্দ শোনা যায়। আর কি সুন্দর পাহাড় দেখা যায়। আমি কাল সকালে দুষ্টুমি করে ছিলাম কিন্তু বিকেল থেকে আবার ভাল হয়েছি। মা বলেছেন।। আর আমি বেশী খেতে চেষ্টা করি। কাল সন্ধ্যেবেলা বাব্‌জা মা বলেছেন যে ভোরে উঠেই আপনার কথা ভাবতে। কিন্তু আজ ভোরে উঠেই ওম্‌নিই আপনার কথা মনে হয়েছে। আমি আপনার কথা সব সময় ভাবি।। এখন আমার সামনেই রোদ হয়েছে। এখনি আপনার একটা চিঠি কাশী থেকে ঘুরে এল। এ চিঠি যেদিনই আমরা কাশী ছেড়েছি সে দিনই দুপুরে আমাদের বাড়ী এসেছে। এর উত্তর আলাদা দেব। এবার থেকে আপনি এখানকার ঠিকানায় চিঠি দেবেন। ঠিকানা ভুল্‌বেন না যেন। আর দুষ্টুমি কর্‌লে রাগ কর্‌ব। আপনাকে আদর দিচ্চি। [ভাদ্র ১৩২৫]

রাণু।।

একরকম লাল ফুল।[২]

৩১
[অগাস্ট ১৯১৮]

[আলমোরা]

এটা আগে লিখেছি।

প্রিয় রবিদাদা,

আমি আপনাকে দুপুরে খাওয়ার পর চিঠি লিখ্ছি। আজ সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্চে। তাই অন্য দিনের চাইতে বেশী ঠাণ্ডা। কেবল এখন রৌদ্রের ভেতরেই একটু একটু করে বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের সামনের পাহাড় মেঘে ঢেকে গেছে। আপনি যদি আসেন তো বেশ হয়। আমি কাল যখন আপনাকে চিঠি লিখ্ছি এমন সময় আপনার চিঠি পেলাম। আমি সে চিঠি শেষ করে তাতে ফুল দিয়ে তাকে বন্ধ করে আপনাকে পাঠালাম। তারপর আপনার সে চিঠি পড়লাম। আজও আমাদের বাড়ীর পেছুনদিকে একটা ঘাসে ঢাকা ঢালু রাস্তা দিয়ে ডাকপিয়ন এসে আমার হাথে চিঠি দিয়ে গেল তার থেকে আমি আমার চিঠি বেছে নিয়ে অন্য সব বাব্জাকে দিলাম। যে চিঠি কাশী থেকে ঘুরে এসেছে সে ভারী আশ্চর্য্য এসেছে। তাতে বাব্জার নাম লেখা ছিলনা শুধু ঠিকানা ছিল তবুও চিঠি আমাকে দিয়ে গেল। আপনি আজকাল খুব লক্ষী হয়েছেন। অনেক চিঠি লেখেন। আগের মতন অত ভুলে যাননা। আমারও আপনাকে চিঠি লিখ্তে বেশ ভাল লাগে। আর আপনি প্রায়ই উপাসনার দিন চিঠি লেখেন। আপনি যে 'বীণা বাজাও' গান বলেছেন তা কি আপনি রোজ সন্ধ্যেবেলা গান? অনেকক্ষণ ধরে? আপনি চিঠি পাওয়ার পর আবার লিখেছেন আমি ইস্কুল পালিএছি। কিন্তু আমি পালায় নি। কখ্খনো। যাকে হয় জিজ্ঞেস কর্বেন। আমি ছুটীও নিইনি। বাব্জা জোর করে একটা চিঠি পাঠালেন। চিঠি দেবার সময় এত লজ্জা করছিল। দিয়েই পালিয়ে গিয়েছিলাম। আর আমি এখানে পড়ার

বইও নিয়ে এসেছি। কিন্তু এখানে বেশী পড়িনা। আমি ভূগোলের বইও এনেছি। আর এখন এসিয়া পড়িনা Europe পড়ি। কিন্তু এসিয়ার রাস্তা ভুলিনি। আপনি যদি দূরে কোথাও যান তো আমায় বল্‌বেন আমি রাস্তা বলে দেব। কিন্তু Irkutskএ যাবেন না।[১] মরুভূমি পাহাড় সব পার কর্‌তে হয়। মাটীর ওপর দিয়ে গেলে। কিন্তু আপনিও বেশ্ ভাল। আপনি বেশ্ ঠাকুরের কাজ করেন। আমিও কোর্‌ব। কাল বাব্‌জা বদ্রী সার বাড়ী গিয়েছিলেন। বদ্রী সাও আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। আজ যে চিঠি এসেছে তার উত্তর কাল দেব। আপনাকে চুমু দিচ্ছি। [ভাদ্র ১৩২৫]

রাণু॥

এখনো বেশীর ভাগ জিনিষ আসেনি তাই একটা বিচ্ছিরি কাগচে দিচ্চি। কাগজ এলে তাতে দেব। হ্যাঁ। আপনাকে একরকমের ফুলের পাতা দেব।

রাণু॥

৩২

[অগাস্ট ১৯১৮]

[আলমোরা]

এটা শেষে লিখেছি।

প্রিয় রবিদাদা,

আমি কাল আপনাকে একটা চিঠি লিখে রেখেছি আজ সেই চিঠি যা কাল এসেছিল তার উত্তর দিচ্চি। কিন্তু আপনি একেবারে জিতে যাননি। আপনি বেশী যে চিঠি লেখেন তার উত্তরও তো আমি দিই। সেইজন্যে

আপনি একেবারে জেতেন নি। আপনি যখন আলমোরায় থাক্‌তেন তখন যেমন ক্যান্টর্মেন্টে থাক্‌তেন আমরাও তেমনি ক্যান্টর্মেন্টে থাকি। কিন্তু এ বদ্রী সার বাড়ী নয় বদ্রী দত্তের বাড়ীর। আমাদের বাড়ীর সামনেই অনেক পাহাড় আছে কিন্তু তাঁরও সামনে আমাদের বাড়ীতে এত দেবদারু গাছ যে পাহাড় টাহাড় কিছুই ভাল করে দেখা যায়না। বাড়ী থেকে একটু দূর গেলেই দেখা যায়। আজ আমরা সকালে বাব্‌জার সঙ্গে গিয়েছিলাম। সে সময় ভোর ছিল তাই সব পাহাড়েতে সূর্য্যের আলো লেগে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি অনেক পাহাড়ী ফুল আর পাতা তুলে ছিলাম। আপনাকে অনেক সুন্দর একটা রকমের পাতা দেব। আমিও এখানে আসবার আগে ভেবেছিলাম পাহাড় খুব উঁচু আর ডাণ্ডিওয়ালারা একেবারে পাহাড়ের গা দিয়ে যাবে। ওরা রাস্তা দিয়ে যায়। সে ত সবাই পারে। ওরা যদি সোজা পাহাড়ের গা দিয়ে যেত তো বেশ্ মজা লাগ্‌ত। আপনার সোজা গেলে কি ভাল লাগ্‌ত? যখন রামগড় আসবার সময় সেই সন্ধ্যেবেলা পাইনের বনের মধ্যে দিয়ে আস্‌তে হয় সে সময় সব চাইতে সুন্দর লাগে। তখন কি সুন্দর কুয়াশায় ভরে যায়। সেখানে একটা খুব ঠাণ্ডা জলের ঝরণা আছে। সে জলে শুধু আমি চুপি ২ একটু খানি পা ডুবিয়ে ছিলাম। আপনার কি সেখানটা সুন্দর লাগে। হিমালয় যদি আরো উঁচু হোত তো বেশ্ হত। আপনার কোন্ পাহাড় সব চাইতে বেশী ভাল লাগে। আপনি লিখেছেন আলমোরা ন্যাড়া[১] কিন্তু আমাদের বাড়ীর কাছে আর চারিধারে অনেক সুন্দর ফুলের আর অন্য বড় গাছ আছে। আপনি যদি আসেন তো বেশ্ হয়। আর আপনিও সুন্দর জায়গায় বসে উপাসনা করতে পারেন। আমি আপনাকে উপাসনার সময় ফুল এনে দেব আপনি ঠাকুরকে দেবেন। আপনি আসবেন। [ভাদ্র ১৩২৫]

রাণু॥

৩৩

[২৯ অগাস্ট ১৯১৮]

[আলমোরা]

প্রিয় রবিদাদা,

আজ বেড়িয়ে এসেই দেখি পড়ার টেবিলে আপনার চিঠি রাখা। আমি ভেবেছিলাম যে আজ যদি আপনার চিঠি না আসে তো আপনাকে একটা চিঠি লিখ্‌ব আপনার চিঠি গুনে দেখেছিলাম সোমবারে আস্‌ত কিন্তু দুদিন দেরী হবার পরও এল না। আমার তাই একটু রাগ হয়েছিল সে কিন্তু একটু। আমি ভেবেছিলাম আপনার অসুখ করেছে। চিঠি যেতে কি দেরী হয়। এমন খারাপ লাগে। আপনাকে যেসব চিঠি লিখি তার সঙ্গে যে সব চিঠি ডাকে গেছে অন্য চিঠি যাদের লেখা হয়েছে তারা সব পেয়েছে। আপনি কেন পাননি? এখন দুপুরবেলা। খুব গরম হয়েছে আর খুব রোদ। এখানে বিকেলে প্রায় বৃষ্টি হয়। আর আমরা প্রায় সকালে বিকেলে বেড়াতে যাই। কিন্তু বেশী পড়া হয় না। এ সময় আপনি যদি আসেন তো বেশ্‌ হয় আর আপনারও নিশ্চয় ভাল লাগে। আমরা যে যায়গায় থাকি সেখানটা ন্যাড়াও নয়। বেশ্‌ দেবদারু গাছের ছাওয়ায় বস্‌বেন্‌। আমিত আপনার কাছে গিয়েছিলাম। আর পূজোর ছুটীর সময় তো আমি আবার আপনার কাছে যাব। তাই আপনিও আসুন্‌। আমার এখানকার পাহাড় বেশ সুন্দর লাগে। আসবার সময় রাস্তা সব চাইতে সুন্দর। এখানেতে আমাদের বাড়ীথেকে একটুখানি বেরুলেই অনেক পাহাড় দেখা যায়। পাহাড় থেকে যে সব ঝরনা বেরিয়েছে তারা কি জোরে দৌড়োয়। কিন্তু দূর থেকে সে নদী দেখলে কি শান্ত বোধহয়। আমার ডাণ্ডি থেকে নাম্‌তে খুব ইচ্ছে করছিল। আমি তিনচার জায়গায় নেমেওছি। একটা গ্রাম পাহাড়ের নীচেই সেই গ্রাম আমার খুব সুন্দর লেগেছিল। সেই গ্রামের যা নাম তার মানে

সোনালী। আপনি যদি দেখেন তো আপনারও নিশ্চয় খুব সুন্দর লাগে। আপনি যদি এমন সময় আসেন ছুটী নিয়ে। একটু। আসবেন্। আপনাকে আজকাল অনেক কাজ কর্‌তে হয়। আপনারও নিশ্চয় এ সব কাজ ঠাকুরের কাজ বলে ভাল লাগে। কিন্তু আপনি নিশ্চয় কম খান্। শেষে পূজোর সময় দেখ্‌বেন আমি কি মোটা হয়ে গেছি। আপনি যদি রোগা হন তো আমার আপনার উপুর খুব রাগ হবে। আপনাকে একটা গল্প ভেবে রেখেছি বল্‌ব কিন্তু তাহলে কখ্‌খনো বল্‌বনা। বেশ্ হবে। আমি তো আপনাকে আগের থেকেই বলেছি এম্ এ পাশ করে ছেলেদের পড়াব। আর আপনার চিঠি সব লিখে দেব। আপনি সব ভুলে যান্। দেখবেন তখন আপনারি মতন করে পড়াব। যদি আমি অনেক পড়া জান্‌তাম্ তো খুব শিগ্গির বেশ এম্ এ পাশ করতাম্। আপনি কেন লিখেছেন আমি কিম্ভুতকিমাকার। আপনি তো বেশ্ সুন্দর। আমার আপনাকে দেখে তাই জন্যে একটুও ভয় করেনি। আপনার কি আমার জন্যে মন কেমন করে। আজ এখানে জন্মাষ্টমী।[১] বিকেল বেলা মেলা হবে আজ সেই গুর্খা সৈন্যরা নিশ্চয় খুব মারামারী কর্‌বে। আপনাকে আমার চুমু দিচ্চি। [১২ ভাদ্র ১৩২৫]

রাণু॥

আমাদের জিনিষ এসে গেছে তাই কাগজ ভাল পেয়েছি আনিও তো বেশ্ বড় চিঠি লিখেছি।

রাণু॥

৩৪

[সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

[আলমোরা]

প্রিয় রবিদাদা,

আপনি আমার চিঠি দেরীতে পান কিন্তু আমি আপনাকে কখ্খনো দেরীতে চিঠি দিইনা। প্রায় যে দিন পাই সেই দিনই তার উত্তর দী। আপনি বুঝি ভাবেন আমি আপনাকে চিঠি দিতে ভাল বাসিনা। শুধু মোটা হতেই চেষ্টা করি। কিন্তু না আমার আপনার চিঠি বেশ্ পেলে আনন্দ হয়। আপনি আমার চিঠি না পেলেও লিখ্বেন। আপনার নিশ্চয় আমাকে চিঠি লিখ্তে সব চাইতে বেশী ভাল লাগেনা। আমার আপনাকে লিখ্তে খুব ভাল লাগে। আমার আপনার জন্যে খুব মন কেমন করে। আপনারও করে নিশ্চয়। এখানে থেকে আপনাকে তারা দেরীতে চিঠি দেয় কিন্তু আপনার কাছ থেকে ঠিক সময়ে আসে। আপনি মোটা হতে বলেছেন আর আমি হতে চেষ্টাও করি। আপনার কি মোটা হতে ইচ্ছে করে? এখানে অনেক দুধ পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে গরুর গন্ধ। তবুও আমি খাই। আজকাল আমি নিশ্চয় আপনার সমানই খাই। আর মা বলেন আমি আগের চাইতে ভালও হয়েছি। আমরা রোজ বেড়াতে যাই। এখানে এতদিন হাওয়া ছিলনা কিন্তু কাল থেকে একটু হাওয়া হয়েছে। আমরা রোজ এক ধারার ধারে এসে বসি। এখানে এত দেবদারু গাছ যে সব বাড়ীর নাম এই দিয়ে। আমি একটা দেবদারুর ফল তুলেছি সেটা বেশ বড়। সেই ধারার কাছেই পাইনের গাছ থেকে আমি দু তিন গুচ্ছ ছিঁড়েছিলাম। তার মজার পাতা চিঠিতে পাঠাব। এখানে অনেক রঙের পাহাড়ী ফুল আছে। কিন্তু গন্ধ নেই। আমরা বেড়িয়ে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করি। ঠাকুর প্রণামএর পর আপনাকেও করি প্রণাম? আপনি কি বুঝতে পারেন? আমি দেখবেন

আপনার সেক্রেটারী হব। আর রোগা না হলেই তো হোল। এখানে আজকাল একটুও ঠাণ্ডা নেই। খুব রৌদ্র হয়। আপনাদের ওখানে তো বেশ ঠাণ্ডা? আপনি কি আজকাল সেই নতুন বাড়ীতে থাকেন? আমি যখন যাব তখন আপনি কোন বাড়ীতে থাক্‌বেন? আপনার বাড়ীর চারিধারে কি সব ফুলের গাছ পুঁতেছেন?[১] এবারে সেই অন্য বাড়ীতে সাদা আর সবুজ পাতার গাছ পুঁতবেন না। মালীকে বলে দেবেন। আর আপনি এই বাড়ীর মত অনেক লাল ফুলের গাছ পুঁতবেন আপনার তো লালরঙ সব চাইতে ভাল লাগে।

আজ আপনারই সঙ্গে আশাদের চিঠি এসেছে। আশা আমাকে লিখেছে যে জন্মাষ্টমীর দিন ওদের থিয়েটার হয়েছিল। শান্তি নাকি দেবকী হত কিন্তু অনেক কাঁদবার ভয়ে হলনা। কৃষ্ণ চলে যাবার পর তাকে কিনা খুব কাঁদতে হয়। তাই ও গর্গ মুনি হয়েছিল। ছাই মেখে গেরুয়া কাপড় পরে, কমণ্ডুলু হাতে নিয়ে নাকি সংস্কৃততে বিবাহ রীতি ব্যাখ্যা করেছিল। আশার ঠিক ছিল নারদ মুনি হয়ে সেতার বাজাবে আর গান করবে। কিন্তু যে মেয়েটি বাসুদেব হত তার অসুখ কর্‌ল। থিয়েটার হবার ১ দিন আগে। তখন একদিনের মধ্যে ওকে পার্ট মুখুস্থ করতে হল। তারপর ও মাথায় প্রকাণ্ড মুকুট, হাতে, আর গায়ে হল্‌দে জরীর জামা পোরে তোয়ালেকে কৃষ্ণ করে তাড়াতাড়ীতে সেই কৃষ্ণ হাতে কোরে যমুনা পার হল। একজন ছোট্ট মেয়েকে কর্‌বার্‌ কথা হয়েছিল কিন্তু সে হবার সময় খুব চেঁচাতে লাগ্‌ল। তার বাবা তাকে নিয়ে নিলেন। ও এমন মজার লিখেছে যে পড়ে খুব হাসি পায়। আপনাকে আদর দিচ্চি। [ভাদ্র ১৩২৫]

রাণু ॥

৩৫

[সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

[আলমোরা]

প্রিয় রবিদাদা,

আজ বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে আস্‌ছি এমন সময় ডাকপিয়ন এসে আপনার চিঠি দিয়ে গেল। আর সুবোধ বাবুর কাছ থেকে বাব্‌জার ওসুধও তার সঙ্গে দিয়ে গেল। আমি আপনাকে তাই বাব্‌জার ছোট্ট পড়ার টেবিলে বসে চিঠি দিচ্ছি। এখন দুপুর বেলা। একটুও হাওয়া নেই। আর রোদ নেই। আর আমার সামনেই দুটো লম্বা ২ দেবদারু গাছ রয়েছে। আর তার পেছুনে একটুখানি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আপনারও এ জায়গাটা নিশ্চয় খুব সুন্দর লাগ্‌ত। এখানে তিনচার দিন থেকে একটু বেশী ঠাণ্ডা হয়েছে। সকালে তো খুব কুয়াশা হয়। কোন জিনিষই স্পষ্ট দেখা যায়না। সকালে বিছানা থেকেই দেখি সব দেবদারু গাছ অস্পষ্ট। কুয়াশার ভেতর দিয়ে যেতে এমন মজা লাগে। চুলে জলের ফোটা পড়ে চুল ভিজে যায়। আমাদের একটী ছোট্ট ইউরেশিয়ণ্‌ ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। সে অনেকটা এণ্ড্রুজ সাহেবের মতন দেখ্‌তে। কেবল রঙ্‌ শাদা শাদা। উনি কি আমার চিঠি পেয়েছেন? দেখলেন? আমি আজকাল ওঁকেও চিঠি দি। কেমন, আমি কি আর ওঁকে হিংসে করি। আমি আপনার চিঠিও সবটা না বুঝতে পারলেও বেশ্‌ সুন্দর লাগে আর আমি বুঝতে চেষ্টাও করি। আজকাল আপনি ছেলেদের কদিন পুরোণো পড়া করতে দেন সপ্তাহের মধ্যে আপনি তাদের পুরোনো পড়ার দিন কি করেন? এবার থেকে সেই দিন আমায় চিঠি দেবেন। আমার কাছ থেকে চিঠি না পেলেও। আপনার লক্ষীর পরীক্ষা তো শেষ হয়ে গেছে।[১] আপনি কি এবার সেটা করবেন? আপনি নয় কল্যাণী নয় লক্ষী সাজ্‌বেন। ক্ষীরো সুকুমারবাবুকে হতে বল্‌বেন উনি যা

মোটা। আমরা এখানে বলাকা, চয়নিকা আর অন্য সব বইও এনেছি। আমি বলাকায় বেশীর ভাগ কবিতাই বুঝতে পারি। আর আমি আপনিই পড়ি। আপনি চয়নিকায় যে ভিরুতা[২] বলে কবিতা লিখেছেন না, তাতে সখি কাকে বলেছেন? যদি ঠাকুরকেই বলেন তো সখি কেন বলেছেন। আপনি আমায় উপাসনার দিন কেন চিঠি লেখেন না। আপনি ভারী দুষ্টু। সব জিনিষ ভুলে যান। আমি ভাবি আপনি দেবেন। আপনার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে। আপনারও নিশ্চয় আমার জন্যে মন কেমন করে। আমি এবার November মাসে, দেওয়ালীর ছুটীতে যখন আপনার কাছে যাব তখন ছোট বৌকেও নিয়ে যাব। এখানকার পাহাড়ী মেয়েরা আর মেয়েমানুষেরা সবাই ছোটবৌরা যে সব পুঁথি আর মুক্তোর মালা পরে তাই পরে। দেখুন আপনি রবিদাদার চাইতে একটা ভাল নাম আমায় বেছে দিন। কিন্তু সে নাম সভ্য আর সুন্দর যেন হয়। রবিদাদা তো আপনাকে সবাই ই বলে। আপনাকে আমি আদর দিচ্ছি। [ভাদ্র ১৩২৫]

রাণু॥

৩৬

[সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

[আলমোরা]

প্রিয় রবিদাদা,

শুনুন্, এমন মজা হয়েছে, যে দিনই আমি বেড়াতে যাই সেইদিনই আপনার চিঠি আসে। আপনার চিঠি কাল এসেছিল কিন্তু কেন উত্তর দিইনি জানেন? কাল আশাদের চিঠি দিয়েছিলাম তাই। কিন্তু আমার

আপনাকে চিঠি দিতে বেশ্ ভাল লাগে। আপনি রাগ কর্‌বেন না। আমার আপনার জন্যে মন কেমনও করে। আপনারও নিশ্চয় করে। আজকাল শান্তিনিকেতনে যেমন খুব বিষ্টি হয় তেমনি এখানেও রোজ বিষ্টি হয়। দুপুর বেলা। আজও তেমনি এখন হচ্ছে। কিন্তু জোরে নয়। আপনি কি কোণে বসে চিঠি লিখ্‌ছিলেন না সেই ছোট্ট ঘরে বসে। তখন যদি আমি থাক্‌তাম্ তো বেশ্ হত। কিন্তু মার্জ্জরী নামটা ভারী বিচ্ছিরি।[১] বোধ হয় বেরাল। আপনার নাম কেন ভাল লাগে। কিন্তু আমি আজকাল কখ্‌খনো দুষ্টু হইনা। দেখবেন আপনি আমি রাগ বেশী কর্‌ব না। আজ আবার চুল বাঁধতে হবে। কিন্তু মাকে জিজ্ঞেস কর্‌বেন। আমি বেশী গোলমাল কর্‌ব না। আপনারও চুল আঁচড়াবার সময় শান্ত হয়ে থাকা উচিত। আপনি কি কখন নন্দা পর্ব্বতে গেছেন।। এখান থেকে তা দেখা যায়। সে বরফ পড়েছে তাই শাদা হয়ে গেছে। ওখানে সব সময় বরফ পড়ে থাকে তাই শাদা বোধ হয়। এমন সুন্দর ঝক্‌মক্ করে। আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে। তার শিখর আকাশের সঙ্গে মিলে গেছে। আপনি তো রামগড়ে থাক্‌তেন। আপনার অনেক গানে লেখা আছে রামগড়। সেখান থেকে কি এই পাহাড় দেখা যায়। আমরা আসবার সময় একরাত্তির ওখানে ছিলাম। সেদিন রাত্তিরে সেখানে খুব ঝড় আর বৃষ্টি হয়েছিল। সেখান থেকে কি এই সব শাদা পাহাড় দেখা যায়? আমি স্কটের ছবি দেখেছি কিন্তু সে তো বেশী সুন্দর দেখ্‌তে নয়। আপনার চাইতে ঢের বিচ্ছিরি।। দেখুন বিষ্টি এমন দুষ্টু থেমে গিয়েছিল কিন্তু আবার হচ্ছে। আপনি যদি থাকতেন তো বেশ্ হত। আপনাকে চুমু দিচ্চি। [ভাদ্র ১৩২৫]

রাণু।।

৩৭

[সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

[আলমোরা]

প্রিয় রবিদাদা,

কাল রাত্তির থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।। আজ সকালেও খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। একটু দূরের জিনিষও দেখা যাচ্ছিলনা। এমন সময়েতে ডাকহরকরা বিষ্টিতে ভিজ্‌তে ২ এসে অনেক চিঠি দিয়ে গেল। আপনার চিঠি তার হাথেই ছিল। অন্য চিঠি খুঁজছিল। আপনার চিঠির পেছুন দিক দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমি তখন বাব্‌জার কাছে জিয়োমেট্রী কর্‌ছিলাম। আমার প্রথম চিঠিই আপনি কি দেরীতে পেয়েছেন। কিন্তু তবুও আপনি যে দিন পেয়েছেন চিঠি সে দিনই তার উত্তর দিয়েছেন। আপনি আগের মতন দু তিন মাস অন্তর উত্তর দেননা। আগে কেন অত চিঠির উত্তর দিতে ভুলে যেতেন? এরও উত্তর দিতে ভুলে যাবেন না যেন। আমিও তো আপনার চিঠি পেলেই তার উত্তর দি। আপনাকে আজকাল অনেক পড়াতে হয়। আর আপনি দুপুরবেলা ম্যাট্রিক্‌ক্লাশের ছেলেদের পড়ান। আপনি কি সন্ধ্যেবেলাও ছেলেদের নিয়ে কিছু করান? আপনি তবে একটুও ছুটী পান না। আপনি কখন পালাবেন? আপনার কি বাইরে আসতে ইচ্ছে করে? আপনার কি আমার কাছে আসতে ইচ্ছে করেনা? আমার কিন্তু আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে করে। আপনার কবে সব চাইতে বেশী পালিয়ে আস্‌তে ইচ্ছে করে? বোধহয় উপাসনার পর? এখান থেকেও নীল আর সোনালী পাহাড় দেখা যায়। ওখানে আপনি সারাদিন কি করেন? আমি সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই বেড়াতে যাই। কিন্তু এখানে একটুও শীত নেই। বেড়াবার সময় রাস্তা প্রায় কুয়াশায় ভরে থাকে। ঘাসের উপর দিয়ে যাবার সময় এত জল পড়ে। পাহাড়ের উঁচুভাগ প্রায় বর[ফ] মেঘে ঢাকা থাকে।

মাঝে ২ তারই ওপর সূর্য্যের আলো পড়ে সোনালী দেখায়। আমার একজন পুতুলের নামও সোনালী। আর কাঠগুদাম থেকে আস্‌বার সময় সবুজ পাহাড় নীল দেখায়। কেমন মজা। আপনি সবচাইতে আগে কোন পাহাড়ে গিয়েছিলেন? আপনার নিশ্চয় খুব ভাল লাগছিল। আমারও বেশ ভাল লাগে। আমি এখানে বেশী পড়িনা। শুধু সকালে আর দুপুরে কিন্তু আজ আপনাকে বসে দুপুরেই চিঠি লিখ্‌ছি। এখন মেঘলা কিন্তু এখনি দেখ্‌বেন রোদ হয়েছে। বিকেল বেলা আবার বেড়াতে যাই। আবার রোদ হয়েছে। তখন আমরা যে জায়গায় বসি তার ঠিক সামনেই সূর্য্য অস্ত যায়। এমন সুন্দর দেখায়। যেমন আপনাদের ওখানে মেঘে রঙ হয় এখানেও তেম্‌নিই হয় তখন বাড়ী আস্‌তে সন্ধে হয়ে যায়। আশার তিনচার দিন পরেই জন্মদিন। কিন্তু এবারে আমরা থাক্‌বনা। তাই ওর নিশ্চয় দুঃখু হবে। কাল একটা প্রকাণ্ড খামে আমি আর ভক্তি ওকে অনেক পাহাড়ী ফুল আর ফার্ন পাঠিয়েছি। আপনাকে যে লাল ফুল দিয়েছিলাম তার রঙ কি আপনার ভাল লাগে। এবারে একটু দেব। সে রঙের ফুল অনেক আছে। আমি কিন্তু যতদিন না খুব মোটা হব ততদিন অত লাল হবনা।[১] আপনার জন্যে মন কেমন করে। [আশ্বিন ১৩২৫]

রাণু॥

একটা মজার কথা শুনুন্। এবার আমরা নেই কিনা তাই আশার জন্মদিন শান্তিই কর্‌বে। ও ভারী গিন্নি কিনা তাই। ওই ওকে চুল আঁচড়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে চন্দন পরিয়ে মালা পরিয়ে নিশ্চয় সাজিয়ে দেবে। রাণু।

৩৮

[সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

[মুক্তেশ্বর]

প্রিয় রবিদাদা,

আপনার চিঠি যেদিন পেলাম সেদিন আমার অসুখ করেছিল, আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম আর মা, বাব্‌জা, ভক্তি সবাই মুক্তেশ্বরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমার ঠিক যেমন শান্তিনিকেতনে অসুখ করেছিল তেমনি করেছিল। একটু নড়লেই বমি আস্‌ত। আমি সিনা খেয়েছিলাম তাই অসুখ কোরেছিল। এত কষ্ট হচ্ছিল। আমাদের সোমবারে মুক্তেশ্বরে যাওয়া ঠিক কিন্তু ডাণ্ডি পাওয়া গেলনা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা হল, শেষে একটার সময় খবর এল আজ ডাণ্ডি পাওয়া যাবেনা। আবার বিছানা, ট্রাঙ্ক সব খোলা হোল। সেইদিনই আমার অসুখ কোর্‌ল। মঙ্গলবারে[১] সকালে কিছুই গোছান হইনি এমন সময় ওরা এসে গেল। সেই সময়েই আপনার চিঠি এল। কিন্তু বলুন্‌ তখন কি কোরে উত্তর দি। তারপর সেদিনই ডাণ্ডিতে চড়ে আমরা সন্ধ্যেবেলা মুক্তেশ্বরে এলাম। আপনি কি কখন এখানে এসেছেন। এই জায়গা খুব উঁচু। সিমলের চাইতেও সাতশো ফীট উঁচু। এখানে আলমোরার চাইতে ঢের শীত। দু তীনটে মোটা জিনিষ গায় দিতে হয়। এখানে আমাদের বাড়ীর সামনে একটা বারাণ্ডা আছে। সেই বারাণ্ডা থেকে তিনচার পা গেলেই খড় নেমে গেছে আর সামনেই পাহাড় দেখা যায়। এখানের সব পাহাড় ওক গাছে ভরা আর একটুও ন্যাড়া নয়। এখানে পাইন গাছ বেশী নেই। আমাদের বাড়ীর সামনেই এক লাইন বরফের পাহাড় দেখা যায়। সেগুলোর নীচের ভাগটা দেখা যায়না, কিন্তু তার শিখর দেখা যায়। বোধহয় সেই শিখরগুলো আকাশে ভাস্‌ছে। এসব পাহাড়ে খানিকটায় নীল ছায়া পড়ে আর খানিকটা চক্‌চক্‌ করে। আপনার কি

এখানে আস্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। আপনি আমায় পূর্ণিমার দিন চিঠি দিয়েছেন। আপনি যখন চিঠি দিয়েছেন তখন আমি আলমোরায়। সেই রাত্তিরে আমরা পাইনের বনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেই যার কথা আপনাকে লিখেছিলাম। যেখানে অনেক লাল ফুল আছে। মুক্তেশ্বরে, এখানে আমাদের বাড়ীতে অনেক লাল ফুলেরই রঙের মতন পালক আছে। সে এমন সুন্দর। আপনি কি সেদিন কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন?

আপনার এবারকার উপাসনা বেশ্‌ ভাল হয়েছে।[২] আপনিও তো একদিন ছোট্ট ছিলেন তখন আপনারও বড় মন কোথায় ছিল? আপনি তখন কি ভাব্‌তেন? এখনও তো আপনি বেশী বড় নন্‌। কিছুদিন পরে তো আমার চাইতেও ছোট হবেন। আপনি কিন্তু সেক্সপিয়রএর চাইতে আমার ভাল লাগে। আমি মিল্‌টন আর সেক্সপিয়ার দু জনেরই জীবনি ইংরিজিতে পড়েছি। আর হ্যাম্‌লেট্‌ আর As you like it পড়েছি আর মিল্‌টনের সেই যাদুকরের গল্প পড়েছি।

আপনি কেমন আছেন? আমি বারণ কর্চ্চিনা কিন্তু আপনি কাজ কোরে কোরে রোগা হোয়ে যেতে কখ্‌খনো পাবেন না। তাহলে কিন্তু রাগ করব॥
[আশ্বিন ১৩২৫]

রাণু॥

আমাদের ঠিকানা এইখানে লিখ্‌ছি। এই দেখে দেখে আমার চিঠির ঠিকানা লিখ্‌বেন।

C/o Mr. Ganguli.
Muktesor.
District, Nainital.

৩৯

[সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

[মুক্তেশ্বর]

আদরের ভানুদাদা,

আপনি যখন চিঠি লিখেছিলেন্ তখন জানতেন না যে আমরা মুক্তেশ্বরে। তাই আলমোরার ঠিকানায় চিঠি লিখেছেন। কিন্তু আমরা আলমোরা ছেড়ে এসেছি। তখন আমরা মুক্তেশ্বরে। আপনি আজ বাব্‌জাকে চিঠি লিখেছেন, তাতে এখানকার ঠিকানা দিয়েছেন। আপনি কি এখানে কখনো এসেছেন? আপনি লিখেছেন, আপনাদের গ্রামে বন্যা এসেছে। সে বন্যা কি বিষ্টি হয়ে হয়েছে না নদীর জল বেড়ে হয়েছে? সব প্রজারা কোথায় থাকে? আপনাদের সেই কোল্‌কাতার বাড়ীতে বোধহয়। আপনার তাদের জন্যে বুঝি খুব দুঃখু হয়? আমারও হয়। তারা আপনাকে বোধহয় চিঠি লেখে যে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। আমরা কাল এখানে এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। এখানে এক ল্যাবরটারী আছে। সেখানে দেখুন সব গরু, খরগোশ, কুকুর এই সব মারা হয়। আবার তাদের ভেতর পিচ্‌কিরি কোরে অসুখ ঢোকান হয়। আমার এমন রাগ হয়। কিন্তু ভাল হয়েছি কিনা তাই রাগ করিনা। আপনারও দেখলে রাগ হোত। আর একটা খুব প্রকাণ্ড এঞ্জিন দেখেছি। সেটা একটা ঘরের মাঝখানে বসান। সে ঘরটা খুব গরম আর তার মেজেতে তেল গড়াচ্ছে। এখানে আর একটা খুব উঁচু মন্দির আছে। সে মন্দির ঠিক আট হাজার ফীট উঁচু। বাব্‌জাকে ফেলে আমরা চড়েছিলাম। তার ওপরটা অনেকটা যে রকম পাহাড় আমি ভাবি। আর সেখানের মন্দির এমন মজার। ঠিক পুতুলের ঘরের মতন। আর ঘরের ভেতর একটী ভাঙা পাথর আছে। তার চারিধারে আলপোনা কাটা। আর সেখান থেকে চারিধার দেখা যায়। তার চাইতে উঁচু পাহাড় আর

নেই। সেখান থেকে নীচে তাকালে এমন ভয় করে। আপনার নিশ্চয় এখানে আস্‌তে ইচ্ছে করে। এখানে কেবল আলমোরার মতন অত ফুল নেই। কিন্তু আমরা একটা ফুলের বাগান করেছি। শুনুন্‌, আমি আপনার নাম কবিদাদা ভেবেই রেখেছিলাম। আর ভানু নামটাও বেশ। একটু মোটা মোটা বোধহয়। কিন্তু আমার বেশ্‌ সুন্দর লাগে। আর আর-কেউ আপনাকে ভানুদাদা বলে না। আর বেশ রাণুর সঙ্গে মেলে।[১] এইজন্যে সব চাইতে ভাল লাগে। আর যেদিন আপনি কোনো নতুন কবিতা লিখ্‌বেন সেদিন আপনাকে বল্‌ব কবিদাদা। হ্যাঁ? কিন্তু মার্কণ্ড নামটা ভারী বিচ্ছিরি। বোধহয় যেন কালো, রোগা, একজন মাথায় ঝুঁটি বাঁধা লোক শাঁপ দিচ্ছে। আপনারও নিশ্চয় ও নাম ভাল লাগেনা। আপনার তো ঠাকুরের সঙ্গে ভাব আছে। বল্‌বেন যে সূর্য্যের ও নাম বদ্‌লে দিতে।

আমাদের বাড়ীতে সেই যে একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থাবলী[২] আছে তাতে একটা আপনার ভানুসিংহের পদাবলী বলে বই আছে। আমি কিন্তু আপনাকে শুধু ভানুদাদা বল্‌ব। আর কবিদাদা নামটাও বেশ্‌। কিন্তু আপনার গুনের মধ্যে বুঝি শুধু কবি। আপনি তো সব বিষয়েই ভাল। আমি তো কাউকে আর প্রিয় লিখিনা শুধু আপনাকে লিখি যে লোকটা হিন্দী দোঁহা লিখেছিল সে বুঝি আমার প্রিয় কবি, আমি তার কবিতা বেশী ভালবাসিনা। শুধু এগ্‌জামিন্‌ দেবার জন্যে পড়েছিলাম। পার্ব্বতী যখন হিমালয়ে তাঁর পিতৃভবনে আসবেন তখন আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে এখানে থাক্‌ব। আবার পার্ব্বতী যেদিন বিশ্বনাথের কাছে চলে যাবেন, আমরাও সেদিন ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাব।[৩] আমরা বিজয়ার পরই চলে যাব। কি মজা। তারপর আমি আপনার কাছে যাব। আমার আদর জানবেন।
[আশ্বিন ১৩২৫]

রাণু॥

৪০

[সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

[মুক্তেশ্বর]

প্রিয় রবিদাদা,

আজ সকালে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলাম জানেন? আপনি নিশ্চয় জানেন না আমি যেমন আপনি কোথায় বসে পড়ান ছেলেদের বল্‌তে পার্‌তাম না আপনিও তেমনি পারবেন না। আমরা কান্টর্মেন্টে যে একটা পাইনের বন আছে সেইখানে গিয়েছিলাম। সে জায়গা খুব সুন্দর আর সেখানে বেশীরভাগ গাছই পাইন কিন্তু কতকগুলো ইউকালিপ্‌টাস্‌এরও গাছ আছে। আর তার কাছেই 'বিশ্বনাথ' বলে নদী আছে। সেই নদী এমন জোরে চল্‌ছে যে তার শব্দ দূর থেকে শোনা যায়। এখানকার সব নদীকেই দূর থেকে দেখ্‌লে শান্ত বোধহয় কিন্তু কাছে এলে বুঝতে পারা যায় এমন শব্দ করে। আলমোরার কাছেই সেই যে একটা ভীষণ নদীর কথা আপনাকে লিখেছিলাম সেই নদীকেও দূর থেকে দেখ্‌লে শান্ত বোধহয়। সেই পাইন বন কাল সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে যাবার সময় আবিস্কার করা হয়েছে। দূর থেকে দেখ্‌লে তাকে ভাল কোরে বোঝা যায়না। সেই বনের ভেতর দিয়ে একটা ঢালু রাস্তা অনেক ঘুরে আমাদের বাড়ীর কাছেরই একটা রাস্তায় এসে পড়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে নীচে নাম্‌বার সময় এমন মজার গড়িয়ে পড়া যায়। রাস্তার দুপাশে সুন্দর ২ লাল অনেক ফুল ছিল। আপনি বোধহয় যখন এসেছিলেন তখন এসব ফুল ছিলনা তাই আপনার ভাল লাগেনি। এবারে এলে আপনার নিশ্চয় ভাল লাগ্‌ত। কিন্তু আপনি নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করেছেন এখানে আস্‌বেন না। কাল আবার সব পাহাড়ীদের কিসের পর্ব্ব ছিল। তাই চারিদিকের যত পাহাড় আছে, তাতে আবার যত গ্রাম আছে তাতে প্রত্যেকটাতে আগুন জ্বলছিল। বেশ্‌ সুন্দর দেখাচ্ছিল। বেড়িয়ে এসেই

দেখি আমার পড়ার ঘরে টেবিলের ওপর আপনার চিঠি রাখা রয়েছে। আর কারুর চিঠি আসেনি। এখানে আমার একটা আপনার সেই তেতলা ছোট্ট শোবার ঘরের মত একটা পড়ার ঘর আছে। সেই ঘরে একটা খুব বড় জান্‌লার সামনে একটা টেবিল পাতা আছে। সেই ঘরেই আমি বেশী থাকি। সেখানে ভক্তিরও পড়্‌বার চেয়ার আছে কিন্তু ও প্রায় আসেই না। আমি আপনাকে দুপুর বেলা চিঠি লিখ্‌ছি। আপনিও নিশ্চয় এবারের চিঠি দুপুরবেলাতেই লিখেছেন, একটুখানি তাড়াতাড়ী খেয়ে। আপনার আজকাল third ক্লাশের ছেলেদের পড়াতে নিশ্চয় খুব ভাল লাগে। আপনি তো প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই ওদের কথা লেখেন। আজকালও কি ওরা আপনাকে ভয় করে। আপনি কি ওদের স্কট্ থেকে পড়ান্? সেদিন যে আমায় স্কটের বন্ধুর কথা লিখেছিলেন,[১] তার কথা কি আপনি ওদের পড়া খুঁজতে খুঁজতে পেয়েছিলেন? আপনি লিখেছেন ওদের কলেজের মত শক্ত পড়া। আপনি তাহলে তো অনেক পড়া জানেন। মামা আপনাকে তাহলে কখ্‌খনো আমাদের সঙ্গে পড়াতেন না। আর আপনি বেশ্ ভাল। ঠাকুরের কাজও করেন আর ঠাকুরকে ভালবাসেন। আমিও আপনার মতন ভাল হব। আমি তো আপনার কাছে থাক্‌তে চেয়েছিলাম আপনিই ভয় পেলেন। আমার আপনার কাছে পড়্‌তে বেশ্ ভাল লাগে। শুনুন্, ফর্ষ্ট অক্টোবারে মিসেস বেসেন্টের জন্মদিন। তাই আশাদের ইস্কুলে ও সময় উৎসব হয়। এবার কলেজের মেয়েরা আপনার ডাকঘর ইংরিজিতে করবে। ওদের কলেজে আশাই সব চাইতে ছোট তাই ও অমল সাজ্‌বে। ওদের মিস্ ভীল এইটে করাবেন।

এণ্ড্রুজ সাহেব শারোদোৎসব কি শিখিয়ে দিয়েছেন? আপনার ওটা কবে করাবেন?[২] এখানে আমি ছোটবৌকে, আর কোন পুতুলকে সঙ্গে আনিনি তাই একটা কাপড়ের পুতুল বানিয়েছি। তাকে এখানকার পাহাড়ীরা যে রকম কাপড় পরে সেই রকম কাপড় পরিয়েছি। এবার যখন আপনার

কাছে যাব তখন তাকে নিয়ে যাব। এণ্ড্রুজ সাহেবএর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেবেন। বেশ হবে। তার নথ পরা নেই বেশ্ সভ্য করেছি। আপনাকে চুমু দিচ্ছি। [আশ্বিন ১৩২৫]

রাণু॥

৪১

[অক্টোবর ১৯১৮]

[মুক্তেশ্বর]

রাণুর ভানুদাদা,

পর্‌শু থেকে আমার অসুখ হয়েছিল। তাই কাল সকালে বিছানায় শুয়ে ছিলাম, এমন সময় ভক্তি আপনার চিঠি এনে দিল। আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হোলাম। এবারে কিন্তু আপনি দেরীতে চিঠি দিয়েছেন। আজ আমি কাল্‌কের চাইতে ভাল আছি। আমি কালই আপনার চিঠির উত্তর দিতাম কিন্তু খুব দুর্ব্বল ছিলাম বলে মা বারণ করেছিলেন। কাল বিকেলে এখানে খুব মেঘ করে বিষ্টি হয়েছিল। আমি তখন বিছানায় কম্বল গায় দিয়ে শুয়েছিলাম। এমন সময় ছড়্‌ছড়্ কোরে ছোট ২ শিলা বিষ্টির সঙ্গে পড়্‌তে লাগ্‌ল। ভক্তি শিলা কুড়ুচ্ছিল। আমি কম্বল ছেড়ে দৌড়ে বাইরে গেলাম। গিয়ে দেখি সামনে ফুলের গাছ্এর তলায় ছোট ২ শিলা পড়েছে। আর বারাণ্ডায় এসে পড়ছে। মা কিন্তু দেখুন জোর কোরে ঘরে সেই বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তখন এমন রাগ হচ্ছিল যে কি বলি। তারপর মাকে অনেক বলে জানলার কাঁচ দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম্। তখন সামনের ফুলের গাছের তলা শাদা হোয়ে গেছে আর সব গাছ নুয়ে পড়্‌ছে। এমন সুন্দোর দেখাচ্ছিল।

আমি যখন আপনাকে প্রথম চিঠি লিখেছিলাম তখন আপনি আমার কাছে নিতান্ত কেবল মাত্র রবিবাবুই বুঝি ছিলেন? তখনও আমি আপনাকে ভালবাস্‌তাম্। কিন্তু তখনকার চাইতে এখন বেশী ভাল-বাসি। আমি আপনাকে তো আর ইংরিজি কায়দায় প্রিয় লিখিনি। প্রিয়র বাঙ্‌লা মানে যা হয় তাই লিখেছি।[১] আমি আর কাউকে প্রিয় লিখিও না। আপনি তো কবিতায় অনেক প্রিয় লেখেন, আমি লিখলেই বুঝি যত দোষ। আমি প্রিয় যে চিঠি লেখ্‌বার পাঠ তা জানিও না। আপনাকে প্রিয় লাগে বলেই লিখি। আপনি ঠাকুরকে যেমন প্রিয় বলেন, আমিও আপনাকে তেমনি প্রিয় বলি। ডালহৌসী পাহাড় বুঝি খুব সুন্দর। ওখানে আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে। বক্রুটা নামটা কি মজার। যেন মার্ত্তণ্ডর বোন। দেখুন পাহাড়ের গাছগুলো সত্যিই বড় হয়। দেখ্‌লে বড় ভয় করে। এখানে আমরা একটা জঙ্গলে বেড়াতে যাই। সেই জঙ্গলে এত ওক গাছ যে তার ভেতরটা অন্ধকার। সেখানে রাত্তিরে অনেক চিতাবাঘ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড stag আসে। এখানে রাত্তিরে বারাণ্ডায় বার হতে নেই। বাঘ আসে। আমরা বিকেলে সেই বনে একটা প্রকাণ্ড পাথরের উপর বসি। তার সামনেটা খোলা, অনেক দূর দেখা যায়। সেই পাথরের সাম্‌নেটা খুব ঢালু। সেই ঢালু দিক্ দিয়ে ওঠা নামা খুব শক্ত। আমাতে ভক্তিতে সেখানে ওঠানামা খেলা করি। খুব মজা হয়। আপনি যদি আস্‌তেন তো আপনাকে নিয়েও খেলা কোর্‌তাম্। পাহাড় আমার বেশ্ ভাল লাগে। আপনার কেমন লাগে? আপনি আমার আদর জানবেন। আর চুমু॥ [আশ্বিন ১৩২৫]

রাণু॥

ভানুদাদা।

৪২

[অক্টোবর ১৯১৮]

[মুক্তেশ্বর]

আদরের ভানুদাদা,

আপনার চিঠি[১] পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। দেখুন এবার থেকে আমি আপনাকে ভানুদাদা বলেই ডাক্‌ব। আপনি সুরবালা খগেন্দ্রমোহিনী জগদম্বা এসব নাম কোথায় পেলেন? কি বিচ্ছিরি নাম? ওর চাইতে রাণু নামটা ঢের সুন্দর। কানু-বিলাসিনী নামটা বোধহয় আজকাল কারুর হয়না। আর শুনুন্ যদিই হয় তবুও সে আপনাকে অনেক চিঠি দিলেও আপনি তার উত্তর দেবেন না। হ্যা? দেখুন নামের অপভ্রংস করে মেলানো উচিত নয়। আর নাম থেকে খানিকটা কথা নিয়ে নেয়াও উচিত নয়? আপনার নাম মানে ধরে করা হয়েছে। নাম তো আর খারাপ করা হয়নি। আমারও তো দেখুন দুটো নাম। দুটোই আলাদা আলাদা। সেই নামেতেই ভানুর সঙ্গে মেলে। বেশ মজা না? আর অন্য কেউ থাক্‌লেও তো আপনি উত্তর দেবেন না। আপনাদের ওখানে এতদিনে বোধ হয় ছুটী সুরু হয়েছে। আমাদের কাশীর স্কুলেও সুরু হয়েছে। যদি আমি কাশী থাক্‌তাম্ তাহলে বোধহয় এখন আপনার কাছে যেতাম। আমাদের ইস্কুলে পোনেরো ষোলো দিন ছুটী হয়। কিন্তু এবারে যদি আপনার কাছে যাই তো বোধহয় পাঁচ ছ দিন থাক্‌ব। আমরা মুক্তেশ্বর থেকে এ বুধবারের পরের বুধবারে যাব। এখানে আজকাল বিকেল বেলায় খুব বৃষ্টি হয়, তাই খুব শীত হয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় সব চাইতে শীত হয়। কাশীতে আশারা লিখেছে যে খুব গরম হয়েছে আর অসুখ হচ্ছে। আমাদের নিশ্চয় ওখানে গিয়ে খুব গরম হবে। আপনি কি কখোনো এখানে এসেছেন? আশাদের ইস্কুলে যে ডাকঘর হবে বলেছিলাম না, তা 1st Octoberএ হয়েছিল। আর আশা লিখেছে

যে ওরা খুব সুন্দর অ্যাক্ট্ করেছে। আর আপনি যে বিসর্জ্জন ইংরিজি ট্র্যানস্লেশন করেছেন না তা boys' ইস্কুলের ছেলেরা প্লে করেছিল। তাও নাকি বেশ্ সুন্দর হয়েছে। আপনাদের শারোদোৎসব কি করা হয়েছে? আপনি যে বলেছিলেন হবে। কেমন সুন্দর হয়েছে? আপনার বুধবারের উপাসনা বেশ্ সুন্দর হয়েছে। আপনি যেমন সুন্দর তেমনি আপনার মনও সুন্দর তাই আপনি সুন্দর সুন্দর কথা বল্‌তে পারেন। না? আপনাকে আমার আদর দিচ্ছি। চুনুও [আশ্বিন ১৩২৫]

রাণু॥

রাণুর ভানু॥

৪৩

[অক্টোবর ১৯১৮]

[কাশী, মুক্তেশ্বর থেকে ফিরে]

আদরের ভানুদাদা,

আপনার ভ্রমণ বৃত্তান্ত[১] ভারী মজার আপনার যেমন অনেক ক্ষণ বসে থাক্‌তে হয়েছিল এঞ্জিনএর জন্যে আমাদেরও তেম্‌নি মুক্তেশ্বর থেকে কাঠগুদাম আস্‌বার সময় আপনারই মতন দেরী হয়েছিল। আমাদের ঠিক হয়েছিল যে প্রত্যেক ডাণ্ডীতে ছ জন কোরে লোক থাক্‌বে। মুক্তেশ্বরের সিমানায় আস্‌তেই বাব্‌জার ডাণ্ডী থেকে একজন লোক পালিয়ে গিয়ে মার ডাণ্ডীয়ালাদের সঙ্গে যেতে লাগ্‌ল। বাবজার ডাণ্ডি অনেক পেছনে ছিল। আমরা মুক্তেশ্বর থেকে দু মাইল দূরে একটা জায়গায় প্রায় দু ঘণ্টা বসে রইলাম। এমন সময়ে দেখি বাব্‌জা হেঁটে, আর দুটো ডাণ্ডীয়ালা

ডাণ্ডী কাঁধে কোরে আস্‌চে। বাব্‌জাকে নাকি ডাণ্ডীয়ালাগুলো আধ রাস্তায় ডাণ্ডীশুদ্ধু ফেলে পালিয়েছে। দুটো কেবল পালায়নি। তার পর আরো এক ঘন্টা বোসে থাকার পর আবার কতকগুলো ডাণ্ডীয়ালা এল আর তারপর নিয়ে গেল। খুব দেরী হোয়ে গিয়েছিল। রাস্তাতেই অন্ধকার হোয়ে গিয়েছিল। তার উপুর আবার রাস্তা এমন বিচ্ছিরি। রাত্তির বেলা একজায়গায় রাস্তা নেই। একটা পাহাড়ী নদী পার হোয়ে গেলে তবে রাস্তা। ডাণ্ডীয়ালারা সেই নদীর ওপর দিয়েই গেল। ওদের হাঁটু পর্য্যন্ত পা ভিজে গেল আমাদেরও কাপড়ে ছিটে লেগেছিল। কিন্তু ভারী মজা লাগ্‌ছিল। আপনার হলেও মজা লাগত। শেষে রাত নটার সময় ভীমতালে পৌঁছুলাম। আপনি কি কখনো ওখানে গ্যাছেন? ওখানে একটা খুব সুন্দর হ্রদ আছে। আর সেই হ্রদের চারিদিকে একটা প্লেন রাস্তা গ্যাছে। আমরা পরদিন সকালে ওখানে একটু বেড়িয়েছিলাম। তার পরেতে আমাদের আর কোনো দেরী হয়নি। আমরা এখন কাশীতে। আর আমি তো বেশ্‌ ভাল আছি আর মাকে জিজ্ঞেস কোর্‌বেন, আমি যতটা দুধ খেতে দেওয়া হয় সব খেয়ে ফেলি। কাশীতে বেশী গরম নেই কিন্তু এখানে অখুখ [য] হচ্চে। শান্তির অসুখ কোরেছে। আপনি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়েছেন। আপনার মন যদি ইঞ্জিনের মতন বেঁকে গিয়েছিল তো আমার মন কেন ধার কোর্‌লেন না।।

আপনি এখন কেমন আছেন? আপনি কি আশ্রমে গেছেন? আমি বোধহয় বাব্‌জার সঙ্গে দেওয়ালীর ছুটীতে আপনার কাছে যাব। তখন তো আপনার ছুটী থাকবে। না?

দেখুন, আমরা এবারও আলমোরায় যাবার রাস্তার মতন একটা পাইন বনের ভেতর দিয়ে এসেছিলাম। তখন সন্ধ্যে হোয়ে গিয়েছিল। রাস্তার পাশ দিয়েই একটা নদী গেছে। এই নদীকে আমাদের তিনবার পার হোতে হয়েছিল। আর এ প্রায় সারা রাস্তাই আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত এসেছিল। রাত্তির বেলা যে নদী পার কোরে ছিলাম তাও সেই নদীই।

কিন্তু বনের ভেতরে কেবল রাত্তিরে লণ্ঠন নিয়ে যেতে হয়েছিল। না ত খালী রাস্তায় খুব চাঁদ উঠেছিল। তাই নদী খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমার খুব ভাল লাগ্‌ছিল। আপনারও খুব ভাল লাগ্‌ত। আমরা কিন্তু পাঁছুলাম্‌। আপনার ভ্রমণ তো শেষ হোলো না। আপনাকে আদর দিচ্ছি। চুমুও।
[কার্তিক ১৩২৫]

রাণু॥

রাণুর।

ভানু।

৪৪

[৩ নভেম্বর ১৯১৮]

আপনি কি কোরছেন?[১]

আদরের ভানুদাদা,

আজ থেকে আমাদের ইস্কুলে ছুটী হোয়ে গেছে। আরো চারদ্দিন পরে ইস্কুল খুলবে। আমাদের ঠীক হোয়েছিল যে আজিই ট্রেণে চড়্‌ব। আর কাল আপনার কাছে গিয়ে পাঁছুব কিন্তু বাব্‌জার মীটিং সুরু হোয়ে গেল। এখনও বোধহয় একসপ্তাহ পর্য্যন্ত মীটিং হবে। তাই জন্যে দেখুন্‌ যাওয়া হোলো না। আপনার দুঃখু হচ্চে না? আমাদের প্রাইজ দু তিন সপ্তাহ পরেই হবে। সেইজন্যে এবারে ছুটীতে ইংরিজি, বাঙ্‌লা, সংস্কৃত কবিতা শ্লোক এইসব মুখস্ত কোর্‌তে দিয়েছেন। আপনি হোলে কি কোর্‌তেন? আপনার আজকাল সারাদিন কি কাজ। আপনি কি করেন। আপনি আজকাল বোধহয় ছাতে বসেন। আজকাল কোনে বোসে বোসে

কি করেন। আপনি সেই নতুন বাড়ীতে কবে যাবেন? কাশীতে এখন শীত হোয়েছে। সকালে গরম জামা পরি। আপনি ওখানে গরম জামা পরেন? আজকাল কাশীতে খুব অসুখ হচ্ছে তাই বাবজাদের পনেরো দিন ছুটী হয়েছে। কিন্তু মীটিংএর জন্যে যাওয়া হচ্ছেনা। আরো অনেক দিন হবে। কিন্তু আমি নিশ্চয় আপনার কাছে যাব ॥ কাল আমার জন্মদিন।[২] আমি কালও আপনাকে চিঠি লিখ্‌ব। আপনি কি সেখানে প্রদীপ জ্বালবেন? আমরা এখানে অনেক প্রদীপ জ্বাল্‌ব। আর আজ চোদ্দটা প্রদীপ জ্বাল্‌ব! কাল আমরা নৌকা কোরে গঙ্গায় বেড়াতে যাব। কাল সারা কাশীতে আলো জ্বলবে। আপনি যখন আমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌চেন, তখন আমি নিশ্চয় ভাল হব। আমি তো ভাল হবার ইচ্ছাই করি। আপনার গীতপঞ্চাশিকা পড়েছি। সেই বৈয়ের গান তো আপনার মুখে শুনেছি। সবার সাথে চল্‌তে ছিল গানটা আপনাকে লিখে দিতে বলেছিলাম।[৩] আপনি যেমন লিখে দিলেন না তেম্‌নি আমি পেয়ে গেছি। কেমন? ওই গানটা আর তার সুর আমার খুব ভাল লাগে। আপনাকে আদর দিচ্ছি। [১৬ কার্তিক ১৩২৫]

রাণু।

৪৫

[১৯১৮]

আদরের ভানুদাদা,

আপনার পলাতকা বলে যে বই আপনি আমায় পাঠিয়েছেন,[১] তা আমি এখুনি পেয়েছি আর খুব খুসী হয়েছি। আমি পড়্‌ছিলাম এমন সময় ডাকয়ালা এসে দিয়ে গেল। আমি বইটা খোলবার আগে ভাব্‌লাম্‌ যে

আপনি বাব্‌জাকে কি বই দিয়েছেন। আমি ওপরের মলাট ছুরী দিয়ে খুল্‌লাম্‌। খুলে দেখে আমার খুব আনন্দ হোলো। আপনি বেশ্‌ লক্ষী। কেমন আমার নাম লিখে দিয়েছেন। আমি খুব যত্ন কোরে রাখ্‌ব। আর আপনি ওতে যে সব ভুল আছে সব ঠিক কোরে দিয়েছেন। আমি বই এখনো ভাল কোরে পড়িনি কিনা, পড়্‌লে পর আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস্‌ কোরব। কেমন? বইয়ের ওপরের মলাটে আপনার নাম এত হাল্কা কালীতে লিখেছে কেন? আমি কাল আপনাকে চিঠি দিয়েছি। আমি পলাতকা পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। আপনাকে আমি অনেক আদর আর চুমু দিচ্ছি। [১৩২৫]

রাণু ॥

৪৬

[৫ নভেম্বর ১৯১৮]

আদরের ভানুদাদা,

আপনার নাম কেমন ফুলের পাতার মধ্যে ঢেকে গেছে। আমি আপনার দুটো চিঠি পেয়েছি কিন্তু দেরীতে উত্তর দিয়েছি বোলে তো আর আপনি রাগ করেন নি। হ্যাঁ? আমি আপনাকে ইস্কুল থেকে এসে চিঠি দিচ্ছি। আজকাল আমাদের ইস্কুলে আড়াইটার সময়েই ছুটী হোয়ে যায়। শুধু পাঁচ পিরিয়ড হয়। আপনি যদি আমাদের ইস্কুলে এই সময় আস্‌তেন তো আপনার সুবিধেই হোত। মোটা দিদিমণি যে সময় ড্রয়িং করাতেন সেই পিরিয়েড্‌টা আজকাল আর হয়না 9th ডিসেম্বর থেকে আবার ছয় পিরিয়ড্‌ই হবে। কিন্তু আপনার এখন যা কাজ, আপনি কি কোরে ইস্কুলের পড়া কোর্‌বেন? কিন্তু আপনার নিশ্চয় এখানে আস্‌তে ইচ্ছে করে। আপনি আজকাল কাজ কোরে কোরে নিশ্চয় রোগা আ আ আ আ হোয়ে গেছেন। আমার আপনার

কাছে খুব যেতে ইচ্ছে করে। বাব্‌জা আবার কোল্‌কাতায় গেছেন ফিরে যাবার সময় বোধহয় একবার আপনার কাছে যাবেন।[১] এখানে আজ মিসেস্‌ বেসেন্ট আস্‌বেন। তাই নাকি আশারা থিয়োসফিকল্‌ সোসায়েটীটা খুব সাজিয়েছে। কাল রাত্তিরে আশা এসেছিল কিন্তু আজ সকালে চোলে গেছে। ওরা বল্‌ছিল যে কি মজা হবে। ইস্কুলের মেয়েরা একটা থিয়েটার কোর্‌বে। কাশীতে পরশু খুব আলো জ্বালা হোয়েছিল।[২] বোধহয় অন্য সব সহরেও জ্বালা হোয়েছিল। আপনি কি জ্বেলেছিলেন? আপনি লিখেছেন দিনুবাবু আর কমল্‌ আপনার বাড়ীর নীচের তলায় এসেছেন? তো বৌমা কোথায় গেলেন। হারিয়ে গেছেন? আর এণ্ড্রুস্‌ সাহেব বার বার চোলে কেন যান? আপনিও এবার কাশী চোলে আসুন না? আমি যে ছবিটা এঁকেছি সে কি নামের আমি এখনো তা ঠীক করিনি। আপনি একটা তার মঞ্জুলিকার মত সুন্দর নাম বেছে দেবেন। ও তো আপনার কাছেই রইল। ও গাব্‌লোর বৌ কিম্বা ছোট বৌ নয়। ছোটবৌরা ওর চাইতেও সুন্দর। আজকাল কাশীতে খুব ঠাণ্ডা। সকাল বেলা খুব মেঘলা থাকে। কিন্তু বিষ্টি হয়না। বোলপুরে আজকাল কত ঠাণ্ডা। কাশীর চাইতে নিশ্চয় কম? কিন্তু কাশীতে খুব অসুখ হচ্ছে। আমি আজকাল রোজ এস্রাজ বাজাই আর সারেগামা এই সব বেশ্‌ ভাল কোরে বাজাতে পারি। কাল রাত্তিরে এখানে খুব বিষ্টি হোয়েছিল তাই সারা সকাল মেঘলা ছিল কিন্তু এখন খুব রোদ। আপনি আজকাল হিন্দি নিশ্চয় ভুলে গেছেন। এবার যখন যাব তখন নিশ্চয় আপনি আবার সব ভুলে যাবেন। আমাদের বাঙ্‌লা বই আর একটা বেড়েছে কিন্তু সেটা ভাল বই। সেটা ব্যাকরণ। আপনি কাজের লোকেদের চাইতে ঢের ভালো আর আপনিও তো কতো ভালো কাজ করেন। আপনাকে আমার আদর দিচ্ছি। [১৯ কার্তিক ১৩২৫]

রাণু॥

৪৭
[২০ নভেম্বর ১৯১৮]

আদরের ভানুদাদা,

কাল আমরা কাশীতে এসেছি। আমি কালই আপনাকে চিঠি দিতাম কিন্তু ডাক চলে গিয়েছিল তাই চিঠি দিইনি।[১] তাই আমি আজ সকালেই আপনাকে চিঠি দিচ্ছি। আপনিও নিশ্চয় আমায় চিঠি দিয়েছেন। যদি আমরা যেদিন চলে যাই সেই দিনই দিয়ে থাকেন তো আজ আপনার চিঠি নিশ্চয় পাব। আপনি এখন কি কর্‌ছেন? আপনার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে। আপনার কাছে আমার যেতে ইচ্ছে করে। রাস্তায় আমাদের গাড়ীতে একটুও ভীড় হয়নি। কিন্তু বোলপুর ইষ্টিষানে পৌঁছুতে দেরী হয়েছিল। যেই আমাদের গাড়ী ইষ্টিষাণে পৌঁছুল অমনি গাড়ী এল। তখন তাই তাড়াতাড়ি কোরে গাড়ীতে উঠ্‌লাম। টিকিট কেনবার সময় হলনা। শেষে রামপুরহাটে গিয়ে টিকিট কেনা হল। আমাদের কোনো কষ্ট হয়নি। আপনার জন্যে আমার মন কেমন কর্‌ছিল। লিলু[২] আমাদের কাশীর ইষ্টিশানে নিতে এসেছিল। আশা বাড়ী নেই তাই আজ ওর সঙ্গে দেখা কোর্‌তে যাব। আপনি যে ছাতা আমায় দিয়েছিলেন সেই ছাতা আমি দেখিয়েছি। ছাতাটা বেশ্ সুন্দর, না? আজ আমাদের ইস্কুলের গাড়ীর গাড়োয়ান এসে বোলে গেল যে আমাদের ইস্কুল বাব্‌জাদের কলেজ খোলার সঙ্গেই খুলবে। কাশীতে বেশী ঠাণ্ডা নয়। বোলপুরের চাইতে গরম। আপনি কিন্তু ওখানে ঠাণ্ডা লাগাবেন্ না। আমার ট্রেণে একটুও খোঁপা খারাপ হয়নি। আর বোধহয় মাথা থেকে একটাও কাঁটা পড়ে যায়নি। মাকে খোঁপা দেখিয়েছি। মা বলেছেন যে খোঁপা খুব সুন্দর বাঁধা হয়েছে। সত্যি। আর শুনুন্ মা বলেছেন যে আমি, আমি একটু মোটা হয়েছি। আর আমি বলে দিয়েছি যে

আপনি রোগা হোয়ে গেছেন। কেমন। আপনাকে চুমু দিচ্ছি।
[৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৫]

রাণু॥

৪৮

[নভেম্বর ১৯১৮]

আদরের ভানুদাদা,

আমি যেদিনই কাশীতে এসেছি তার পরের দিনই আপনার চিঠি পেয়েছি।[১] আর আমি নিশ্চয় ভেবেছিলাম যে সেদিন আপনার চিঠি পাব। আমি আপনার চিঠি পেয়ে খুসী হয়েছি। আমাদের আজ ইস্কুল খোলবার কথা ছিল। তাই আমি দশটার মধ্যে তৈরী হোয়ে রইলুম, কিন্তু গাড়ী এলই না। তাই জানিনা যে কবে ইস্কুল খুলবে। বোধ হয় মামার অসুখ কোরেচে। গাড়োয়ান বোলে গিয়েছিল যে কখন ইস্কুল খুলবে তার ঠীক নেই। আপনাদের ইস্কুল তো ৩ ডিসেম্বরে খুলবে। আজ বাব্‌জা এলাহাবাদে সকালেই চলে গেছেন। আজকাল বাব্‌জা খুব কাজ করেন। আপনি আজকাল কত কাজ করেন? লক্ষীটী, আপনি বেশী কোরে খাবেন। আর আরো রোগা হোয়ে যাবেন না। আপনি এবারেতে আগের চাইতে রোগা হোয়ে গেছেন। হ্যাঁ। আপনি কি সেই নাটকটা শেষ কোরেছেন? আপনি আরো কটা গান তাতে দিয়েছেন?[২] আমি আজকাল শিশুমহাভারত প্রায় বোল্‌তে গেলে পড়িই না। আমাদের ইংরিজি বইটাতো ভালো, আমি সেইটা পড়ি। আমি রোজ সন্ধ্যেবেলা এস্রাজ বাজাই। আমি এখানে এখনও একটাও গল্প লিখিনি। এখানে যে কোনো লোক নেই গল্প বল্‌বার। হিন্দুস্থানী

সেই দুটো গল্প আমি আপনাকে কাল পাঠিয়ে দেব। আমি আপনার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী নিশ্চয় হব। তখন আমি আপনার সব জঞ্জাল পরিষ্কার কোরে দেব। আর আপনাকে এমন সুন্দর সাজিয়ে দেব যে আপনাকে পৃথিবীর [সব] চাইতে সুন্দর দেখাবে। আপনি চুল কাট্‌বেন না। আমি কাল স্বপ্ন দেখ্‌লাম্ যেন আপনি ট্রেনে কোরে বিলেত যাচ্ছেন। আর সেই ক্যারেজটা যেন বাড়ীর ঘরের মত। আমার আপনার জন্যে মন কেমন করে। আমি আপনাকে চুমু দিচ্ছি। [অগ্রহায়ণ ১৩২৫]

রাণু॥

৪৯

[ডিসেম্বর ১৯১৮]

আদরের ভানুদাদা,

এবারে আপনি এত দেরীতে কেন চিঠি দিয়েছেন? কিন্তু আমি রাগ করিনি আর আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। বাব্‌জা আপনার কাছ থেকে ফিরে এসেছেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা আপনার কাছে আমার খুব যেতে ইচ্ছে কর্‌ছিল আর এখোনো করে। আর আমার আপনার জন্যে খুব মন কেমনও করে। আর আমার শিশুমহাভারত আর চারুপাঠএর চাইতে আপনার গান ঢের ভাল লাগে। আপনি ভারি দুষ্টু। আপনি বুঝি ভাবেন আমি আপনাকে ভাল বাসিনা। কিন্তু আপনি কেন আমার কাছে এলেন না। যান্, আপনি ভারী দুষ্টু। আপনি যদি বিলেতে চলে যান্ তো আমি আপনার কাছে মার সঙ্গে যাব যদি বাব্‌জার ছুটী না হয়। তখনও বেশ্ মজা হবে। আজকাল আপনি রোজ সন্ধ্যেবেলা গান তৈরী করেন। আমি

যদি থাক্‌তাম তাহলে কিন্তু আপনার গান শুন্‌তাম আমি আপনাকে একটা গান বানাতে দেখেছি। আপনি আর কটা বানিয়েছেন? আপনার ইস্কুল খুলে গেছে কিন্তু আমার ইস্কুল পরশু খুল্‌বে। এতদিন শুধু তিনটী ক্লাস হচ্ছিল। আজকাল তিনটের সময় আমাদের ছুটী হয় কিন্তু পরশু থেকে চার্‌টের সময় হবে। আজকাল এখানে চার্‌টের্‌ সময়ই সব রোদ পড়ে যায়। সন্ধ্যের মতন দেখায়। আর আজকাল কাশীতে খুব ঠাণ্ডা। আজ তো খুব ঠাণ্ডা হয়েছে। অনেকটা মুক্তেশ্বরের ঠাণ্ডার মত। সকাল বেলা জল খুব ঠাণ্ডা থাকে। দেখুন গুরুমা ভারী বড় এক কম্‌পোসিসন্‌ চারুপাঠ থেকে লিখ্‌তে দিয়েছেন। কীটানুর বিষয়ে। সেটা আজ লিখ্‌তেই হবে। কাল দিতে হবে। কিন্তু সেই কম্‌পোজিসন এর চাইতে আমার আপনার গান ঢের ভাল লাগে। আর মামা বলেছেন এক সপ্তাহ অন্তর একটা কোরে বাঙ্‌লা চিঠি লিখ্‌তে হবে। সেই চিঠি ঠীক পুরোনো প্রথার হিন্দি চিঠির মত আপনি যদি আমাদের ইস্কুলে পড়েন তো তাই যদি কোর্‌তে হয়। কি হবে। আপনি বিলেতে চোলে গেলে আমার আপনার জন্যে খুব মন কেমন কোর্‌বে। কিন্তু। শান্তিদের ইস্কুলের প্রিন্সিপাল ওকে একজন হোলিম্যান-এর বিষয়ে লিখতে বলেছেন। তাঁর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত বর্ণনা কোর্‌তে হবে। তো শান্তি আপনার বর্ণনা কোর্‌বে বোলেছে।' আপনাকে ও নিশ্চয় সুন্দর বর্ণনা কোর্‌বে। কি বলুন। কি মজা। দেখুন সত্যি কিন্তু আমার আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে করে। আপনাকে আদর দিচ্ছি। [অগ্রহায়ণ ১৩২৫]

রাণু॥

৫০

[ডিসেম্বর ১৯১৮]

আদরের ভানুদাদা,

আমার হিস্ট্রি আর ভূগোল পড়া বন্দ হয়ে গেছে। আর পড়্বনা। দেখুন দিকিন্ বাব্জা কি দুষ্টু। আমি আজকাল বাড়ীতে বেশী পড়িনা আপনার চাইতে কাজ ঢের কম করি। সকালে বোধহয় এক ঘন্টা পড়ি। এবারে আপনার খামের ওপর লেখা বেশ্ সুন্দর হয়েছে। আমার চাইতেও ভাল। এবারে আমি আপনার মত লাইন না টেনে লিখ্ছি। শান্তি যে আপনার বিষয় প্রবন্ধ লিখেছিল সেটা পড়ে, ও বল্লে মিস্ ব্যানিং খুব সুন্দর হয়েছে বলেছেন। ও অন্য কোন সময়ের বিষয় বলেনি। কেবল আপনি যখন উপাসনার আগে ঘন্টা বাজান সেই সময়কার আপনিকে বর্ণনা করেছে। আর আপনাকে খুব সুন্দর করেছে। সুন্দর না কর্লে ওর সঙ্গে আমি আড়ি করে দিতাম। আমরা গুরুমাকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছি। চিঠির ভেতরে তাড়িত বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত বিষয়ে লিখ্তে হয়েছিল। কিন্তু সম্বোধনটা হিন্দির মত অত ভীষণ নয় ভাল। গুরুমা বলেছিলেন যে কল্যাণীয়াসু বলে সুরু কর্তে। দেখুন তবে আপনি এখানে আসুন না। কিন্তু আজ ইন্স্পেক্ট্রেস এসেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বচ্ছর আসেন। কালও আসবেন। বৌমা যদি আপনার খোরাকী বন্দ করে দেন্ তো আপনি আমার কাছে আস্বেন কেমন?১ তখন বেশ্ মজা হবে। এবার আপনার চিঠি আস্বার দিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আপনার চিঠি আসবে। আমি সবাইকে বলে রেখেছিলাম যে আস্বে। তাই আপনার চিঠি খুব শিগ্গির এসেছে। আপনি ভারী দুষ্টু। কেবল আমাকেই দোষ দেন। আমি আপনার কাছে তো তিনবার গিয়েছি দেখা কর্বার জন্যে। একবার ইস্কুল অ্যাব্সেন্ট করেও গিয়েছি আর আপনিত একবারও এলেন না পড়ানো ছেড়ে। আর আপনি

তো চিঠি আমার চাইতে শিগ্গিরও লিখ্‌তে পারেন। কিন্তু এর আগের বারের চিঠি নিশ্চয় আমার কাছে দেরীতে এসেছিল। প্রতিজ্ঞা আজ কাশীর ওপর দিয়ে একটা এয়রোপ্লেন গেছে। ঠীক ওপর দিয়ে। আমি দেখ্‌তেই পাইনি। অনেক লোকে দেখেছে। সবাই বল্‌ছিল যে ঠীক চিলের মতন পাখা আর খুব শব্দ হচ্ছিল। তার ভেতর লোকও ছিল। আপনি কিন্তু সেইটেয় কোরে বিলেতে চলে যাবেন না যেন। ভারী হাওয়া। আপনার জন্যে আমার মন কেমন করে। আপনাকে চুমু দিচ্ছি। [অগ্রহায়ণ ১৩২৫]

রাণু॥

৫১

[ডিসেম্বর ১৯১৮]

প্রিয় ভানুদাদা,

কাল আমাদের ইস্কুলে প্রাইজ হয়েছে। সেই যেটার কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম। সেই জন্যে বেশ্ মজা হয়েছে।[১] আমাদের প্রাইজের আগের কদিন শুধু রেসিটেশনই হোত। আমাদের ইংরিজিতে দু ক্লাশ নিয়ে হোয়েছিল। আমাদের ক্লাশ আর আমাদের নিচের ক্লাশ। দেখুন সেই কবিতায় কতক্‌গুলি মেয়ে আর কতকগুলি মাষ্টার্ চাই। তো মামা আমাদের ক্লাশের সব মেয়েকে মাষ্টার্ কোর্‌লেন। আর আমাদের চেয়ে যারা নীচু ক্লাশে পড়ে তাদের ছাত্র কোর্‌লেন। মেয়েরা এক এক জন কোরে বল্‌ছিল যে একটী নদী তাদের কি বলেছে। আর আমরা নদী যা বলেছে তার থেকে উপদেশ বার কোরে ২ তাদের বল্‌ছিলাম। ভক্তিদের আর তার নীচের ক্লাশের একটা ভারী মজার হোয়েছিল। ছটী মেয়েকে বেছে নেওয়া

হোয়েছিল। ছ জন ছটা রঙ হোয়েছিল। ভক্তি হোল্‌দে হোয়েছিল। আর সবাইকার মধ্যে কেউ লাল, কেউ নীল, কম্‌লানেবুর রঙের, সবুজে আর বেগুনি। যে যা রঙ্‌ হোয়েছিল সে সেই রঙেরই ফ্লাগ নিয়ে ছিল। আপনি যদি থাক্‌তেন তাহলে আপনি মামাকে বল্‌তেন আমি লাল হব। আর বৌমার কাছ থেকে একটা লাল কাপড় চেয়ে নিয়ে পর্‌তেন। কেমন? সমস্কৃত বল্‌বার সময় আমি একজন মন্ত্রিক ব্রাহ্মন হোয়েছিলাম। আরো সব অনেক রেসিটেশন হোয়েছিল। হিন্দুস্থানী দুজন মেয়ে হিন্দিতে সুর কোরে ২ তুলসীদাসের রামায়ণ পড়েছিল। এমন মজার হোয়েছিল।

আমাদের প্রাইজ দিতে মিসেস্‌ পিম্‌ এসেছিলেন। তিনি এখানকার কলেক্টরএর স্ত্রী। তাঁর সঙ্গে তার একজন বন্ধুও এসেছিলেন। আমি মিসেস্‌ পিম্‌কে একটা মালা পরালাম্‌ আর আরএকজন মেয়ে তাঁর বন্ধুকে। আমাদের যখন রেসিটেশন হচ্ছে এমন সময় একটী ছোট্ট মেয়ে আমাদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে গিয়ে তার বোনের কাছে গেল। গিয়ে ~~চিৎকার করে~~ কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। যত দিদিমণি, মামা সবাই দৌড়ে এসে তাকে যত থামাতে যায় সে ততই কাঁদে। শেষে তার বোন অনেক কোরে তাকে থামাল। কি মজা হোয়েছিল। দেখুন আমাকে আপনার পাঠসঞ্চয় বোলে একটী বই দিয়েছে। তাতে গল্পগুচ্ছের কতকগুলো গল্প আছে। আপনি ভাগ্যিস্‌ এ সময় আমাদের ইস্কুলে আসেন্‌ নি। না ত আপনাকে শুধু গিফ্‌ট দিত। একটা বল আর একটা টিনের খেলনা। তা নিয়ে কি খেলা কোর্‌তেন? আমি সংস্কৃততে ফর্ষ্ট হয়েছি বলে জানেন একটা স্পেশল প্রাইজ পাব। তার বই এখনো এসে পৌঁছোয় নি। আর একটা মেডেলও পাব। কি মজা॥ [পৌষ ১৩২৫]

রাণু॥

৫২

[ডিসেম্বর ১৯১৮]

প্রিয় ভানুদাদা,

জানেন পরশু কি ভীষন জিনিষ হয়েছিল।[১] আপনি হোলে আপনিও চেঁচিয়ে ২ কাঁদ্‌তেন। সেদিন কি হোয়েছে যে দিদিমনিরা সব গাড়ীর পেছুনদিকে বসেছেন। আমরা মাঝখানে বসেছি। আর গাড়ীতে খুব ভীড়ও ছিল। রাস্তার প্রায় যখন মাঝখানে এসেছি এমন সময় গাড়ী উল্টে গেল। আমি একটী মেয়েকে আমি যে এগ্‌জামিনটা দিয়েছিনা তারই কথা বল্‌ছিলাম্‌। সে মেয়েটী এবচ্ছর এগ্‌জামিনটা দেবে। আর তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর্‌ছিলাম। তারপর আমি তাকে প্রশ্ন টস্ন জিজ্ঞেস কর্‌বার পর একটা বই পড়্‌বার জন্যে যেই সেই বইটা খুলেছি অপনি [য] গাড়ীটা উল্টে গেল। পেছুন দিকে দিদিমনিরা বসেছিলেন কিনা তাই গাড়ীটা পেছুন দিকে উল্টোলো। গরুটা পালিয়ে গেল। আর গাড়ীতে যত মেয়ে ছিল সবাই চিৎকার কোর্‌তে লাগ্‌ল। কেউ ওরে বাবারে বোলে কেউ মরে গেলুম বোলে আর বেশীর ভাগ শুধু [illegible] আ আ আ কোরে চেঁচাতে লাগ্‌ল। অনেক লোক, গাড়োয়ান সবাই মিলে গাড়ীটা টেনে তুল্‌লা [য]। নাম্‌বার জায়গাটা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। একজন খুব বড় লোক আমাদের সবাইকে কোলে কোরে কোরে নামিয়ে দিল। দিদিমনিরা এ্যাকেবারে লাফিয়ে নেমে পড়্‌লেন। দিদিমনিরা বল্লেন কি কোরে ইস্কুলে যাই। শেষে হেঁটে যাওয়াই ঠীক হল। এমন সময় একজন বাব্‌জাদের কলেজের প্রফেসার একটা গাড়ী কোরে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাদের গাড়ীটা দিয়ে দিলেন আর নিজে হেঁটে চলে গেলেন। যত সব ছোট্ট ছোট্ট মেয়ে আর একজন দিদিমনি সেই গাড়ীতে কোরে গেলেন। ভক্তি সেই গাড়ী গেল। আমরা একটুখানি হেঁটে গেছি এমন সময় একজন ভদ্রলোক নিজের

এক্কায় চড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এক্কা থেকে নেমে গিয়ে নিজে হেঁটে যেতে লাগ্‌লেন। আমাকে আর আর দুটী মেয়েকে এক্কাটায় বসিয়ে দিলেন আমি পা ঝুলিয়ে বসেছিলাম এমন সময় আমার পা থেকে জুতো পড়ে গেল। রাস্তাতে পড়ে গেল। আমি এক্কাটাকে থামতে বল্‌লাম। একপায়ে জুতো পরে যেতে ভারী খারাপ লাগ্‌ছিল। এমন সময় সেই ভাল লোকটী এসে আমার জুতো এনে দিলেন। ইস্কুলে গিয়ে আমরা খুব কাঁদতে লাগ্‌লাম। মামা ভাব্‌লেন আমাদের লেগেছে। মামা কতকগুলি মেয়েকে তখনি বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু যানেন আমি যাইনি। কেমন, কি ভীষণ জিনিষ হোয়েছিল। আপনি হোলেও ওরে বাবারে, আ আ ত কোরে চ্যাঁচাতেন। আপনি কখনো নিশ্চয় এমন জিনিষ দেখেন নি। দেখলে আপনি নিশ্চয় বোলতেনও। আপনার উৎসবে কখ্‌খনো এত মজা হয়নি। তাই নিশ্চয় আমি জিতে গেছি। আপনি হেরে গেছেন। কেমন মজা। [পৌষ ১৩২৫]

রাণু॥

রাণুর ভানুদাদা ॥

৫৩

[মার্চ ১৯১৯]

ভানুদাদা,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। আপনি শিবরাত্রির দিন চিঠি দিয়েছেন।[১] সেদিন কাশীতে বাব্‌জার জন্মদিন ছিল। আমাদের ইস্কুলেও ছুটী ছিল। কিন্তু আপনার চিঠি কাশীতে খুব দেরীতে পৌঁছেছে। ঠীক এক

সপ্তাহ পরে। আপনি আমাকে লিখেছিলেন যে সারা জানুয়ারী মাস ঘুরে বেড়াবেন আর এদিকে তো এখনো পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে। আপনি ভারী দুষ্টু। তার উপুর আবার লেক্‌চর দিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিজেই তো বলা হয় যে অ্যামেরিকায় যখন লেক্‌চার দিতেন তখন আপনার বুক ঢিলে হোয়ে গিয়েছিল। তবুও জেনেশুনে আবার লেক্‌চার্ দিচ্ছেন। আচ্ছা! আপনি আমাকে এত বোকা ভাবেন কেন? আপনি ভাবেন যে আপনি যে 'সার রবীন্দ্রনাথ চমৎকার বক্তৃতা [য] করেছিলেন, খূ-ব চমৎকার'টা কেটেছেন, আমি ভাব্‌ব যে সত্যিই ঢাক্‌বার জন্যে কেটেছেন। আপনি নিশ্চয় ইচ্ছে করে দেখাবার জন্যে কেটেছেন। আমি চিঠির দিকে তাকিয়েই বুঝ্‌তে পেরেছি। আর অত্যাশ্চর্য্য, অতিসুন্দর বক্তৃতা দিয়েও যে মহানুভব ব্যক্তি সে সংবাদটা সম্পূর্ণ গোপন করে যেতে পারে, সে তো আপনি লিখেই দিয়েছেন যে আমি। পড়েই তো বোঝা যায়। যান্ আপনি ভারি হাঁসান। আপনি আজকাল এত কম চিঠি কেন লেখেন। সারাদিনই তো আর লেক্‌চার দেননা। আর এত আর কি কাজ বেশী। আমারি বরং 1st Aprilএ এগ্‌জামিন সুরু হবে। তার উপুর আবার মঙ্গলবার থেকে বোধহয় morning ইস্কুল হবে। আজকাল তাই কত পড়া কর্‌তে হয়। আজকাল কাশীতে এত্ত গরম হয়েছে যে কি বলি। আপনি থাক্‌লে না জানি কি কোর্‌তেন। আমি আজকাল আমার স্কলার্‌শিপ পেয়েছি। কি মজা। আপনাকে কি কিনে দেব বলুন।[২] তা বলে কোন মণি চাইবেন না। সে কোথায় পাব বলুন। আপনি এবার গরমের ছুটীতে কোথায় থাক্‌বেন? যদি বিলেতে না থাক্‌তেন তো আমি আপনার কাছে যেতাম। [ফাল্গুন ১৩২৫]

রাণু॥

৫৪
[৯ এপ্রিল ১৯১৯]

ভানুদাদা,

কাল আপনি চলে যাবার পর[১] আমরা আর একটা ট্রেনে গিয়ে বস্‌লাম্। সেই ট্রেণটায় এত মাল ভরা হল যে সেই মালগুলো ভরাতে ভরাতে সন্ধ্যে হোয়ে গ্যাল। তারপর আমি বাবজ়া আর যদুবাবু কাশী ইষ্টিষান থেকে একটা নৌকো কোরে দশাশ্বমেধ ঘাটে এলাম। সেইখান থেকে বাড়ী গেলাম। বাড়ীতে যখন পৌঁছুলাম, তখন রাত্তির হোয়ে গেছে। সেইজন্যে তখন আপনাকে চিঠি লিখিনি আজ তাই সকালে চিঠি লিখ্‌চি। আপনার গাড়ীতে বোধহয় খুব কষ্ট হবে। যা গরম। আপনি আর দু তিন দিন যদি এখানে থাক্‌তেন তো বেশ হোতো। আমাদের দুদিনের ছুটীও হয়েছে। সেখানে গিয়ে আপনি নিশ্চয় খুব কাজ কোর্‌বেন। ভোর বেলা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত আর একটা থেকে ৬টা পর্য্যন্ত আর রাত্তিরবেলা রাত্তির বারোটায় শুতে যাবেন। কেমন। কিন্তু খবর্‌দার্ যদি তা করেন। সারাদিনে একঘন্টার বেশী যদি কাজ করেন তো আপনার সঙ্গে একেবারে আড়ি কোরে দেব। রাত্তির বেলা সকাল সকাল শুতে যাবেন আর দিনের ব্যালা বেশীর ভাগ সময় শুয়ে থাক্‌বেন, বিছানায়। বুঝলেন তো। এণ্ড্রুজ্ সাহেবকে বোলে দেবেন যেন উনি কখ্‌খনো রাত্তির ব্যালা আপনার সঙ্গে গল্প কোর্‌তে না আসেন। তাহলে উনি আপনাকে মাঝরাত্তির পর্য্যন্ত জাগিয়ে রাখ্‌বেন। নিশ্চয় আপনি কাউকে পড়াবেন না যেন। পড়ালে হার্টে ভারি স্ট্রেইন লাগে। শুধু কাজের মধ্যে শোবেন, ঘুমুবেন আর খাবেন। আর আপনি রোগা থাক্‌তে পাবেন না। আমার তাহলে আপনার জন্যে বেশী মন কেমন করে॥ আমার স্কলারশিপের টাকা আরো পেয়েছি।[২] আমি ভেবেছিলাম যে কাল যাবার সময়ে সেগুলো নিয়ে যাব কিন্তু নিয়ে যেতে ভুলে গেলাম।

আমাদের ইস্কুল ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে বন্ধ হোয়ে যাবে। আপনি যদি বিলেতে যান্ তো আর এ্যাকবার নিশ্চয় আমাদের বাড়ীতে এসে থাক্‌বেন। এবারে এলে আমাদের বাড়ীতে থাক্‌বেন। [২৬ চৈত্র ১৩২৫]

রাণু ॥

৫৫

[১৩ এপ্রিল ১৯১৯]

ভানুদাদা,

আমি আপনার ছোট্ট চিঠি[১] পেয়ে একটুও রাগ করিনি। আপনার বোধহয় ওইটুকু চিঠি লিখ্‌তেই খুব কষ্ট হয়েছে। আপনি নিশ্চয় বিছানা থেকে উঠ্‌তেই পারেন না তাই বিছানায় শুয়ে থাক্‌তে হয়। কালই তো পয়লা বৈশাখ কিন্তু আপনি খবরদার্ যদি একটুও কাজ করেন। অন্য দিনের মত শুয়ে থাক্‌বেন। যদি কেউ জ্বালাতন করে তো আমাকে লিখে দেবেন আমি তাকে খুব বকে দেব। আপনি কাশীতে এসে কেন তিনটে বক্তৃতা দিলেন আর আরো কত জায়গায় গান গাইলেন আর বক্তৃতা দিলেন। আপনি ইচ্ছে করেই তো নিজের শরীর খারাপ করেন। আপনার শরীর খারাপ বলেইতো আমার আপনার জন্যে বেশী মন কেমন করে। আবার লেখা হয়েছে যে আমি চাইনা যে আমার জন্যে তোমার মনে একটুও কষ্ট হবে। আবার আপনি যা কম খান। ওইটুকু খেলে কেউ মোটা হয় না। আপনি একটু খানি বেশী করে খাবেন। এণ্ড্রুজ্ সাহেবকে রাত্তির বেলা আপনার কাছে কিছুতে আসতে দেবেন না। আমি রোজ ঠাকুর প্রণাম কর্‌বার সময় ভগবানকে আপনাকে সারিয়ে দিতে বলি। বাব্‌জা কোল্‌কাতায় গ্যাছেন কাল দুটোর সময়। রবিবারে ফিরে আস্‌বেন।

বাব্‌জাকে কোল্‌কাতা থেকে আরো অনেক সহরে ঘুর্‌তে হবে। বাব্‌জা বলেছেন যে যদি সময় হয় তাহলে নিশ্চয় আপনাকে দেখে যাবেন। আমাদের এগ্‌জামিন এখোনো শেষ হয়নি। ২৫ এপ্রেলের পরে ইস্কুল বন্ধ হবে। শান্তিদের এগ্‌জামিন কাল থেকে সুরু হবে। ওদের ভারী মজা হবে। রোজ সকাল ভোর থেকে বিকেল পর্য্যন্ত এগ্‌জামিন হবে আর রোজ ৩।৪ বিষয় কোরে হবে। তিন দিনের মধ্যে ওদের এগ্‌জামিন শেষ কোর্‌তে হবে। তাই শান্তিকে সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত বোর্ডিঙেই থাক্‌তে হবে আর খেতে হবে। ওদের ইস্কুল শুদ্ধ মেয়ের খুব রাগ হয়েছে। আপনি হলে কি কোর্‌তেন। কাশীতে আজকাল একটু লু বয়। আমার গর্ম্মীর ছুটীতে আপনার কাছে খুব যেতে ইচ্ছে করে। [৩০ চৈত্র ১৩২৫][২]

রাণু॥

ভানুদাদা
দিন রাত শুয়ে থাক্‌বেন। কাজ কর্‌বেন না আর
খুব খাবেন॥

রাণু॥

৫৬
[মে ১৯১৯]

আমার ভানুদাদা,

আমি আপনার জন্মদিনের জন্যে এক্‌টা রুমাল বানিয়েছি।[১] সেই রুমালটার সারাটাই আমি নিজেই বানিয়েছি। তাতে আপনার নামও

লিখেছি। আশাদের ইস্কুলে একটী পার্শী মেয়ে পড়ে। তার নাম হোমাই। আমি তার কাছে বানাতে শিখে এই রুমালটা বানিয়েছি। এইটে যদি আপনার জন্মদিনের দিন পৌঁছোয় তো কি মজা হয়। আর শুনুন্। এই রুমালটা নিশ্চয় আপনার জন্মদিনের সারাদিইন্ পকেটে কোরে রাখবেন। যদি না রাখেন তো আপনার সঙ্গে জন্মের মতন আড়ি। বুঝ্লেন। আপনার নিশ্চয় খুব আনন্দ হচ্ছে। জন্মদিন কিনা। আমি তো জন্মদিনে সারা দিনই লাফিয়ে বেড়াই। আপনি তা বলে লাফাবেন না যেন। বুকে বড় ষ্ট্রেন্ লাগ্বে। আমি যদি আপনার কাছে থাক্তাম্ তো আপনাকে এমন চমৎকার কোরে সাজিয়ে দিতাম। আপনি নিজের রূপ দেখে মুগ্ধ হোয়ে যেতেন। আপনাকে সাজিয়ে গুজিয়ে এক্টা চেয়ারে বসিয়ে দিতাম। আমি যখন্ আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারী হব তখন আপনাকে জন্মদিনের দিন পৃথিবীর মধ্যে সুন্দর কোরে সাজিয়ে দেব। আর সেদিন মীরাকে বলে দেবেন পরমোন্ন কোর্তে। জন্মদিনের দিন পরমোন্ন না খেলে পাপ হয়। আমরা শিগ্গিরিই 'সোলানে' যাব। সেখানে গিয়ে আপনাকে আমি ঠিকানা দেবো। আমি বৈতালিক্' পেয়েছি আর খুব খুসী হয়েছি।
[বৈশাখ ১৩২৬]

রাণু ॥

আপ্নার জন্মদিনে আপনাকে প্রণাম কর্চ্ছি ॥

রাণু ॥

৫৭

[এপ্রিল ১৯১৯]

প্রিয় ভানুদাদা,

আজ থেকে আমাদের গরমের ছুটী সুরু হয়েছে। সাতই জুলাইএ ইস্কুল খুল্‌বে। কিন্তু মামা এক বচ্ছরের ছুটী নিয়ে চলে যাচ্ছেন। ওর শরীর বড় খারাপ হয়েছে। সে এক বচ্ছর আমাদের ইস্কুলে একজন বাঙালী প্রিন্‌সিপ্‌ল আস্‌বেন। মামা গরমের ছুটীতে কর্‌সিয়ংয়ে থাক্‌বেন। ওঁর ঠিকানা আমি চেয়ে নিয়েছি। আমাদের ইস্কুলে প্রাইজ হোয়ে গেছে। সেইজন্যে আপনাকে চিঠি লিখিনি। অনেক রেশিটেশন মুখুস্ত কোর্‌তে হোতো। ইংরিজি মামা বেশ্‌ কম্‌ ২ কোরে দ্যান্‌। কিন্তু সংস্কৃততে গুরুমা বাব্বা। এত মুখুস্ত কোরতে দিয়েছিলেন। আমরা আগে থেকেই গুরুমাকে বলে রেখেছিলাম যে এবারে আমরা সংস্কৃততে কিছু কোর্‌বনা কিন্তু গুরুমা বল্‌লেন যে মামা বলেছেন যে তোমাদের সংস্কৃততে কিছু কোর্‌তেই হবে। তখন বলুন্‌ আর কি করি। তখন গুরুমা আট্‌টী মেয়েকে আট্‌টা লম্বা ২ পার্ট দিলেন। আমাকে কোর্‌লেন রাম। আমার আবার ৩।৪ পাতা লম্বা লেক্‌চার। আর সাতজনের মধ্যে কেউ কৌশ্যল্যা. কেউ কৈকেয়ী কেউ সীতা, কেউ লক্ষ্মণ॥ সকলকারই ২।৩ পাতা বক্তৃতা। বাড়ী এসে খেয়েই তা মুখুস্ত কোরতে বস্‌লাম। দু তিনদিন পরেই প্রাইজ্‌। তাড়াতাড়ি আবার মুখুস্ত কোর্‌তে হবে। যেমন কোরে হোক্‌ তাড়াতাড়ি মুখুস্ত কোর্‌লাম। আশা বল্লে যে মামা কখ্‌খনো অতটা বল্‌তে দেবেন না। আর এত খারাপ শোনাত। সাত আট জন মেয়ে, প্রত্যেকে দুতিন পাতা সংস্কৃততে লেক্‌চার দিয়ে যাচ্ছে। প্রাইজের আগের দিন মামা শুন্‌লেন। শুনেই সেটা আর বল্‌তে দিলেন না। কি মজা হোলো। আমি 'পূজারিণী' কবিতাটা প্রাইজে বলেছিলাম॥ এবারে প্রবাসীতে একটা রেণু' বোলে কবিতা বেরিয়েছে।

সেই কবিতাটা ঠীক আপনার পলাতকার কবিতাগুলোর মত। আপনি যেখানে লিখেছেন বয়স ছিল আট, ও লোকটা লিখেছে বয়স ছিল কাঁচা। এমন দুষ্টু। নকল কোর্‌তে লজ্জাও করে না। তার নাম আবার এত বিচ্ছিরি। কৃষ্ণদয়াল। ওর বোধহয় ইচ্ছে ছিল যে নামটাও নকল করে। আপনি কেমন আছেন? আগের চাইতে কি ভাল আছেন? আমার আপনার জন্যে মন কেমন করে। আমি গরমের ছুটীতে সঞ্চয়[১] শেষ কোরবো। এরি মধ্যে ২০ কিম্বা পাঁচিশ পাতা পড়া হোয়ে গ্যাছে। আর সব বুঝ্‌তেও পারি। আমি আর শান্তি সংস্কৃত রামায়ণ পড়ি। [বৈশাখ ১৩২৬]

রাণু॥

৫৮

[মে ১৯১৯]

[কাশী থেকে সোলনের পথে আলিগড়ে]

ভানুদাদা,

আমরা সোলন যাচ্ছি।[১] এখন আমরা মোগলসরাই ইষ্টিষানে। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী এখান থেকে ছাড়্‌বে। আমাদের এই গাড়ীতে একজন হিন্দুস্থানী মেয়ে মানুষ আছেন তার সঙ্গে তিনজন এমন সুন্দর দেখ্‌তে ছেলে। দু এক ষ্টেসন পরেই এঁরা নেমে যাবেন। ছেলেরা এমন চেঁচাচ্ছে যে তার মা তাদের মামার কাছে তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আমরা কাশী থেকে মোগলসরাই পর্য্যন্ত যে গাড়ীতে এসেছিলাম তাতে একজন কনে ছিল। আর তার সঙ্গে একজন হিন্দুস্থানী চাকরাণী। সেই কনে এত গয়না পরেছিল

যে কি বোল্‌বো। তার হাতে একটা কাজললতা ছিল, তাতে বনলতা লেখা ছিল। সে একটা গোলাপী বেনারসী পোরে ছিল। কিন্তু সে বড় অসভ্য কোরে ধুতি পোরে ছিল। যেই মোগল সরাইএ গাড়ী থাম্‌ল অম্‌নি তার চাকরাণী একজন লোক্‌কে দেখিয়ে বল্‌ল ও হচ্ছে একজন বরযাত্র ঘুম্‌টা দে আর সেই কনেটী এত্তটা ঘুম্‌টা দিল। তারা বাঁকীপুরে নাম্‌বে। তার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছে চাকরাণীটা বল্ল সে ৫৫ টাকা স্কলারশিপ্‌ পায়। এখন বিকেল হয়েছে আর গাড়ী চল্‌ছে। আজ পূর্ণিমা তাই রাত্তিরে কেমন চাঁদের আলো হবে। খুব গরম হচ্ছে। গাড়ীটা যা নড়্‌ছে তাই লেখা এত বিচ্ছিরি হচ্ছে।

কাল চারটের সময় আমরা আলীগড়ে পৌঁছুব। সেখানে একদিন আমার মাসীমার বাড়ী থাক্‌ব। সেখানে মাসিমা কিন্তু নেই। আমার একজন মাস্তুত ভাই এক্‌লাআ সেখানে আছে। সেখান থেকে কাল্‌কায় যাব। জানেন, আমরা এক্‌টা প্রকাণ্ড টনেল পার হব। সেখানটা হচ্ছে অন্ধকার আর জল চোঁয়। কি মজা। সোলন্‌ থেকে সিম্‌লে খুব কাছে। এখন আমাদের দুপাশে খালি মাঠ আর মাঝে মাঝে চার পাঁচটা গাছ আর গ্রাম।

এখন অরোরা রোজ বোলে একটা ইষ্টিষাণে গাড়ী থেমেছে। এখানটায় অনেক গাছ। এখানে একটা গ্রাম দ্যাখা যাচ্ছে। এখন প্রায় সন্ধ্যে এখানে মাঠের ওপর সরু ২ রাস্তা দিয়ে কৃষকরা যাচ্ছে। এখন গাড়ী যাচ্ছে আর দু ধারে মাঠ। এখানে মাঠের ভেতর একটা দু তিন হাতের ছোট্ট নদী আর তার উপুর একটা ছোট্ট পুল। সেই পুলের উপুর দিয়ে লোক যাচ্ছে। আমারো যেতে ইচ্ছে কর্চ্চে। কেমন ছোটো পুল। আর একটা ছোট্ট নদী কিন্তু এটাতে পুল নেই।

খানিকক্ষণ পরে লিখ্‌ছি।

এখানে চারিধারে পাহাড় কিন্তু সেগুলোতে একটুও গাছ নেই।

এখানে অনেক খেজুর গাছ। এখানে চারিধারে পাহাড় ঘেরা। এখানকার

নাম চুনার। সেই মেয়েমানুষটী আমাদের গাড়ীর নেমে গেলেন। এখানে তাঁর মা থাকেন। দেখুন অন্ধকার হোয়ে এল। এখানে শুধু পাহাড়। এখন একটা ইষ্টিসান এল। এর নাম ডগমগপুর। কি মজার নাম। কিন্তু এখানে কেবল পাহাড় আর রাশি রাশি পাথর

ভানুদাদা, এখন রাত্তির হোয়ে গেছে। এমন চাঁদের আলো হয়েছে। ইঞ্জিনের আগুনের টুকরোগুলোকে আমি ভেবেছিলাম জোনাকি পোকা। শেষে মা বল্লেন্ যে ওগুলো আগুনের টুকরো।

এখন বিন্ধ্যাচল বোলে একটা ইস্টিসানে গাড়ী থেমেছে কিন্তু এখান থেকে পাহাড় তো দেখা যাচ্ছেনা। এখানে চারিদিকে গাছ আছে। এই ইষ্টিসানে অনেক লোক রয়েছে। এইবার এখান থেকে গাড়ী ছাড়্চে। অনেক লোক বাকী রোয়ে গ্যাল। বেচারারা কি কোর্‌বে যে। এইবার পাহাড় দ্যাখা যাচ্ছে। ওগুলো খুব নীচু। এখানে অনেক ছোট ছোট গাছ রয়েছে। এ পাহাড়গুলোও গাছে ভরা।

ভানুদাদা, এখন আমার বড় ঘুম পেয়েছে। শুচ্ছি।

আমাদের গাড়ীতে আর কেউ ওঠেনি। আপনি এখন কি কোর্‌ছেন। যদি শোন্ তাহলে আপনাকে খুব আদর কোর্‌বো আর আপনি লক্ষ্মী ছেলে হবেন। আপনার বরং এর আগেই শোয়া উচিৎ।

ঘুম ভেঙে গ্যাল। এক্ষুণি পুলের ওপর দিয়ে একটা নদী পার হোলাম্। সেই নদীর জলে এমন চমৎকার চাঁদের ছায়া পড়েছিল।

এক্ষুণি আমরা যমুনা নদী পার হলাম। এমন চমৎকার। অনেক নৌকো সেখানে বাঁধা ছিল। এখন গাড়ী এলাহাবাদ ইষ্টিসানে থেমেছে। আমাদের গাড়ীতে অনেক লোক এসেছে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই হায়দ্রাবাদবাসী। তারা এসেই কেউ বঙ্কেতে লাফ মেরে ঘুমুতে লাগ্‌ল কেউ নিজের ছেলেদের গড়ে গড়ে শুইয়ে দিল। ওরা কাল যাবে। আরো কতকগুলো ক্রীশ্চানও এসেছে। যা ভীড় হয়েছে।

এখন সকাল। কানপুর স্টেষানে ভীড় কমে গ্যাছে। তবুও কিছু লোক আছে। এখন খুব রোদ হয়েছে। খানিকক্ষণ পরেই এত গরম হবে। এখন গাড়ীর দুধারে শুধু জঙ্গল। আর ঠীক নদীর মত অনেক নহর। সেই নহরগুলো দুধারেও গাছ। এখন অম্বিয়াপুর বলে একটা জায়গায় গাড়ী থেমেছে। এর নাম অম্বিয়াপুর কেন জানেন্। এই জায়গায় অনেক আম গাছ আছে আর তাতে অনেএএক আম রয়েছে।

এখন সাম্হন্ বোলে একটা জায়গায় গাড়ী থেমেছে। এখানকার প্লাট্ফর্ম এত নিচুতে। লোকেরা সব এত কষ্ট কোরে উঠ্ছে।

ভানুদাদা, এক্ষুণি এটাবায় গাড়ী থেমেছিল। এই ইষ্টিসানটা বেশ্ বড়। শুনুন, আমাদের পাশে একটা মালগাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। সেই গাড়ীটার ভেতরে সব বাঁচা মহিষ আর মহিষের বাচ্চা ছিল। তাদের সঙ্গে একজন লোকও ছিল। কি মজা।

আমরা যে সব গ্রাম দেখ্তে পাচ্ছি সেগুলো এমন আশ্চর্য্য। তাদের চারিধারে একটা উঁচু মাঠীর দেয়াল। আর সেই দেয়ালের ভেতরে গ্রাম।

এখন বোধহয় ১। বেজেছে। এত্তো গরম হয়েছে। গাড়ী তেতে উঠেছে। এক্ষুণি মাঠের ওপর ঘূর্ণী ধুলো উঠেছিল। সেটা আবার নড়্ছিল।

এক্ষুণি একটা খুব বড় স্টেশনে এসেছিলাম। তার নাম ভুলে গেছি। গাড়ী এত্ত গরম হয়েছে। আরো দুঘণ্টা পরে আলীগড় পৌঁছুব। বাবা, গাড়ীটা কী নড়্ছে

খানিকক্ষণ হোলো সেই হায়দ্রাবাদের লোকেরা চলে গেল। এবার খুব শিগ্রিরি আলিগড়ে পাঁছুব॥

ভানুদাদা কাল আমরা আলিগড়ে পৌঁছেছি। আজ সকালে এখন আমরা আলিগড়ে। এখানে কাশীর চেয়ে সকালবেলা বেশী শীত করে। এখানে রাস্তাগুলো বেশ্ পরিষ্কার। এই বাড়ীর সামনেই গ্রান্ড ট্রঙ্ক্ রোড। কাল আমি আশা আর বাবু রাত্তিরবেলা অচলেশ্বরএর মন্দির আর তার পাশের

পুকুর দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। সে জায়গাটা এমন সুন্দর। সেই পুকুরের চারিধারে প্রকাণ্ড ২ গাছ রয়েছে আর পুকুর ঘোরবার সময়ে যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম্ সেটা এমন সরু আর ঠীক নদীর তীরে। কি মজা। কিন্তু সকালবেলা সেখানে অনেএএএএক বাঁদর আসে। কিন্তু তারা কাশীর বাঁদরের মতন চোরও নয়, দুষ্টুও নয়। আজ এখানে ভোরবেলা আমরা ছাতে শুয়ে আছি এমন সময় দেখি দলে দলে সব বাঁদর পুকুরে জল খেতে যাচ্ছে। এই বাড়ীর কাছে দুটো ট্যাঙ্ক্ আছে। আজ চারটের সময় আমরা আবার্ ট্রেণে চড়্‌ব আর কাল দশটার সময় সোলন পৌঁছুব। জানেন আমি কাল উঁটের গাড়ী দেখেছি সেগুলো খুব উঁচু আর দোতলা হয়। আমি গীতিবীথিকা[২] আর ছবি পেয়েছি আর পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। সেই ছবিটার প্রথম পাতায় যা আঁকা সেটা নিশ্চয় সেই রুমালের ডিজাইন দেখে করেছেন। তার তলায় যা লেখা তা কে লিখেছে? [বৈশাখ ১৩২৬]

রাণু ॥

৫৯

[মে ১৯১৯]

[আলিগড় থেকে সোলন যাওয়ার পথে ট্রেনে]

ভানুদাদা,

গাড়ী যা নড়ছে। কি বিচ্ছিরি লেখা হচ্ছে। আমরা আলীগড় কখন পার হয়েছি। আমাদের গাড়ীতে শুধু একজন মেয়েমানুষ রয়েছেন। কিন্তু তিনি সেই সিন্ধিয়াদের মতন অসভ্য নন। এখনো একটু ২ গরম।

আমার দুধারে জঙ্গল মাঠ রয়েছে। এখানে অনেক গাছ আছে।

ভানুদাদা এখন দুদিকে শুধু বন। এখনি দেখলাম মাঠের মাঝখানে একটা মেলা হচ্ছে। সেই মেলাতে লোকেরা নানা রঙের কাপড় পোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাড়ীও ছিল। ট্রেণ দেখ্‌তে পেয়ে অনেক লোক দৌড়ে আমাদের কাছে আস্‌তে লাগ্‌ল।

ভানুদাদা এখানে অনেক গরু ষাড় আর ঘোড়া আর বড় বড় পাখী রয়েছে।

চোলা। এই ইষ্টিসানে অনেক উট আর তার গাড়ী রয়েছে। আচ্ছা, চোলা মানে কি বলুন দিকিনি।

ভানুদাদা, এক্ষুণি একটা কেনালের ধারে পানা পুকুরে পদ্ম ফুটে রয়েছে গাজিয়াবাদে। এই ষ্টেসনটা খুব বড় অনেক লোক রয়েছে। এখানে আরও অনেক ট্রেণ রহেছে। ভাগ্যিস আমাদের গাড়ীতে কেউ আসেনি। আমাদের গাড়ীর মেয়েমানুষটী কেবল বরফ খাচ্চে। আপনি কি এখানে কখনো এসেছেন।

ভানুদাদা, একটা অন্ধকার ইষ্টিসানে গাড়ী থেমেছে। ইষ্টিসানটায় অনেক লোক। মারামারি ঠ্যালাঠ্যালি কোরছে। ছাত তার টিনের। আর একটা ভাঙা টিনের লণ্ঠন। একজন বেটাছেলে মোটা হিন্দুস্থানি আমাদের গাড়ীতে প্রায় উঠে এসেছিল। কিছুতেই যাচ্ছিল না। অনেক কষ্টে চোলে গ্যাছে। গাড়ী খুব ধীরে ধীরে চোল্‌ছে। আর ইঞ্জিন থেকে এত ধুয়া বেরুচ্ছে যে আকাশও অন্ধকার হোয়ে গ্যাছে।

একটা উঁচু রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ীটা ধীরে ধীরে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ কোরতে কোরতে যাচ্ছে। তার অনেক নীচে চাঁদের আলোয় একটা মাঠ ঝক্‌ঝক্‌ কর্‌ছিল। ভক্তি এমন বোকা যে সেই মাঠ্‌টাকে বলছিল যমুনা। আমি ঠীক বুঝ্‌তে পেরেছিলাম যমুনার ওপর দিয়ে গাড়ী যাচ্ছে। কিন্তু খুব ধীরে ২ গাড়ী যাচ্ছে। দিল্লির ফোর্টের ভেতর দিয়ে গাড়ী গ্যাল। সেই ফোর্টটা

এমন চমৎকার। তার চারিধারে ভিড় ছিল। এখন দিল্লী। এই ষ্টেযনটা খুব বড়। এখানে অনেক আলো আছে। একটা খুব বড় ঘড়ী রয়েছে।

ভানুদাদা, দিল্লী থেকে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। আমরা পনেরো মিনিটে দিল্লীর চাঁদনীচক্ পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এসেছি এমন তাড়াতাড়ি হেঁটেছি। পার্কের ভেতর দিয়ে যে রাস্তা সেটা এমন চমৎকার। গাছে ঢাকা আর মাঝে মাঝে পুকুর। এখানে সব রাস্তাতেই অনেক ইলেকট্রিক লাইট রয়েছে।

আমার ওখানে যাবার সময় এত ভয় কোরছিল যদি গাড়ীটা চোলে যেত তো কি হোতো? বাবা।

এখন অনেক রাত্তির হোয়েছে। প্রায় ১০টা। আমাদের এই গাড়ীটাতে আর কেউ ওঠেনি। এখন দুধারেতে খালী মাঠ আর মাঝে মাঝে গাছ। চাঁদের আলোতে সব স্পষ্ট দ্যাখা যাচ্ছে। আপনি এখন নিশ্চয় ঘুমুচ্ছেন কিম্বা ছাতের সেই ইজিচেয়ারটায় চুপ কোরে শুয়ে আছেন। আমার আপনার কাছে এখন যেতে ইচ্ছে কর্চ্ছে। আপনি বোধহয় একলাই বোসে আছেন।

ভানুদাদা, এখন অনেক রাত। সবাই ঘুমুচ্ছে। আমার ঘুম ভেঙে গেছে। খুব শীত কোরছে। ইঞ্জিনটা খুব শব্দ কর্চ্ছে।

এখন রাত্তির সাড়ে তিনটে। আমরা অম্বালায়। এতক্ষণ গাড়ীতে কেউ আসেনি। কিন্তু এক্ষুণি কতকগুলি পাঞ্জাবী মেয়েমানুষ উঠল। তাঁরা কঁসৌলি যাবেন। একজন সিম্‌লায়। এঁরা বেশী অসভ্য নন। কিন্তু সবাইকারি এ্যাক দুজন কোরে ছোট ছেলে আর এই ছেলেগুলো সবাই মিলে চীৎকার কোরছে।

ভানুদাদা, এখন সকাল হয়েছে। কাল্‌কার খুব কাছে এসে গেছে। দুধারে পাহাড় দ্যাখা যাচ্ছে। এখনো সূর্য্য ওঠেনি। চাঁদ মাঝে মাঝে পাহাড়ে ঢেকে যাচ্ছে। এদিকে সূর্য্য কাশীর পশ্চিম দিকে উঠ্‌বে। বোলপুরে যেদিকে সূর্য্য ওঠে এখানেও সেদিকেই।

কাল্‌কা। এখান থেকে গাড়ী কিছুতে ছাড়্‌ছে না। এই গাড়ীগুলো বেশ ছোটো ছোটো।

আমরা অনেকগুলো টনেল পার হয়েছি। কোনো কোনোটা এ্যাকেবারে অন্ধকার। এ্যাকটার দুধারে জল চুঁইছিল। এমন গা বমি বমি কোরছে। বোধ হোচ্চে য্যান এক্ষুণি বমি হোয়ে যাবে। গাড়ীটা আবার এ্যাত নোড়্‌ছে।

ভানুদাদা, আজ ১০টার সময় এখানে পৌঁচেছি। এখন বিকেল। বাবা, এখানে কি শীত। মেঘলাই রোয়েছে।[১] আমি ২।৩ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। আমার বড় মাথা ব্যাথা কোরছে। এখানে পাহাড়ে খুব কম গাছ। এমন সুন্দর সুন্দর ঢালু বেড়াবার পাহাড় আছে। আপনি এখানে যদি আসেন তো নিশ্চয় এ্যাকেবারে সেরে যান্‌। [বৈশাখ ১৩২৬]

রাণু॥

৬০

[মে ১৯১৯]

[সোলন]

আমার ভানুদাদা,

আপনার চিঠি যখন এল তখন আমি এস্রাজ্‌ বাজাচ্ছিলাম। এখানে আমার যে মাস্তুত ভাই আছেনা, তার নাম সুরেশদাদা, তার একটা নতুন এস্রাজ্‌ আছে। সে এস্রাজ্‌ বেশ বাজাতে পারে আমি তার কাছ থেকে সেটা চেয়ে নিয়েছি। এই এস্রাজ্‌টা বড় বড়। কিছুতে ধর্‌তে পারিনা। এই এস্রাজ্‌টা আমার কাছেই থাকে। শুনুন্‌, সেই এস্রাজ্‌টার যে বাক্স, তার যে চাবী সেটা হারিয়ে যাবে বোলে আমি একটা ফিতে দিয়ে গলায় বেঁধে রেখে ছিলাম। তার পরদিন যখন বাক্সটা খুল্‌তে গেলাম তখন মনেই ছিলনা

যে চাবীটা গলায় বেঁধে রেখেছি। সারা বাড়ী খুঁড়ে বেড়ালাম্ কোথাও পেলাম না। আমি ভাব্লাম বুঝি বাক্সটা আর খুল্‌তেই পার্ব্ব না। শেষে নাইবার সময় যখন সব জামা খুলে ফেলেছি এমন সময় দেখি যে চাবীটা হারিয়ে যায়নি। কি মজা।

জানেন্? যে পোষ্টম্যান্ চিঠিটা নিয়ে এল সে বুঝ্‌তে পারেনি যে ওটা আমার চিঠি। সে শান্তিকে জিজ্ঞেস্ কোর্‌ছিল যে আমায় এই চিঠির ঠিকানাটা পড়ে দাওতো। শান্তি দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে ওটা আমার চিঠি। ও তাই চিঠিটা তার কাছে থেকে নিয়ে নিল। এবার থেকে পোষ্টম্যানটা আর ভূল কোর্‌বে না। ও চিনে গ্যাছে কিনা।

সোলনে আমরা রোজ সকাল ব্যালা আর সন্ধ্যোব্যালা ব্যাড়াতে যাই। কেবল কাল আর আজ যাইনি। ক্যান জানেন্। কাল আশার আর শান্তির একটু জ্বর হোয়েছিল। আজ দুজনেই ভাল আছে। কাল সন্ধ্যেব্যালা থেকে আমার গলাতেও খুব ব্যাথা হোয়েছিল। আজ সেরে গ্যাছে। এখানে খুব কম গাছ। এ্যাক্কেবারে ন্যাড়া। আলমোরা এর চেয়ে ঢের ভাল। এখানে বিষ্টি হোলে খুব ঠাণ্ডা হয়। তাই যেদিন এখানে এসে পৌঁছেছিলাম সেদিন খুব ঠাণ্ডা ছিল। আর একটু রোদ হোলেই গরম হয়। আজকাল গরম হয়। একটু বিষ্টি হোলে বাঁচি। এখানে একজন বাঙালী আছেন। তাঁর নাম অবিনাশ বাবু। একদিন আমরা তাঁর বাড়ী ব্যাড়াতে গেছি। তাঁর যে স্ত্রী তিনি লেনু বোলে একজন চাকরকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। আপনার বাবারোতো লেনু বোলে একজন পাঞ্জাবী চাকর্ ছিল।[১] জীবনস্মৃতিতে যে আছে। এও পাঞ্জাবী। আমি ভাবলাম সেই লেনুই।

দেখুন, এখানে ব্যাড়াবার সব্ চাইতে ভাল রাস্তাগুলোতেই যেতে দ্যায় না। বলে এটা ক্যান্টন্‌মেন্ট। কান্টমেন্ট তো ভারি। ১০।১২ জোন গোরা আছে। এমন রাগ হয়। আমি একদিন নিশ্চয় এ্যাক্‌লাই সেখানে যাব। দেখ্‌বো কি করে। আপনি আজকাল শান্তিনিকেতনে বুঝি এক্‌লাই

থাকেন? আপনার ভয় করে না? আমরা যদি শান্তিনিকেতনে এবার ছুটীতে যেতাম্ তো বেশ্ হোতো। আপনার আর একলা থাক্‌তে হোতোনা। আপনার জন্যে আমার মন কেমন্ করে। আপনি ক্যামন্ আছেন? রাণু॥

শুনুন্, আমি ব্যাড়াতে ব্যাড়াতে হেঁটে এ্যাক্‌টা টনেল্ পার হয়েছি।
[জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬]

রাণু॥

৬১
[জুন ১৯১৯]

[সোলন]

ভানুদাদা,

আপনার চিঠি যখন পেলাম তখন আমরা ইষ্টিসানে ছিলাম। সোলন থেকে তিন মাইল দূরে সোলন ব্রুয়ারী বোলে এ্যাক্‌টা জায়গা আছে। সেখানে ব্যাড়াতে যাবার জন্যে ইষ্টিসানে এসেছিলাম। সেদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। চিঠিটা পাছে হারিয়ে যায় সেইজন্যে আমি সেটা জামার মধ্যে পুরে রেখে ছিলাম। সেটা হারাওনি। আজকাল বোলপুরে বুঝি খুব গরম হয়েছে। এখানেও খুব গরম হোয়েছিল। একটু একটু কাশীর মোতোন। কেবল কাল দুপুর ব্যালা থেকে খুব জোরে জোরে হাওয়া বইছে আর কাল খুব মেঘলা হয়েছিল আর বিষ্টি পড়্‌ছিল। খুব শীত কোর্‌ছিল। আজ রোদ্ হোয়েছে কিন্তু বেশী গরম নয়। ওখানে তো খুব গরম। আপনি এখানে আসুন্ না। আপনার শরীরো তাহলে খুব ভাল হবে। আপনি ক্যামোন্ আছেন তা লেখেন না ক্যান। এখানে অনেক লোক

ব্যাড়াতে আসে এখানে আলমোরার মতন ব্যাড়াবার অনেক সোজা রাস্তা আছে। আপনার এখানে এলে ব্যাড়াতে যাবার সময় কোনো কষ্ট হবে না। আপনি আসুন না। কাশীর রাজা যেই ডাকলো অম্‌নি তো এলেন। আপনার জন্যে আমার খুব মন ক্যামন করে। পরশু ভক্তির জন্মদিন। ও রোজ ভোর ব্যালা ওঠে আর দিন গুনে। এখানে এ্যাক্‌টা টনেল্ আছে। এই টনেল্‌টা কাট্ রোডের এ্যাক্ পাশে। সেই টনেলের ওপরে আমরা কোনো কোনো দিন্ ব্যাড়াতে যাই। তাতে তিনটে টেলিগ্রাফ্ পোষ্ট আছে। সেই তিনটে পোষ্টে আমি ছুরি দিয়ে আপনার নাম লিখেছি। আমি আপনার নাম উর্দ্দুতে আর আরব ভাষাতেও লিখতে পারি। জানেন্ দেখুন্ লিখ্‌ছি।[১]

আপনি এর পরের চিঠিতে দেখ্‌বো ক্যামোন্ না দেখে এটা লিখ্‌তে পারেন? আচ্ছা বলুন্ দিকিন্ যে কোন্‌টা উর্দ্দু আর কোন্‌টা আরবি? আমি আমার নামো লিখ্‌তে পারি। দেখুন্ লিখছি।[১] আচ্ছা বলুন দিকিন্ কোন্ দিক্ থেকে এই লেখা সুরু কোর্‌তে হয়? বলুন্ দিকিন্। আমি কার কাছে এই লেখা লিখতে শিখেছি। আপনি কখ্‌খোনো জানেন না। কি মজা। আমি এখানেও বাঙ্‌লা সঞ্চয় পড়ি। আমি সব বুঝতেও পারি। আমার বইটা প্রায় শেষ হোয়ে গেছে। ইংরিজিতে আমি জন রস্‌কিন্‌এর[২] কিং অফ্ দি গোল্ডন রিভর পড়ি। বাবা সেটা এ্যামোন্ শক্ত। আমার সেটাও প্রায় শেষ হোয়ে গেছে. তার সবটাই প্রায় শক্ত কেবল শেষের দু তিন চ্যাপ্টার সহজ। বোধহয় রস্‌কিন্ ডিক্সনারিতে শেষে আর কথা পেলেনা। আপনি সে বইটা পোড়েছেন? আমার সব চাইতে ভাল লাগে...[৩] আর সব চাইতে খারাপ লাগে হ্যান্‌মকো। আমি কবিতার বই বাঙ্‌লাতে পড়ি খেয়া আর ইংরিজিতে টেনিসনের[৪] 'ইন মেমোরিয়ম্'[৫] পড়ি। আমি টিয়র্‌স্ [য] আইড্‌ল...[৬] কবিতাটী মুখুস্তো কোরছি। আমার গীত পঞ্চাশিকার সেই যে এ্যাকটা গান্ আছে 'এই কি তোমার খুসী আমায় তাই পরালে মালা, সুরের গন্ধ ঢালা' গানটা খুব ভাল লাগে। আমি মুখুস্ত কোর্‌বো। এর মানে

আমি সব বুঝ্‌তে পারি। এইবার আপনি নববর্ষর দিন যে প্রবন্ধ পড়েছিলেন সেটা প্রবাসীর লোকেরা কোথায় পেলো। সেটা প্রবাসীতে ছেপেছে।' বাঙলাতে তো সর্টহ্যাণ্ড হয় না। জানিনা বাবা ওরা ক্যামোন কোরে পেলো। আপনি এ্যাতো বড়ো লেক্‌চার কেনো দিয়েছিলেন? তাইতো এ্যাতো অসুখ কোর্লো। কিন্তু লেক্‌চার্‌টা ভারী সুন্দর। আপনি 'পাখী আমার নীড়ের পাখী অধীর হ'ল কেন জানি' গান্‌টা ক্যানো লিখেছেন? আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। যান্ আপনি বড় দুষ্টু।' ও গান্‌টা সবে বানিয়েছেন? ওর কি সুর বসিয়েছেন? [জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬]

রাণু॥

জানেন্, আমি সোলেনক্রয়ারীতে নেক্‌ড়ে আর চিতাবাঘের বাসা দেখেছি। সেগুলো খুব উঁচু পাহাড়ে। আম্‌রা সেখানে উঠেছিলাম্। সেগুলো দেখ্‌তে অনেক্‌টা গুহার মোতো। কি মজা।

রাণু॥

৬২

[জুন ১৯১৯]

[সোলন]

ভানুদাদা,

পরশু থেকে সোলনে খুব বিষ্টি হচ্ছে। পোরশুদিন বিকেল ব্যালা হঠাৎ এ্যাত জোরে বিষ্টি হোতে লাগল। সেইজন্যে পোর্‌শু থেকে এখানে খুব ঠাণ্ডা হোয়েছে। কাল সকালে উঠে দেখি যে বাইরে এ্যামোন্ কুয়াশা হোয়েছে যে কিছু দেখা যাচ্ছে না। জান্‌লা দিয়ে ঘরের ভেতোরো কুয়াশা

ঢুক্‌ছিল। এমন সময় বাব্‌জা আমাকে আপনার চিঠিটা এনে দিলেন। এবার অনেকদিন পরে আপনি আমায় চিঠি দিলেন। আমি আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। বাব্‌জা বোলেছেন যে আমাকে জুলাই মাসে বোধহয় আপনার কাছে নিয়ে যাবেন। বাব্‌জা যদি ছুটী না পান্‌ তো আমি এ্যাক্‌লাই আস্‌ব। আমি এ্যাক্‌লা যদি আসি তো আপ্‌নি কি করেন্‌? তাহলে বেশ্‌ মজা হয়। আমিও আপনাকে গল্প বোল্‌বোখোন্‌। কাল্‌ আমি, মা, আশা, ভক্তি, বাবু সবাই বরোগ বলে এ্যাক্‌টা জায়গায় ব্যাড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানটা খুব সুন্দোর আর পাইন গাছে ঢাকা। সেখানে এ্যাক্‌টা ঝর্‌ণা আছে সেটা ঠীক সেই জীবনস্মৃতির ঝরণার ছবিটার মতন। আমি সেই ঝরণাটাতে গা ধুয়ে ছিলাম। আম্‌রা ফের্‌বার সময় রেলের লাইন্‌ ধোরে এসেছিলাম। হেঁটে চার পাঁচটা টনেলও পার হয়েছি। এ্যাক্‌টা টনেল যখন পার হচ্ছি এ্যামোন্‌ সময় ট্রেনের whistle শুন্‌তে পেলাম। দৌড়ে টনেলটা পার যেই হোয়েছি ওম্‌নি ট্রেনটা টনেলে ঢুক্‌লো। আর একটু দেরী হোলেই টনেলটায় চাপা পোড়ে যেতাম। বাবা। আমরা যখন বাড়ী ফির্‌লাম তখন ৪টে বেজে গ্যাছে। কি মজা হোলো। আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে দু তিন দিন হোলো এ্যাক্‌টা প্রকাণ্ড ম্যালা হোয়ে গ্যাছে। আমি আপনাকে তার এ্যাক্‌টা ছবি দেব। সেই ম্যালার এক্‌দিন আগে থেকে জুয়া খ্যালা সুরু হোয়ে ছিল। আমাদের বাড়ীর ঠীক নীচেই এ্যাক্‌দল খেল্‌ছিল। তাদের খ্যালা দেখে আমিও জুয়া খেলা শিখে গেছি। আমি যদি বোলপুরে যাই, আপনার সঙ্গে খেল্‌বোখোন্‌। আমি আপনাকে শিখিয়ে দেবোখোন্‌ খেল্‌তে।[১] ছ সাত্‌টা নাগর দোলাও এসেছিল। আমি চড়্‌তাম কিন্তু মা চড়্‌তে দিলেন না। অনেক লোকও এসেছিল। সেই ম্যালায় একজন লোক এক্‌টা অজগর সাঁপ নিয়ে এসেছিল। সে সাঁপটা আবার চোলে ব্যাড়াচ্ছিল। এখ্‌খুনি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আর আষাঢ় মাসের শান্তিনিকেতন এলো। যেটা আমার না। তাতে আমার নাম্‌টা কে লিখেছে। আপনি তো লেখেন নি?

আমি আপনাকে চিঠি লিখে সেগুলো পোড়্বো। আপনি ক্যামোন আছেন? আমি গিয়ে যদি আপনাকে মোটা না দেখি তো আড়ি কোরে দেবো।
[আষাঢ় ১৩২৬]

রাণু॥

ভানুদাদা, শুনুন্। এই বার প্রবাসীতে এ্যাক্টা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে সেটা এ্যামোন্ মজার। আমার পোড়ে এমোন্ হাসি পেয়েছিল। আপনাকে সেটা কেটে পাঠিয়ে দিচ্ছি। 'সার রবীন্দ্রনাথের সার্ উপাধি'টা আবার বড় বড় কোরে লিখেছে যাতে লোকের চোখে পড়ে।

রাণু॥

আমি প্রবাসীতে বাতায়নিকের পত্রটা[২] পড়েছি। সারাটা। আমার খুব ভাল লেগেছে। বাব্জা আমরা পড়্বার আগেই একদিন নিজে পড়ে পরে মুখে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুর প্রণামের পর। তাই আরো ভালো কোরে বুঝ্তে পেরেছি। আমার কাল বৈশাখী কবিতাটা খুব ভাল লাগে। এবার প্রবাসীতে আপনার অনেক কবিতা বেরিয়েছে।[৩] আমি সব পোড়েছি।

রাণু॥

৬৩

[জুলাই ১৯১৯]

[সোলন]

ভানুদাদা,

আমি আর ভক্তি রোজ দুপুর ব্যালা খাবার পর থেকে বারাণ্ডায় বসে থাকি চিঠির জন্যে। কাল আমি বল্লাম আমার চিঠি আস্বে। ভক্তি বল্লে

ওর বন্ধুর চিঠি আস্‌বে। কিন্তু আমি জিতে গেলাম। ও আজও বল্‌ছিল যে ওর এ্যাক্‌টা চিঠি আস্‌বে। কিন্তু আজও ওর চিঠি এলোনা। এখানে আজকাল আবার গরম হোয়েছে। কিন্তু আমরা এখান থেকে ছ সাতদিন পরেই চোলে যাব। সোলন থেকে কাল্‌কা পর্য্যন্ত ট্রেনে চড়্‌তে হবে। তাই খুব ভয় করছে। এখানকার লোকেরা বলে যে নাম্‌বার সময় নাকি বেশী গা বমি বমি করে। বাবা। আমরা ফেরবার সময় দিল্লীতে একদিন থাক্‌ব আর মিরেটে এ্যাক্‌দিন থাক্‌ব। তারপর কাশী যাব। আপনি যদি বিলেতে যান্‌ তো যাবার আগে এক্‌বার কাশীতে নিশ্চয় আস্‌বেন। না ত আপনার সঙ্গে আড়ি। ভানুদাদা, আপনাকে বুঝি বৌমা বোকেছেন যে জুয়া খেল্‌তে পারেন না। বৌমাকে বোক্‌তে বারণ কোর্‌বেন। বলবেন যে আমি বৌমাকে নিয়েও খেল্‌বো। কিন্তু আপনি ভারী দুষ্টু। লিখেছেন যে আমি ভুলেও কখোনো নিজের প্রশংসা কর্‌তে জানিনে। এদিকে তার আগেই তো নিজের ৭।৮ লাইন ধোরে প্রশংসা কোরেছেন।[১] কিন্তু আপনি একটা বিষয়ে ভারী দুষ্টু। আপনি ভারী কম খান। আমি বরং আপনার চেয়ে বেশী খাই। আমি আজকাল রোজ শান্তিনিকেতন পড়ি। আমি আপনার অনেক নতুন গান তাতে পড়েছি। আমার শান্তিনিকেতন পড়্‌তে খুব ভাল লাগে। দেখুন, এক্ষুনি আবার এ্যাম্‌ন্‌ মেঘলা হোয়ে গ্যাল। আপনি এখোন্‌ কি কোরছেন? সেদিন আমরা বরোগ ব্যাড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে এ্যাকটা ঝরণা বয়ে আমরা প্রায় এ্যাক্‌ মাইল গিয়েছিলাম্‌। সে ঝরণাটা এ্যামোন্‌ সুন্দোর্‌। আমার মাসীমা তাতে নাইলেন। আমারো নাইতে খুব ইচ্ছে কোর্‌ছিল। কিন্তু মা নাইতে দিলেন না। বোল্লেন অসুখ কোর্‌বে। আমরা সারা রাস্তা কাঁচা কাঁচা ডালিম খেয়েছিলাম। সে গুলো এ্যামোন্‌ সুন্দোর্‌ খেতে। আম্‌রা সেই জলে হাত মুখ ধুলাম। ঝরণাটার ওপোর এ্যামোন্‌ বড় বড় সব পাথর ছিল যে তার ওপোর কুড়ি পঁচিশ জন লোক বস্‌তে পারে। আমরা ঝরণাটার ধারে পন্‌চক্কি দেখেছিলাম। পন্‌চক্কিটার ধারে

্যাকটা খুব জোরে ঝরণা বইছিল। পনচক্কিটা এক্টা মাটীর কুটীরের ভেতোর ছিল। সেইজন্যে কুটীরটা থর্ থর্ কোরে কাঁপছিল। ঠীক য্যান ভূমিকম্প হোয়েছে। আপনি দেখ্লে অবাক্ হোয়ে যেতেন। [আষাঢ় ১৩২৬]

রাণু॥

৬৪

[জুলাই ১৯১৯]

[সোলন]

ভানুদাদা,

শুনুন, কাল এ্যাক্টা খুব ভীষণ কাণ্ড হোয়েছে।[১] এমোন্ ভীষণ কাণ্ড যে কি বোল্বো। কি হোয়েছে আপনাকে আমি বল্ছি, শুনুন। ভয় পাবেন না য্যানো। কাল বাবু মিরেট যাচ্ছিলেন। সাড়ে ছটার গাড়ীতে। আমরা ভাব্লাম যে বরোগ পর্য্যন্ত বাবুর সঙ্গে ট্রেনে কোরে যাই। তারপর বরোগ থেকে হেঁটে সোলনে ফিরে আস্ব। আমাদের সাড়ে তিন মাইল হেঁটে যেতে হোতো। ট্রেন্টা পোনেরো ষোলো মিনিট দেরী কোরে এলো। তার পর ট্রেন্টা ছাড়্লো। তারপর এ্যাক্ ফরলং যেতে না যেতেই ট্রেন্টা আবার ফিরে এসে ষ্টেসনে থাম্ল। এঞ্জিনটা নাকি খারাপ হোয়ে গ্যাছে। এঞ্জিন্টা থেকে ঝর ঝর কোরে জল পড়্ছিল। ট্রেনে আধঘন্টা বোসেই আছি। শেষে নাম্বার বন্দোবস্ত হোচ্চে এমন সময় ট্রেনটা আবার ছাড়্ল। তারপর থেকে ট্রেন্টা বেশ্ চোল্তে লাগল। আবার খানিক দূর এসে ট্রেন্টা থাম্ল। কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ থাক্ল না। চল্তে লাগ্ল। বরোগ

সোলন থেকে অনেক উঁচুতে। তাই ট্রেনটাকে অনেক চড়্তে হয়। তার পর থেকে ট্রেন্‌টা খালী চড়্তে লাগ্‌ল। সেই রাস্তাটা এ্যামোন্‌ ভীষণ। এ্যাক্‌পাশে গভীর খড়্। ঠিক ট্রেন্‌টার নীচেই। আর আর এ্যাক্‌ পাশে উঁচু পাহাড়। ট্রেন্‌টা আবার ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল এ্যামোন্‌ সোময় কি হোলো, এঞ্জিন্‌টায় জল কোমে গ্যালো। এঞ্জিনটা তাই গাড়ীটাকে আর টান্‌তে পার্‌ল না। আর রাস্তাটা ছিল ঢালু। গাড়ীটা তীরের মতন নেমে যেতে লাগ্‌ল। আমি ভেবে ছিলাম বুঝি মজা হচ্ছে। সে রাস্তাটাও ভীষণ। আর তারপর গাড়ীটা একটা বনের মাঝখানে সমতল জায়গায় এসে গাড়ীটা থাম্‌ল। সেখানে যেই গাড়ীটা থাম্‌ল, অম্‌নি যত লোক নেমে গ্যাল। কেউ কেউ আবার সেই বনের মধ্যে সারি সারি বোসে খেতে সুরু কোরে দিল। আমাদের সঙ্গে অনেক জিনিষ ছিল আর কোনো কুলি পাওয়া গ্যালোনা। তাই না বরোগে যেতে পারলাম না সোলনে ফিরে আসা যায়। সেখানে রাত্তির দশটা পর্য্যন্ত বোসে থাক্‌তে হোলো। তারপরে একটা এঞ্জিন সিম্‌লের থেকে এলো। এসে আমাদের ট্রেনটার পেছুনে লাগ্‌ল। তারপর ধীরে ২ বরোগ পৌঁছুল। তারপর বাবু সেই ট্রেন্‌টায় কোরে ফিরেট গেলেন। বরোগে একজন বাঙালী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের ভাব আছে। সে ফলের দোকান করে। সে এখানেই থাকে। অনেক দিন থেকে। সে এখানে এ্যাক্‌জন্‌ পাহাড়ীকে বিয়ে কোরেছে। আম্‌রা তার কাছ থেকে একটা লণ্ঠন চেয়ে নিলুম। তার স্ত্রী আমাদের খানিকটা দূর পর্য্যন্ত আলো দ্যাখাবে বোল্লে। তার স্ত্রী বেশ্‌ ভাল। বল্লে যে তুমি আমার বাড়ী চল্‌না। তোমাদের আমি রুটী সেঁকে খেতে দেব। বাব্‌জা বোল্লেন যে আজ বাড়ী ফিরে যাই আর এক্‌দিন আস্‌বো। তারপর আম্‌রা অন্ধকারে যেতে লাগ্‌লাম্‌। রাস্তাটা আবার খুব উঁচু। শুধু চড়্তে হয়। বনের মধ্যে দিয়ে। তারপরে কার্টরোডে উঠ্‌লাম। সে রাস্তাটা ভালো কিন্তু চারিদিক্‌টা এ্যামোন্‌ ভীষণ। কালো কালো পাহাড় এ্যাকদিকে আর কালো খড়্ এ্যাক্‌দিকে। পাহাড়ের

ড়ার গাছগুলো ঠীক এ্যাক্‌টা দৈত্যের মতন দ্যাখাচ্ছিল। সেদিন চাঁদের আলো থাক্‌তে পার্‌ত কিন্তু পাহাড়ে চাঁদটা প্রায় ঢেঁকে গিয়েছিল। একটু খানি দ্যাখা যাচ্ছিল। ভক্তি বেচারা কিছুতে যেতে পারছিলনা। ও বলছিল যে আমি রাস্তায় শুয়ে পড়ছি। আমারো এত ঘুম পেয়েছিল যে চোখ বন্ধ হোয়ে যাচ্ছিল। খানিকদূর গিয়ে যেই এক্‌টা পাথরের ওপোরে বসেছি এ্যামোন্‌ সোময় মা রাস্তার ধারে এ্যাক্‌টা লোক্‌কে দেখ্‌লেন। সে এমোন অস্বাভাবিক জায়গায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। তার নিশ্বাসও পড়্‌ছিল না। আমাদের এ্যামোন্‌ ভয় হোলো যে যদি ডাকাত হোতো। আমরা তাড়াতাড়ি আর এ্যাক্‌ মাইল গেলাম। তখন আকাশে এ্যামোন্‌ মেঘ হোয়েছে। আর সে জায়গায় সাঁপেরো খুব ভয়। এ্যামোন্‌ সোময় খুব জোরে বিষ্টি হোতে লাগ্‌ল। তখন প্রায় বাড়ী এসে গিয়েছিলাম। আমি আর ভক্তি তো বাড়ী এসেই ঘুমিয়ে পোড়লাম। মাসীমাকেও আমাদের গাড়ীতে থাক্‌তে হোলো। ওঁর বাড়ীর সাম্‌নে যাত্রা হচ্ছিল। তাই ভারী ভীড় হোয়েছিল। যাওয়া যাচ্ছিল না। রাস্তায় আমার বাব্‌জাকে দেখে ভারী হাসি পাচ্ছিল। বাব্‌জা এ্যাক্‌ কাঁধে ছাতা নিয়ে আর এ্যাক্‌ হাতে লাঠি আর এ্যাক হাতে বাতি নিয়ে গম্ভীর ভাবে যাচ্ছিলেন।

[আষাঢ় ১৩২৬]

রাণু ॥

৬৫

[নভেম্বর ১৯২৪]

C/O Prof. P. B. Adhikari
The Benares Hindu
University
সোমবার।

ভানুদাদা,

অনেকদিন আপনার কোনো চিঠি পাইনি— একমাসের উপর হল। আপনি সিলোন থেকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন, মনে আছে কি ভানুদাদা? তাতে লিখেছিলেন যে আমাকে চিঠি লেখা বোধহয় আপনার পক্ষে আর সম্ভবপর হবে না। সেইজন্যেই বোধহয় চিঠি পাইনি। একবার শুন্‌লুম যে আপনি পোর্ট সেইডে এক সপ্তাহ থাকবেন তারপর জেরুজালেম যাবেন। গেছেন কি ভানুদাদা? তারপর আবার কাগজে একদিন দেখ্‌লুম যে আপনি ম্যাডিডি এ start করেছেন। পেরুতে শুনেছিলুম আপনি 10th Decএ যাবেন।[১] এ চিঠিখানা তবে পেরুতেই পাঠাই ভানুদাদা— আপনি রাগ করবেন না ভানুদাদা চিঠি আবার লিখ্‌ছি বলে। আপনি কেমন আছেন আর কোথায় আছেন এ খবরটুকুও কি খবরের কাগজে থেকে জান্‌তে হবে? খবরের কাগজও যে সব সময় পাই না। সুবীরদাদা[২] যখন কোল্‌কাতায় যায়, তাকে বলে দিয়েছিলুম যে আপনার কোনো খবর পেলে আমাকে পাঠাতে। সেদিন সে এক্‌টুখানি খবর পাঠিয়েছে যে আপনি পেরু যাবেন। ভানুদাদা, আপনার এক্‌টুখানি হাতের লেখা দেখ্‌তে আমার ভারী ইচ্ছে করে। আপনি যখন আমার চিঠি পাবেন তখন কত শত শত লোকের মাঝখানে আপনি। আমি আপনার কে ভানুদাদা যে আপ[illegible] [illegible]খন আমাকে মনে করবেন? আমি সে আশাও করিনা। কিন্তু যদি কো[illegible]ন রাত্তিরবেলা [illegible]কারে শুতে গিয়ে আমাকে একটীবারও মনে পড়ে ভানুদাদা তাহলে

এক লাইনের একটা ছোট্ট চিঠি দেবেন ভানুদাদা যে সেদিন আমাকে মনে হয়েছে আপনার। আমি আপনার কে ভানুদাদা? আমি আপনার বন্ধুও নই, আর কেউ জান্‌বেও না, ভানুদাদা। আমাকে পথের মাঝখান থেকে আপনি একদিন কুড়িয়ে নিয়েছিলেন, তারপর যেই আপনার একটু খারাপ লাগ্‌ল পথেই ফেলে দিয়ে গেলেন। ভানুদাদা— আমি কি বল্‌ব? ভালবাসার কি একটা দাবী নেই? ভানুদাদা, আপনি কি আমাকে ক্ষমা কর্‌তে পারেন না? আমার যে ভারী কান্না পায় ভানুদাদা। ভানুদাদা, আমি ত বেশী কিছু অন্যায় করিনি। আমি Parisএ কিরকম কষ্ট পেয়ে আপনাকে চার পাঁচখানা চিঠি লিখেছি। ভানুদাদা— একটুও কি আপনাকে move কর্‌ল না? ভানুদাদা, আমি কতসময় ভাবি যে অভিমান করে আপনাকে চিঠি লিখ্‌ব না, কিন্তু কি রকম একলা, কি রকম বুকে কষ্ট হয় তাই আজ আবার লিখ্‌ছি। ভানুদাদা, দয়া করেও কি এক লাইন লেখা যায় না? ভানুদাদা, কোলকাতা থেকে ফিরে এসেই আমার জ্বর হয়েছিল। আপনার চিঠি কখানা সেই সময়ই পাই। ভানুদাদা, আমি এত দোষ করেছি যে আপনাকে আমি আর ভালবাস্‌তে পাব না? ভানুদাদা, আপনিই ত কতবার বলেছেন যে আমাদের সত্যিকারের বিয়ে হয়ে গেছে।[৫] তবে আপনি কি বলে আমাকে এমনভাবে অপমান করেছেন? আমাকে চিঠিতে আপনি যত খুসী বকুন না কিন্তু মাকে কেন লিখ্‌লেন? ভানুদাদা, আমি আপনাকে কি বল্‌ব, আমি সেই সময় গুলো সেই দুপুরবেলা সেই সন্ধ্যে সকাল, রাত্রি, সেই আপনার একেবারে কাছে বসে যখন গল্প কর্‌তুম, সেই সময়গুলো ভাব্‌তে পারি না। বুক টন্‌টন্ করতে থাকে— এত কষ্ট হয় কিন্তু তবু বারবার ভাব্‌তে ইচ্ছে করে। ভানুদাদা, সে সব হয়ত আপনার জীবনের একটী খেলার পালা কিন্তু আমার তা নয়। নয়, একেবারে নয়। এ যদি আমার জীবনে মিথ্যে হয় ভানুদাদা তাহলে পৃথিবীতে সত্য কাকে বল্‌ব? আমি একটুখানি ভাল হতেই আমরা আলীগড় গিয়েছিলুম, সেখানে গিয়েই আমার আবার

জ্বর আর কাশী হয়েছিল। আর তার সঙ্গে বমি হত। তারপর, সেখানে থেকে আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলুম, পেয়েছিলেন কি? আমরা আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, ফতেপুর সীক্রী, আর আরো দুচার জায়গায় বেড়িয়ে কাল কাশী এসেছি। আপনি হয়ত শুনে খুসী হবেন। আজ কলেজ গিয়েছিলুম কিন্তু ভারী মাথা ব্যথা হয়েছিল তাই তাড়াতাড়ি চলে এলুম। ভানুদাদা, ভানুদাদা, আমাকে ভুলে যাবেন না। ভানুদাদা, আমাকে আর ভালবাস্‌বেন না? ভানুদাদা, আপনি যাই বলুন আমি কাউকে কিছুতেই ভালবাস্‌তে পারব না। আমি বুড়োদের[৩] কোনো খবর জানি না। জানতে চাইও না। সেই আমাকে তার জন্যেই ত আবার আপনি অবধি আমাকে ভালবাসেন না। আমি ত আপনার পায়ে ছুঁয়ে বলেছি যে তাদের কোনো খবর নেবনা। আমি বিয়ে কর্‌ব না। কখনই, কখনই না তাকে সে আমার পায়ে ধরে সাধ্‌লেও না। ভানুদাদা, আমি যত ভেবে দেখি, দেখি যে সে কাপুরুষ— আমি তার সঙ্গে আর কোনো রকম কিচ্ছু সম্বন্ধ রাখ্‌তে চাই না। ভানুদাদা, আগে আমার বুড়োর উপর একটুও রাগ হত না কিন্তু এখন মনে হলে ঘৃণা হয়। আমি কাউকেই বিয়ে কর্‌ব না— আপনার সঙ্গে ত বিয়ে হ'য়ে গেছে। ভানুদাদা, আপনি হয়ত মান্‌বেন না কিন্তু আমি মানি। আপনি আমাকে নাই ভালবাসলেন। আপনি আমাকে নাই চিঠি দিলেন কিন্তু আমি ত মনে মনে জান্‌ব যে একদিন আমি ভানুদাদার সমস্ত আদর পেয়েছি। আমার সমস্ত শরীর ছেয়ে সে আদর আমার মনকে ভরে দিয়েছিল সে ভাবনাটুকু কেড়ে নেবার সাধ্য এ পৃথিবীতে কারুর নেই ভানুদাদা আপনারও না। নাই বা আপনি চিঠি দিলেন, আমি ত জান্‌ব মনে মনে যে একটা secret আছে যা আমি আর ভানুদাদা ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। সেই secretটুকুতে ত কারুর অধিকার নেই। ভানুদাদা, আপনাকে কত লোক ভালবাসে, কত লোক আপনাকে চায়, কত শত শত লোক একটীবার আপনাকে চোখের দেখা দেখ্‌বার জন্যে দূর দূর দেশ থেকে

আসে— আমি তাদের মাঝখানে কে ভানুদাদা? আমার এমন কোনো গুণ নেই যার জন্যে আপনার ভালবাসার যোগ্য হতে পারি। এমন রূপও নেই ভানুদাদা যে আপনাকে মুগ্ধ করতে পারি। ভানুদাদা, আমার চেয়ে কত শত শত সুন্দরী মেয়ে আপনার ভালবাসা চায় তবু ভানুদাদা আপনি আমাকে ভালবাসেননি। এখন যদি না ভালবাসেন তবে আমি কি বলব ভানুদাদা? আপনার জীবনে অনেক নূতনত্বের মধ্যে এ হয়ত একটা খেলা কিন্তু ভানুদাদা আমি যে আপনাকে ভারী ভালবাসি ভানুদাদা। আমার রূপ নেই গুণ নেই কিন্তু আমার মতন কেউ কখন আপনাকে ভালবাস্‌তে পার্‌বে না। চাই না চাই না আমি প্রতিদান। একদিন ত পেয়েছিলুম একদিন ত আপনাকে ভালবাস্‌তে পেয়েছিলুম, ভানুদাদা, সে কথা ভাবতেই আমার এমন বুকে কষ্ট হয় কিন্তু তবু কেবলি বার বার ভাবতে ইচ্ছে করে। ভানুদাদা, মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয়। ভানুদাদা, আপনি আমাকে misunderstand করলেন বলে আর চিঠি দিলেন না এই কথা ভাব্‌তেও আমার কষ্ট হয়। ভানুদাদা, আপনি কি করে বুঝবেন? কিন্তু আমার এ কথা মনে হলেও এত একলা বোধ হয়। বোধহয় যেন এ পৃথিবীতে কেউ নেই যে আমাকে একটু sympathiseও করে। ভানুদাদা, আমি কখনই কাউকে বিয়ে কর্‌ব না। বুড়োকে কখনই কখনই না। সে যদি আমার পায়ে ধরে সাধে তবুও না। সে কাপুরুষ এক sentimental লোক। আমি আর তার সঙ্গে কোনোরকম সম্বন্ধ রাখতে চাই না। তার চিঠির কথা মনে হলে আমার এমন লজ্জা করে ভানুদাদা। সে সত্যি লোভী, true ভালবাসা কাকে বলে ওদের সমস্ত বাড়ী একত্র কর্‌লে বোধহয় কেউ বল্‌তে পারে না। ভানুদাদা, আপনি আমার জন্যে যা করেছেন আমাকে একসময় ভালবাসতেন বলেই করেছেন। ভানুদাদা, বুড়ো আমার পায়ে ধরে সাধ্‌লেও আমি ওকে বিয়ে করব না। ভগবান করেন ওর সঙ্গে যেন আমার এ জীবনে কখন না দেখা হয়। ও শনি। আপনার আর আমার জীবনের মাঝে এসেছিল— ভগবান করেন

আবার যেন যেখানে ছিল চলে যায়। ভানুদাদা, কার সাধ্য আমাকে আপনার কাছ থেকে দূরে রাখে। আমি তাকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছিলুম, তার মধ্যে প্রায় অনেকগুলোই ও আমাকে ফিরত পাঠিয়েছিল সেগুলো পুড়িয়ে ফেলেছি। ওর সমস্ত চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছি। ওর চিহ্ন মুছে যাক্, ধুয়ে যাক্। ভানুদাদা, দোহাই আপনার, আমাকে কখন বিয়ে কর্‌তে বল্‌বেন না। আমি যেমন আছি থাক্‌ব। আপনি ছাড়া আমি কাউকে কখন ভালবাসতে পার্‌ব না। ভানুদাদা জানেন আমার মর্‌তেও ইচ্ছে করে আপনার বুকের কাছে। ভানুদাদা আমি যে কিরকম [করে?] চাই একটু আপনার হাতের লেখা দেখ্‌তে। ভানুদাদা আপনি একটু হাত দিয়ে ছুঁয়েও আমাকে একখানা কাগজ পাঠিয়ে দেবেন। ভানুদাদা, আমার মতন unfortunate বোধ হয় কেউ নেই এ পৃথিবীতে কেউ নেই। আপনার কতদিন কোনো খবর পাইনি। ভানুদাদা, আপনি আমাকে misunderstand করলেন আর এমন করে ফেলে চলে গেলেন যেন আমি একটা পথের কুকুর। একটুখানি চিঠি লিখে খবর অবধি জানালেন না। কেন, কেন আমি এমনি কি দোষ করেছি যে আপনি এক লাইনের চিঠি লিখ্‌তে আমাকে ঘৃণা করেন। আমি আপনাকে কখনই ঠকাইনি। সত্যি যদি না ভালবাস্‌তুম তাহলে আপনার খবর জান্‌বার আমার দরকার কি? ভানুদাদা— আপনার দুটী পায়ে ধরে বল্‌ছি— আমি কি রকম উৎসুক থাকি আপনার একটুখানিও খবর জান্‌তে। আমি এত কাঁদি আপনি কি এক্‌টুও বোঝেন না? ভানুদাদা, যদিই দোষ করে থাকি আপনি কি ক্ষমা কর্‌তে পারেননা? আপনি এতই নিষ্ঠুর? ভানুদাদা— আপনি না ভালবাসলে আমি বাঁচ্‌ব কি করে? ভানুদাদা— আমি আর কখনই কখনই অভিনয় কর্‌ব না। আমার অভিনয়ের কথা মনে হলে রাগ হয়। আমি আর কিচ্ছু চাইনা কেবল আপনার ভালবাসা। ভানুদাদা আমার ভারী মন কেমন করে। যদি সময় না পান্, আমাকে দয়া করে একলাইনও খবর দেবেন যে কেমন আছেন।

আমরা কাশীতে এসেছি। মা, বাবা সকলে ভাল আছে। শুন্‌ছি দিলীপ কুমার রায়* দু তিন [দিন] বাদে কাশীতে আমাদের বাড়ীতে আস্‌বেন। এখানে একটা science conference হবে তাতেও প্রশান্তবাবুরা অনেকে আস্‌বেন বোধহয় কোল্‌কাতা থেকে। আর শুনছি অমিয়বাবু এসে নাগোয়াতে কোথায় আছেন। এসেই জ্বর হয়েছে— বোধহয় ম্যালেরিয়া। ভানুদাদা, ভানুদাদা, দোহাই ভানুদাদা, আমি যে ভারী চাই আপনার একটুখানিও খবর জান্‌তে। ভানুদাদা— আমি জানি আমার রূপও নেই, গুণও নেই তবু ভানুদাদা আপনি আমাকে ভালবেসেছিলেন। এখন আপনি আমার মনের কথা একটুও ভাবলেনও না— ভানুদাদা আপনার ত ভুল্‌তে একটুও দেরী হল না। দেয়ালীর দিন আমার জন্মদিন ছিল। ভানুদাদা— আমার প্রণাম আপনাকে চিঠিতে পাঠাচ্ছি। ভানুদাদা, একলাইন চিঠিও কি পাবনা ভানুদাদা।

রাণু॥

P.S. গবাদা* আমাকে ২।৩ খানা চিঠি আর ছবি দিয়েছিল। ভানুদাদা, আমি তখন বাধ্য হয়ে একটা ছোট্ট [চিঠি] দিয়েছি। তারপর গবাদা আবার দুটো ছবি পাঠিয়েছে। আমি আর লিখ্‌ব না ভাব্‌ছি। ভানুদাদা, আমি কখনই encourage কর্‌ব না— ইচ্ছেও নেই। ভানুদাদা, আমার ভারী মন খারাপ থাকে— একখানা চিঠি কি দেবেন না ভানুদাদা?

৬৬

[৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪]

*7, Harington Street
Calcutta
13.6.37

ভানুদাদা,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। আপনাদের বিশ্বভারতীর যে monthly একটা খবর বেরয়[১]— তাতে আপনাদের আলমোরা বাসের সব খবর পেলুম।[২] আমরাও অনেকদিন আগে আলমোরায় গিয়েছিলুম— আপনার কি মনে আছে? আমার খুব ভাল লেগেছিল। আশা করি আপনার শরীরের উন্নতি হচ্ছে।

আমরা যাবার আগে আপনাকে প্রণাম পাঠাচ্ছি। Mooltanএ রওনা হচ্ছি 19th June এ। কোলকাতা থেকে 17th Blue trainএ ছাড়ছি। ছেলেদের[৩] রেখে যাচ্ছি বলে বড় মন কেমন করছে। হয়ত England থেকে America যেতে হবে। আমাদের Londonএর Office ঠিকানা হল চিঠি দিতে হলে

Messrs. T. A. Martin & Co.
Laurence Pountray Hill
Vestry House
London E. C. 4.

আমরা থাকব Dorchester Hotel এ। দেখুন— এত খবর দিলুম তার মানে আপনার চিঠি চাই।

আপনি বহুদিন আগে আমার ছবি চেয়েছিলেন— একটা পাঠাচ্ছি— কি জানি যদি ভুলে যান।

আমার অনেক ভালবাসা ও প্রণাম জানবেন।

ইতি আপনার

রাণু

৬৭

[৮ শ্রাবণ ১৩৪৭]

**7, Harington Street*
Calcutta
Park 464
24.7.40

ভানুদাদা,

আপনার দুলাইনের চিঠি পেয়েও কি আনন্দ হল যে কি বলব।[১] যখন কোলকাতায় আসবেন— আশা করি খবর পাব। কাউকে বলবেন যে একবার Phone করে আমাকে সব খবর দিয়ে দেবে।

আপনাকে একটু বিরক্ত করছি। একখানি ইংরাজী গীতাঞ্জলী পাঠালুম— যদি ইংরাজীতে আপনার নাম ও তারিখ সই করে দেন— এইমাসে বইখানি ফিরৎ পেলেই হল।[২] কষ্ট দিচ্ছি কিছু মনে করবেন না।

আশাকরি ভাল আছেন। কোলকাতা ভয়ানক গরম— 7th August আপনার কাছে যাবার ইচ্ছা রইল।

ইতি

আপনার স্নেহের রাণু

৬৮

[২১ শ্রাবণ ১৩৪৭]

7, Harington Street
Calcutta
Park 464
6.8.40 মঙ্গলবার।

ভানুদাদা—

কাল আপনি খুবই ব্যস্ত থাকবেন[১] তবু কালকের জন্য দুলাইন না লিখে থাকতে পারলুম না। আশাকরি সবই খুব সুন্দর ভাবে সম্পাদিত হবে।

আমার ভাগ্যে যাওয়া নেই। গত দিন চারেক থেকে flu হয়ে শয্যাগত আছি। গলা ধরে গেছে এমন যে গলার জন্য electric treatment নিচ্ছি।

যাবার খুব ইচ্ছা ছিল।

আপনার autographed বই যথাসময়ে পেয়েছি। খুব সুন্দর হয়েছে। মহারাজা দারভাঙা ৭০০॥ টাকা দিয়ে বইখানি কিনেছে।[২]

আশা করি আপনি ভাল আছেন। আমার ভালবাসা জানবেন।

ইতি আপনার
রাণু

পরিশিষ্ট ২

আশা অধিকারী (আর্যনায়কম্)-র পত্র

রবীন্দ্রনাথ ও অনিলকুমার চন্দকে

১

১৬ জুলাই ১৯১৮

ওঁ

বারাণসী : মঙ্গলবার।

শ্রীচরণকমলেষু,

কাল আপনার আশীর্ব্বাদী পত্র পাইয়া আমরা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

বাবজা এখানে আসিয়া গরমে একটু ক্লিষ্ট হওয়া ভিন্ন বেশ ভালই আছেন। কিন্তু এখানে এমন অস্বাভাবিক দারুণ গরম পড়িয়াছে, ও সহরে কলেরা ও ডেঙ্গুজ্বর হইতেছে, যে তাঁহার জন্য আমরা বড়ই ভয় পাইতেছি। তিনি অগষ্ট মাসের প্রথম হইতে দুইমাস ছুটীর জন্য আবেদন করিয়াছেন্। বাবুর জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে তবে এখনও বড় দুর্ব্বল আছেন্। আমরা আর সকলে ভাল আছি।

রাণু দিনে তিনবার দুধ খায় এবং স্কুলে যেটুকু পড়ে তাহা ব্যতীত কিছু পড়িতে দেওয়া হয়না ; তবে সে অনেক জিদ করিয়া স্কুলে অ্যালজেব্রা ও জিয়োমেট্রীর ক্লাস লইয়াছে। দিনে স্কুল থাকিতে রাণু সারা সকাল চিঠি লিখিত, ও বিকালে যেদিন আপনার চিঠি পাইত সেদিন সারাবিকাল আপনার চিঠি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, আর নয় ত নানাদেশের রাজপুত্র রাজকন্যা ও পরীদের ছবি আঁকিত। আজকাল সকালে স্কুল, দুপুরে ছুটী; তাই সারাদুপুর রাণু যে পথ দিয়া ডাকহরকরা আসে সেই পথের ধারের জানলা খুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। আজ তিনচারদিন আপনার চিঠি না পাইয়া রাণু চুলবাঁধা ছবিআঁকা সব ছাড়িয়া দিয়াছে। এখানে আসিয়া অবধি রাণু অত্যন্ত বিষণ্ণ ও মনমরা হইয়া আছে। কাহারও সহিত বড় কথা কয়

না, খেলাধূলা ত একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। সন্ধ্যাবেলা অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া গিয়া ছাদে শুইয়া থাকে। সেজন্য মা বাবজাও তাহার শরীরের জন্য বড় চিন্তিত হইয়াছেন্।

আপনি আমাদের সকলকার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন্। ইতি,—
[৩২ আষাঢ় ১৩২৫][১]

আপনার স্নেহের

আশা।

২

২১ ডিসেম্বর ১৯৩৭

*অখিল ভারত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সমিতি

*বর্ধা (মধ্যপ্রান্ত)

তাং ৬ই পৌষ, ১৯৩৭।

শ্রীচরণেষু,

গুরুদেব, আপনি আমাদের উভয়ের পৌষোৎসবের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন্।

বহুদিন আপনাকে কোনও চিঠি লিখিনি। আপনি কিছুদিন পূর্ব্বে যখন অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন্[১], তখন একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে আপনার সেবা করবার প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু হয়ত কোনও সেবায় লাগবনা কেবল সেখানকার ভীড় বাড়াব এই আশঙ্কায় সে ইচ্ছা সম্বরণ করেছিলাম্।

ওয়ার্দ্ধায় যে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সম্মেলন হয়েছিল তার পর রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রচেষ্টা চলছে সে সম্বন্ধে হয়ত গান্ধীজী কলকাতায় থাকতে আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন্। আমাদের সমিতির কাজ যতদূর

অগ্রসর হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনার কাছে পাঠালাম্, আপনার কখনও অবসর হলে একবার দেখবেন্।

আপনি আমাদের দুজনের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন্। ভবিষ্যতে যখন আপনার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হবে একবার গিয়ে আপনাকে দর্শন করে আসবার আশা মনে আছে।

ইতি

প্রণতা

আশা। আরিয়াম্।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব অনিলকুমার চন্দকে লিখিত

* হিন্দু মহিলা মণ্ডল

Mahila Ashram
Wardha, C.P.
25/11/36

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের অনিল, তোমার পোষ্টকার্ড পেয়ে ভারী খুশী হ'লাম্। গুরুদেবের কাছে আমাদের কয়েকটী প্রার্থনা নেই একটী মাত্র প্রার্থনা।

তুমি ত জান এখানে আমরা দুজনে দুটী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজ করছি। একটী বালকবিদ্যালয় ও একটী মহিলাশ্রম। দুটী প্রতিষ্ঠানে এতদিন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক নামকরণ ও কার্য্যপদ্ধতি ছিল। উভয় প্রতিষ্ঠানেই এখন নামকরণ ও কার্য্যপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করবার প্রস্তাব চলছে।

আমি যে মণ্ডলীর সম্পাদিকার (এদেশে বলে মন্ত্রী) কাজ করছি, তার নাম এতদিন ছিল "হিন্দু মহিলামণ্ডল" ও উদ্দেশ্য ছিল 'হিন্দু মহিলাদের

নৈতিক, বৌদ্ধিক, ঔদ্যোগিক ... ইত্যাদি ইত্যাদি' শিক্ষা প্রদান করা।

মণ্ডলীর গত অধিবেশনে স্থির হয়েছে যে বর্ত্তমান constitution বদলে যে নূতন constitution করা হবে— তাতে উদ্দেশ্য রাখা হবে "জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে নারীজাতিতে নবজাগৃতি ও আত্মপ্রত্যয় সম্পাদনে সহায়তা করা এবং তাঁদের সেবার জীবনের জন্য প্রস্তুত করা"।

(হেসোনা যেন— এখানে বড় বড় নেতারা এইরকম বড় বড় প্রস্তাব করে থাকেন্)

এই মণ্ডলীর বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত রূপের জন্য গুরুদেবের নিকট একটী নূতন নাম প্রার্থনা করা হবে। গত অধিবেশনেই এই প্রস্তাব হয়েছিল। এবং সেই প্রস্তাবের একটী কপি আমি মল্লিকজীর হাতে গুরুদেবের কাছে পাঠিয়েছিলাম্। পেয়েছ কি?

আগামী ২৯শে নভেম্বর আমাদের অধিবেশনের দিন। যদি সম্ভব হয় ত গুরুদেবের কাছ থেকে বালকবিদ্যালয়ের জন্য একটী ও মহিলামণ্ডলের জন্য একটী— দুটী নাম জিজ্ঞাসা করে আমাদের তারযোগে জানাতে পারবে কি?[১] তারের খরচ অবশ্য মহিলামণ্ডল দেবে।

ডিসেম্বর মাসে একবার কাশী যাব। যদি সম্ভব হয় সেখান থেকে একদিনের জন্য গিয়ে একবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসব। আশা করি রাণীর[২] শরীর ভাল আছে। তোমরা দুজনে আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি [৯ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩]

আশাদিদি।

পুঃ। হিন্দী প্রস্তাবের আর একটা কপি এইসঙ্গে পাঠালাম্। আশাদিদি।

ফণিভূষণ অধিকারী (?-১৯৫০) নদীয়া জেলার টুঙ্গী গ্রামের বেণীমাধব অধিকারীর পুত্র। বেণীমাধব ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, টোল স্থাপন করে সংস্কৃত শিক্ষাদানে তিনি জীবনের অনেকটা অংশ অতিবাহিত করেন। স্ত্রী-বিয়োগের পরে তিনি সন্ন্যাস নিলে তাঁর নাম হয় পরমহংস স্বামী যোগানন্দ। তাঁর এক শিষ্য কাশীতে খানিকটা ভূমি-সহ একটি বাড়ি তাঁকে দিয়েছিলেন। এই বাড়িতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি জীবনের বাকি অংশ অতিবাহিত করেন।

বেণীমাধবের চার পুত্রের মধ্যে তৃতীয় ফণিভূষণ ছিলেন পিতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনের পরে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন নেপালের রাণাদের গৃহশিক্ষক হিসাবে। এর পরে তিনি দিল্লির হিন্দু কলেজে অধ্যক্ষ ও দর্শনের অধ্যাপকের পদে যোগ দেন ও ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর অ্যানি বেসান্টের আহ্বানে দিল্লির কাজ ছেড়ে ফণিভূষণ অল্প বেতনে কাশীর হিন্দু সেন্ট্রাল কলেজে দর্শনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এর আগেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল চন্দননগরের হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা সরযূবালার (? - ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭২) সঙ্গে। ১৯১৪ সালে বেনারস হিন্দু য়ুনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হলে ফণিভূষণ সেখানে দর্শনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

সরযূবালার পিতা হরিমোহনও ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ, সংগীতজ্ঞ ও বহুবিধ গুণের অধিকারী। জম্মুর রাজা রাম সিং-এর অধীনে তিনি কর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু রাজার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়ে তিনি চাকরি ত্যাগ করে লাহোরে চলে আসেন। তাঁর সাতটি সন্তানের মধ্যে কালীপ্রসন্ন (?-১২ নভেম্বর ১৯১৯) ছিলেন বহুবিধ গুণের অধিকারী। সাংবাদিক হিসেবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি

অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অনুরাগী এই মানুষটি পুত্র বিশ্বনাথকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি করে দেন। কিছুকাল তিনি শান্তিনিকেতনে এসে বাসও করেছিলেন। তাঁর চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিদ্যালয়ের কাজে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কাশী হিন্দু বালিকা ও বালক বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব ত্যাগ করে তাঁর পক্ষে শান্তিনিকেতনে এসে থাকা সম্ভব হয় নি। তাঁর মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সরযূবালাকে ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৬ তারিখে যে চিঠিটি লেখেন, সেটি 'শোকাতুরার প্রতি' নামে পৌষ-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

সরযূবালার জীবনে তাঁর এই অগ্রজের প্রভাব অপরিসীম। রবীন্দ্র-সাহিত্যপ্রীতির দীক্ষা তিনি তাঁর কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। লাহোরে থাকার সময়ে রাভি নদীর তীরে বেড়াতে গিয়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতেন। শৈশবেই সরযূবালা রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলতে পারতেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন সুগায়িকা, রবীন্দ্র-সংগীতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। অ্যানি বেসান্টের থিয়োসফিক্যাল স্কুলে তিনি অবৈতনিক সংগীতশিক্ষিকার কাজ করতেন।

ফণিভূষণও রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন। এই অনুরাগেরই বশবর্তী হয়ে তিনি ১৯১০ সালে গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে কলকাতা থেকে কর্মস্থলে ফেরার পথে কয়েক ঘণ্টার জন্য শান্তিনিকেতনে আসেন ও তাঁর অভিজ্ঞতার ইতিবাচক বিবরণ 'বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়' নামে অগ্রহায়ণ ১৩১৭-সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে প্রকাশ করেন। তাঁদের বাড়িতে রবীন্দ্রচর্চার যে আবহাওয়া বিদ্যমান ছিল, তার প্রভাব তাঁদের সন্তানদের উপরেও পড়েছে স্বাভাবিকভাবে।

ফণিভূষণ ও সরযূবালার পাঁচটি সন্তান। জ্যেষ্ঠা আশার জন্ম লাহোরে ১৯০৩ সালে (মৃত্যু : ৩০ জুন ১৯৭০), দ্বিতীয়া কন্যা শান্তির জন্ম ১৯০৪-এ দিল্লিতে, তৃতীয়া কন্যা প্রীতি বা রাণুর জন্ম ১৯০৬ সালে কাশীর

'মিশ্রী পুকুরা' নামক স্থানে (মৃত্যু: ১৫ মার্চ ২০০০), চতুর্থা কন্যা ভক্তি ১৯০৮-এ ও একমাত্র পুত্র অশোক ১৯১০ সালে কাশীতেই জন্মগ্রহণ করেন।

উপরে অধিকারী-পরিবারের যে বিবরণ দেওয়া হল, সেটি প্রায় সম্পূর্ণতই শ্রীসমর ভৌমিকের 'রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য' (১৪০৪) গ্রন্থে প্রদত্ত তথ্য অবলম্বন করে। তিনি লিখেছেন, ফণিভূষণের তৃতীয়া কন্যা প্রীতি বা রাণুর জন্ম ১৯০৬ খৃস্টাব্দে কাশীর 'মিশ্রী পুকুরা' নামক স্থানে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নিজের পত্রের সাক্ষ্যে আমরা জানতে পারি, রাণুর জন্ম হয়েছিল কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে অর্থাৎ কালীপুজোর দিনে। ওই বছর কার্তিকী অমাবস্যার তিথি ছিল ১ কার্তিক ১৩১৩ বৃহস্পতিবার ১৮ অক্টোবর ১৯০৬ তারিখে। সুতরাং এই তারিখটিকে রাণু বা প্রীতি অধিকারীর (পরবর্তীকালের লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়) জন্মতারিখ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে, রাণুর পরিবারে রবীন্দ্রসাহিত্য ও সংগীতের চর্চা ছিল অত্যন্ত সজীব। ফলে অল্প বয়স থেকেই রাণু রবীন্দ্রনাথের যে বই হাতে পেয়েছেন আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলেছেন বুঝে বা না-বুঝে। তা ছাড়া তাঁদের বাড়িতে 'প্রবাসী', 'ভারতী' ও 'সবুজ পত্র' পত্রিকা আসত, তাই নতুন লেখা পড়ারও সুযোগ ছিল তাঁর। তাঁর মা পত্রিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবি কেটে বাঁধিয়ে ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিলেন, তাই তাঁর চেহারার আদলও রাণুর অজানা ছিল না। এই-সবেরই পরিণতি শ্রাবণ ১৩২৪-এ রবীন্দ্রনাথকে লেখা রাণুর প্রথম চিঠি। চিঠিটিতে তাঁর ঠিকানা ছিল, কিন্তু নিজের পোশাকি নাম ও পদবীর উল্লেখ ছিল না— প্রযত্নে বাবার নাম লেখার তো প্রশ্নই নেই। এইরূপ চিঠির উত্তর না-পাওয়াই স্বাভাবিক, তবু-যে জবাব দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ যত্নসহকারে চিঠিটি রক্ষা করেছিলেন তার কারণ এর বিষয়বস্তু ও লেখিকার রচনার পদ্ধতি। রুল-টানা কাগজে মাত্রা দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা দেখেই পত্রলেখিকার বয়স অনুমান

করা শক্ত নয় (তখনও তিনি এগারো বছর পূর্ণ করেন নি)। আর বিষয়বস্তু? এই বালিকা জানাচ্ছেন, তিনি সেই বয়সেই 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছাড়া গল্পগুচ্ছের সব গল্পগুলিই পড়ে বুঝতে পেরেছেন— তাঁর পড়া বইয়ের তালিকায় আছে গোরা, নৌকাডুবি, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, রাজর্ষি, বৌঠাকুরানীর হাট, গল্পসপ্তক (তাঁর মা যেটি জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন), ডাকঘর, অচলায়তন, রাজা ও শারদোৎসব— কোনো-কোনো জায়গায় বুঝতে না পারলেও তাঁর ভালো লেগেছিল। এ ছাড়া তিনি চতুরঙ্গ, ফাল্গুনী ও শান্তিনিকেতন পড়তে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু বুঝতে না পারায় পড়া বিশেষ এগোয় নি। উপরন্তু তিনি জানিয়েছেন, তিনি ও তাঁর ছোটো বোন 'কথা' ও 'ছুটির পড়া' থেকে কবিতা 'মুখুস্ত' করেন। সুতরাং এমন একজন লেখককে দেখতে চাওয়া বা বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজেদের শোবার ঘরে শুতে দেওয়া ও প্রিয় পুতুলগুলি দেখানোর প্রতিশ্রুতি দান করা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। ক্ষুদ্র পাঠিকা কিন্তু শুধু প্রশংসামুখর নন, 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে ইরাণী বাঁদীর কাহিনীকে অসম্পূর্ণ রাখা বা 'জয়পরাজয়' গল্পে রাজকন্যার সঙ্গে শেখরের বিয়ে না দিয়ে তাকে মেরে ফেলা যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ঠিক কাজ হয় নি ও তার সংশোধন আবশ্যক, অনুরোধের ছদ্মবেশে এই পরোক্ষ সমালোচনাও তাঁর পত্রে আছে। তা ছাড়া আছে প্রায় জন্মগত আড়ি করে দেওয়ার ভয় দেখানো। কাজেই এমন একটা ও পরে আরও অনেক চিঠি পড়ে রবীন্দ্রনাথ বহুবিধ ব্যস্ততা সত্ত্বেও এই বালিকা বন্ধুর সঙ্গে এক দীর্ঘকালস্থায়ী পত্রালাপে প্রবৃত্ত হবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাঁর শৈশব ও তারুণ্যের সজীবতাকে সারাজীবন রক্ষা করে যাওয়া, সেই কারণেই সাহিত্য ও কর্মে নিজের পুনরাবৃত্তি না করে তিনি সর্বদাই নূতন পরীক্ষানিরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে পেরেছেন— তাই রাণু যখন তাঁর বয়সকে অপরিবর্তনীয় সাতাশ বছরে বেঁধে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে তাকে

শিরোধার্য করেন— শুধু রাণুকে লেখা চিঠিতে নয়, দেশ ও বিদেশের বহু সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁর এই চিরন্তন সাতাশ বছর বয়সের কথা তিনি সগর্বে উল্লেখ করেছেন।

রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলিতে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ দেখা যায়— একটি রাণুর সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয়ের পূর্ব্ববর্তী ও অপরটি প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পরবর্তীকালের। তাঁর সব চিঠিই যে পাওয়া গেছে তা নয়, কিন্তু বর্তমান সংকলনের ২০৮টি চিঠির হিসাব নিলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে ৭টি রাণুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের আগে লেখা— সময়কাল ১৯ অগাস্ট ১৯১৭ থেকে ১৫ এপ্রিল ১৯১৮ আট মাস, গড়ে মাসে একটিরও কম; সেক্ষেত্রে মাসাধিককাল শান্তিনিকেতনে একত্র বাসের পরে কেবলমাত্র জুলাই মাসে (১০-৩১ জুলাই ১৯১৮) লিখিত পত্রের সংখ্যা ৯টি। প্রথম পর্বের চিঠিগুলি নিতান্ত কৌতুকের ভঙ্গিতে লেখা— কিন্তু সাক্ষাৎপরিচয়ের পরে লেখা চিঠিগুলির সুরে গভীরতার স্পর্শ অনুভব করা যায়, কৌতুক সেখানেও আছে, কিন্তু স্নেহ ও কল্যাণকামনা তাদের অনেকটাই আর্দ্র করে তুলেছে।

এর কারণটি নিহিত আছে যে-অবস্থায় রাণুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল, তার মধ্যে। রাণু তাঁর প্রায় প্রতিটি পত্রেই কাশীতে আসার জন্য রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান জানিয়েছেন, শেষে গঙ্গার পরপারে ভ্রমণের একটি বিবরণ দিয়ে প্রলোভন দেখিয়েছেন, 'আপনি যখন আসবেন তখন আপনাকেও নিয়ে যাব। কিন্তু আপনি আসেন কই।' শেষ পর্যন্ত রাণু নিজেই এলেন দেখা করতে। তাঁর পিতা ফণিভূষণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন বৈশাখ ১৩২৫-এর শেষে— ভবানীপুরের বাসার ঠিকানা দিয়ে রাণু দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে দাবি জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ যেন অবশ্যই আসেন, 'নয়ত জন্মের মতন আড়ি'। কিন্তু তাঁকে হারিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই এলেন ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ (১৫ মে ১৯১৮) সন্ধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ভয় দেখিয়ে লিখেছিলেন, 'আমাকে দেখ্‌তে নারদ মুনির মত— মস্ত বড় পাকা

দাড়ি'— কিন্তু রাণু ভয় পান নি, পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন (২৫ অগাস্ট ১৯১৮), 'আমি যখন তোমাকে লিখেছিলুম যে, আমাকে তুমি নারদমুনির মত মনে করে হয়ত ভয় করবে, তখন আমি কত বড় ভুলই করেছিলুম— আমি যে ছ ফুট লম্বা মানুষ, এত বড় গোঁফ দাড়িওয়ালা কিম্ভূতকিমাকার লোক, আমাকে দেখে তোমার মুখশ্রী একটুও বিবর্ণ হল না এসে যখন আমার হাত ধরলে তখন তোমার হাত একটুও কাঁপল না, অনায়াসে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে দিলে, কণ্ঠস্বরে একটুও জড়িমা প্রকাশ হলনা— একি কাণ্ড বল দেখি?' এর পরের দিনই তাঁকে একটি অত্যন্ত দুঃখের আঘাত সহ্য করতে হয়েছে, তাঁর প্রথম সন্তান মাধুরীলতা (বেলা) দীর্ঘদিন রোগে ভুগে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। এই পরম দুঃখের দিনে রাণুই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে এসেছেন। সেইদিনই বিকেলে তিনি রাণুদের ভবানীপুরের বাসায় উপস্থিত হয়েছেন এবং তার পরে যতদিন কলকাতায় ছিলেন প্রায়ই গেছেন তাঁদের বাড়ি। ২৭ জুলাই তাঁকে লিখেছেন, 'আমার খুব দুঃখের সময়েই তুমি আমার কাছে এসেছিলে;— আমার যে মেয়েটি সংসার থেকে চলে গেছে সে আমার বড় মেয়ে, শিশুকালে তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি; তার মত সুন্দর দেখ্‌তে মেয়ে পৃথিবীতে খুব অল্প দেখা যায়। কিন্তু সে যে মুহূর্ত্তে আমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল সেই মুহূর্ত্তেই তুমি আমার কাছে এলে— আমার মনে হল যেন এক স্নেহের আলো নেববার সময় আর এক স্নেহের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। আমার কেবল নয়, সে দিন যে তোমাকে আমার ঘরে আমার কোলের কাছে দেখেচে তারই ঐকথা মনে হয়েচে। তাকে আমরা বেলা বলে ডাক্‌তুম, তার চেয়ে ছোট আর এক মেয়ে আমার ছিল তার নাম ছিল রাণু, সে অনেকদিন হল গেছে।' এই দুটি শূন্য স্থান পূর্ণ করেছেন রাণু অধিকারী— সাতান্ন বছরের পুরুষের কাছে এগারো বছরের বালিকা মেয়ের ভূমিকা নিতে পারেন না, তাই রাণুর সম্বোধন

'রবিবাবু'কে পরিবর্তিত করে 'রবিদাদা' সম্বোধনে পরিণত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট হয়েছেন।

এরপরে রাণু রবীন্দ্রনাথের আরও কাছে এসেছেন শান্তিনিকেতনে গিয়ে মাসাধিককাল অবস্থান করে। ফণিভূষণের কলকাতার চিকিৎসা সম্পূর্ণ হলে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথই তাঁদের শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেন। এ কথা বললে ভুল হবে না, রাণুর সান্নিধ্য পাওয়ার স্বার্থবুদ্ধিও তাঁর আমন্ত্রণের পিছনে কাজ করেছিল। এখানে রাণু তাঁকে দেখলেন তাঁর কর্মক্ষেত্রের পটভূমিকায়, যদিও তখন গরমের ছুটি চলছিল। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা না থাকলেও আশ্রমবাসী শিক্ষক ও তাঁদের পরিবারের ছেলেমেয়েরা ছিলেন। তাই লাবু, রেখা, কল্যাণী প্রভৃতিকে বন্ধু হিসেবে রাণু পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে থাকলেই তাঁকে ঘিরে অনাহূত সভা জমে উঠত— তাই গান, আবৃত্তি, ইংরেজি সাহিত্য পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের স্বাদও রাণু পেয়েছেন, নিজেও 'অভিসার' ইত্যাদি কবিতা আবৃত্তি করে তাতে অংশ নিয়েছেন। তাঁর নিজের আসরও ছিল। দেহলির ছাদে সন্ধ্যার সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে বসে তিনি হিন্দি দোঁহা, শিশুমহাভারত, রূপকথার গল্প প্রভৃতি শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছেন (২৭ জুলাই ১৯১৮), 'সন্ধ্যাবেলায় মোড়ায় বসে তুমি যখন আমার কাছে নানা বিষয়ে গল্প বলে যাও সে আমার খুব মিষ্টি লাগে। সন্ধ্যা আকাশের তারা ঈশ্বরের খুব বড় সৃষ্টি, কিন্তু সন্ধ্যায় ছাদে রাণুর মুখের কথাগুলি তার চেয়ে কম বড় নয়— ঐ তারার আলো যেমন কোটি কোটি যোজন দূরের থেকে আস্‌চে— তেমনি তোমার হাসি গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হয় যেন কত জন্ম জন্মান্তর থেকে তার ধারা সুধাস্রোতের মত বয়ে এসে আমার হৃদয়ের মধ্যে এসে জম্‌চে।'

কিন্তু রাণুর ভালোবাসায় যে অধিকারবোধের প্রকাশ তিনি দেখেছেন, তাকে তিনি ভয়ও পেয়েছেন। ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল, কিন্তু ভালোবাসা যখন বন্ধনে পরিণত হওয়ার উপক্রম করেছে তখনই

সেই বন্ধন ছিন্ন করার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। তরুণ বয়সের সঙ্গিনী, প্রেরণাদাত্রী নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবী তাঁর জীবনে প্রথম নারীর ভালোবাসার আস্বাদ এনে দিয়েছিলেন কিন্তু সেই ভালোবাসাই যখন তাঁর রুচির দাসত্ব করতে রবীন্দ্রনাথকে বাধ্য করতে চেয়েছে, সেই ভালোবাসাই যখন 'রাহুর প্রেম'-এর মতো সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে, তখন তাঁর মন বিদ্রোহ করেছে। এইভাবে রাণুও যখন তাঁকে একান্তভাবে নিজের করে চাইতে শুরু করলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন চিঠির পর চিঠিতে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন, লিখেছেন (২৫ জুলাই), 'আমি ভিতরের সৌন্দর্য্যকে সব চেয়ে ভালবাসি— যাদের স্নেহ করি তাদের মধ্যে সেই সৌন্দর্য্যটি দেখবার জন্যে আমার সমস্ত মনের তৃষ্ণা। মেয়েদের মনে এই সৌন্দর্য্যটি যখন দেখা যায় তখন তার আর তুলনা কোথাও থাকে না। কিন্তু মেয়েরা যখন কেবল সংসারে জড়িয়ে থাকে, সব তা'তেই কেবল আমার আমার করে, নিজের ছোট ছোট সুখ দুঃখকে নিয়ে পৃথিবীর সব মহৎ লক্ষ্যকে আড়াল করে রাখে, যখন তারা বড় চেষ্টার বাধা, বড় তপস্যার বিঘ্ন হয়ে কেবল মাত্র লোকের মন ভোলানোকেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে রাখে তখন বাইরে তাদের যতই সৌন্দর্য্য থাক্ সে সৌন্দর্য্য মায়া মাত্র, সে সৌন্দর্য্য সত্য নয়।' রাণুর মতো ছোট্ট মেয়ের সম্পর্কে এইরূপ ভাবা অমূলক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু রাণুর চিঠিগুলি পড়লে রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কার কারণটি বোঝা যায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথও চাইছিলেন রাণুকে কাছে রাখতে। প্রায়ই চিঠি লিখছিলেন, বিভিন্ন ছুটিতে শান্তিনিকেতনে আসার জন্য, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরে ডিগ্রির মোহ ত্যাগ করে বিশ্বভারতীতে ভর্তি হওয়ার জন্য। ১৯২৩-এ গ্রীষ্মের ছুটিতে কোনো খবর না দিয়ে রাণু যখন হঠাৎ শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর পিতাকে জানালেন, 'আমরা দেরাদুনে যাচ্ছি সেখানে একে নিয়ে যাব।' দেরাদুনে যাওয়া হয় নি, তাঁকে

নিয়ে গেছেন শিলঙে ছুটি কাটাতে। রবীন্দ্রনাথ তখন 'রক্তকরবী' নাটক লিখছেন। নন্দিনী চরিত্র নাটকটির মূল তাৎপর্যেরই অন্তর্গত, সুতরাং এই চরিত্রের কল্পনায় রাণুর ভূমিকা অনুমান করা একটু অতিরেক বলেই মনে হয়, কিন্তু রাণুর সান্নিধ্য উক্ত চরিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় অবশ্যই সহায়তা করেছে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, রাণুকে নন্দিনীর ভূমিকা দিয়ে নাটকটি মঞ্চস্থ করতে। সেটি সম্ভব হয় নি, কিন্তু 'বিসর্জন' নাটকে রাণুকে অপর্ণার ভূমিকা দিয়ে তিনি নিজে বাষট্টি বছর বয়সে যুবক জয়সিংহের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

এই ঘটনা রাণুর জীবনে এবং রবীন্দ্রনাথ ও রাণুর সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের কারণ হয়েছিল। নাটকটির মহড়া চলার সময়ে রাণুকে অনেকদিন জোড়াসাঁকোয় থাকতে হয়। তাঁর বয়স তখন ষোলো বছর পূর্ণ হয়েছে, সেকালের মাপকাঠিতে তিনি তখন অবশ্যই বিবাহযোগ্যা। ফলে তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যে ও মিশুক স্বভাবে আকৃষ্ট হয়ে অনেক যুবক তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়েছেন এবং জীবনের জটিলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রাণু ফলাফল বিবেচনা না করেই তাদের মধ্যে কাউকে-কাউকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এইসব ঘটনা রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিল ভাববার কোনো কারণ নেই। কিন্তু রাণুকে স্নেহবশত তিনি বালিকাই ভাবতেন, ফলে তাঁর দৈহিক পরিণতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন না থেকে বাক্যে ও ব্যবহারে কোনো-কোনো পাণি-প্রার্থীকে কিছুটা প্রশ্রয়ই দিয়েছেন, রাণুর সঙ্গেও অনেক কৌতুক করেছেন, প্রাপ্ত পত্রাবলীতে তার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। এমন-কি, কৌতুক করে নিজেকেও প্রণয়প্রার্থীর ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন। যে-কোনো তরুণীই একে কৌতুক বলে মনে করবেন ও হেসে উড়িয়ে দেবেন— সেইটাই স্বাভাবিক; কিন্তু সরল অনভিজ্ঞতায় রাণু তাকে বিশ্বাস করেছেন ও মানসিক জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পেয়েছেন ও কষ্ট দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক্ সচেতন হলেন, তখন ঘটনার

দোলাচলে তিনি নিজেকে কতটা অসহায় মনে করেছেন ফণিভূষণ ও সরযূবালাকে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠিতে তার আভাস পাওয়া যাবে। রাণুর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রণয়প্রার্থীরা যখন কাশী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছেন, বেনামী চিঠি লিখে তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের চেষ্টা শুরু করেছেন, তখন রাণুর পিতামাতা সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর বিয়ে দিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানাতে পারেন নি। তিনি ফণিভূষণকে লেখেন, 'শীঘ্রই রাণুর বিবাহ দিয়ে সমস্যা সমাধানের যে চিন্তা করচ আমার কাছে সেটা ভালো বলে ত ঠেকচে না, তাতে সামাজিক সমস্যার মীমাংসা হতেও পারে, কিন্তু রাণুর নিজের পক্ষে সেটা সুখকর কিম্বা কল্যাণকর হবে কিনা সেটাই বিশেষ করে ভাববার কথা। ...আমার ত মনে হয় আরো কিছুদিন পড়াশোনার ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে বর্ত্তমান এই সমস্ত জঞ্জালের চিহ্ন মুছে ফেলা সর্ব্বপ্রথমে দরকার। তারপরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ শান্ত হলে ওর সম্বন্ধে সুব্যবস্থা সহজ হবে।' তিনি ফণিভূষণ ও সরযূবালাকে রাণুর অনুরাগী একটি যুবকের কথা ভেবে দেখতেও বলেছেন। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ সেরে ইটালি হয়ে দেশে ফিরেই যখন তিনি শুনলেন, সাহিত্যিকা অনুরূপা দেবীর দৌত্যে বিখ্যাত ধনী স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণুর বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে তখন তা মেনে নিয়েছেন। তবে খুব প্রসন্ন মনে যে সম্মতি দেন নি তা বোঝা যায়, বিদেশযাত্রার আশু প্রয়োজনের প্রসঙ্গ তুলে রাণুর বিবাহে উপস্থিত থাকা নিয়ে দোলাচলতার কথা জানিয়ে। এর পরেও বিবাহটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নি। রাণুকে, রাণুর পিতামাতাকে, রবীন্দ্রনাথকে, এমন-কি রাণুর ভাবী শ্বশুরবাড়িতে হতাশ প্রার্থীরা বেনামী চিঠি পাঠিয়ে ভয় দেখাতে শুরু করেছেন। এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করেছেন নিজেকে এই দুর্ঘটনার জন্য কিছুটা দায়ী ভেবে। তা সত্ত্বেও তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা

করেছেন এই সংকট কাটানোর জন্য— এমন-কি, রাণুর ভাবী শাশুড়ি লেডি যাদুমতী মুখোপাধ্যায়কে একটি দীর্ঘ চিঠিও লিখেছেন। শুভাকাঙ্ক্ষার আন্তরিক প্রয়াস ছাড়াও চিঠিটি উল্লেখযোগ্য রাণুর স্বভাবপ্রকৃতির বিশ্লেষণ ও তাঁর প্রতি নিজের মনোভাবের অকপট প্রকাশের জন্য। রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

'রাণুকে তাহার শিশুকাল হইতে জানি এবং একান্তমনে স্নেহ করি। ইহা জানি তাহার চরিত্র কলুষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার বয়সে বাঙালীর ঘরের মেয়েরা যে সাধারণ অভিজ্ঞতা সহজে লাভ করে তাহার তাহা একেবারেই ছিল না। সে এমনি শিশুর মত কাঁচা যে তাহার কথাবার্ত্তা ও আচরণ অনেক সময় হাস্যকর হইত। এইরূপ অদ্ভুত অনভিজ্ঞতাবশত লোক ব্যবহার সম্বন্ধে তাহার কোনো ধারণা ছিল না। এই কারণে রাণুর বিবাহ সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ উদ্বেগ ছিল। আমি তাহার জন্য এমন সৎপাত্র কামনা করিতেছিলাম যে তাহার একান্ত সরলতার যথার্থ মূল্য বুঝিবে এবং লৌকিকতার ত্রুটি ক্ষমা করিবে।...

'আপনি আমার কন্যা বেলাকে জানিতেন। তাহার ছোটভাই শমী বাঁচিয়া নাই। আমি অনেকবার ভাবিয়াছি যে, সে যদি বাঁচিয়া থাকিত তবে রাণুর সঙ্গে নিশ্চয় তাহার বিবাহ দিতাম। তাহার কারণ রাণুর মধ্যে অসামান্যতা আছে। বুদ্ধিতে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণতা— কিন্তু তাহার চেয়ে বড় কথা তাহার মনের নিষ্কলুষ সরলতা। ঠিক এমনটি আমি আর কোথাও দেখি নাই।...'

লেডি যাদুমতী ও স্যার রাজেনকে তিনি শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সমস্ত বিষয় মুখোমুখি আলোচনা করার জন্য। এই আলোচনা সংঘটিত হয়েছিল কি না জানা নেই, কিন্তু বিবাহ স্থির হতে বাধা হয় নি। জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' বাড়িতে থেকে বিবাহ দেবার জন্য ফণিভূষণের প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ আগ্রহের সঙ্গেই মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু সম্ভবত রাণুর শ্বশুরবাড়ি সেই প্রস্তাব অনুমোদন করে নি। এমন-কি, বিবাহের পূর্বে

ফণিভূষণ সপরিবারে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের আলিপুর অবজারভেটরির বাসায় থাকলেও পাকাদেখার অনুষ্ঠান তাঁরা করেছিলেন নিজেদের বাড়িতে মেয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে, রাজকীয় ভোজের খরচ দিয়েছিলেন নিজেরাই। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বুঝতে পারছিলেন, সামাজিক যে-সব অসুবিধা স্যার রাজেনদের ভোগ করতে হয়েছিল তার জন্য তাঁরা তাঁকেই দায়ী করেছেন। এই অবস্থায় তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন বিবাহানুষ্ঠানে যাবেন না, কিন্তু রাণু দুঃখ পেতে পারেন ভেবে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসেছেন, কিন্তু কী-ধরনের মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন তার বিবরণ পাওয়া যায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর 'রোজনাম্‌চা বা দৈনিক লিপি'-তে।

বিবাহের পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণুর যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে আসে। তার পরেও রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চল্লিশটি চিঠি পাওয়া গেছে, কিন্তু তার আকারও যেমন ছোটো হয়ে এসেছে, আগেরকার চিঠির মাধুর্যও সেখানে অনুপস্থিত। একথা ঠিক, সংসার, সন্তান ও ধনী ইঙ্গবঙ্গ পরিবারের জীবনযাত্রা নিয়ে রাণু তখন অন্য জগতের অধিবাসিনী, রবীন্দ্রনাথও বার্ধক্যের ভারে পীড়িত— কিন্তু উভয়ের সম্পর্ক যে অন্য মাত্রা লাভ করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

এই পর্বে রাণুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী আশা রবীন্দ্রনাথের অনেক কাছে এসেছেন। তাঁদের উভয়ের পত্র যা পাওয়া গেছে তা সংখ্যায় খুবই কম। কিন্তু অন্তত ফণিভূষণকে লেখা পত্রে আশার প্রসঙ্গ যেটুকু আছে, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না এই বিদুষী কন্যাটিকে বিশ্বভারতীর ছাত্রী ও কর্মী হিসেবে পেতে রবীন্দ্রনাথ খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীণ রাজনীতির চাপে আশা ও তাঁর স্বামী আরিয়ামকে আশ্রম ত্যাগ করতে হয়, তাঁরা গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যক্রমে যুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, যেন তাঁরা আবার বিশ্বভারতীর কাজে ফিরে আসেন— কিন্তু তাঁর সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি।

রাণুর কনিষ্ঠা ভগ্নী ভক্তিকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর ছাত্রী ও শিক্ষিকারূপে কিছুদিনের জন্য পেয়েছিলেন। এই সময়ে তাঁকে লেখা দুটি মাত্র পত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে।

সরযূবালাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে-পাঁচটি চিঠি ও তারই একটির অনুষঙ্গে লেডি যাদুমতী মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি বর্তমান সংকলনে আছে, তার প্রথমটি ছাড়া সবগুলিই রাণুর বিবাহ-সংক্রান্ত।

ফণিভূষণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগও প্রধানত রাণুকে কেন্দ্র করেই। প্রথমে 'আপনি'র দূরত্ব থাকলেও ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়ে 'তুমি'তে পরিণত হয়েছে। রাণুর বিবাহের পরে অবশ্য তাঁর লেখা চিঠিতে অন্য প্রসঙ্গও এসেছে। কায়স্থ সুরেন্দ্রনাথ করের সঙ্গে বৈদ্য রমা (নুটু) মজুমদারের প্রেমমূলক বিবাহ নিয়ে যে সামাজিক সংকট দেখা দিয়েছিল, সেই বিষয়ে ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞ ফণিভূষণের অভিমত রবীন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন। ফণিভূষণের উত্তর পাওয়া না গেলেও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর থেকে বোঝা যায়, তিনি মানবিক অনুভূতির চেয়ে সামাজিক শাস্ত্রবিধি মেনে চলারই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতামত ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করতে পারে নি, কিন্তু পত্রটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফণিভূষণ অবসর নিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিদ্যাভবনের কাজে আহ্বান করেন। ফণিভূষণ তাঁকে নিরাশ করেন নি।

চিঠিপত্র অষ্টাদশ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত চিঠিগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে লেখা রাণুর ৬৭টি এবং আশার ৩টি (ও অনিলকুমার চন্দকে লেখা ১টি) পত্রের মূল শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। রাণুর ৬৫-সংখ্যক পত্রটির মূল ইংল্যাণ্ডের ডার্টিংটন হলের অভিলেখাগারে রক্ষিত, শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত তার ফোটো-প্রতিলিপি সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন, এর জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

৪ এপ্রিল ১৯২৫ শান্তিনিকেতনে নববর্ষ বা জন্মোৎসবের অনুষ্ঠানে

রবীন্দ্রনাথ রাণুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছিলেন, 'তোমরা যখন আস্‌বে তখন আমার সমস্ত চিঠি সঙ্গে করে এনো। সকলের ইচ্ছা সে চিঠিগুলি রক্ষা করা হয়— এখানে যত্ন করেই রাখা হবে।' রাণু মূলপত্র দেন নি, কিন্তু তখন পর্যন্ত লেখা রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পত্রের প্রতিলিপি নিজের হাতে প্রস্তুত করে তাঁর হাতে তুলে দেন। কিন্তু এর পরেও আর-একটি প্রতিলিপি প্রস্তুত করানো হয়। এই দ্বিতীয় প্রতিলিপির খাতাটিতে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপক সম্পাদনা করেন। কিছু পত্র সম্পূর্ণ ও কিছু পত্রের অংশবিশেষ বর্জিত হয়, সর্বত্রই সম্বোধন ও স্বাক্ষর বাদ যায়, সামান্য কিছু সংশোধন ও সংযোজনও হয়েছে। বোঝা যায়, 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কারকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। উক্ত পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৩৪ থেকে আষাঢ় ১৩৩৫ পর্যন্ত ১২টি সংখ্যায় ৫৯টি পত্র মুদ্রিত হয়ে 'পত্রধারা' পর্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ হিসেবে চৈত্র ১৩৩৬ (মার্চ-এপ্রিল ১৯৩০)-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ভূমিকা'য় লেখেন:

'পত্রধারার দ্বিতীয় পর্যায়ের চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল একটি বালিকাকে। সে চিঠির বেশির ভাগ লেখা শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগুলির মধ্যে দিয়ে স্বতই বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনের জীবন-যাত্রার চলচ্ছবি। এগুলিতে মোটা সংবাদ বেশি কিছু নেই, হাসি-তামাশায় মিশিয়ে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস; আর তারই সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ। বিশেষ কিছু বলতে হবে না মনে করে হালকা মনে আটপৌরে রীতিতে যা বলা যেতে পারে তাকে কোনো শান-বাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই।'

বইটি যখন প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন য়ুরোপে; ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন শহরে থাকার সময়ে বইটি হাতে পেয়ে ৮ অগাস্ট

১৯৩০ তিনি রানী মহলানবিশকে লেখেন: 'ইতিমধ্যে ভানুসিংহের পত্রাবলী নতুন ছাপা হয়ে পড়ল আমার হাতে এসে। শান্তিনিকেতনের বর্ষার মেঘ ও শরতের রৌদ্রে পরিপূর্ণ সেই চিঠিগুলি। দূরদেশে এসে সেই চিঠিগুলি পড়ছি বলে সেগুলো এত পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গেলুম— কোথায় আছি।' আবার বার্লিন থেকে ৫ সেপ্টেম্বর রাণুর বোন ভক্তিকে লিখেছেন: 'ভানুসিংহের পত্রাবলী সেদিন আমার হাতে এসে পৌঁচেছে। পড়তে পড়তে শান্তিনিকেতন আমার চারদিকে মূর্ত্তিমান হয়ে উঠল। ভুলে গেলুম যে আছি পশ্চিম সমুদ্রের পারে। আমার কোনো লেখাতেই শান্তিনিকেতনের রূপ এমন রসপূর্ণ হয়ে জাগেনি। নিজের কীর্ত্তি নিয়ে অহঙ্কার করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে তবু সত্যের খাতিরে বলতেই হচ্চে এই চিঠিগুলির পরিধি দুই ডাকঘরের দুই কিনারার মধ্যেই পরিসমাপ্ত নয়— আর, কালের যে সীমানা আমার আকস্মিক সাতাশ বছর বয়সের মধ্যেই কিছু দিনের জন্যে আবদ্ধ ছিল পত্রাবলী তাকে অনেকদূর ছাড়িয়ে গেছে। রাণুকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলুম বঙ্গবাণীর নিত্য ঠিকানায় সেগুলি পৌঁচেছে।'

এই খণ্ডে রাণুকে লেখা 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'র ৫৯টি চিঠির পূর্ণাঙ্গ পাঠের সঙ্গে প্রাপ্ত আরও ১৪৯টি চিঠি প্রকাশিত হল। অপ্রকাশিত চিঠির কয়েকটি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র নব পর্যায়ের তিনটি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। রাণুর লেখা কয়েকটি চিঠিও উক্ত সংখ্যাগুলিতে মুদ্রিত হয়। কিছু চিঠি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শ্রীসমর ভৌমিকের লেখা 'রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য' গ্রন্থে। ফণিভূষণ ও ভক্তি অধিকারীকে লেখা যথাক্রমে তিনটি ও একটি চিঠি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯-সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। মূল পত্র বা ফোটোকপির অভাবে এই চিঠিগুলির ক্ষেত্রে পত্রিকার পাঠই অনুসরণ করা হয়েছে। বাকি চিঠিগুলি কলকাতার অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্ট্স্-এ রক্ষিত মূল পত্র বা ফোটোকপির সঙ্গে

মেলানো হয়েছে। বানান ও ছেদচিহ্নের ক্ষেত্রে কোনো সংশোধন না করে অবিকল মূল পাঠ অনুসৃত হয়েছে, কেবল বিশেষ কয়েকটি বানানের ত্রুটি '[য]' চিহ্ন-যোগে নির্দেশ করা হল।

বর্তমান খণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রবীন্দ্রনাথকে লেখা রাণুর চিঠিগুলি। তাঁর সমস্ত চিঠি রক্ষিত হয় নি, কিন্তু যেগুলি আছে নানা কারণে তাদের মূল্য অপরিসীম। রাণুর প্রথম দিকের কোনো চিঠিতেই তারিখ বা স্থানের স্বতন্ত্র উল্লেখ নেই। প্রথমে পত্রগুলিকে তিনটি স্থূল ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে— রাণুর প্রাথমিক চিঠিগুলিতে সম্বোধন ছিল 'প্রিয় রবিবাবু', তার পরে সেটি পরিবর্তিত হয় 'প্রিয় রবিদাদা'য় এবং সবশেষে 'প্রিয় ভানুদাদা' বা 'ভানুদাদা' সম্বোধনে। এইরূপ তিনটি গুচ্ছে চিঠিগুলিকে ভাগ করে পত্রগুলির বিষয়বস্তু এবং রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ ও বিষয়ের সূত্র অবলম্বন করে সেগুলির কালানুক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু এ-ব্যাপারে নির্ভুলতার দাবি করতে পারি না। আলাদা করে রবীন্দ্রনাথ ও রাণুর চিঠি পড়ার আনন্দ তো আছেই, কিন্তু উভয়ের পত্র মিলিয়ে পড়লে একটি অতিরিক্ত রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ৭ অক্টোবর ১৮৯৪ তারিখে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখবার ক্ষমতা আছে।' ইন্দিরা দেবীর সেই সময়ে লেখা চিঠিগুলি পাওয়া যায় নি, সুতরাং তাঁর 'চিঠি লেখবার ক্ষমতা'র প্রমাণ যাচাই করবার সুযোগ নেই— কিন্তু রাণুর লেখা চিঠিগুলি পড়লে পাঠকের নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হবে না, কী গুণে তিনি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বর্তমান সংকলনের অন্তর্গত অপূর্ব চিঠিগুলি লিখিয়ে নিতে পেরেছিলেন। রাণু মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর এই চিঠিগুলি প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছিলেন, তার জন্য তাঁর উদ্দেশে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই খণ্ড সংকলনে ও সম্পাদনায় আমি অনেকের কাছেই ঋণী। সর্বাধিক সহায়তা পাওয়া গেছে রবীন্দ্রভবনে আমার সহকর্মী শ্রীমতী জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শ্রাবণী পালের কাছ থেকে। অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্ট্‌সে পাঠ মেলানোয় সাহায্য করেছেন অধ্যাপিকা ড. ভাস্বতী লাহিড়ী ও অধ্যাপক কুন্তল মিত্র। এই কাজে অ্যাকাডেমির অধিকর্তা শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত ও অবেক্ষক শ্রীঅমিতাভ দাস যে সৌজন্যপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন তা একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা। প্রয়োজন বিশেষে শ্রীঅনাথনাথ দাসের সাহায্য পাওয়া গেছে। শ্রীশঙ্খ ঘোষ এই আনন্দদায়ক কাজের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করেছিলেন বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ

রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)কে লিখিত

পত্র ১। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১।

১ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ১।

২ রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা রেণুকা (১৮৯১-১৯০৩), ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে বারো বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

৩ 'জয়পরাজয়' (প্রথম প্রকাশ : 'সাধনা', কার্তিক ১২৯৯) গল্পের নায়ক।

৪ 'ক্ষুধিত পাষাণ' (প্রথম প্রকাশ : 'সাধনা', শ্রাবণ ১৩০২)।

পত্র ২। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২।

১ *Gitanjali (Song Offerings)* ১৯১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হলে বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি প্রচারিত হয়, পরের বৎসরে (নভেম্বর ১৯১৩) তিনি সুইডিশ অ্যাকাডেমি কর্তৃক নোবেল প্রাইজের সম্মানে ভূষিত হলে বিশ্বব্যাপী তাঁর খ্যাতির বিস্তার ঘটে।

২ জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা (১৮৮৬-১৯১৮), ডাক নাম বেলা।

পত্র ৩। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩।

১ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ৩।

পত্র ৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪।

১ রাণুর পিতা ফণিভূষণ অধিকারীর কাশীর বাড়ির ঠিকানা ছিল ২৩৫, অগস্ত্য কুণ্ড।

২ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে বোলপুরে যান ৫ কার্তিক ১৩২৪ সোমবার ২২ অক্টোবর ১৯১৭ তারিখ রাত্রে; সুতরাং চিঠির তারিখটি সঠিক নয়।

পত্র ৫।

১ হয়তো এই সাতাশ দফা ফর্দ দেখেই রাণু রবীন্দ্রনাথের বয়স সাতাশে বেঁধে দিয়েছিলেন।

পত্র ৭। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫।

১ ইংরেজ উপনিবেশ ফিজিতে চুক্তিদাস-প্রথার পীড়নে ভারতীয়রা যে

অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করছিল, তার অবসান ঘটানোর জন্য অ্যান্ড্রুজ ও পিয়র্সন সেখানে গিয়েছিলেন ১৯১৫ সালে। এর পরেও অ্যান্ড্রুজ আবার ফিজিতে যান ১৯১৭ সালে। এই যাত্রায় তিনি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সেখানকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা-সফরের ব্যবস্থা করে আসেন। ভারতীয় তথা এশীয়দের সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়া গবর্মেন্ট যে অভিবাসন নীতি গ্রহণ করেছিল, তার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ও ঠিক করেন এই যাত্রাতেই তিনি পুনরায় জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণ করে আসবেন। তিনি ইংরেজবিরোধী মনোভাব পোষণ করেন, কিছু-সংখ্যক অস্ট্রেলিয়াবাসী এইরূপ অভিযোগ করছেন জেনে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার সফর বাতিল করেন; আমেরিকা সফর বাতিল হয় ক্যালিফোর্নিয়ার হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর নাম যুক্ত করায়।

২ তখন য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) চলছে এবং জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণে অনেক ব্রিটিশ ও আমেরিকান জাহাজ ডুবে যায় এবং বহু প্রাণহানি ঘটে।

পত্র ৮।

১ রাণুর পিতা ফণিভূষণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন ও বিশ্রামের জন্য রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে এসে মাসাধিককাল (৪ জুন-১০ জুলাই ১৯১৮) অবস্থান করেন। ১০ জুলাই কাশী রওনা হওয়ার সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্টেশনে গিয়ে তাঁদের ট্রেনে তুলে দেন।

২ প্রাক্তন ডাকাত-সর্দার ও পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমের পাহারাদার দ্বারী সর্দারের পুত্র হরিশ দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনের বাগানে মালির কাজ করেন।

৩ রেলগাড়িতে বসে তাঁদের ভ্রমণের একটি দীর্ঘ বিবরণ রাণু রবীন্দ্রনাথকে লিখে পাঠান। দ্র. রাণু অধিকারীর পত্র, সংখ্যা ১৪।

৪ রচনা : শান্তিনিকেতন, ২৩ চৈত্র ১৩২০ (৬ এপ্রিল ১৯১৪); গীতিমাল্য, ৮৭-সংখ্যক; গীতবিতান ১ম খণ্ড।

পত্র ৯।

১ দ্র. পত্র ৮, ৩-সংখ্যক টীকা।

২ Charles Freer Andrews (১৮৭১-১৯৪০), শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

৩ 'ঘরে-বাইরে' বৈশাখ-ফাল্গুন ১৩২২-সংখ্যা 'সবুজ পত্র' মাসি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হওয়ার পরে ১৩২৩ (১৯১৬ খৃ.) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ 'At Home and Outside' নামে *The Modern Review* (January-December 1918) পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয় ও ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় *The Home and the World* (1919) নামে। এই চিঠি ও রাণুকে লেখা অন্যান্য কয়েকটি চিঠি থেকে জানা যায়, অ্যান্ড্রুজের অনুলেখনে রবীন্দ্রনাথও মুখে মুখে উপন্যাসটির কিছু অংশ অনুবাদ করেন। তিনি ৫ নভেম্বর ১৯১৮ তারিখে লন্ডনে ম্যাকমিলান কোম্পানিকে সেই খবরটি জানিয়ে লেখেন: 'My nephew Surendranath has translated the latest novel of mine. ...A large part of it I have done myself and it has been carefully revised.' প্রকাশক অবশ্য বিজ্ঞপ্তিতে জানান: 'This story was translated by Mr. Surendranath Tagore and the translation was revised by the author.' রাণুকে লেখা চিঠি থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে বলা যায়, প্রকাশক অসম্পূর্ণ তথ্য তাঁদের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করেছিলেন।

৪ ২৬ আষাঢ় বুধবার (১০ জুলাই) দুপুরের গাড়িতে রাণু কাশী রওনা হন।

৫ বর্তমান গৌরপ্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁশবনে ঘেরা একটি খড়ের আটচালা মাটির বাড়ি। এখানে বিভিন্ন সময়ে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ অনেকেই বাস করেছিলেন। পরে বাড়িটি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেলে পুরোনো বাড়ির আদলে একটি পাকা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে।

৬ শান্তি অধিকারী (গঙ্গোপাধ্যায়), রাণুর মধ্যমা ভগিনী, ইংরেজিতে

এম. এ.; রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়র কেশবলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়।

৭ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫), রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র, তাঁর 'সকল গানের ভাণ্ডারী'।

৮ আশা অধিকারী (আর্যনায়কম্) (১৯০৩-৬৯), রাণুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী; পরে বিশ্বভারতীর ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী। সেখানকার অধ্যাপক এবং বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের সফরসঙ্গী ও সচিব ই. ডব্ল্যু. আরিয়াম (আর্যনায়কম্)-এর সঙ্গে বিবাহ হয়। পরে উভয়েই ওয়ার্ধায় গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হন।

৯ ভক্তি অধিকারী (প্যাটেল), রাণুর কনিষ্ঠা ভগিনী; গুজরাতি ব্যবসায়ী চিন্ময় প্যাটেলের সঙ্গে বিবাহ হয়।

১০ রাণুর পিতা কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী (?-১৯৫০)

১১ রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী (১৮৯৩-১৯৬৯)।

১২ রাণুর মাতা সরযূবালা অধিকারী (?-১৯৭২)।

পত্র ১০।

১ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ১৫।

২ রাণুর পুতুলদের নাম।

৩ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ১৫। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (চৈত্র ১৩৩৬)-তে একটি টীকা যোগ করেছেন : 'ভানু-সিংহের বয়স যে সাতাশ বছরে এসে চিরকালের মতো ঠেকে গেছে, বালিকার এই স্বরচিত বয়ঃপঞ্জীর বিধান ছিল।' (পত্র ৪২)

৪ 'সুভা' (প্রথম প্রকাশ : 'সাধনা', মাঘ ১২৯৯)। অনাথনাথ মিত্র-কৃত গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ সেপ্টেম্বর ১৯১০-সংখ্যা *The Modern Review*-তে মুদ্রিত হয়, পরে *Mashi and Other Stories* (১৯১৮) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই চিঠি থেকে স্পষ্ট নয়, রবীন্দ্রনাথ উক্ত অনুবাদটির কথা এখানে উল্লেখ করেছেন কি না।

৫ রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে 'অনুবাদ-চর্চা' (১৯১৮) পাঠ্যপুস্তকটি প্রস্তুত করছেন। এখানে সম্ভবত উক্ত গ্রন্থের ২৬-২৮ অনুচ্ছেদগুলির কথা

উল্লেখ করা হয়েছে।

৬-৮ বিদ্যালয়ের তৎকালীন পঞ্চম বর্গের ছাত্র সমরেশচন্দ্র সিংহ, জ্যোতিষচন্দ্র রায় ও আভাসচন্দ্র সেন।

পত্র ১১।

১ লাবু ক্ষিতিমোহন সেনের দ্বিতীয়া কন্যা মমতা (দাশগুপ্তা)-র (?১৯১১-৮৪) ডাক নাম।

২ রবীন্দ্রনাথ রাণুর পিতা ফণিভূষণকেও ৩১ আষাঢ়ের পত্রে লিখেছেন : 'আমার বিশেষ অনুরোধ সন্ধ্যাবেলা রাণুদের গান বাজনা শিখাইবার ব্যবস্থা করিবেন। আনন্দ আমাদের সব চেয়ে বড় খাদ্য— এই খাদ্য ছোট ছেলে মেয়েদের বাড়িবার বয়সে যত বেশি আবশ্যক এমন বড় বয়সে নয়।' রাণুর জন্য কণ্ঠসংগীত, এস্রাজ ও সেতার শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল।

পত্র ১২। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৬।

১ এই সময়ে সারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতেও ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধি মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই এই ব্যাধির প্রকোপ দেখা দেয় বলে একে 'যুদ্ধজ্বর' বলা হত।

২ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৯), বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রণেতা।

পত্র ১৩।

১ রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া পরবর্তী অনেকগুলি পত্রে দেখা গিয়েছিল।

২ রবীন্দ্রনাথ রাণুকে একটি পুতুল উপহার দিয়েছিলেন, তার নাম।

৩ নারায়ণ কাশীনাথ দেবল, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও ভাস্কর। রবীন্দ্রনাথেরই অর্থসাহায্যে লন্ডনে গিয়ে ভাস্কর্যবিদ্যা শিখে আসেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন বা কলকাতায় উপযুক্ত জীবিকার সংস্থান করতে না পেরে তিনি মাদ্রাজে চলে যান। তাঁর পরবর্তী জীবনের কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না।

৪ 'কল্পনা' কাব্যের অন্তর্গত, '১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত।'

৫ 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত, রচনা : ১৭ চৈত্র ১২৯৯।

৬ 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত, রচনা : ২৯ মাঘ ১৩০২।

পত্র ১৫।

১ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার (বেলা) ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয় ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ (১৬ মে ১৯১৮) সকালে। তার আগের দিন সন্ধ্যায় রাণুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে; রথীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে লিখেছেন : 'Ranu, the little girl of eleven, with whom father has had such an interesting correspondence, came this evening with her family. She is such a bright girl. But she felt shy before such a company here. She asked father to go to see her tomorrow or the day after.' পরের দিন সকালে বেলার মৃত্যু হলে সেইদিন বিকালেই রবীন্দ্রনাথ ভবানীপুরে গিয়ে রাণুর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি কলকাতায় যতদিন ছিলেন, প্রায়ই ভবানীপুরে গিয়ে রাণুর সঙ্গে দেখা করতেন।

২ মধ্যমা কন্যা রেণুকা।

পত্র ১৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৭।

১ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উচ্চতম বিভাগ।

২ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩), 'প্রবাসী' ও *The Modern Review* পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক— এই সময়ে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করছেন।

পত্র ১৭।

১ বর্তমান কালের ষষ্ঠ শ্রেণী।

পত্র ১৮। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৮।

১ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৪-১৯২৬), ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম পাঁচ জন ছাত্রের অন্যতম, পরে আমৃত্যু এখানেই শিক্ষকতা ও অন্যান্য গঠন-মূলক কাজে যুক্ত ছিলেন।

পত্র ১৯। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৯।

১ বর্তমান অষ্টম শ্রেণী।

২ প্রথম প্রকাশ : 'সাধনা', মাঘ ১৩০০; রচনা : ২৬ শ্রাবণ ১৩০০।

৩ 'Kacha and Devajani': *The Fugitive* [1921]।

পত্র ২০। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১০।

১ শৈলবালা দেবী, সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী।

পত্র ২১।

১ 'অশ্রুনদীর সুদূর পারে' গানের অংশ— 'নিজের হাতে নিজে বাঁধা ঘরে আধা বাইরে আধা'। এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, গানটির রচনাকাল ২৪ শ্রাবণ ১৩২৫-এর পূর্ববর্তী।

পত্র ২২।

১ ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০), ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট পণ্ডিত।

২ রেণুকা দাশগুপ্তা, বরিশালের হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

৩ রাণুর বিদ্যালয়ের ইংরেজ শিক্ষিকা।

৪ দিনেন্দ্রনাথের স্ত্রী কমলা ঠাকুর, নাতবউ সম্পর্কের জন্য রবীন্দ্রনাথ এঁকে নিয়ে অনেক কৌতুক করতেন।

পত্র ২৩। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১১।

১ ১৩১৫ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত; প্রথম ছত্রের পূর্ণ পাঠ : 'তব অমল পরশরস, তব শীতল শান্ত পুণ্যকর অন্তরে দাও।'

২ ১৩১৪ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত।

৩ কিছুদিন থেকে রাণুর পিতা খুবই অসুস্থ ছিলেন, তাই বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে আলমোড়ায় যাবেন, রাণুর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সেই খবর পেয়েছিলেন, দ্র. রাণুর পত্র ২৯।

৪ অসুস্থা কন্যা রেণুকার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে রবীন্দ্রনাথ আলমোড়ায় যান ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, অগাস্টের শেষ দিকে ফিরে আসেন।

৫ Irkutsk রাশিয়ার পূর্ব সাইবেরিয়ায় বৈকাল হ্রদের নিকটবর্তী একটি শহর। রবীন্দ্রনাথ রাণুর ভূগোল-জ্ঞান পরীক্ষার্থে এই শহরটির নাম করেছিলেন, কিন্তু রাণুকে ঠকাতে পারেন নি, দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ৩১।

৬ আলমোড়ার Thomson House নামে যে বাড়িটিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, তার মালিক বা ভারপ্রাপ্ত ছিলেন লালা বদ্রি শাহ। রাণুর চিঠি থেকে জানা যায়, এঁর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিল।

পত্র ২৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১২।

১ রবীন্দ্রনাথ উপনয়নের পরে বারো বৎসর বয়সে এপ্রিল ১৮৭৩-এ পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হিমালয়ের ডালহৌসি পাহাড়ে গিয়ে সেখানকার বক্রোটা শিখরে মাসখানেক থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন।

পত্র ২৫।

১ রবীন্দ্রনাথের 'অনুবাদ-চর্চা' গ্রন্থ রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়'-মতে প্রকাশিত হয়েছিল '১৯১৭ খৃষ্টাব্দে (১৩২৪ বঙ্গাব্দে)'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি পরের বৎসরে (১৯১৮ খৃ.) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির অন্যতমা অনুবাদিকা প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবী সেপ্টেম্বর ১৯১৮-এর বিবরণে লিখেছেন: 'এই সময়ে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলেদের জন্য একটি তর্জমার বই তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজে নানা ইংরেজি মাসিক পত্র ও পুস্তক হইতে খানিকটা করিয়া জায়গা দাগ দিয়া দিতেন, আমাদের অনেকের উপর ভার ছিল সেগুলি সহজ বাংলায় রূপান্তরিত করা।' ('পুণ্যস্মৃতি', ১৩১৭, পৃ. ১৮৮)।

২ প্রথম প্রকাশ: 'সবুজ পত্র', চৈত্র ১৩২১, মাঘ ১৩২২ ('বৈরাগ্যসাধন'); ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে (১৩২২) গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

পত্র ২৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৩।

১ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ৩০। এই পত্রের সঙ্গে রাণু আলমোড়া পাহাড় থেকে একটি লাল রঙের ফুল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পত্র ২৭। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৪।

১ রচনা: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০৪; প্রথম প্রকাশ: 'ভারতী', ফাল্গুন ১৩০৫, 'কাহিনী' (ফাল্গুন ১৩০৬) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

২ 'The Trial': *The Modern Review*, July 1920-সংখ্যায় মুদ্রিত।

পত্র ২৮। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৫।

১ Sir Walter Scott (1771-1832), স্কটিশ ঔপন্যাসিক, কবি, ঐতিহাসিক ও জীবনীকার। Marjorie Fleming-এর সঙ্গে স্কটের ঘনিষ্ঠতার কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত J. G. Lockhart-এর *Memoirs of the Life of Sir Walter Scott* [1836-38] নামক সাত খণ্ডে প্রকাশিত জীবনী থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

পত্র ২৯। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৬।

১ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী (১৮৯৬-১৯৬৯), ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক।

পত্র ৩০। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৭।

১ হেমলতা ঠাকুর (১৮৭৩-১৯৬৭), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ, দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী। শান্তিনিকেতনে 'বড়োমা' অভিধায় খ্যাত। কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িত্রী।

২ কিরণবালা সেন, আশ্রমে 'ঠানদি' নামে অভিহিত হতেন।

৩ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দুই কন্যা শান্তা (১৮৯৩-১৯৮৪) ও সীতা (১৮৯৫-১৯৭৪) দেবী।

৪ কালীমোহন ঘোষ (১৮৮৪-১৯৪০), ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক, পরে শ্রীনিকেতনের গ্রামপুনর্গঠনের কাজে যুক্ত হন।

৫ নেপালচন্দ্র রায় (১৮৬৭-১৯৪৪), ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক।

৬ বর্তমানে পাঠভবনের অফিস।

৭ বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (১৮৭৮-১৯৫৯), বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর বিশিষ্ট অধ্যাপক, বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ে পরম পণ্ডিত।

৮ জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩), শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনাপর্ব থেকে অঙ্ক ও বিজ্ঞানের শিক্ষক। সর্বসাধারণের উপযোগী করে বাংলা ভাষায় অনেকগুলি বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা।

৯ রেভারেন্ড সুশীলকুমার রুদ্র (১৮৬১-১৯২৫)।

১০ ২৫ ভাদ্র ১৩২৫ (১১ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)।

পত্র ৩১। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৮।

১ ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস থেকে ভাদ্র ১২৯৫ (১৮৮৮) পর্যন্ত

রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে গাজিপুরে ছিলেন, 'মানসী' কাব্যের অনেকগুলি কবিতা এখানে লেখা।

২ ১ আশ্বিন ১৩২৫ (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)।

পত্র ৩২। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ১৯।

১ 'ভানুসিংহ' ছদ্মনাম গ্রহণ করে বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন ('ভারতী', আশ্বিন ১২৮৪-জ্যৈষ্ঠ ১২৯১, কবিতাগুলি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে ১২৯০ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' ('নবজীবন', শ্রাবণ ১২৯১) নামক একটি রসরচনাও লিখেছেন তিনি।

পত্র ৩৩। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২০।

১ আলমোড়ার নিকটবর্তী একটি শৈলশহর।

২ ১৩১০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে কন্যা রেণুকাকে নিয়ে আলমোড়া যাওয়ার সময়ে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই দুঃখজনক স্মৃতি স্মরণ করেছেন।

৩ দ্র. 'হিমালয়যাত্রা' অধ্যায়, 'জীবনস্মৃতি'।

পত্র ৩৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২১।

১ এই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আজ বুধবার। আজ মন্দিরে ছুটির ঠাকুরের কথা বলেছি।' কিন্তু ১৬ আশ্বিন ১৩২৫ 'বুধবার' নয়, বৃহস্পতিবার। সেই কারণেই তারিখটি সংশোধিত হয়েছে।

২ ১৭ আশ্বিন শুক্রবার ৪ অক্টোবর ১৯১৮ মহালয়ার দিন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পূজাবকাশ আরম্ভ হয়।

পত্র ৩৫।

১ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ৪১।

২ এই খর-দাহনের নমুনা 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী' প্রভৃতি কাব্যের কিছু কবিতায় ও সমসাময়িক প্রবন্ধাবলিতে পাওয়া যাবে।

৩ রবীন্দ্রনাথ এই দিনই কলকাতায় রওনা হন, এ যাত্রায় তাঁর মাদ্রাজ পর্যন্ত যাওয়া হয় নি।

পত্র ৩৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২২।

১ ২৫ আশ্বিন ১৩২৫ (১২ অক্টোবর ১৯১৮)।

২ ২ কার্তিক ১৩২৫ (১৯ অক্টোবর ১৯১৮)।

পত্র ৩৭। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২৩।

পত্র ৩৮।

১ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ৪৪।

২ সম্ভবত *The Fugitive* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অনুবাদগুলি। রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা যাত্রা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় শান্তিনিকেতন থেকে গ্রন্থটির একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 'For private circulation'।

৩ প্রথম মহাযুদ্ধের বিরতি ঘোষিত হয় ১১ নভেম্বর ১৯১৮ তারিখে।

৪ রাণুর পিতা আসতে না পারলেও দেওয়ালির ছুটিতে রাণু কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

পত্র ৩৯।

১ সম্ভবত ১৭ কার্তিক ১৩২৫ (৩ নভেম্বর ১৯১৮) কার্তিকী অমাবস্যায় রাণুর জন্মদিন পালিত হয়।

২ রবীন্দ্রনাথের ৫০টি গান স্বরলিপি-সহ 'গীতপঞ্চাশিকা' নামে আশ্বিন ১৩২৫-এ প্রকাশিত হয়। নবপ্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে মুদ্রিত এটিই প্রথম গ্রন্থ।

পত্র ৪০। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২৪।

১ স্বল্পকাল শান্তিনিকেতনে থেকে রাণু এইদিনই কাশীর উদ্দেশে রওনা হন।

২ নগেন্দ্রনাথ আইচ (১৮৭৮-১৯৫৬), বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

৩ রাণুর পাঠানো এই ধরণের দুটি রূপকথা রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

পত্র ৪১। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২৫।

১ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এর পরে একটি ছত্র যোগ করেছেন : 'কথাটা সত্য হলে তো মরেও শান্তি নেই।'

পত্র ৪২। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২৬।

১ 'স্বর্গ-মর্ত', দ্র. 'সবুজ পত্র', ফাল্গুন ১৩২৫; 'লিপিকা' গ্রন্থে সংকলিত।

২ নাটিকাটিতে দুটি গান আছে : (১) 'মাটির প্রদীপখানি আছে', (২) 'পথিক হে, পথিক হে'।

পত্র ৪৩। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২৭।

১ প্রতিমা দেবীর হিন্দুস্থানী পরিচারিকা।

২ এই গানগুলি 'বৈতালিক' (চৈত্র ১৩২৫) ও 'গীতিবীথিকা' (বৈশাখ ১৩২৬) গ্রন্থে স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত হয়।

পত্র ৪৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২৮।

১ এই সময়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অনেক গুজরাটি ছাত্র ভর্তি হন। নিরামিষ আহার ও অন্যান্য সংস্কারের কারণে তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র গুজরাটি রান্নাঘর ও ভোজনশালার ব্যবস্থা করতে হয়।

পত্র ৪৫। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ২৯।

১ 'নৈবেদ্য' (১৩০৮) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গানের অংশ, সংখ্যা ২১।

২ এই গানগুলি 'গীতিবীথিকা'য় (বৈশাখ ১৩২৬) সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ১১২-সংখ্যক পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠানুক্রমে এই পনেরোটি গানের তালিকা সম্ভবত এইরূপ : ১। অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক; ২। আকাশ জুড়ে শুনিনু; ৩। দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়; ৪। সে যে বাহির হল আমি জানি; ৫। তোমায় কিছু দেব বলে; ৬। আমি আছি তোমার সভার দুয়ার-দেশে; ৭। আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান; ৮। ফাগুন-হাওয়ায় রঙে রঙে; ৯। তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে; ১০। সুর ভুলে যে ঘুরে বেড়াই; ১১। গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি; ১২। তোমার দ্বারে কেন আসি; ১৩। যে আমি ওই ভেসে চলে; ১৪। যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে; ১৫। জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে।

পত্র ৪৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩০।

১ প্রসিদ্ধ যাত্রাগায়ক ও পালা-রচয়িতা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২)।

২ সীতা দেবী 'পুণ্যস্মৃতি'তে এই মেলার বর্ণনা দিয়েছেন : ৯ই পৌষে "মেয়েদের 'আনন্দবাজার' খুলিল। হট্টগোল হইল প্রচুর, জনসমাগমও শান্তিনিকেতনের পক্ষে বেশ ভালোই হইয়াছিল বলিতে হইবে। সন্ধ্যার সময়েই

জমিল সব-চেয়ে বেশি। আমরা দুই বোন এবং সুকেশী দেবী নিচুবাংলায় হেমলতা দেবীর ঘরের সামনে ব্লাউজ ফ্রক প্রভৃতির একটি দোকান খুলিয়াছিলাম। আশ্রমবাসী কয়েকজন যুবক আমাদের ক্রেতা জুটাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, জিনিস বিক্রি হইল মন্দ নয়। ...বিকালে নিচুবাংলার ঘেরা উঠানে শামিয়ানা টাঙাইয়া খাবারের দোকান খোলা হইল। সুকেশী দেবীর বালক-ভৃত্য লক্ষ্মণের গলায় ঝুলানো মস্ত এক প্ল্যাকার্ডে 'শীঘ্র আসুন, শীঘ্র আসুন বউঠাকুরাণীর হাটে' লিখিয়া ছেলেটিকে আশ্রম ঘুরিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।"

৩ দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের পত্নী সুকেশী দেবী। পৌষ উৎসবের অল্পদিন পরে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান (১৮ পৌষ)।

পত্র ৪৭। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩১।

১ ২১ পৌষ (৫ জানুয়ারি ১৯১৯) কলকাতায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরের দিন দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে রওনা হন।

পত্র ৪৮।

১ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে এসে রবীন্দ্রনাথ মাদুরায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। স্বাস্থ্যোদ্ধার ও বিশ্রামের উদ্দেশ্যে মদনাপল্লীতে তিনি আইরিশ বন্ধু ও কবি জেম্‌স্‌ হেনরি কাজিন্‌সের (১৮৭৩-১৯৫৬) অতিথি হয়ে উড ন্যাশানাল কলেজের অতিথিশালায় অবস্থান করেন। পত্রটি সেখান থেকে লেখা। এইবারে বিভিন্ন শহরে তিনি 'The Message of the Forest', 'The Centre of Indian Culture' ও 'The Spirit of Popular Religion in India'-শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ও অনেক বিদ্যানিকেতনে অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ পড়ে শোনান।

২ এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে কেটে দেন যাতে পড়তে কোনো অসুবিধা না হয়।

পত্র ৪৯।

১ ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) কলকাতায় গিয়ে কাশীর মহারাজার আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১৫ চৈত্র কাশী রওনা হন ও পরদিন রবিবারে সেখানে পৌঁছন।

২ রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে জানা যায়, তিনি কাশীতে তিনটি বক্তৃতা করেন। তার মধ্যে দুটি বক্তৃতার নিশ্চিত বিবরণ পাওয়া যায়। ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল) কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছাত্রগণ একটি সভায় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দনপত্র দেন। ২৩ চৈত্র তিনি বারাণসী-শাখা সাহিত্য পরিষদে বক্তৃতা করেন দ্র. 'অর্চ্চনা', ফাল্গুন ১৩২৬। ১ এপ্রিল রাণুর পরীক্ষা শুরু হয়।

পত্র ৫০।

১ রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন পরে ২ বৈশাখ ১৩২৬ ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখেন: 'কাশী থেকে ফিরে এসে শরীর সুস্থ নেই। বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার খানিকটা ছিন্ন অংশ এখনও শরীর থেকে বেরিয়ে পড়বার সুযোগ পাচ্চে না। ...যাই হোক্ যতটা পারি চুপচাপ করে শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছি।'

পত্র ৫১।

১ বাক্যটি এমনভাবে কেটে দেওয়া যাতে পড়তে অসুবিধা না হয়।

পত্র ৫২।

১ সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

পত্র ৫৩। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩২।

১ রাণুরা এই সময়ে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাবার জন্য তখনকার পাঞ্জাব ও এখনকার হিমাচল প্রদেশের সোলন শৈলশহরে গিয়েছিলেন। তারই ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি লিখে পাঠান। দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ৫৮।

২ ঠিক এই জাতীয় ভাবই রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন সমকালে লেখা 'বাতায়নিকের পত্র' প্রবন্ধে।

৩ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ 'কাওয়াজ' শব্দটি যোগ করেছেন।

৪ রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী (১৮৯৪-১৯৬৯), তাঁর পুত্র-কন্যা নীতীন্দ্রনাথ (১৯১১-৩২) ও নন্দিতা (১৯১৬-৬৭)।

৫ রাজনৈতিক নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)।

৬ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ (১৮৮৮-১৯৬১), পৌষ

১৩২৫-এ মহামারী ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে পীড়িতা পত্নী প্রতিমা দেবীর স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাঁকে নিয়ে শিলঙ পাহাড়ে গিয়ে কয়েকমাস কাটিয়ে আসেন।

পত্র ৫৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৩।

১ জেনারেল ডায়ারের সেনাবাহিনী পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ান-ওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে সরকারি হিসাবে ৩৭৯ জনকে নিহত ও ১২০০ জনকে আহত করে (৩০ চৈত্র ১৩২৫ : ১৩ এপ্রিল ১৯১৯)। সমগ্র পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করে অন্যান্য শহরেও অবর্ণনীয় অত্যাচার চালানো হয়। এরই প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইটহুড' বা 'স্যার' উপাধি ত্যাগের ইচ্ছা জানিয়ে ৩১ মে ভাইসরয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে একটি ঐতিহাসিক পত্র প্রেরণ করেন।

পত্র ৫৫। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৪।

১ ৫৪-সংখ্যক পত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

২ বৈশাখ ১৩২৬ থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর মুখপত্র হিসেবে 'শান্তিনিকেতন' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। প্রথম সংখ্যায় একটি ছাড়া সবগুলি রচনাই রবীন্দ্রনাথের লেখা।

৩ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩০৮ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকায় 'কষ্টিপাথর'-শীর্ষক একটি বিভাগে অন্যান্য পত্রিকার বিশিষ্ট রচনাগুলি পুনর্মুদ্রিত হত। অনুরূপভাবে বৈশাখ ১৩২৬-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' থেকে 'গান', 'নববর্ষ', 'মৈসুরের কথা' ও 'বিশ্বভারতী' রচনাগুলি জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৪ এই সময়ে আশ্রম-সীমানার বাইরে উত্তর-পশ্চিমে মাঠের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ খড়ের চালা দেওয়া একটি মাটির বাড়ি তৈরি করাচ্ছিলেন।

পত্র ৫৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৫।

১ এই শব্দটি রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে যোগ করেন।

পত্র ৫৮। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৬।

১ দ্র. রাণুর পত্র, সংখ্যা ৬৪।

২ রবীন্দ্রনাথের এককালীন বাসস্থান 'দেহলি'।

পত্র ৫৯।

১ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ভৃত্য।

২ কিরণচন্দ্র দে, আই. সি. এস.।

পত্র ৬১। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৭।

১ দ্র. ৫৫-সংখ্যক পত্র, টীকা ৪। এই চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, তখনই রবীন্দ্রনাথ সেই বাড়িটিকে 'উত্তরায়ণ' নামে অভিহিত করছেন। পরে বাড়িটির অনেক পরিবর্তন হয়ে 'কোণার্ক' নামে পরিচিত হয়েছে। এখন সমগ্র এলাকাটিকে 'উত্তরায়ণ' বলা হয়।

২ তখন হাওড়া স্টেশনের কাছে গঙ্গা পার হওয়ার জন্য একটি পন্টুনব্রিজ ছিল, জোয়ারের সময়ে বড়ো জাহাজ যাওয়ার পথ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ব্রিজ খুলে দেওয়া হত।

৩ এই চিঠিটি পাওয়া যায় নি।

পত্র ৬২। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৮।

পত্র ৬৫। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৩৯।

১ শিলং থেকে গৌহাটি, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা ভ্রমণের পর রবীন্দ্রনাথ কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন ২৭ কার্তিক ১৩২৬ (১৩ নভেম্বর ১৯১৯) তারিখে। এই তথ্য অবলম্বনে চিঠিটির তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

২ দ্র. পত্র ৫৫, টীকা ৪ ও পত্র ৬১, টীকা ১।

পত্র ৬৬।

১ এই দুটি ছাত্র সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন : 'আমি ও আমার সঙ্গী অন্ধ্রদেশীয় বিদ্যার্থী চলমায়কে বিশ্বভারতীর প্রথম ছাত্র বলিলেও বলা যায়। ...রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত আমাকে ও চলমায়কে পাঠ দিতেন। দুপুরবেলাতে ইংরেজি; তখন কেবল আমরা দুটিই থাকিতাম।' ('রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', ১৩৯৩, পৃ. ১২৩, ১২৮)

২ এই সময়ে রাণুদের শান্তিনিকেতনে আসা সম্ভব হয় নি।

৩ এঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এই দিনই কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ

গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন: 'St. Paul's-এর Principal সাহেব কাল থেকে আমাদের অতিথি। আমার এই মাঠের বাড়িতেই তাঁকে এনে রেখেচি। নইলে দূর থেকে দেখাশোনার বড় অসুবিধা হয়। আমার এই জায়গাটি তাঁর খুব ভালো লেগেচে। তিনি খুব অল্প দিন হল বিলেত থেকে এসেছেন— তাঁর শ্রদ্ধা এবং নম্রতা এখনো বেশ তাজা আছে।'

পত্র ৬৭।

১ এই বিষয়ে পৌষ ১৩২৬-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ 'সংবাদ' দেওয়া হয় : 'কিছুদিন হইতে বীথিকা গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এবং আম বাগানের মধ্যে আশ্রমের সমস্ত ক্লাশ বসিতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যাপক মহাশয় নির্দিষ্ট বৃক্ষতলে ক্লাশ লইয়া থাকেন। আম্রবীথির বেদীতলে সকাল বেলায় সমবেত সঙ্গীত হইয়া থাকে।' (পৃ. ১২)

২ চৈত্র ১৩২৬-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ এই বিষয়ে লেখা হয়: 'এবার নানা কারণে গ্রীষ্মাবকাশ ১২ই চৈত্র হইতে আরম্ভ হইয়া ৩ মাস থাকিবে। আগামী পূজায় ছুটি মাত্র ৭ দিন দেওয়া হইবে।'

৩ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা, পরবর্তীকালে শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের সহধর্মিণী (১৯০৭-৭৩)।

৪ প্রাক্তন ছাত্র ও তৎকালীন শিক্ষক গৌরগোপাল ঘোষ (১৮৯৩-১৯৪০)।

৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী।

৬ ক্ষিতিমোহন সেনের দ্বিতীয়া কন্যা মমতা (দাশগুপ্তা)।

পত্র ৬৮। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪০।

১ জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের ৩৪তম বার্ষিক অধিবেশনের স্থান হিসেবে অমৃতসরকে নির্বাচন করা হয়। অধিবেশন চলে ২৭ ডিসেম্বর ১৯১৯ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সভাপতি ছিলেন মতিলাল নেহরু (১৮৬১-১৯৩১)।

২ James Clark Ross (1800-1862), ইংরেজ ভূপর্যটক, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে চৌম্বকীয় উত্তর মেরু আবিষ্কার করেন। ১৮৩৯ সালে দক্ষিণ মেরুতেও অভিযান করেন।

৩ একজন বিখ্যাত সাধু, কথিত আছে তিনি মাটির তলায় বাস করে কেবল বায়ু ভক্ষণ করে জীবনধারণ করতেন।

৪ David Lloyd George (1863-1945), ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী (১৯১৬-১৯২২)।

৫ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বৈশাখ ১৩১০ থেকে আষাঢ় ১৩১২ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়ে ভাদ্র ১৩১৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৬ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক James D. Anderson, I. C. S. (1852-1920)-এর আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ইংরেজিতে 'নৌকাডুবি' অনুবাদের অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

৭ John Graham Drummond, I. C. S. (1884-1958)-ও 'নৌকাডুবি' অনুবাদ করতে চাইলে অ্যান্ডারসন তাঁর কৃত কয়েকটি পরিচ্ছেদের অনুবাদ ড্রামন্ডকে দিয়ে দেন। সমগ্র অনুবাদটি *The Wreck* [1921] নামে প্রকাশিত হয়।

৮ 'বারো আনা'র ঘুম' উদ্ধৃতি-চিহ্নাঙ্কিত অংশটি রবীন্দ্রনাথ পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে যোগ করেন।

পত্র ৬৯।

১ 'রাজা' নাটক রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ১৩১৭ সালের কার্তিক মাসে, এটি প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩১৭-তে।

২ এই সময়ে তিনি 'রাজা' নাটকটির সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধন করেন 'অরূপরতন' নামে, ভূমিকায় লেখেন : 'এই নাট্যরূপকটি "রাজা" নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ— নূতন করিয়া পুনর্লিখিত'। অভিনয়পত্রীর আকারে মুদ্রিত নাটিকাটি মাঘ ১৩২৬-এ প্রকাশিত হয়।

৩ 'রাজা' নাটকে ছিল ২৬টি গান, 'অরূপরতন'-এ আছে ৩৯টি— এদের মধ্যে ১১টি সাধারণ— বাকি ২৮টি নূতন গান (এদের মধ্যে ৮টি এই নাটকের জন্যই রচিত)।

৪ এই নাটিকার অভিনয় করা তখন সম্ভব হয় নি।

পত্র ৭০।

১ এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদ, গুজরাটের কয়েকটি শহর, বরোদা, পুনা, বোম্বাই প্রভৃতি সফর করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ৩ মে ১৯২০ (২০ বৈশাখ ১৩২৭)।

২ ১৫ মে (১ জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী 'MERCA' জাহাজে ইংল্যান্ড অভিমুখে রওনা হন।

৩ ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭২-১৯৪০) জ্যেষ্ঠা কন্যা মঞ্জুশ্রীকে (১৯০৭-৮০) রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে নিয়ে যান ইংল্যান্ডে তাঁর পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিতে। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক হয় নি, ইতস্তত কয়েকটি বিদ্যালয়ে পড়ে মঞ্জুশ্রী তাঁদের সঙ্গেই দেশে ফিরে আসেন।

৪ ২৮ বৈশাখ (১১ মে) ভৃত্য সাধুচরণ ও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই মেলে রওনা হন।

৫ কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী।

৬ ননীবালা রায় প্রতিমা দেবীর সংসার পরিচালনায় সাহায্য করতেন।

৭ প্রমদারঞ্জন ঘোষ (১৮৮৬-১৯৭৬), বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক।

৮ নন্দলাল বসু (১৮৮৩-১৯৬৬), বিশিষ্ট শিল্পী, শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যাপক।

৯ রবীন্দ্রনাথের দেশে ফিরতে অনেক দেরি হয়েছিল, তিনি ১৬ জুলাই ১৯২১ (৩২ আষাঢ় ১৩২৮) বোম্বাইয়ে পৌঁছন।

১০ রবীন্দ্রনাথ ভুল করে '১৩২৬' লিখেছিলেন, হবে '১৩২৭' (১৯২০ খৃ.)।

পত্র ৭১।

১ পত্রটিতে ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গ (Strasbourg) শহরের ডাকঘরের মোহর থাকলেও এটি প্যারিস থেকে লেখা। মোহরে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২০ তারিখ আছে, কিন্তু এটি রচনার তারিখ হল্যান্ড রওনা হবার দিন ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২০ (২ আশ্বিন ১৩২৭)।

পত্র ৭২।

১ হল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী ও অন্যতম প্রধান বন্দর রটারডামে

রবীন্দ্রনাথ আসেন ১ অক্টোবর ১৯২০, এইদিন সন্ধ্যায় তিনি এখানকার গির্জাঘরের বেদী থেকে 'The Meeting of the East and West', প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

পত্র ৭৩।

১ বেলজিয়ামের বন্দর ও বাণিজ্য নগরী Antwerp-এ রবীন্দ্রনাথ ২ অক্টোবর ১৯২০ Royal Artistic Circle-এর উদ্যোগে 'The Message of the Forest' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

২ ৩ অক্টোবর বেলজিয়ামের রাজধানী Brussels-এ এসে পরদিন ৪ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ সেখানকার বিচারালয় Palais de Justice-এ 'The Meeting of the East and West' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সুতরাং তিনি পত্রে ৬ অক্টোবর ১৯২০ তারিখ দিলেও এটি বস্তুত ৪ অক্টোবরে লেখা।

পত্র ৭৪।

১ ফ্রান্স থেকেই রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা যাত্রা করবেন বলে ঠিক হয়েছিল, কিন্তু প্রতিমা দেবীর একটি অপারেশন হয়েছে খবর পেয়ে তিনি ১২ অক্টোবর লন্ডনে চলে আসেন।

২ 'মঙ্গলবার' অর্থাৎ ১৯ অক্টোবর তাঁর আমেরিকা রওনা হওয়া সম্ভব হয় নি। দ্র. পত্র ৭৫।

পত্র ৭৫।

১ ২১ অক্টোবর ১৯২০ বৃহস্পতিবার ডাচ-আমেরিকান জাহাজ 'Rotterdam'-এ রবীন্দ্রনাথ, পিয়র্সন ও কেদারনাথ দাশগুপ্ত আমেরিকা রওনা হন।

পত্র ৭৬।

১ ২৮ অক্টোবর ১৯২০ রাত্রে নিউ ইয়র্ক বন্দরে জাহাজ পৌঁছয়, কিন্তু তখনই পারে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় নি, পরদিন সকালে ডাক্তারি পরীক্ষার পরে জাহাজ থেকে নেমে রবীন্দ্রনাথ Hotel Algonquin-এ আশ্রয় নেন।

২ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন : 'ত্রেতাযুগে তোদের সমুদ্রপারের যে কাহিনী শোনা গেছে তাতে জলস্পর্শ করতে হয়নি। এখন সেই পবিত্র ল্যাজ খসে' গিয়ে বিংশ শতাব্দীতে বায়ুযানের আকার ধারণ

করেছে— সেই অবধি বায়ুনন্দনের দর্পচূর্ণ হয়ে গেছে। যখন অতলান্তিকের চপেটাঘাতে আমাদের জাহাজ বিচলিত তখন এই কথা চিন্তা করছিলুম। যা হোক তলিয়ে না গিয়ে পেরিয়ে এসেচি।

পত্র ৭৭।

১ নিউ ইয়র্কের বহুতল বাড়িগুলির ছবি-ছাপা পিকচার-পোস্টকার্ডে চিঠিটি লেখা। য়ুরোপ-আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে লিখিত সবগুলি চিঠিই বিভিন্ন ছবি-সংবলিত পিকচার-পোস্টকার্ডে লেখা, কোনোটিতেই স্বাক্ষর নেই।

পত্র ৭৮।

১ Mr. Seaman নামক এক ধনী ব্যক্তি নিউ ইয়র্কের কাছে Catskill Hill অঞ্চলে সুন্দর পাহাড়ী পরিবেশে Yama Farms নামে একটি অতিথিশালা নির্মাণ করে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সেখানে আমন্ত্রণ করতেন। বড়োদিনের ছুটি কাটানোর জন্য আমন্ত্রণ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সেখানে এসে একটি সপ্তাহ কাটিয়ে যান। এখানকার সৌন্দর্য, আতিথ্য ও সঙ্গ তাঁর ভালো লেগেছিল। দিনেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'জায়গাটি সুন্দর— শান্তরসাস্পদ। ...মনে মনে ভাবচি ভাগ্যবিধাতা আমার বনবাসের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলে হা হতোঽস্মি বলে দুঃখ করতুম না। বোধ করি নিয়ুইয়র্কের থেকে অযোধ্যা সহরের অনেক তফাৎ ছিল। নইলে রাম ফিরতেন না।'

পত্র ৮০।

১ একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা সফরের জন্য রবীন্দ্রনাথ ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ পর্যন্ত টেক্সাসের বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়ান।

পত্র ৮১।

১ ১৬ এপ্রিল ১৯২১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে ইংল্যান্ড থেকে 'Goliath' নামক একটি ছোটো বিমানে প্যারিসে আসেন। এইটিই তাঁর প্রথম আকাশপথে ভ্রমণ। উক্ত বিমানের ছবি-ছাপা পিকচার-পোস্টকার্ডে তিনি চিঠিটি লিখেছিলেন।

পত্র ৮২।

১ প্রথম মহাযুদ্ধে ১৯১৮ সালে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের পর মধ্য য়ুরোপের বোহেমিয়া, মোরাভিয়া ও স্লোভাকিয়া অঞ্চলগুলি নিয়ে

একটি নূতন প্রজাতন্ত্র চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। তৎকালে প্রচলিত ভূগোল গ্রন্থগুলিতে এই রাষ্ট্রের নাম না থাকার সম্ভাবনাকে ইঙ্গিত করে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের একটি পত্র থেকে জানা যায়, রাণু এই নূতন রাষ্ট্রের নাম জানতেন।

২ ১৮ জুন ১৯২১ সকালে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে এসে রবীন্দ্রনাথ এইদিনই দুপুর এগারোটার সময়ে স্থানীয় চেক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'The Message of the Forest' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

৩ ১৬ জুলাই ১৯২১ রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

পত্র ৮৩।

১ এই সময়ের একটি পত্র পাওয়া যায় নি যাতে রবীন্দ্রনাথ অজন্তা গুহা দেখতে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। সমকালীন অন্য কোনো পত্রেও প্রসঙ্গটির উল্লেখ দেখা যায় না। অনেক পরে ১২ মাঘ তিনি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন: 'মার্চ মাসের আরম্ভে হাইদ্রাবাদে রওনা হব। [স্যার আকবর] হাইদরী আমাকে নিমন্ত্রণ করেচেন— অজন্তা ও ইলোরায় নিয়ে যাবেন। নন্দলালরা সেখানে ছবি কপি করবার অনুমতি পেয়েচেন। সেইজন্যেই আমাকে যেতে হচ্চে— আমি যাব এই প্রলোভনেই হাইদ্রাবাদের কর্তৃপক্ষ এই বন্দোবস্তে রাজি হয়েচেন।' ('দেশ', ৮ পৌষ ১৩৬২, পৃ. ৫৬১-৬২) হয়তো এই আমন্ত্রণ এর আগেই জানানো হয়েছিল, যার কথা রবীন্দ্রনাথ রাণুকে লিখেছিলেন।

২ প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানি ও তুরস্কের পরাজয়ের পরে সন্ধির শর্ত নির্ধারণ করার জন্য প্যারিসের অদূরে ভার্সাই নগরীতে যুদ্ধরত দেশগুলির যে বৈঠক হয়, সেটিই Peace Conference নামে পরিচিত। ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানির উপর বহুবিধ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপ করা হয় ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৬৫০ কোটি পাউন্ড অর্থদণ্ড দেওয়া হয়, যা জার্মানিকে চল্লিশ বছর ধরে শোধ করতে হবে।

৩ রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ২৯ অগাস্ট ১৯২১ সোমবার য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে প্রদত্ত 'সত্যের আহ্বান' শীর্ষক বক্তৃতাটির কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে পত্রটি রচনার তারিখ হয় ১২ ভাদ্র ১৩২৮। (২৮ অগাস্ট ১৯২১)।

৪ ১৭-১৮ ভাদ্র ১৩২৮ (শুক্র-শনি ২-৩ সেপ্টেম্বর ১৯২১) জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের গান সহযোগে 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠিত হয়।

৫ কারও-কারও মন গুমটও হয়েছিল; গান্ধীজি-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী শান্তিনিকেতনে গিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারিণী মেয়েদের ধিক্কার দিয়ে আসেন; মাতুলকে জানান: 'দেশে যখন আগুন লেগেছে তখন বর্ষামঙ্গলের গান করা অকর্ত্তব্য এবং যে মেয়েরা সেদিন গানের সভায় সেজে এসেছিল তারা এই অগ্নিকাণ্ডে আহুতি দিয়েচে।' (চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭১-৭২)।

পত্র ৮৪।

১ Casus Belli— যুদ্ধের কারণ।

পত্র ৮৫। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪১।

১ রাণু এই সময়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন। মার্চ ১৯২২-এ এই পরীক্ষা হয়।

পত্র ৮৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪২।

১ পরবর্তী ৮৭-সংখ্যক পত্র থেকে জানা যায়, রাণু এই সময়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, কিন্তু সঠিক সময়টি নির্ধারণ করা যায় নি।

পত্র ৮৭।

১ শান্তিনিকেতনের ছাত্র, 'ধীমু' নামে বিশেষ পরিচিত।

২ তারিখ-যুক্ত পাণ্ডুলিপির অভাবে বলা শক্ত রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কোন গানগুলি রচনা করেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী' থেকে জানা যায়, অনাদিকুমার দস্তিদারের খাতায় প্রাপ্ত 'শরৎ ১৩২৮' সময়-চিহ্নিত ১৪টি গান শান্তিনিকেতনে রচিত হয়েছিল, যেগুলি 'নবগীতিকা প্রথম খণ্ড' (১৩২৯) গ্রন্থে স্বরলিপি-সহ ছাপা হয়।

৩ সুকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৪৮), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্রীনিকেতনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

৪ রবীন্দ্রজীবনী-কার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক (১৮৯২-১৯৮৫)। ইনি লিখেছেন, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুহৃৎকুমার ৮ নভেম্বর ১৯২১

দিনপঞ্জীতে লেখেন : "আমি অসুস্থ থাকায় এ কয়দিন গুরুদেবের কাছে যেতে পারিনি, তিনি আমাকে দুদিন দেখতে আসেন।" তাঁদের জননীও তখন পীড়িত, রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁদের গুরুপত্নীর বাসায় এসে খোঁজখবর নিতেন। দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২০-২১

পত্র ৮৮।

১ এই বৎসর কার্তিকী অমাবস্যা ছিল ১৩ কার্তিক ১৩২৮ রবিবার ৩০ অক্টোবর ১৯২১; এর পরবর্তী 'বুধবার' ১৬ কার্তিক, এই হিসাবে পত্রটির তারিখ অনুমিত হয়েছে।

পত্র ৮৯।

১ B. S. Nanjumda Naidu নামক এক ব্যক্তি ৩১ অক্টোবর ১৯২১ চারটি স্তবকের রবীন্দ্র-প্রশস্তিমূলক একটি ইংরেজি কবিতা রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই কাগজেরই অপর পৃষ্ঠায় পত্রটি লেখেন। কবিতার প্রথম স্তবকটি নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত হল:

Oh my beloved Gurudeva!
Thy name is spoken
Even in the corner of a town
As a laureate thou art considered
And as Kalidas thou art told
Thy love towards the humanity
Has found its utility.
Jai Jai Jai Gurudeva.

২ রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে প্রতিটি ইংরেজি শব্দ ভুল বানানে লিখেছেন।

৩ প্রসিদ্ধ ফরাসি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ Sylvain Levi (1853-1935) বিশ্বভারতীর প্রথম য়ুরোপীয় অতিথি-অধ্যাপক হিসাবে শান্তিনিকেতনে আসেন ২৩ কার্তিক ১৩২৮ বুধবার ৯ নভেম্বর ১৯২১ তারিখে।

পত্র ৯০। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৫।

১ এই বিষয়ে ফাল্গুন ১৩২৮-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ লেখা হয়: 'সাতই পৌষের বাৎসরিক উৎসবের পর জনকোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন

হইয়া পদ্মাবক্ষে কিছুকাল কাটাইবার নিমিত্ত গুরুদেব গত ১৩ই পৌষ শিলাইদা গিয়াছিলেন সপ্তাহকাল কাটাইয়া গত ২২শে পৌষ সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটি নূতন নাট্য লিখিতে এতদিন প্রবৃত্ত ছিলেন।'

২ এই বাক্যাংশটি পত্রিকায় প্রকাশের সময়ে 'আপনার পথ সে কাটছে'-রূপে পরিবর্তিত হয়।

৩ এই নাটকটি হল 'মুক্তধারা', বৈশাখ ১৩২৯-সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে মুদ্রিত হওয়ার পরে আষাঢ় ১৩২৯-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পত্র ৯১। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৩।

১ 'মুক্তধারা' নাটকটির নামকরণ রবীন্দ্রনাথ প্রথম করেছিলেন 'পথ'। আবার ২০ ফাল্গুন ১৩২৮ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখেন: "আমার নতুন নাটকটার নাম 'মুক্তধারা' নয়, 'পথমোচন'।" ('দেশ', ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২) 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ৬টি গান 'মুক্তধারা'য় গৃহীত হয়।

পত্র ৯২।

১ এই প্রসঙ্গে ফাল্গুন ১৩২৮-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ লেখা হয়: 'সেটি সমাপ্ত হইলে ৩০শে পৌষ আশ্রমবাসীদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। সংশোধন ও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া পুনরায় দুইবার পাঠ করিয়াছিলেন। তিন দিনের জন্য কলিকাতা গমন করিয়া বন্ধুদিগের নিকট নাট্যটি দুইদিন পড়িয়াছিলেন।'

২ উক্ত পত্রিকায় এই বিষয়ে লেখা হয়েছে: 'গুরুদেবের সন্ধ্যার ক্লাশ প্রায় নিয়মিত হইতেছে। বলাকা পাঠ শেষ হইলে লোক সাহিত্যের "ছেলে ভুলানো ছড়া" পড়িয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।' প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত-অনুলিখিত 'বলাকার' ব্যাখ্যা ও আলোচনার নোটটি দীর্ঘকাল ধরে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। ক্ষিতিমোহন সেনও যে অনুলিখন নিয়েছিলেন, সেগুলি 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

পত্র ৯৩।

১ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা সীতা দেবী তাঁর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে কলকাতায় দুদিন 'মুক্তধারা' পাঠের বিবরণ দিয়েছেন: "ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেন। 'মুক্তধারা' পড়িয়া

শুনানো হইবে শুনিলাম। বিচিত্রার উপরের ঘরে তখন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করিতেছিলেন, তাই পড়িবার স্থান স্থির হইল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ি। সেইখানেই গেলাম। বসিবার ঘরে আমাদের বসাইয়া গগনবাবু বলিলেন, 'বসুন আপনারা, আরম্ভ হলেই খবর দেব।' অনেক পরে পড়া আরম্ভ হইল। পাঠান্তে নাটকটি অভিনয় করার কথা উঠিল। ...পরদিন আমাদের Social Fraternityর অধিবেশনে তাঁহাকে একবার পদধূলি দিতে অনুরোধ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ...মুক্তধারা নাটকটি আর-একবার পড়িয়া শুনাইলেন।" নাটকটি অবশ্য অভিনীত হয় নি।

পত্র ৯৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৪।

১ ২৯ মাঘ রবীন্দ্রনাথ ফণিভূষণকে লিখেছিলেন : 'লেভি সাহেব শীঘ্রই কাশীতে যাইবেন, তাঁহাকে সেখানকার সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখাইবেন— রাণুর সঙ্গেও পরিচয় করাইয়া দিবেন।' সস্ত্রীক লেভি ১৮ ফেব্রুয়ারি (৫ ফাল্গুন) কাশীতে পৌঁছন। মাদাম লেভি তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন : 'অধ্যাপক অধিকারী আমাদের সঙ্গে করে সব কিছু দেখাতে চাইলেন। কন্যা রাণুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন। কবির বর্ণনায় যার অপরূপ লাবণ্যের সঙ্গে মিশেছে হরিণীর স্বচ্ছন্দ চঞ্চলতা।' (নন্দদুলাল দে-অনূদিত 'মাদাম লেভির ডায়েরি', 'দেশ' ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪) এই আলাপের সূত্রেই লেভি হয়তো বলেছিলেন, অর্থাভাবে ক্লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীর স্বর্ণপদ্মের সন্ধানে আছেন।

পত্র ৯৫।

১ হিসাবের খাতা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী পরদিন ১ চৈত্র কলকাতায় গিয়েছিলেন।

২ লেভি-দম্পতি ও অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৮ মার্চ ১৯২২ নেপাল যাত্রা করেন। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, তিনিও তাঁদের সঙ্গী হবেন। কিন্তু তাঁর যাওয়া হয় নি। মাদাম লেভি লিখেছেন : [গান্ধীজির কারাদণ্ড ঘোষিত হওয়ার আশঙ্কাজনিত] 'বর্তমান পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ কোথাও যেতে পারেন না; যাওয়াও উচিত নয়। কয়েক সপ্তাহ নেপালে আটক থাকার ঝুঁকি নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। নেতার অভাবে দেশ যদি তাঁর নেতৃত্ব চায়, তাঁর সাহায্য, উপদেশ বা নির্দেশের মুখাপেক্ষী হয়, সেক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে [এসময়]

দেশের বাইরে থাকা আদৌ সমীচীন নয়।' ('দেশ', ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪) এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের নেপাল-যাত্রা পরিত্যক্ত হয়।

৩ ১০ মার্চ ১৯২২ তারিখে গান্ধীজির গ্রেপ্তারের সংবাদে বসন্তোৎসবের বিপুল আয়োজন পরিত্যক্ত হলেও ২৯ ফাল্গুন সোমবার ১৩ মার্চ দোলপূর্ণিমার রাত্রে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হয়। পিঠাপুরমের রাজার বীণকার সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী (১৮৭৪-১৯৩১) তখন আশ্রমে ছিলেন, তিনি বীণা বাজিয়ে শোনান। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে 'রাতে রাতে আলোর শিখা', 'এনেছ ওই শিরীষ বকুল আমের মুকুল', 'ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী', 'তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়', 'ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা' প্রভৃতি নূতন গান রচনা করেন, নিশ্চয়ই গানগুলি এই উৎসবে গীত হয়েছিল।

পত্র ৯৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৬।

১ ২৩ মার্চ ১৯২২ (৯ চৈত্র) রাত্রে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে রওনা হন।

২ এই বাক্যটি পত্রিকায় ও গ্রন্থে বর্জিত হয়।

৩ ৬ এপ্রিল (২৩ চৈত্র) সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতা রওনা হয়ে রবীন্দ্রনাথ ২৭ চৈত্র শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

পত্র ৯৮। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৭।

১ ২৭ এপ্রিল ১৯২২ (১৪ বৈশাখ ১৩২৯) থেকে ২৬ জুন (১২ আষাঢ়) পর্যন্ত বিশ্বভারতী গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ থাকে, ২৮ জুন ক্লাশ আরম্ভ হয়। এই সময়ে রাণু বেশ কিছুদিন শান্তিনিকেতনে অবস্থান করে ২৭ জুন কাশীতে ফিরে যান। আষাঢ়-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লেখা হয়েছে: 'কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী মহাশয় সপরিবারে সমস্ত ছুটিই এখানে কাটাইয়াছেন।'

২ এই বিষয়ে শ্রাবণ-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ লেখা হয় : 'ছাত্রীনিবাসের কাছেই হাঁসপাতালের সম্মুখের অপরিষ্কার বাগানটি ছাত্রীরা নিজেদের হাতে বড় বড় গাছ জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়াছেন— এখন সেই জমিতে তাঁহারা প্রত্যহ গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে আবর্জ্জনা পুঁতিয়া জমি যাহাতে উর্ব্বর হয় তাহার জন্য উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন— আশা করা যায় তাঁহাদের বাগান শীঘ্রই ফলে ফুলে শাক সবজীতে ভরিয়া উঠিবে।'

পত্র ৯৯। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৮।

১ ৩১ শ্রাবণ ১৩২৯ (১৬ অগাস্ট ১৯২২) কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরির হলে, ১৭ অগাস্ট (৩২ শ্রাবণ) কর্পোরেশন স্ট্রিটের ম্যাডান প্যালেস অব্ ভ্যারাইটিস্ হলে ও ১৯ অগাস্ট (২ ভাদ্র) হ্যারিসন রোডের আলফ্রেড থিয়েটারে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানপত্রী থেকে জানা যায় ১৮টি গান এখানে পরিবেশিত হয়েছিল।

২ এই সময়ে রচিত যে-গানগুলির কথা জানা যায়, সেগুলি হল : 'আজ আকাশের মনের কথা', 'ভোর হল যেই শ্রাবণশর্বরী', 'আসা-যাওয়ার মাঝখানে', 'একলা বসে একে একে অন্যমনে', ও 'শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার ওই খোলা'।

পত্র ১০০। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৯।

১ ১৫ জুলাই ১৯২২ (৩১ আষাঢ় ১৩২৯) রাত্রের ট্রেনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারির সদর শহর পতিসর অভিমুখে রওনা হন। এইদিনই তিনি এল্‌ম্‌হার্স্টকে লেখেন: 'I am starting for Patishar tonight and shall be back before Thursday next.' রাণুকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায়, তিনি মঙ্গলবার ১৮ জুলাই রাত্রে রওনা হয়ে পরের দিন কলকাতায় ফিরে আসেন।

পত্র ১০১।

১ পতিসর ও কলকাতা ঘুরে রবীন্দ্রনাথ ৮ শ্রাবণে (২৪ জুলাই) শান্তিনিকেতনে আসেন, সম্ভবত পত্রের তারিখটি হল ৯ শ্রাবণ।

২ উক্ত তারিখে অনুষ্ঠানটি হয় নি, দ্র. পত্র ৯৯, টীকা ১।

৩ দ্র. পত্র ৯৯, টীকা ২।

৪ কলকাতা থেকে দূরবর্তী শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর কাজকর্মের সঙ্গে কলকাতাবাসী জনগণের যোগাযোগের সেতু রচনার জন্য বিশ্বভারতী সম্মিলনী (কোথাও-কোথাও বিশ্বভারতী বন্ধু-সভা নামেও উল্লিখিত) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ১৫ জুলাই ১৯২২ রামমোহন লাইব্রেরি হলে একটি প্রাথমিক বক্তৃতা দেন। এর পরে ২১ জুলাই তিনি সেখানেই 'মুক্তধারা' নাটক পাঠ করেন এবং ২৮ জুলাই এল্‌ম্‌হার্স্টের ও ১ অগাস্ট ক্ষিতিমোহন সেনের বক্তৃতাসভায় সভাপতিত্ব করেন।

৫ ২১ জুলাই (৫ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ রামমোহন লাইব্রেরি হলে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে তাঁর নূতন নাটক 'মুক্তধারা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই বিষয়ে ২৪ জুলাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় লিখিত হয়: 'প্রথমে তিনি নাটকের প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিয়া বলেন, এই নাটকখানাকে রূপক রূপে গ্রহণ না করিলে চলে। যে আন্দোলন স্রোতে দেশ আজ ওতপ্রোত, তাহাকে রূপকের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তোলা নাটকখানির উদ্দেশ্য নহে। অবশ্য অত বড় একটা পারিপার্শ্বিক ঘটনার ছাপ উহাতে না থাকিয়াও পারে না। পথকে মুক্ত করা, মানবের মিলনের পথকে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়াই যে সমস্ত সভ্যতার শেষ কথা, উহাই নাটকে বিশেষ ভাবে দেখানো হইয়াছে।' (শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা' ১ম, ১৯৯৩, পৃ. ১৫২)

৬ আষাঢ় ১৩২৯-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ লেখা হয়েছিল : 'এখানে আজকাল প্রায় বৃষ্টি হইতেছে। এবার কালবৈশাখীর ঝড়ে আশ্রমের পাকশালার টিনের ছাদ অনেকটা উড়িয়া গিয়াছিল, এবার পাকা ছাদ হইতেছে।' ঘটনাটি নিশ্চয় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ঘটেছিল, অথচ রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে লিখেছেন, যাতে এটিকে সমসাময়িক ঘটনা বলে মনে হয়।

পত্র ১০২।

১ দ্র. পত্র ৯৯, টীকা ১। ম্যাডান থিয়েটারে দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (১৯ অগাস্ট) লেখে : 'এই উৎসবে বর্ষার প্রবর্তন, স্থিতি ও বিদায় সম্বন্ধে রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত গীত হয়। ...তিনজন সঙ্গীতজ্ঞ এসরাজ ও একজন মৃদঙ্গ বাদন করেন। ষ্টেজখানাও অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। মোটের উপর ১৬টি সঙ্গীত গীত হয়: ইহার মধ্যে অনেকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যোগদান করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার স্বরচিত তিনটি কবিতাও আবৃত্তি করিয়াছিলেন।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৫৫) কবিতা তিনটি হল 'ঝুলন', 'বর্ষামঙ্গল' ও 'অবিনয়'।

অ্যালফ্রেড থিয়েটারের তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে উক্ত পত্রিকায় (২১ অগাস্ট) লেখা হয়: 'গতবারে স্থানাভাবে অনেক লোককে হতাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। এবার তাঁহাদেরই সুবিধার জন্য এই অনুষ্ঠান। কিন্তু

এবারেও প্রশস্ত থিয়েটার হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না। ...কবি স্বয়ং বসিয়া সমস্ত উৎসব পরিচালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এবার আবৃত্তি করিতে পারেন নাই। মাত্র একটি ছোট কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ বর্ষামঙ্গলের ১৮টি গান গাওয়া হইয়াছিল। ...শ্রীমতী চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত ...ও শ্রীমতী [অরুন্ধতী] চট্টোপাধ্যায় ...প্রত্যেকে ২টি করিয়া গান গাহিয়াছিলেন।' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৫৫)

২ 'শান্তিনিকেতন প্রেসে শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত' চার আনা দামের মলাট-সহ কুড়ি পৃষ্ঠার পুস্তিকা 'বর্ষা-মঙ্গল ১৩২৯'। এতে ১৮টি গান আছে : 'দারুণ অগ্নিবাণে', 'এস এস হে তৃষ্ণার জল', 'ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে', 'হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর', 'কখন বাদল ছোঁওয়া লেগে', 'আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে', 'আজ আকাশের মনের কথা', 'এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে', 'পূব সাগরের পার হতে', 'আজি বর্ষারাতের শেষে', 'শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার', 'বহুযুগের ওপার হতে', 'বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা', 'একি গভীর বাণী এল', 'আমার হৃদয় আজি যায় যে ভেসে', 'ভোর হল যেই শ্রাবণ-শর্বরী', 'বৃষ্টিশেষের হাওয়া কিসের খোঁজে' ও 'বাদল ধারা হল সারা'।

৩ 'লিপিকা'র রচনাগুলি কেবল 'কথিকা' নামে 'সবুজ পত্র'-তেই প্রকাশিত হয় নি— বিভিন্ন নামে 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'শান্তিনিকেতন' প্রভৃতি পত্রিকাতেও ছাপা হয়।

৪ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২ অ্যালফ্রেড থিয়েটার ও ১৮ সেপ্টেম্বর ম্যাডান প্যালেস অব্ ভ্যারাইটিস্-এ 'শারদোৎসব' অভিনীত হয়।

পত্র ১০৩।

১ পূর্ববর্তী ১০২-সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'শারদোৎসব' অভিনয়ের আগে ১ সেপ্টেম্বর তিনি বোম্বাই রওনা হবেন— কিন্তু উক্ত অভিনয়ের জন্যই তাঁর যাওয়া হয় নি। এখানে তিনি ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় অভিনয়ের কথা লিখেছেন, অভিনয়টি হয় ১৬ ও ১৮ সেপ্টেম্বর। এর পরেই ২০ সেপ্টেম্বর তিনি দক্ষিণ ভারত ও সিংহল যাত্রা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে সন্ন্যাসী-ছদ্মবেশী রাজা বিজয়াদিত্যের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

২ Leonard Knight Elmhirst (1893-1974), ইংরেজ কৃষি-বিজ্ঞানী। রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর আহ্বানে শ্রীনিকেতনের গ্রাম পুনর্গঠন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরই পরিচালনায় ও তাঁর ভাবী পত্নী ডরোথির অর্থানুকূল্যে ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ তারিখে শ্রীনিকেতনে Institute of Rural Reconstruction প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশীতে গিয়ে রাণুর সঙ্গে তাঁর এক অসমবয়সী বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপিত হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে তাঁদের তিনজনের মধ্যে এক ত্রিকোণ প্রেমের অস্তিত্ব ঘোষণা করতেন।

পত্র ১০৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫১।

১ বিভূতিভূষণ গুপ্ত (১৮৯৮-১৯৭০), বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক।

পত্র ১০৫। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫২।

১ রমা মজুমদার (কর), সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগ্নী (১৯০৩-৩৫)।

২ লতিকা রায়, ননীবালা রায়ের একমাত্র কন্যা।

৩ ননীবালা রায় (১৮৯৫-১৯৮০), প্রতিমা দেবীর সহচরী।

৪ পাঞ্জাবের অধিকাংশ গুরুদ্বার হিন্দু মহান্তদের অধিকারে ছিল, শিখ আকালিরা তাঁদের নিজেদের ধর্মস্থানের উপর অধিকার দাবি করলে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। অ্যান্ড্রুজ এই ঘটনার তদন্তে পাঞ্জাবে গিয়েছিলেন।

পত্র ১০৬।

১ পত্রটিতে তারিখ নেই, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সকালে রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালোরে আগমন ও সেইদিন বিকালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার সংবাদ থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে।

২ এল্‌ম্‌হার্স্ট ও গৌরগোপাল ঘোষকে সঙ্গী করে রবীন্দ্রনাথ ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে পুনার অভিমুখে যাত্রা করে ২১ সেপ্টেম্বর বিকালে সেখানে পৌঁছন।

৩ ২৮ সেপ্টেম্বর দুপুরে বাঙ্গালোর ত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ ও অ্যান্ড্রুজ ২৯ সেপ্টেম্বর সকালে মাদ্রাজ পৌঁছন।

৪ ৩০ সেপ্টেম্বর রাত্রে মাদ্রাজ থেকে রওনা হয়ে ১ অক্টোবর সকালে তাঁরা কৈম্বাটুরে উপস্থিত হন।

৫ ৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ অ্যান্ড্রুজকে নিয়ে ত্রিবাঙ্কুরের অলবে (Alwaye) শহরে পৌঁছন।

৬ তাঁরা মাঙ্গালোরে পৌঁছন ৫ অক্টোবর সন্ধ্যায়।

৭ মাঙ্গালোর থেকে ৭ অক্টোবর মাদ্রাজে ফিরে রবীন্দ্রনাথ ও অ্যান্ড্রুজ ৯ অক্টোবর সিংহল অভিমুখে রওনা হন ও ১০ অক্টোবর সেখানে পৌঁছন। সেখানে প্রায় এক মাস কাটিয়ে ৭ নভেম্বর ভারতে ফিরে তাঁরা ত্রিবান্দ্রমে যান।

৮ সিন্ধু প্রদেশে এবারে রবীন্দ্রনাথের যাওয়া হয় নি, তিনি বোম্বাই হয়ে আমেদাবাদে গিয়ে ৪ ডিসেম্বর ১৯২২ গান্ধীজির সবরমতী আশ্রমের অধিবাসীদের কাছে ভাষণ দেন।

৯ ২৩ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ বোম্বাইতে পৌঁছন।

১০ পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরপরিবারের কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র (১৮৮৭-১৯৩৮), ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। কাশীতে তাঁর যে বাসস্থান ছিল, মীরা দেবী সন্তানদের নিয়ে সেখানে কিছুদিন ছিলেন। বোম্বাই থেকে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের পথে কয়েকদিন কাশীতে থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নিয়ে আসেন।

পত্র ১০৭।

১ এই প্রসঙ্গে ৩০ নভেম্বর ১৯২২ রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে কাশীতে মীরা দেবীকে লেখেন: 'আমি ডিসেম্বরের ৭ই কিম্বা ৮ই তারিখে বোম্বাই থেকে তোদের ওখানে যাব— সেখানে দুই একদিন থেকেই তোদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে যাব।' দ্র. পত্র ১০৬, টীকা ১০।

পত্র ১০৮।

১। অনুষ্ঠানটির সংবাদ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় (১৬ ডিসেম্বর ১৯২২) প্রকাশিত হয়: 'বিশ্বভারতী-সম্মিলনী:— সোমবার ইংরাজী ১৮ই ডিসেম্বর, বিকাল ৫॥ টার সময় রামমোহন লাইব্রেরী হলে সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবার্ট ব্রাউনিংয়ের কবিতা পাঠ ও

আলোচনা করিবেন।' ('রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' ১ম, পৃ. ১৫৬) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন, তিনি 'দিনলিপি'তে লিখেছেন: 'সোমবার দিন যখন রামমোহন লাইব্রেরীতে নিয়ে যাচ্ছি গাড়ীতে বল্‌লেন যে, 'আমি ইচ্ছে করেই Luriaটা choose করেচি। ...Luriaর মধ্যে Browning একটা কথা বলে গেছেন যেটা আজকের দিনে বিশেষ করে' স্মরণ করা দরকার। ...আমার খুব বিশ্বাস Browning শুধু psychologyর দিক থেকে ইচ্ছা করেই Luriaর মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম্বন্ধের কথা বলেছেন।' ('রবীন্দ্রবীক্ষা', সংকলন ৩২, পৌষ ১৪০৪, পৃ. ৫৮)

২ পৌষ ১৩২৯-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার 'আশ্রম-সংবাদ'-এ এই দুদিনের মেলার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়।

পত্র ১০৯।

১ এঁর সম্পর্কে মাঘ-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ লেখা হয়: 'সম্প্রতি প্যালেষ্টাইন হইতে আশ্রমে মিস ফ্লাউম (Miss Flaum) নামধেয়া ইহুদি মহিলা আসিয়াছেন। ইঁহার জন্মভূমি রুসিয়ায়। ইনি ফরাসী, জার্মান, ইংরেজি, ইটালীয় প্রভৃতি সাতটি প্রধান প্রধান য়ুরোপীয় ভাষায় শিক্ষিতা। কিছুকাল যুক্তরাজ্যস্থ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশুদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি এখানকার শিশুবিভাগের ছাত্রদিগকে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিখাইবার ভার লইয়াছেন। জার্মান ভাষা শিক্ষা দিবার ভারও ইনি লইয়াছেন। ইনি বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতে বিশেষ উৎসুক। তাঁহার ইচ্ছা বাংলা শিখিয়া তিনি গুরুদেবের সমস্ত গ্রন্থ রুশীয় ভাষায় অনুবাদ করিবেন।' Schlomith Frieda Flaum নামক এই বিদুষী মহিলার সঙ্গে ১৯২১ সালে নিউ ইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। শান্তিনিকেতন দেখা ও এখানকার কাজে আত্মনিয়োগ করার বাসনায় রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে তিনি এখানে উপস্থিত হন।

২ Stella Kramrish (1895-1993) একজন অস্ট্রিয়ান ইহুদি শিল্প-বিশেষজ্ঞা, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। ইনি নৃত্যেও পারদর্শিনী ছিলেন।

৩ প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-৮৫), পড়াশোনা করেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ও বিশ্বভারতীতে। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও রসরচনায় তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের কৃতী অধ্যাপক।

৪ 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক অভিনীত হয় ৯ পৌষ রাত্রে।

পত্র ১১০।

১ আনন্দশঙ্কর ধ্রুব (১৮৫৯-১৯৪২), বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার।

২ দ্র. পত্র ১০৯, টীকা ২।

৩ L. Bagdanov, এঁর সম্পর্কে পৌষ ১৩২৯-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' -এ লেখা হয় : 'Mr. Bagdanov নামক একজন রুশীয় অধ্যাপক আসিয়াছেন। তিনি বহুপূর্ব্বে St. Petersburg বিশ্ববিদ্যালয়ের আরব্য ও পারস্য ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। এই দুই ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভের জন্য তিনি বহুকাল তুরস্ক ও পারস্যে বাস করিয়াছিলেন। তিনি আগমন করায় পারস্য ভাষার একটি ক্লাস খোলা হইয়াছে।' অর্থাভাবের কারণ দেখিয়ে ১৯৩০ সালের জুন মাসে এঁকে বিদায় দেওয়া হয়।

৪ Dr. Mark Collins (?-1933), এঁর সম্পর্কে অগ্রহায়ণ ১৩২৯-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ সংবাদ দেওয়া হয় : 'সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কলিন্‌স্‌ কিছুদিন হইল আশ্রমে আসিয়াছেন। তিনি দুই তিন মাস এখানে থাকিয়া বিশ্বভারতীর কাজে সহায়তা করিবেন। ইনি ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত। কয়েক মাসের জন্য এলেও তিনি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করেন।

পত্র ১১১।

১ প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২) আলিপুর অবজারভেটরির অতিরিক্ত দায়িত্ব পেয়ে সেখানকার কোয়ার্টারে বাস করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ মাঝেমাঝেই সেখানে গিয়ে থাকতেন, এটির অবস্থান আলিপুর জুলজিক্যাল গার্ডেন বা চিড়িয়াখানার পাশেই।

২ Lord Rufus Daniel Isaacs Reading (1860-1935) ১৯২১ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ভারতের গবর্নর জেনারেল বা ভাইসরয় ছিলেন। কলকাতায় এলে ভাইসরয়রা আলিপুরের বেলভেডিয়ার প্রাসাদে বাস করতেন, যেটি এখন ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার।

৩ 'রাজর্ষি' উপন্যাস অবলম্বনে কোনো চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায় না।

৪ Victor Alexander George Robert Lytton (1876-1947) ১৯২২ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত বাংলার গবর্নর ছিলেন। লর্ড কারমাইকেলের সময় থেকেই বাংলার গবর্নরদের শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করা প্রথায় পরিণত হয়েছিল, সেই প্রথা মেনেই তিনি ১৬ জানুয়ারি ১৯২৩ (২ মাঘ ১৩২৯) এখানে আসেন। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার মাঘ ১৩২৯-সংখ্যায় লেখা হয়েছে: 'কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার নূতন গভর্ণর লর্ড লিটন সুরুল কৃষিবিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে আসিয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে আশ্রমেও আসিয়াছিলেন। শিশুদের থাকিবার ঘরটি [সন্তোষালয়] দেখিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তারপর গুরুদেব ও অন্যান্য সকলের সহিত তিনি আমবাগানে চা পান করিয়াছিলেন। সেইদিন সন্ধ্যায় তিনি বিদায় গ্রহণ করেন।'

৫ ২৫ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ (১৩ ও ১৫ ফাল্গুন ১৩২৯) প্রথম দিন ম্যাডান থিয়েটার ও দ্বিতীয় দিন য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে রবীন্দ্রনাথের নবরচিত 'বসন্ত' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। ৩ এপ্রিল ১৯২৩ 'বিশ্বভারতী-সম্মিলনী' শিরোনামে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংবাদ দেয়: 'গত ফেব্রুয়ারী মাসে বসন্তোৎসব উপলক্ষে মোট পাঁচ হাজার চারশত ছেচল্লিশ টাকা আট আনা উঠে। সম্মিলনীর নিয়মা-নুসারে শতকরা দশ টাকা সম্মিলনীর প্রাপ্য। সেই শুদ্ধ মোট খরচ এক হাজার নয়শত টাকা এক পয়সা। বাকী থাকে তিন হাজার পাঁচশত সাঁইত্রিশ টাকা সাত আনা তিন পয়সা, উহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ এক হাজার সাতশত আটষট্টি টাকা এগার আনা সাড়ে তিন পয়সা উত্তরবঙ্গে বন্যা প্রপীড়িতদিগের দান করা হইল। অপর অর্দ্ধেক বিশ্বভারতী পাইবেন।'

৬ ফাল্গুন ১৩২৯-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ লেখা হয়েছে :'শ্রীমতী তটিনী

দাস, শ্রীমতী শান্তা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী আশা অধিকারী বিশ্বভারতীর ছাত্রীরূপে আসিয়াছেন। আরো দুই তিন জন নূতন ছাত্রীও আসিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য 'নেবুকুঞ্জে' নূতন একটি ছাত্রীনিবাস খোলা হইয়াছে। শ্রীমতী আশা অধিকারী এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আচার্য্য উইন্টারনিজের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন'।

পত্র ১১৩।

১ রাণুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশোক অধিকারী।

২ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ ক্ষিতিমোহন সেনকে সহযাত্রী করে রবীন্দ্রনাথ কাশী যাত্রা করেন। তিনি ১ মার্চ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন এবং ৩ ও ৪ মার্চ উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন।

পত্র ১১৪।

১ ফণিভূষণ রাণুকে সঙ্গে নিয়ে মোগলসরাই স্টেশন পর্যন্ত এসে রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহনকে লখ্‌নৌগামী ট্রেনে তুলে দিয়ে কাশী ফিরে যান।

২ রেলপথে লেখা এই গানগুলিকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা শক্ত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-রচিত 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী' অনুসারে ১৯ ফাল্গুন ১৩২৯ (৩ মার্চ ১৯২৩) কাশীতে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'নাই বা এলে সময় যদি নাই' ও 'নাই যদি বা এলে তুমি' গান-দুটি লেখেন, এর পরে ২৬ ফাল্গুন (১০ মার্চ) 'লক্ষ্ণৌ-বোম্বাই পথে' তিনি লেখেন 'তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে' এবং ২৯ ফাল্গুন (১৩ মার্চ) আমেদাবাদে রচিত হয় 'তোমায় গান শোনাব' গানটি— এ ছাড়া অনুমিত হয় 'যুগে যুগে বুঝি আমায়', 'খেলার সাথী, বিদায়দ্বার খোলো' এবং 'দ্বারে কেন দিলে নাড়া' গানগুলি ফাল্গুন মাসে রচিত হয়েছিল।

৩ সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে আমেদাবাদ হয়ে সিন্ধুপ্রদেশের করাচি শহরে পৌঁছন ১৮ মার্চ (৫ চৈত্র)। তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন ২৭ চৈত্র (১০ এপ্রিল) তারিখে।

পত্র ১১৫।

পত্রটির একটি ভূমিকা আবশ্যক। গত বৎসর 'শারদোৎসব' অভিনয়ের

সাফল্যের পরে পরিকল্পনা নেওয়া হয় যে, বিশ্বভারতী সম্মিলনীর পক্ষ থেকে 'বিসর্জন' অভিনয় করা হবে। বর্তমান বৎসরে গ্রীষ্মাবকাশের শুরুতে কোনো খবর না দিয়ে রাণু শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলে রবীন্দ্রনাথ ৮ বৈশাখ ১৩৩০ (২১ এপ্রিল ১৯২৩) তাঁর পিতাকে লেখেন, তাঁকে নিয়ে তিনি দেরাদুনে যাবেন (দ্র. ফণিভূষণকে লেখা পত্র, সংখ্যা ৫), কিন্তু পরিবর্তে যান শিলঙে। সেখান থেকে কলকাতায় এসে কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন ১৭ আষাঢ় (২ জুলাই)। এখানেই 'বিসর্জন' অভিনয়ের মহড়া শুরু হয়। ২৭ আষাঢ় (১২ জুলাই) হিসাবের খাতায় 'শ্রীযুত এন্ড্রুজ সাহেব ও রাণুকে লইয়া গুরুদেবের কলিকাতা গমনের' সংবাদ পাওয়া যায়। কলকাতায় কিছুদিন রিহার্সলের পরে ২০ জুলাই *The Statesman* পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা হয় যে, বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে ৩১ জুলাই মঙ্গলবার, ১ অগাস্ট বুধবার ও ৩ অগাস্ট শুক্রবার (১৫, ১৬ ও ১৮ শ্রাবণ) এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন' অভিনীত হবে। টিকিট বিক্রয়ও আরম্ভ হয়। কিন্তু ৩১ জুলাই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞাপন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় মুদ্রিত হয় : 'রবিবার সন্ধ্যাবেলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের হঠাৎ জ্বর হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট দিনগুলিতে এম্পায়ার থিয়েটারে "বিসর্জ্জন" নাটকে অভিনয় করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এই কারণে অভিনয় আপাতত স্থগিত রহিল। পুনরাভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ যতশীঘ্র সম্ভব দেওয়া হইবে।' অতঃপর পুনরাভিনয়ের তারিখ ঘোষণা করা হয় ২৫, ২৭ ও ২৮ অগাস্ট (৮, ১০ ও ১১ ভাদ্র) আগের কেনা টিকিটেই এই অভিনয় দেখা যাবে। আনন্দবাজার পত্রিকায় (২৯ অগাস্ট) বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, বিশেষ অনুরোধে হ্রাসমূল্যে ৩০ অগাস্ট আর-একটি অভিনয় হবে— শ্রীরুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ: সমকালীন প্রতিক্রিয়া' (১৯৯৫) গ্রন্থে স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, অভিনয়টি হয় ১ সেপ্টেম্বর শনিবারে।

১ উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, পত্রের ১৬ শ্রাবণ ১৩৩০ (১ অগাস্ট) তারিখটি ঠিক নয়— হিসাবের খাতায় এইদিনে 'বধূমাতা ঠাকুরানী দঃ রাণুর গাড়িভাড়াদি' হিসাব থেকে বরং মনে হয়, অভিনয় আপাতত

বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাণু সম্ভবত এইদিনই কাশী চলে যান। তিনি তখন কাশীর কলেজে আই. এ. ক্লাসে পড়াশোনা করছিলেন।

২ দ্র. পত্র ১১০, টীকা ১।

৩ এই বৎসর মহরম ও ঝুলনের তারিখ ছিল যথাক্রমে ৭ ও ৯ ভাদ্র (২৪ ও ২৭ অগাস্ট) শুক্র ও সোমবার।

পত্র ১১৬।

১ সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫-৫৩), রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্র নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

২ দ্র. জীবনস্মৃতি, 'ঘর ও বাহির' অধ্যায়।

৩ মঞ্জুশ্রী ঠাকুর (চট্টোপাধ্যায়), সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা (১৯০৭-৮০)।

৪ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮)।

পত্র ১১৭।

১ বিখ্যাত নট, নাট্যকার ও পরিচালক অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) বিসর্জন-এর প্রথম দিনের অভিনয় দেখে *The Indian Daily News* পত্রিকায় (৪ সেপ্টেম্বর) যে পত্র লেখেন, তার প্রাসঙ্গিক অংশগুলি উদ্ধৃত হল:

'... Few actors know how to make their entrances and exits. Babu Dinendra Nath Tagore, as the high priest of the Holy Mother's temple, entered and, before he uttered a single word, we knew that the genius of an actor was in him. He looked the haughty Brahmin, proud of his paita, conscious of his authority, intriguing, designing, yet never losing his native dignity; no convention, no mannerism, no stiffness.

'Next comes the little lady in the character of Aparna, the beggar-girl. As everything on the stage must be counterfeit, a real Ranee was chosen to represent a beggar; the duckling glides in and out of the stage as if the boards were her play-pond; native in speech, artless in manners,

how sweetly she laid her virgin cheek on the step-stone to caress her pet, her stolen and slain kid, the aching heart murmuring soft words soaked in tears.

'After the officers have preceeded comes the General, "The Rabindranath". Born great, he has achieved greatness and greatness courts him, too. The great poet is a great actor, almost a master of the technique of stage-craft. But, young aspirants to histronic fame, beware of the great master! As in poetry one must drink at the fountain of Rabindranath's mind as not simply borrow his words, so, on the stage, one should imbide the spirit of his acting and not imitate him in action, attitude, gesture of pose. They are all his own, and the copy-right is not to be infringed.

'In endowing Rabi Babu with a great mind, Providence seems to have prepared a special mould to cast the golden casket in which that mind was to find its home. There is, in the masculine frame of Rabindranath, such a judicious admixture of the feminine, that the product almost approaches the Divine. He sighs, murmurs, wails, kneels, claps his hands, draws on his long vowels and we feel that the woman peeps out without making effeminate the poetry of his presentation...'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ খেয়াল করেন নি, অমৃতলাল শনিবারের অভিনয়ের কথা লিখেছেন— সেদিন অসুস্থতার জন্য অপর্ণার ভূমিকায় রাণু অভিনয় করতে পারেন নি, সেদিনকার অভিনেত্রী ছিলেন মঞ্জুশ্রী ঠাকুর!

২ Fernand Benoit সুইজারল্যান্ড থেকে আগত সুইশ-ফরাসি যুবক, ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের জুরিখ ভ্রমণের সময়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজে আত্মনিয়োগের প্রস্তাব করেন ও ১৯২২ সালের শুরুতেই বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়ে ফরাসি ও জার্মান ভাষা শিক্ষা

দেবার কাজে নিযুক্ত হন। 'রক্তকরবী'র ইংরেজি অনুবাদে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন, এই তথ্য রাণুকে লেখা বর্তমান পত্র ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না। সম্ভবত ১৯২৪ সালের ১৮ জুলাই তারিখে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি অমিয় চক্রবর্তীর সাহায্যে যক্ষপুরী নাটকের ফরাসি অনুবাদ করার অনুমতি রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। কাজটি তিনি সম্ভবত সম্পন্ন করতে পারেন নি।

পত্র ১১৮।

১ *The Englishman* পত্রিকার ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩-সংখ্যায় শচীন সেনের 'Aparna in Visarjan/An Appreciation' শিরোনামে একটি পত্র প্রকাশিত হয়: '...such a misty— vague and appealing character cannot be better exhibited as it was done in the Empire Theatre. Her art and skill is at once novel and marvellous. ...She can identi[illegible] herself with the role in which she appears. That she is to feign and pretend is uppermost in her mind. The conception of the histrionic art is vitiated— so much so that she is drilled in the display of physical forms and movement which are often obnoxious— repulsive and inartistic. But the whole audience was all astonishment when it was discovered that the consummate histrionic art found expression in Aparna. She is stage free. She does not shrink, nor does she shirk. ...Her gratitude, her caress, her intense feeling of love were nicely exhibited in her choked voice, delightful movements, and self-surrender attitude. She was not tutored or drilled but had the fullfledged freedom. Her pathetic and passionate call of 'Joy Sh-i-ng' behind the screen hypnotised the whole audience. After the demise of 'Joyshing' her scattered steps and wild look were more eloquent than any speech. 'Aparna' with her deft art has elevated the Bengali

stage, in sooth, the Bengalee nation.' (শ্রীরুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৬-৬৭)

২ Moriz Winternitz (1863-1937), অস্ট্রিয়ান ইহুদি প্রাচ্য-তত্ত্ববিৎ, ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ ভ্রমণের সময়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন ও তাঁর আমন্ত্রণে ১৯২২ সালে এক বৎসরের জন্য অতিথি-অধ্যাপক হিসেবে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন।

৩ এই প্রসঙ্গে আশ্বিন ১৩৩০-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লেখা হয়: 'আচার্য্যের বিদায় গ্রহণোপলক্ষ্যে সন্ধ্যার উপাসনার পরে বিশ্বভারতীর ছাত্র ও অধ্যাপকেরা কবি ভবভূতির উত্তররামচরিতের প্রথম তিন অঙ্ক অভিনয় করিয়া তাঁহাকে দেখান। তাহার পরদিন রাত্রিতে তাঁহার বিদায়সভা করা হয়। সভার প্রথমে আচার্য্যকে মাল্য ও চন্দনে অভিনন্দিত করা হয়। সেই সময় তাঁহাকে পট্ট বস্ত্র, উত্তরীয় ও একটি অঙ্গুরীয় উপহার দেওয়া হয়। তাহার পর বেদমন্ত্র পাঠ করা হইলে পূজনীয় গুরুদেব, শাস্ত্রী মহাশয় ও বেনোয়া সাহেব তাঁহাদের বিদায় অভিনন্দন পাঠ করেন। তৎপর আচার্য্য সমবেত আশ্রমবাসীদের সম্বোধন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বলেন। পরে শান্তিমন্ত্র পাঠ করা হইলে "জনগণ মন অধিনায়ক" গানটি গাওয়ার পর সভাভঙ্গ করা হয়।'

পত্র ১১৯।

১ ফরাসি চন্দননগর থেকে প্রকাশিত মতিলাল রায়-সম্পাদিত 'প্রবর্ত্তক' মাসিক পত্রের শ্রাবণ ১৩৩০-সংখ্যায় বিসর্জন-অভিনয়ের একটি সমালোচনা মুদ্রিত হয়, তার প্রাসঙ্গিক অংশ শ্রীসমর ভৌমিকের 'রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য' (১৪০৪) গ্রন্থ (পৃ. ৭৭-৮০) থেকে উদ্ধৃত হল:

'...অনাড়ম্বর দৃশ্যপটের সমক্ষে, তিনটি দিনের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে, এক অপূর্ব্ব রস মূর্ত্ত হইয়া অবিরাম গতিতে বহিয়া গেল—...

'এই রস ফুটাইয়া তুলিলেন নট-কবি রবীন্দ্রনাথ ও বালিকা অপর্ণা। অপর্ণা "সঞ্চারিণী দীপশিখার" মত অভিমান-তিমির সমাবৃত নাটকের ক্রূর ঘটনাবলীর উপর করুণ-কোমল আলোক বিকীরণ করিয়া অসত্য ও অকরুণার বিকট বাত্যার ফুৎকারে নিভিয়া গেল। তাহার কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গী

অপর্ণার ভূমিকায় স্বতঃউৎসারিত করুণার প্রস্রবণ, তাহার পদক্ষেপ নির্ভীক, তাহার অভিনয় সহজ, স্বৈর-বিহারিণী ভিখারিণীরই মত সহজ সরল সতেজ।

'আর রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ ভাব-বিপর্যায়ের মধ্যে, বিরুদ্ধ স্রোতের মধ্যে পতিত তৃণখণ্ডের মত, বিক্ষুব্ধ, বিড়ম্বিত, বিপর্যাস্ত জয়সিংহের চরিত্র অভিনয়ে যে নিপুণতা, সূক্ষ্ম নাট্যকলার অভিব্যক্তির পরিচয় দিলেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, ...বিশেষতঃ ষষ্টিপর বৃদ্ধ বিংশতি বর্ষের যুবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যে সজীবতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দেখাইলেন তাহা অসাধারণ। তাঁহার নেপথ্যও নিখুঁত।

'...রঘুপতি, রাজা ও নক্ষত্র ভূমিকায় পাত্র মনোনয়ন একেবারেই উপযুক্ত হয় নাই। রঘুপতির স্থূল দেহের সঙ্গে স্থূল inartistic কণ্ঠ মিলিয়া তাঁহার অভিনয়ের art-কে নিমজ্জিত করিয়া এক বিকট রসের সৃষ্টি করিতেছিল।...'

পত্র ১২০।

১ বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকার কার্তিক ১৩৩০-সংখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ ৫ আশ্বিন 'যাত্রা' ('আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলের') কবিতাটি লিখে দেন, দ্র. 'পূরবী'।

পত্র ১২১।

১ অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪), প্রখ্যাত গীতিকার ও ব্যারিস্টার।

২ উত্তরপ্রদেশের সম্পন্ন জমিদার, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা।

পত্র ১২২। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫৫।

১ নির্মলকুমারী মহলানবিশ (১৯০০-১৯৮১), প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্নী, ডাকনাম রানী। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে আলিপুর অবজারভেটরিতে এঁদের অতিথি হয়ে ছিলেন।

২ এই উল্লেখ থেকেই পত্রটির তারিখ নির্ণয় করা হয়েছে। ২২ আশ্বিন মঙ্গলবার (৯ অক্টোবর) ছিল মহালয়া, এর পরের দিন থেকেই ছাত্রেরা পূজাবকাশের জন্য বাড়ি রওনা হতে সুরু করে, যদিও আশ্বিন-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ লেখা হয়েছে : 'আগামী ১২ই অক্টোবর [২৫ আশ্বিন]

শুক্রবার হইতে আরম্ভ করিয়া ১২ই নভেম্বর [২৬ কার্তিক] সোমবার অবধি এই একমাস পূজাবকাশের জন্য আশ্রম বন্ধ থাকিবে।' পুজোর ছুটিতে রবীন্দ্রনাথের কাঠিয়াবারে যাওয়ার কথা ছিল, তিনি সেই যাত্রা বাতিল করে ২৬ আশ্বিন শনিবার আশ্রমে ফিরে আসেন।

পত্র ১২৩।

১ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯৬২), প্রখ্যাত চিকিৎসক ও রাজনীতিক। নানা সময়ে রবীন্দ্রনাথেরও চিকিৎসা করেছেন।

২ এই প্রসঙ্গে ২৪ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন : 'নন্দিনী নাটকটার উপর ক্ষণে ক্ষণে প্রায়ই তুলি বুলচ্চি— তাতে তার রং ফুটচে বলেই বোধ হচ্চে। কাল সন্ধ্যাবেলায় আত্মীয়সভায় ওটা আর একবার পড়বার কথা আছে। আগাগোড়া সবটা একটানে পড়ে' গেলে বুঝতে পারব কোথাও তার ওজনের বেঠিক আছে কি না।' (চিঠিপত্র ১১, পত্র ২৬, পৃ. ৩৬) 'আত্মীয়সভা' জোড়াসাঁকোয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পত্র ১২৪।

১ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সৌরাষ্ট্রে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য ভ্রমণ করছিলেন রাজাদের কাছ থেকে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসাহায্য সংগ্রহের আশায়। ধ্রাঙ্গাধ্রা (Dhrangadhra)-র মহারাজা স্যার ঘনশ্যাম সিংজির আমন্ত্রণে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। রাজা ২৫০০০ টাকা সাহায্য করেন।

২ মোরভি (Morvi) সৌরাষ্ট্রের আর-একটি দেশীয় রাজ্য। এখানকার ঠাকুর সাহেব লাখাধারাজি ওয়াদিা বাহাদুর ১০০০০ টাকা দান করেন।

৩ রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করার জন্য জংশন স্টেশনটির নামের বানানে একটু বদল ঘটিয়েছেন, এর প্রকৃত বানান 'Wadhwan'।

৪ হিরজিভাই পোস্তানজি মরিস, পার্শি যুবক, বিশ্বভারতীতে ফরাসি ভাষা শিক্ষা দিতেন। বহুবার রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী হন— তিনি আদর করে এঁকে 'মরীচি' নাম দিয়েছিলেন।

৫ বনমালী পারুই, এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সেবা করেন। প্রভুভৃত্যের সম্পর্কটি অত্যন্ত মধুর ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে

'নীলমণি', 'লীলমণি' প্রভৃতি বিচিত্র নামে সম্বোধন করতেন। এইরূপ নামকরণের ইতিহাসের জন্য দ্র. রবীন্দ্রনাথের ১৩১-সংখ্যক পত্র।

পত্র ১২৫।

১ পত্রটি দেশীয় রাজ্য রাজকোট থেকে লেখা। রবীন্দ্রনাথ ঠিক কবে সেখানে গিয়েছিলেন বলার মতো তথ্য নেই, কিন্তু ৯ নভেম্বর তাঁর ভ্রমণসঙ্গী গৌরগোপাল ঘোষ বোম্বাই থেকে রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লেখেন যে, এল্‌ম্‌হার্স্টকে জাহাজ থেকে নামিয়ে পরদিন 'গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য Rajkot রওনা করে দিচ্ছি।' রবীন্দ্রনাথ ১২ নভেম্বর রাজকোটের দরবারকক্ষে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন।

২ রাণু যখন 'বিসর্জন' নাটকের মহলার জন্য জোড়াসাঁকোয় ছিলেন, তখন তাঁর রূপে ও মিশুক স্বভাবে আকৃষ্ট হয়ে অনেক যুবক তাঁর প্রণয়প্রার্থী হয়ে ওঠেন। এর পরিণতি কি জটিল আকার নিতে পারে তা অনুমান করতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৌতুকময় স্বভাবের জন্য কিছু পরিমাণে এতে উৎসাহ দেন। কিন্তু তার পরিণাম রাণু ও তাঁর পরিবারের পক্ষে সুখকর হয় নি। এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে রাণুর সম্পর্ক নিয়েও অনুরূপ যে কৌতুক রবীন্দ্রনাথ করতেন, এল্‌ম্‌হার্স্ট তা সঠিক বুঝতে না পেরে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পরবর্তীকালে লেখা চিঠি বা ডায়েরিতে এমন-সব মন্তব্য করেছেন, যা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে।

পত্র ১২৬।

১ পত্রের তারিখটি অনুমিত। পৌষ ১৩৩০-সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে লেখা হয়: 'গত ২৮শে নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ জামনগরে পৌঁছিয়াছেন। জামসাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি বিশ্বভারতী ভাণ্ডারে ৫০,০০০ টাকা দান করিবেন।'

পত্র ১২৭।

১ রবীন্দ্রনাথ বস্তুত বোম্বাই পৌঁছন ৯ ডিসেম্বর রবিবার সকালে।

২ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান শিক্ষক গৌরগোপাল ঘোষ, তাঁর ডাকনাম ছিল 'গোরা'।

৩ ঠিক জানা নেই, সম্ভবত কিছুকাল পূর্বে সাধুচরণের জীবনাবসান হয়।

পত্র ১২৮।

১ ১২৭-সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে লিখেছিলেন, 'ক্রিস্টমাসের পূর্ব্বেই ফিরব। তোমার বাবজাকে লিখে দিয়েছি তোমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসতে', কিন্তু ১৫ ডিসেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'কাশী ১৪ই ডিসেম্বর' তারিখ দিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়: 'অদ্য রবীন্দ্রনাথ কাথিয়াবার হইতে এখানে আসিয়াছেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন'— এর থেকে অনুমান করা যায়, রাণু হয়তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তিনি কাশী ফিরে যাওয়ার পথে ও সেখানে পৌঁছে যে দুটি চিঠি লেখেন, এখানে সেই দুটি চিঠির উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি রক্ষিত হয় নি।

২ এই চিঠিটি পাওয়া যায় নি।

৩ এই গানগুলি সম্ভবত 'আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে,' 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে,' 'যখন এসেছিলে অন্ধকারে' (১৬ পৌষ) ও 'আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা' (১৭ পৌষ)।

৪ সুবীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী পূর্ণিমা ঠাকুর (চৌধুরী), দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্রী নলিনীর কন্যা— ডাকনাম বুবু।

৫ দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, সুহৃৎনাথ চৌধুরীর স্ত্রী।

৬ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১-৭৪), পিতা সুধীন্দ্রনাথ— সাম্যবাদী রাজনীতির অন্যতম প্রবক্তা, সুকণ্ঠের অধিকারী এই মনস্বী পুরুষ শেষ জীবনে রবীন্দ্রসংগীত ও সংস্কৃতির প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

৭ Gretechen Green, আমেরিকান সমাজসেবিকা, শ্রীনিকেতনে এল্‌ম্‌হার্স্টের পল্লীপুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করার জন্য তাঁর ভাবী পত্নী ডরোথী স্ট্রেট তাঁকে ভারতে পাঠান। তাঁর আত্মজীবনী *The Whole World and Company* [?1936] অত্যন্ত সুখপাঠ্য ও শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের অন্তরঙ্গ বিবরণে পূর্ণ।

৮ মাঘ ১৩৩০-সংখ্যা শান্তিনিকেতন-এ এই বিষয়ে লেখা হয়: 'মেয়েরাও এইবার ছুটি উপভোগ করিতে ছাড়েন নাই। সন্তোষ বাবু ও অক্ষয় বাবুর নেতৃত্বে নারী বিভাগের ১২টি মেয়ে বক্রেশ্বর বেড়াইয়া আসিয়াছেন। আশ্রম

হইতে বক্রেশ্বর ৪০ মাইল। দলটি সর্ব্বশুদ্ধ বক্রেশ্বর যাওয়া আসাতে ৮০ মাইল বেড়াইয়া আসিয়াছেন।'

পত্র ১২৯।

১ আমরা একটি চিঠি পেয়েছি, সেটি হল ১২৮-সংখ্যক পত্র।

২ বেতালভট্ট-প্রণীত 'নীতিপ্রদীপ'-এ একটি শ্লোক আছে:

সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরীধিয়া দ্রুতমগাৎ ভিল্লসা পত্নী মুদা।
পাণীভ্যাবগুহ্য শুক্লকঠিনং তদ্‌বীক্ষ্য দূরে জহা-
বস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী স্যাদ্‌গতিঃ॥

রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'বাজে কথা' ('বিচিত্র প্রবন্ধ') প্রবন্ধে এই শ্লোকের ভাবানুবাদ করেছিলেন: 'সিংহনখরের দ্বারা উৎপাটিত একটি গজমুক্তা বনের মধ্যে পড়িয়াছিল, কোনো ভীলরমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল, যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তামাত্র, তখন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।'

৩ এই প্রসঙ্গে ফাল্গুন-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ লেখা হয়েছে: 'আজকাল বিনোদন পর্ব্বে পূজনীয় গুরুদেব গানের দলকে নূতন গান শিখাইতেছেন।'

৪ পূর্বোল্লিখিত চারটি গান ছাড়া পৌষ ১৩৩০-এ রচিত আর একটিমাত্র গানের সন্ধান পাওয়া যায়— 'আয় রে মোরা ফসল কাটি'।

৫ এই কথা লিখলেও রবীন্দ্রনাথ পরে মত পরিবর্তন করে কাশী যান, দ্র. পত্র ১৩০।

৬ জাহাঙ্গীর ভকিল, অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট— ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের লোভনীয় চাকরির সুযোগ ত্যাগ করে দেশের সেবা করার উদ্দেশ্যে স্ত্রী ও শিশুকন্যা নিয়ে বিশ্বভারতীতে ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন।

৭ পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর (১৮৭২-১৯৩১) মহারাষ্ট্রীয় সংগীতজ্ঞ, 'গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়' নামক সংগীত-শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা।

পত্র ১৩০।

১ এই বিষয়ে ১১ জানুয়ারি ১৯২৪ (২৬ পৌষ) রবীন্দ্রনাথ কালিদাস

নাগকে লেখেন : 'হিন্দু য়ুনিভার্সিটির কন্‌ভোকেশনে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। প্রথমে টেলিগ্রাফ করেছিলুম যাব না। মনে করেছিলুম আমার বদলে রথীরা গিয়ে বরোদার মহারাজাকে চেপে ধরবে। কিন্তু রথীরা দিল্লির সপ্তভূপতি-সঙ্গমে যাচ্চে— তারা যখন দিল্লিতে রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী ঠিক সেই সময়েই বরোদা বারাণসীতে। ...তাই রাজাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাতে যেতে হবে। ...তোমাকে সঙ্গে নিতে চাই, তুমি সেখানে একটা লেকচার দেবে, সেটাতে বিশ্বের মধ্যে বিশ্বভারতীর স্থান তোমাকে নির্দেশ করতে হবে। বৃহস্পতিবার [১৭ জানুয়ারি] রাত্রে ছাড়ব রবিবার [২০ জানুয়ারি] রাত্রে প্রত্যাবর্তনের যাত্রা করব'। (চিঠিপত্র ১২, পৃ. ২৯১-৯২) ১৩১-সংখ্যক পত্র থেকে জানা যায় রবিবারে তাঁদের ফেরা হয় নি— প্রতিমা দেবী, কালিদাস নাগ ও কনমালীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ২৩ জানুয়ারি বুধবার বেনারস থেকে রওনা হন।

পত্র ১৩১।

১ দ্র. পত্র ১৩০ টীকা ১।

২ নন্দিনী লালা (১৯২১-৯৫), রবীন্দ্রানুরাগী এক গুজরাটি পরিবারের সন্তান। শান্তিনিকেতনে কিছুকাল অবস্থানের সময়ে তাঁর চিররুগ্ন মা সন্তানপালনে অসমর্থ দেখে নিঃসন্তান প্রতিমা দেবী ও রথীন্দ্রনাথ তাঁকে দত্তক নেন। ডাক নাম পুপে।

৩ কালিদাস নাগ (১৮৯১-১৯৬৬), প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিক পণ্ডিত, রবীন্দ্রানুরাগী এই মানুষটির দিনলিপি রবীন্দ্রজীবন-সংক্রান্ত তথ্যের মূল্যবান আকর।

৪ গল্পের পরবর্তী অংশ জানা যায় ক্যাশবইয়ের '১০ই মাঘ শ্রীযুত কর্ত্তামহাশয় ও শ্রীমতী বধূমাতা ঠাকুরাণীর কলিকাতা হইতে বোলপুর আগমন খরচ'-এর হিসাব থেকে, রবীন্দ্রনাথ আলিপুরে না গিয়ে প্রতিমা দেবীর সঙ্গেই শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

পত্র ১৩২।

১ দ্র. পত্র ১২৫, টীকা ২। প্রসঙ্গটির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে সরযূবালা অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ২-সংখ্যক পত্রের টীকায়।

২ ডাঃ নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩), রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রখ্যাত চিকিৎসক।

৩ ২১ মার্চ ১৯২৪ (৮ চৈত্র ১৩৩০) 'ইথিওপিয়া' জাহাজে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে চীন অভিমুখে রওনা হন ও ১৭ জুলাই (১ শ্রাবণ ১৩৩১) তারিখে 'সাদোমারু' জাহাজে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

পত্র ১৩৩।

১ পত্রটিতে '১০ ফেব্রুয়ারি' তারিখ থাকলেও অভ্যন্তরীণ প্রমাণে জানা যায়, এটি সোমবার ১১ ফেব্রুয়ারি লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে শ্রীনিকেতনে জাপানি দারুশিল্পী কিংতারা কাসাহারা-নির্মিত বৃক্ষাবাসে বাস করছিলেন।

২ 'পূরবী' (১৩৩২) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'ভাঙা মন্দির' ও 'আগমনী' কবিতা দুটি মাঘ ১৩৩০ কাল-চিহ্নিত। তৃতীয় কবিতাটিকে শনাক্ত করা যায় নি।

পত্র ১৩৪। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫৯।

১ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম বিদেশী শিক্ষকদের অন্যতম উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়র্সন (১৮৮১-১৯২৩) ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার থেকে ২৭ অগাস্ট ১৯১৮ একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর চার জন অল্পবয়সী বন্ধুর বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন: 'One was a little girl of ten to whom I surrendered my heart.' তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ৬ অক্টোবর যে চিঠি লেখেন, তার থেকে উদ্ধৃত। মূল চিঠির (দ্র. *The Visva-Bharati Quarterly,* May-July 1943, pp. 53-54) ভাষার কিছু পরিবর্তন করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

পত্র ১৩৫।

১ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ তারিখে কলকাতার অ্যালফ্রেড থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি-রূপে যে ভাষণ দেন, সেটি জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১-সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, দ্র. 'পল্লীপ্রকৃতি', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৭শ খণ্ড।

২ পরের দিন শান্তিনিকেতনে ফেরা হয় নি, হিসাবের খাতা থেকে দেখা

যায়, ২৭ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কলকাতা থেকে আশ্রমে ফিরে আসেন।

৩ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা মঞ্জুশ্রী, দ্র. পত্র ১১৬, টীকা ৩।

৪ পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-পরিবারের প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের (১৮৮৭-১৯৩৮) পুত্র পূর্ণেন্দ্রনাথ, ডাকনাম 'বুড়ো'।

দ্র. পত্র ১৩২, টীকা ১।

৫ চিঠির শেষে স্বাক্ষর নেই, আরও পৃষ্ঠা ছিল কি না বলা যায় না।

পত্র ১৩৬।

১ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। ক্যাশবহির একটি হিসাব থেকে জানা যায়, রাণু তাঁর মা সরযূবালার সঙ্গে এই সময়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই কলকাতায় যান। সন্তোষচন্দ্র তাঁদের কাশী পৌঁছে দিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

পত্র ১৩৭।

১ বেশ কয়েকবার তারিখ পরিবর্তনের পরে ২১ মার্চ রবীন্দ্রনাথ সদলবলে চীনের উদ্দেশে রওনা হন।

২ ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রথম সমুদ্রযাত্রা করেন। এই যাত্রায় সমুদ্রপীড়ার আক্রমণে তাঁর বিপর্যস্ত অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায় 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (১৮৮১) গ্রন্থটির প্রথম পত্রে।

৩ ৩ মে ১৯১৬ জাপানের উদ্দেশে সমুদ্রযাত্রা করার দুদিন পরেই বঙ্গোপসাগরে প্রচণ্ড সাইক্লোনের কথা এখানে স্মরণ করা হয়েছে।

৪ সম্ভবত 'পূরবী' কাব্যের অন্তর্গত 'উৎসবের দিন', 'গানের সাজি' ও 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতা তিনটি।

৫ ৯ মার্চ ১৯২৪ য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে অধ্যাপক ও কবি মনোমোহন ঘোষের (১৮৬৯-১৯২৪) স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন।

৬ মঙ্গলবারের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ বুধবার ১২ মার্চ শান্তিনিকেতনে যান।

পত্র ১৩৮।

১ সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২ ১০ মার্চ ১৯২৪ (২৭ ফাল্গুন ১৩৩০) সন্ধ্যায় মহর্ষিভবনে সুরেন্দ্রনাথের কন্যা মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে সুকিয়া স্ট্রিট-নিবাসী যামিনীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ক্ষিতীশপ্রসাদের বিবাহ হয়। চৈত্র-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-য় লেখা হয় : 'পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদী হইতে নব-দম্পতীকে সময়োপযোগী একটি সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।' রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে এদিন গগনেন্দ্রনাথের একটি ছবি অবলম্বনে 'সাত ভাই চম্পার মঙ্গল উপহার' কবিতাটি রচনা করেন, কবিতাটি পাঠান্তরে 'ওগো বধূ সুন্দরী' গানে পরিণত হয়।

৩ মালতী সেনগুপ্ত (চৌধুরী), স্নেহলতা গুপ্তের কন্যা মালতী এই সময়ে বিশ্বভারতীতে পড়াশোনা করতেন, মঞ্জুশ্রীও সেখানে পড়তেন।

৪ শ্রীমতী হাতিসিং (১৯০৩-৭৮)। রবীন্দ্রানুরাগী পুরুষোত্তম ও লীলা হাতিসিং এর কন্যা ১৯২০-তে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। তাঁর মা কন্যার থাকার জন্য গোয়ালপাড়া যাওয়ার রাস্তার পাশে একটি খড়ে ছাওয়া পাকা বাড়ি নির্মাণ করে দেন, রবীন্দ্রনাথ বাড়িটির নামকরণ করেন 'গুর্জরী'। নৃত্যপটিয়সী। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ হয়।

৫ রেখা মজুমদার (গুপ্ত)।

পত্র ১৩৯।

১ পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও চীনের 'লেকচার অ্যাসোসিয়েশন' রবীন্দ্রনাথকে চীনে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। রাণু হয়তো চৈনিক কবি ও অধ্যাপক Hsu Tse Mon-র লেখা ২৭ ডিসেম্বর ১৯২৩ তারিখের পত্রটি দেখেছিলেন।

২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ড. আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪)।

৩ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'হাজার টাকার সাম্মানিক বৃত্তিতে রবীন্দ্রনাথকে 'রীডার'-পদে নিয়োগপত্র আসে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ তারিখে, শর্ত ছিল তাঁকে সাহিত্য বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হবে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করে

১, ২ ও ৩ মার্চ ১৯২৪ সেনেট হলে রবীন্দ্রনাথ তিনটি মৌখিক বক্তৃতা করেন, সেগুলির লিখিত রূপ যথাক্রমে 'সাহিত্য', 'তথ্য ও সত্য' এবং 'সৃষ্টি'। দ্র. 'সাহিত্যের পথে', রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩শ খণ্ড।

পত্র ১৪০।

১ রবীন্দ্রনাথের হিসাব খাতায় তাঁর কলকাতা যাওয়ার তারিখ বুধবার ১৯ মার্চ (৬ চৈত্র)।

২ প্রেচেন গ্রীন তাঁর আত্মজীবনীতে অনুষ্ঠানটির একটি বিবরণ দিয়েছেন : 'In front of the white columns of the library, an Eastern audience hall was set for the ceremony of Baroni (acceptance), performed for me because I am accepted in India. I stood before the Poet in the centre of a circle, seven women in scarlet saris circling round me to purify with water and with fire. They bore offerings on a petah (gift dish) of rice-grains and fruit, a red marriage sari and a wedding bracelet of carved iron. The Poet spoke words of welcome and gave me a crystal amulet, the girls sang songs of evening, and the full moon looked on.' গ্রেচেন দুটি বাংলা শব্দ 'বরণ' ও 'পাটা' একটু ভুল বানানে লিখেছেন।

৩ 'ভরা থাক্ স্মৃতি সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি', রচনা : ৪ বৈশাখ ১৩৩০।

৪ 'প্রবাহিণী' (অগ্রহায়ণ ১৩৩২)-র অন্তর্গত গানটির রচনা যে বহু পূর্ববর্তী, এই পত্র তার অন্যতম প্রমাণ।

৫ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পর্শু মঙ্গলবার' অর্থাৎ পত্রটি রবিবারে লেখা, কিন্তু ২ চৈত্র শনিবার ছিল।

পত্র ১৪১।

১ এঁর পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি।

২ পূর্ণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্র ১৪২।

১ জাহাজ ২৪ মার্চ সকালে রেঙ্গুনে পৌঁছলে বিরাট জনতা রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানায়। একটি নামহীন সংবাদপত্র-কর্তিকায় দেখা যায় :

'When the poet and his party landed on the wharf, the poet was garlanded by Mr. J. A. K. Jamal and a handsome bouquet was handed over to him by a Burmese lady. ...This over, the Poet and his party were taken in motor cars to a well-furnished house in Bingandet Street where they will put up during their stay in Rangoon.'

পত্র ১৪৪।

১ রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার সমর্থনে ৩১ মার্চের *Straits Echo* সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যায় : Rabindranath Tagore touched at Penang yesterday on his way to Singapore and China, and received a wonderful emotional welcome. ...No sooner had the S. S. Ethiopia cast anchor than a representative body of Indians headed by the Hon. P. K. Nambyar started for the ship. ...A party of Indian musicians played weird airs on their sharp-pitched instruments. After the great poet had stepped on to the gangway there was a rush to offer the usual floral tribute. ...At the centre of the Jetty Dr. Tagore was again stopped, and Mr. S. K. Pillay on behalf of the Kedah Indians, adored him with a song of Owydra in Tamil and sang the translation in English. ...With great difficulties that he was got into a car and drove away. ...The distinguished guest was driven to the residence of the Hon. Mr. P. K. Nambyar in Farquhar Street, where large crowds besieged him throughout the day.'

পত্র ১৪৫।

১ ১ এপ্রিলের *The Malaya Mail* পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করে : 'The Ethiopia, on which Dr. Tagore is travelling to Singapore on his way to China entered Port Sweetenham after 1 p.m. yesterday, ...were received by a

few members of the Selanger Reception Committee, who brought him ashore, and then to Kualalumpur by motor car reaching the residence of Mr. R. D. Ramaswamy after 4 p.m. The news of Dr. Tagore's presence in town quickly got abroad, and quite a large number of people flocked to see him. ...He drove through the town in the company of Mr. H. N. Ferrers ...had dinner at the house of Dr. Sen, and left for Port Swettenham just before 7 p.m.'

পত্র ১৪৬।

১ রাণুর আই. এ. পরীক্ষা ৩১ মার্চ ১৯২৭ তারিখে শুরু হয়।

পত্র ১৪৭।

১ ইথিওপিয়া জাহাজে ২ এপ্রিল ১৯২৪ সকালে সিঙ্গাপুরে পৌঁছে সেইদিনই বিকেলে জাপানি জাহাজ আৎসুতা মারু-তে আরোহণ করে রবীন্দ্রনাথ চীনের উদ্দেশে রওনা হন।

২ কাথিয়াবাড়ের দেশীয় রাজ্য লিমডির রাজকুমার ঘনশ্যাম সিংজি, ইনি নিজ ব্যয়ে চীনভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়েছিলেন।

পত্র ১৪৮।

১ জাহাজ ১২ এপ্রিল ১৯২৪ শনিবার সকালে সাংহাই বন্দরে পৌঁছয়। সেপ্টেম্বর-সংখ্যা *The Modern Review*-তে কালিদাস নাগ 'Rabindranath Tagore's Visva-Bharati Mission' নামে যে-বিবরণ প্রকাশ করেন, তার থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে: 'The N. Y. K. boat Atsuta Maru landed the party consisting of Dr. Rabindranath Tagore, Miss Green, Prof. L. K. Elmhirst, Prof. K. M. Sen, Prof. N. L. Bose and Dr. Kalidas Nag. ...Mr. Tsemon Hsu, a talented Chinese poet and interpreter of Dr. Tagore, came on board the ship to take charge of the party. He was accompanied by Mr. S. Y. Ch'u M. A., Dean of the National Institute of Self-Government, and other distinguished members of the Chinese community.

The Indian residents of Shanghai came to a man to honour their National poet. They greeted him with repeated cries of Bande Mataram and overwhelmed him with garlands and flowers. Dr. Tagore motored down to the Barlington Hotel.'

২ Percy Bysshe Shelly (1792-1822)-র 'Stanzas Written in Dejection, Near Naples'-শীর্ষক কবিতার প্রথম চারটি ছত্র।

পত্র ১৪৯।

১ বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ন্যানকিঙে গিয়েছিলেন ২০ এপ্রিল (৭ বৈশাখ) তারিখে, বক্তৃতাসভার যে-ঘটনা তিনি চিঠিতে বর্ণনা করেছেন তা ওইদিনই সংঘটিত হয়েছিল— তাই পত্রের প্রকৃত তারিখ হবে ৯ বৈশাখ ১৩৩১ (২২ এপ্রিল ১৯২৪)।

২ রাণু এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন 'ভানুসিংহ ঠাকুর: কিছু তথ্য' ('রবীন্দ্রবীক্ষা', ৩২শ সংকলন, পৌষ ১৪০৪)-শীর্ষক রচনায়: 'একবার সে কী কাণ্ড। বিসর্জন অভিনয় চলছে পুরোনো এমপায়ারে। হঠাৎ কি করে উপর থেকে আগুনের ফুলকি পড়ল। ভয় পেয়ে ছুট লাগিয়েছি গ্রিনরুমের দিকে। খপ করে হাত টেনে ধরলেন জয়-সিংহরূপী ভানুদাদা। পরিস্থিতি উপযোগী দু'একটা কথা ছুঁড়ে দিয়ে অবিচল অনর্গল সংলাপ চালিয়ে গেলেন তিনি।'

৩ Tsinansu শহরে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছন ২২ এপ্রিল সকালে, বিকেলে প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলি হলে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু জনাধিক্যে সভাটি সংলগ্ন প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত করতে হয়।

৪ রবীন্দ্রনাথ ২৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় পিকিঙে পৌঁছন।

পত্র ১৫০।

১ বিধুশেখর শাস্ত্রী।

২ রায় বাহাদুর বলদেব দাস বিরলা শান্তিনিকেতনে এশীয় ছাত্র ও অতিথিদের জন্য আবাস নির্মাণের উদ্দেশ্যে কুড়ি হাজার টাকা দান করেন। এই অর্থে হাসপাতালের পাশে 'পান্থশালা' নামক একটি গৃহ নির্মিত হয়।

৩ ২০ মে রাত্রে পিকিং ত্যাগ করে শান্‌সি প্রদেশের রাজধানী তাইয়ুয়ানফু নগরে যান।

৪ ২৫ বৈশাখ (৮ মে) পিকিঙে রবীন্দ্রনাথের ৬৩তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালন করা হয়। ক্রেসেন্ট মুন সোসাইটি নামক বুদ্ধিজীবীদের একটি সংস্থা পিকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'চু-চেন-তান' এই তিনটি চীনা অক্ষর-খোদিত একটি পাথরের ফলক রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেওয়া হয়, যার অর্থ হল 'ভারতের মেঘমন্দ্রিত প্রভাত' বা 'ভারতের রবীন্দ্র'। এর পরে *Chitra* অভিনীত হয়।

৫ রাণুর ভ্রাতা অশোক অধিকারী।

পত্র ১৫১।

১ রবীন্দ্রনাথ ৩০ মে সাংহাই ত্যাগ করে ২ জুন কোবে বন্দরে পৌঁছন।

পত্র ১৫২।

১ 'সাদোমারু' জাহাজে রবীন্দ্রনাথ ১৩ জুলাই ১৯২৪ রেঙ্গুন ত্যাগ করে কলকাতা অভিমুখে রওনা হন। সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়েছিল, জাহাজটি ১৬ জুলাই কলকাতায় পৌঁছবে। কিন্তু ঝড়বৃষ্টির জন্য জাহাজটির গতি মন্থর হওয়ায় তাঁরা ১৭ জুলাই অপরাহ্নে কলকাতায় পৌঁছন।

২ রাণুর দিদি আশা অধিকারী এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃততে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন, রাণু প্রথম বিভাগে আই. এ. পরীক্ষা পাস করেন।

৩ রবীন্দ্রনাথ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ জাপানি জাহাজ 'হারানা মারু'তে পেরুর পথে য়ুরোপযাত্রা করেন।

পত্র ১৫৩।

১ সম্ভবত ২৪ শ্রাবণ (৯ অগাস্ট) শনিবার রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় যান।

২ কলকাতা যাত্রার দু'একদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সুসীম চা-চক্রের উদ্বোধন করেন। তাঁর চৈনিক বন্ধু, চীনে তাঁর দোভাষী Hsu Tse Mon-এর নামে এই সভার নামকরণ করা হয়।

৩ এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'হায় হায় হায় দিন চলি যায়' গানটি রচনা করেন।

পত্র ১৫৪।

১ সম্ভবত বীরেন্দ্রমোহন সেন (১৮৯৯-১৯৬৯), ক্ষিতিমোহন সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র।

২ ৮ ভাদ্র (২৪ অগাস্ট) রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে যান, এই তথ্যের সূত্রে চিঠিটির তারিখ অনুমান করা হয়েছে। রাণু ও তাঁর প্রণয়প্রার্থীদের নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি তাঁকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করে থাকতে পারেন। তা ছাড়া ৩০ ভাদ্র (১৫ সেপ্টেম্বর) অ্যালফ্রেড থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ 'অরূপরতন' নাটকটি পাঠ করেন, রাণু তাতে রানী সুদর্শনার চরিত্রে মূকাভিনয় করেন। এই অভিনয়ের মহড়ার জন্যও তাঁকে নিয়ে আসার দরকার ছিল।

পত্র ১৫৫। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫৪।

১ দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার উদ্দেশ্যে ১৯ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ মেলে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে পরের দিন মাদ্রাজে পৌঁছন। রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, নন্দিনী, সুরেন্দ্রনাথ কর ও গিরিজাপতি ভট্টাচার্য তাঁর সহযাত্রী হন।

পত্র ১৫৬। দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫৮।

১ *Ceylon Observer* (23 Sep 1924) পত্রিকায় লেখা হয় : 'Dr. Rabindranath Tagore arrived in Colombo by the Talaimanner route and proceeded to "Sravasti", Cinamon Gardens, the residence of Dr. W. A. de Silva, where he remained during his stay in Colombo. ...He leaves for Europe to-morrow by the N. Y. K. "Haruna Maru".'

২ 'যেদিন সকল মুকুল গেল ঝরে' গানের সঞ্চারীর প্রথম ছত্র।

৩ দ্র. টীকা ১।

৪ দ্র. 'তপোভঙ্গ': পূরবী।

পত্র ১৫৭।

১ দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা রাজ্যের বুয়েনোস আইরেস শহর থেকে 'জুলিয়ো সিজারে' নামক ইতালিয়ান জাহাজে ৪ জানুয়ারি ১৯২৫ তারিখে রবীন্দ্রনাথ ইতালির উদ্দেশে রওনা হন।

২	'হারানা-মারু' ও 'আন্ডেস' জাহাজে লিখিত কবিতার সংখ্যা ৩০টি।

৩	দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্র পেরু স্পেনের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয় ৯ ডিসেম্বর ১৮২৪ তারিখে। এই দিনটির শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পেরু সরকার বিশ্বের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম।

৪	নভেম্বরের শেষে নয়, ৬ নভেম্বর ১৯২৪ 'আন্ডেস' জাহাজ আর্জেন্টিনা রাজ্যের বুয়েনোস আইরেস বন্দরে পৌঁছয় ও জাহাজঘাটে বিপুল সংবর্ধনা লাভের পরে তিনি ও তাঁর ভ্রমণসঙ্গী এল্‌ম্‌হার্স্ট প্লাজা হোটেলে আশ্রয় নেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ৭ নভেম্বরে লেখা 'অতীত কাল' ও 'বেদনার লীলা' কবিতাদ্বয়ের রচনাস্থল 'আণ্ডেস জাহাজ'-রূপে চিহ্নিত।

৫	জাহাজেই রবীন্দ্রনাথ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন ও তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা দেখা দেয়। চিকিৎসকেরা বিশ্রামের পরামর্শ দিলে রবীন্দ্রভক্ত বিদুষী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (১৮৯০-১৯৭৯) লা-প্লাটা নদীর ধারে সান ইসিদ্রো মালভূমির উপরে অবস্থিত 'মিরালরিও' নামক একটি সুরম্য বাগানবাড়ি ভাড়া করে রবীন্দ্রনাথকে প্রায় দুমাস সেখানে আতিথ্য দান করেন।

৬	এই তিন মাসে লেখা মোট কবিতার সংখ্যা ৫৬টি, তার মধ্যে বুয়েনোস আইরেসে লেখা হয় ২৮টি কবিতা।

৭	'জুলিয়ো সিজারে' জাহাজ ইতালির জেনোয়া বন্দরে পৌঁছয় ২১ জানুয়ারি ১৯২৫ (৮ মাঘ ১৩৩১) তারিখে।

পত্র ১৫৮।

১	বিশিষ্ট শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৪-১৯৩৬) পুত্র বীরেন্দ্রনাথ (১৮৯৯-১৯৮২), এঁর সঙ্গেই রাণুর বিবাহ হয় ২৮ জুন ১৯২৫ তারিখে।

২	রাণুর হতাশ প্রণয়প্রার্থীরা তাঁর নামে নানা অপবাদ দিয়ে বহু বেনামী চিঠি রবীন্দ্রনাথকে, রাণুর পরিবারে ও তাঁর ভাবী শ্বশুরবাড়িতে পাঠাচ্ছিলেন। এই সময়ে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির পূর্ণেন্দ্রনাথ (বুড়ো) প্রায়ই রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে বিরক্ত করছিলেন।

৩	রাণু মূলপত্রগুলি দেন নি, নিজেই প্রতিলিপি করে দেন, পরে

বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে আর-একটি প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হয়। মূল পত্রগুলি তিনি কলকাতার অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস্‌কে দান করেছেন।

পত্র ১৫৯।

১ এই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম রাণুর প্রতি 'তুই' সর্বনাম প্রয়োগ করেন।

২ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা ও কালিদাস নাগের অনতিকাল পরেই বিবাহ হয় (আশীর্বাদী কবিতার তারিখ ৯ বৈশাখ ১৩৩২). বিবাহানুষ্ঠানে থাকতে পারবেন না বলে উভয়কে আগেই আহারে নিমন্ত্রণ করে আশীর্বাদ করেন।

পত্র ১৬০।

১ ? চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অধ্যাপক।

২ চিঠিটি পাওয়া যায় নি।

পত্র ১৬২।

১ জন্মদিনের বিবরণ-সহ চিঠিটি পাওয়া যায় নি। এইদিন সকালে তিনি উত্তরায়ণের উত্তরে পথের ধারে অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, অশোক ও আমলকী গাছের পাঁচটি চারা অর্থাৎ পঞ্চবটী রোপণ করেন। সন্ধ্যায় কলাভবনে মেয়েরা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করেন।

পত্র ১৬৩।

১ 'কোণার্ক' নামে অভিহিত বাড়িটির কথা এখানে বলা হয়েছে।

২ মমতা সেন (দাশগুপ্তা)।

৩ অমিতা সেন (১৯১২)। মমতা ও অমিতা দুজনেই ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা।

৪ গৌরী বসু (ভঞ্জ), নন্দলাল বসুর কন্যা।

৫ কিরণবালা সেন, ক্ষিতিমোহন সেনের পত্নী।

৬ সুধীরা বসু (?-১৯৬৮)।

৭ William Wordsworth (1770-1850)-এর 'To a Highland Girl' ও 'Poems of Imagination VIII'।

৮ পত্রটির কিছু অংশ পড়া যায় নি।

পত্র ১৬৪।

১ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

পত্র ১৬৫।

১ রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর পালিতা কন্যা নন্দিনী (পুপে)।

২ জগদানন্দ রায়। বিবাহের আয়োজনে রাণুরা এই সময়ে সপরিবারে কলকাতাতে অবস্থান করছিলেন।

পত্র ১৬৬।

১ রবীন্দ্রনাথের জার্মান বন্ধু দার্শনিক Hermann Keyserling (1880-1946) *The Book of Marriage* (1926) নামক প্রবন্ধ-সংকলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি লেখা চাইলে তিনি 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' নামে ('প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৩২) প্রবন্ধটি প্রথমে বাংলায় লিখে পরে তার ইংরেজি অনুবাদ 'The Indian Ideal of Marriage' (*The Visva-Bharati Quarterly*, July-Sep. 1925) কাইজারলিংকে প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে তাঁকে ভারতীয় বিবাহ সম্পর্কে বহু শাস্ত্রবিধি চর্চা করতে হয়েছিল।

পত্র ১৬৭।

১ রাণুর বিবাহ হয় ২৮ জুন ১৯২৫ (১৪ আষাঢ় ১৩৩২) রবিবারে। তাঁর বিবাহে উপহার দেওয়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'রাণু লিখেছে তার ভাবী ননদেরা আমাদের কাছ থেকে কোনো একটা জবর wedding present-প্রত্যাশায় আছে। ও খুব ভয় পেয়ে গেছে— লিখ্ছে, "আমি কিছুই চাই নে কিন্তু আপনাকে নিয়ে আমাকে যেন একটুও খোঁটা সইতে না হয়।" এখন ভাবচি ওকে যে বইগুলো দেব তার একটা ভালো আধার দিতে পারলে চোখ-ভরা গোছের চেহারা হত। ...বাংলা পদ্যগ্রন্থাবলীর মোটা কাগজের সংস্করণটাই যেন দেওয়া হয়— স্বরলিপি ও অন্যান্য সমস্ত ছোট বড় বই দিয়ে বোঝা ভারি করিস্। ম্যাকমিলানের সংস্করণ সমস্ত ইংরেজি বইও দিতে হবে— সেগুলো হয়ত বিশেষ করে না বাঁধালেও ক্ষতি হবে না। বাঁধাইয়ের কাপড় তোরাই পছন্দ করে দিস্, কিন্তু সময়মত যেন হয়ে যায়— ...যাবার জন্যে রাণু খুব চেঁচামেচি করে চিঠি লিখেচে— চেষ্টা করব এড়াতে। যদি যাই একেবারে দুই একদিন আগে যাব।'

('বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬) ১ আষাঢ় ১৩৩২ প্রশান্তচন্দ্রকেও লিখেছেন: 'রাণুর বিবাহে বাংলা বই রাণুকে ও ইংরেজি বই বীরেনকে দেওয়া ভাল। বাংলা বাসন্তী রঙ ও ইংরেজি purple (রাজকীয়) রঙে হলে কেমন হয়? ইংরেজি যদি না বাঁধাতে চাও তাহলে বিলিতি ম্যাক্‌মিলানের Edition দিলেই হবে। দুটো আলাদা সেট করে দুজনকে দিতে ইচ্ছে করি। গানের স্বরলিপিগুলোও উপহারের মধ্যে ধরে দিয়ো— কেননা যদি কোনোটার কিছুমাত্র ব্যবহার হয় ঐটেরই হবে।' ('দেশ', ১৩ আষাঢ় ১৩৮২, পত্র ৪৯) ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী তাঁর 'রোজনাম্‌চা বা দৈনিক লিপি'তে ('স্মৃতিসম্পুট, ২য় খণ্ড, ১৯৯৯, পৃ. ২৩) লিখেছেন: 'রবিকা' তাঁর সব গ্রন্থাবলী একই ধরণে বেশ সুন্দর ঁধিয়ে সব বইয়ের ভিতরে স্বহস্তে আশীর্ব্বাদ লিখে একটা কাঁচের আলমারিসহ রাণুকে উপহার দিয়েছেন।'

এক সময়ে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' বাড়িতে রাণুর বিবাহ দেবার প্রস্তাব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু যখন বালিগঞ্জে বিরাট বাড়ি ভাড়া করে বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়, তখন তিনি পুত্রকে লেখেন, বিবাহে উপস্থিত থাকা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন তিনি। শেষে রাণুর মনে যেন কষ্ট না হয় সেই ভেবে ২৫ জুন কলকাতায় এসে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ইন্দিরা দেবীর বালিগঞ্জের বাড়িতে ওঠেন। কিন্তু সেখানে টিকতে পারেন নি, ২৭ জুন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে চলে যান। ইন্দিরা দেবী অভিমান করে তাঁর রোজনাম্‌চায় লিখেছেন: 'কায়ক্লেশে বৃহস্পতি শুক্র দু'দিন থেকে শনিবার সকালে একটু বেলা হতেই বাড়ি যাবার জন্যে এত অস্থির কেন-যে হয়ে পড়লেন তা এখন পর্যন্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। সুরেনদের ওখানে সেদিন সকালে গিয়ে বলেছেন শুনলুম যে, মন বসছে না, একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারছেন না, ইত্যাদি। আমাদের বললেন যে, রথীদের উপর চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি যে-সব ভার দিয়েছেন তা সম্ভবত হচ্ছে না, ফোনে ঠিক বোঝানো যায় না, ইত্যাদি। ...আসলে আমার বিশ্বাস রাণুকে যা দেবেন তার কী হল জানবার জন্যে ব্যস্ত এবং সেদিন আবার এক সাইক্লোন হবার হুজুক উঠেছিল তার জন্যে ভীত হয়ে এই কাণ্ডটি করলেন। পরে শুনলুম, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি রাত দশটার সময় গাড়ি ক'রে রাণুর যৌতুক পাঠিয়েছিলেন।' ('স্মৃতিসম্পুট',

২য় খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪) আশীর্ব্বাদের পত্রটি এই কারণেই বিবাহের আগের দিনে লেখা। অবশ্য শ্রীসমর ভৌমিক লিখেছেন: 'বিবাহ বাসরে ...রবীন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাদ করতে এসে বিচ্ছিন্নতার ছেঁড়া তার যেন জুড়ে গেলেন সারা সন্ধ্যে আমোদ আহ্লাদ করে।' ('রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য', ১৫০-৫১)

২ রাণুর শ্বশুর স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পত্র ১৬৮।

১ য়ুরোপ-ভ্রমণান্তে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফেরেন ৫ পৌষ ১৩৩৩ (২০ ডিসেম্বর ১৯২৬) তারিখে। পরের দিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তাঁর অভ্যর্থনার বিবরণ প্রকাশিত হয়: 'গতকল্য সকাল বেলা কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে সমবেত জনসঙ্ঘ তুমুল আনন্দধ্বনি সহকারে তাহাদের কবিকে বরণ করিয়া লয়। নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই এক বিশাল জনতা হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া জড় হয়। ট্রেন আসিয়া থামামাত্র প্রিয় কবিকে দেখিবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। ...গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে কবিবরকে তুমুল জয়ধ্বনি ও "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির মধ্যে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়। ...কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি, অমল হোম, পি, কে, চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চ্যাটার্জ্জী, ললিতমোহন দাস, প্রভাতচন্দ্র সান্যাল, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং বিশ্বভারতীর সদস্যবর্গ কবিকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বহু কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া কবিকে মোটর গাড়ীর নিকট লইয়া যাওয়া হয়। সমবেত বিরাট জনসঙ্ঘকে দর্শন দিবার জন্য কবিকে বহুক্ষণ গাড়ীর পা-দানীর উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। কয়েক মিনিট পরে গাড়ী ধীরে ধীরে কবিবরের কলিকাতা বাসস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ...রাস্তার স্থানে স্থানে দর্শনাকাঙ্ক্ষী জনসঙ্ঘকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মাঝে মাঝেই গাড়ী থামাইতে হয়।'

পত্র ১৭০।

১ ভরতপুর, আগ্রা, জয়পুর ও আমেদাবাদ ভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ ১১ এপ্রিল ১৯২৭ শান্তিনিকেতনে ফেরেন।

২ আমেদাবাদের বিশিষ্ট শিল্পপতি অম্বালাল সারাভাই।

পত্র ১৭১।

১ ২৩ বৈশাখ ১৩৩৪ (৬ মে ১৯২৭) অম্বালাল সারাভাইয়ের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলং যাত্রা করেন। অম্বালাল সেখানে দুটি বাড়ি ভাড়া করেছিলেন, Uplands নামক বাড়িটিতে রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় নেন।

২ এখানে রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' পত্রিকার জন্য 'তিন পুরুষ' নামক একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেন, পরে তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'যোগাযোগ'।

পত্র ১৭৪।

১ লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (জন্ম ১৮৬৩ খৃ.) ৫ মার্চ ১৯২৮ তারিখে পরলোকগমন করেন।

পত্র ১৭৫।

১ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট লেকচার দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে ৫ মে ১৯২৮ তারিখে কলকাতা থেকে 'সিটি অব্ ইয়র্ক' জাহাজে রবীন্দ্রনাথের কলম্বো রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর যাত্রা স্থগিত রাখা হয়। পরে মাদ্রাজ থেকে জাহাজ ধরার জন্য তিনি ১১ মে মাদ্রাজ মেলে রওনা হন। এ যাত্রায় তাঁর য়ুরোপে যাওয়া হয় নি।

পত্র ১৭৭।

১ দ্র. ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৫৮, 'বিচিত্রা' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫-সংখ্যায় (পৃ. ৭৫৭-৫৮) মুদ্রিত হয়।

২ কলম্বো থেকে ১৪ জুন রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজে আসেন, কিন্তু ওয়াল-টেয়ারের পরিবর্তে তিনি ১৫ জুন বাঙ্গালোরে গিয়ে দিন-দশেক ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আতিথ্য ভোগ করে ২৯ জুন কলকাতায় ফিরে আসেন।

পত্র ১৭৮।

১ ডাঃ নীলরতন সরকার রবীন্দ্রনাথের জন্য ডায়াথার্মিক চিকিৎসার সুপারিশ করেছিলেন।

২ ৫ শ্রাবণ ১৩৩৫ শান্তিনিকেতনে 'বর্ষা-উৎসব উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান' হয়। ৯ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ-প্রবাসী প্রতিমা দেবীকে লেখেন :

'তোমার টবের বকুল গাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হোলো।...সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল— শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন— আমি একে একে ছটা কবিতা পড়লুম— মালা দিয়ে চন্দন দিয়ে ধূপধুনো জ্বালিয়ে তার অভ্যর্থনা হোলো।...তার পরে বর্ষামঙ্গল গান হোলো— আমি এই উপলক্ষে ছোট একটি গল্প লিখেছিলুম সেটা পড়লুম।' (চিঠিপত্র ৩য়, পৃ. ৬৪-৬৫, পত্র ২৮) উক্ত কবিতাগুলি হল 'বনবাণী' কাব্যের 'ক্ষিতি', 'অপ', 'তেজ', 'মরুৎ', 'ব্যোম' ও 'মাঙ্গলিক'। নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর-পরিকল্পিত রূপসজ্জায় সভাস্থলে পাঁচ জন ছাত্র-শিক্ষক পঞ্চভূত সেজে উপবিষ্ট হন। সন্ধ্যায় বর্ষার গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'বলাই' গল্পটি পড়ে শোনান।

পত্র ১৭৯।

১ চিকিৎসার জন্য রবীন্দ্রনাথ ২৮ জুলাই কলকাতায় আসেন।

পত্র ১৮২।

১ অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচার দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের উদ্দেশে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ কলকাতা ত্যাগ করেন।

পত্র ১৮৩।

১ রাণুর পুত্র রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

২ ১৯, ২১ ও ২৬ মে ১৯৩০ রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ডে তিনটি বক্তৃতা দেন, প্রবন্ধগুলি কিঞ্চিৎ ভিন্ন আকারে *The Religion of Man* (1930) নামে প্রকাশিত হয়।

৩ রাণুর প্রথমা কন্যা গীতা।

পত্র ১৮৪।

১ এলমহার্স্ট ও তাঁর স্ত্রী ডরোথী শান্তিনিকেতনের আদলে ডেভনশায়ারের টট্‌নেসে ডার্টিংটন হল নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে দেখা করা ও বিশ্রামের জন্য ৬ জুন সেখানে গিয়ে মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে আসেন।

২ E. W. Ariam (?1889-1967), সিংহলদেশীয় তামিল খ্রিস্টান, পরে আর্যসমাজী মতে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়ে 'আর্যনায়কম্' পদবী গ্রহণ

করেন। রাণুর দিদি আশাকে বিবাহ করেন।

পত্র ১৮৫।

১ যুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ ৩১ জানুয়ারি ১৯৩১ গভীর রাত্রে কলকাতায় ফিরে আসেন ও ২ ফেব্রুয়ারি সকালের ট্রেনেই শান্তিনিকেতনে রওনা হন।

২ আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে ১৯ অক্টোবর ১৯৩০ নিউ হ্যাভেনে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। অসুস্থতা এমন-কিছু গুরুতর ছিল না, কিন্তু আমেরিকান সংবাদপত্রগুলি এমন প্রচার আরম্ভ করে যে, তাঁর পরবর্তী কার্যসূচির অনেকটাই বাতিল হয়ে যায়।

পত্র ১৮৬।

১ এই প্রসঙ্গে ১৯ মে ১৯৩১ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সংবাদ দেয়: 'কিছুদিন পূর্ব্বে পারস্যের সম্রাট রবীন্দ্রনাথকে পারস্যদেশে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সম্রাট সেই আমন্ত্রণের পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন। কবিবর এই আমন্ত্রণ রক্ষা করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পারস্যের দূত ডাক্তার আলী বোম্বাইতে কবির যাত্রার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। ২১শে মে তারিখ যাত্রা করার কথা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে কবির ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে, সুতরাং যাত্রা স্থগিত রাখিতে হইয়াছে।' এক বৎসর পরে ১১ এপ্রিল ১৯৩২ তারিখে রবীন্দ্রনাথ পারস্যের উদ্দেশে আকাশপথে যাত্রা করেন।

২ এই বৎসর সমারোহ-সহকারে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে জন্মোৎসবের আয়োজন করা হয়, ২৫ বৈশাখ ১৩৩৮ শান্তিনিকেতনে যথারীতি জন্মোৎসব পালিত হলেও মূল সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানটি হয় কলকাতায় ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩১।

৩ দার্জিলিং যেতে আপত্তি থাকলেও শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বিশ্রামের জন্য সেখানে যান ২৭ মে তারিখে। জুলাই মাসের শুরুতে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

পত্র ১৮৭।

১ গরমের তাড়নায় না হোক, লোকের তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ ১৮ অক্টোবর দার্জিলিঙের উদ্দেশে রওনা হন।

পত্র ১৮৯।

১ ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ চৌরঙ্গিতে কলকাতা আর্ট স্কুলে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনী শুরু হয়, চলে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

২ দ্র. পত্র ১৮৬, টীকা ১। ৪ এপ্রিল যাওয়া হয় নি, রবীন্দ্রনাথ পারস্যযাত্রা করেন ১১ এপ্রিল সকালে।

পত্র ১৯১।

১ চিঠির তারিখটি অবশ্যই ভুল, উক্ত তারিখে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং জেলার মংপুতে অবস্থান করছেন। রবীন্দ্রনাথ '১৩৩৯' লিখতে গিয়ে '১৯৩৯' লিখেছেন।

২ রবীন্দ্রনাথ নিজেও ২৫ অক্টোবর ১৯৩২ (৮ কার্তিক ১৩৩৯) খড়দহে গিয়ে সেখানে পক্ষকাল অবস্থান করে ১০ নভেম্বর শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

৩ ১ অগাস্ট ১৯৩২ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত করে।

৪ [?] ডিসেম্বর ১৯৩২-এ রবীন্দ্রনাথ রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হিসেবে সিনেট হলে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', দ্বিতীয় ভাষণটি দেন ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ তারিখে 'শিক্ষার বিকিরণ' নামে। দুটি ভাষণই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে, দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৮শ খণ্ড।

পত্র ১৯৩।

১ ১৯৪-সংখ্যক পত্র থেকে অনুমান করা যায়, রাণু সন্তানদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

পত্র ১৯৪।

১ বরানগরে 'শশিভূষণ ভিলা'য় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাসায় থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'মালঞ্চ' উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন।

২ প্রশান্তচন্দ্রের স্ত্রী নির্মলকুমারী বা রানী মহলানবিশ।

পত্র ১৯৫।

১ ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ তারিখে কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাহিত্যতত্ত্ব' শীর্ষক বক্তৃতা করেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের 'রবীন্দ্রপরিষদ'-এ ভাষণ দেন ও ১৩ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানির রজতজয়ন্তী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন।

২ অনিলকুমার চন্দ (১৯০৬-৭৬), রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব।

পত্র ১৯৬।

১ 'শ্যামলী' নামক মাটির বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ গৃহপ্রবেশ করেন ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ তারিখে।

পত্র ১৯৭।

১ 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য' অভিনয়ের দল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পাটনা, এলাহাবাদ, লাহোর, দিল্লি ও মীরাট ভ্রমণ করেন।

২ এইদিন রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী নন্দিতার (ডাকনাম 'বুড়ি', ১৯১৬-৬৭) সঙ্গে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক কৃষ্ণ কৃপালনির (১৯০৭-৯২) বিবাহ হয়।

পত্র ১৯৮।

১ রাণুর শ্বশুর স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় ১৫ মে ১৯৩৬ (১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২) তারিখে (জন্ম ১৮৫৪ খৃ.)।

পত্র ১৯৯।

১ বরানগরে নয়, রবীন্দ্রনাথ এবার দীর্ঘদিন চন্দননগরে গঙ্গার তীরে কাটান, এই পত্রটি সেখান থেকেই লেখা।

২ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

পত্র ২০০।

১ ২৯ এপ্রিল ১৯৩৭ (১৬ বৈশাখ ১৩৪৪) রবীন্দ্রনাথ আলমোরা যাত্রা করেন। বেরিলি স্টেশনে সাত ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়।

পত্র ২০১।

১ রাণু তাঁর ১৩ জুনের পত্রের সঙ্গে একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন।

২ ২৭ জুন রবীন্দ্রনাথ রাণীক্ষেতের পথে আলমোরা ত্যাগ করেন।

পত্র ২০২।

এই চিঠির উপর কেউ '1/4/38' তারিখটি লিখে রেখেছেন।

১ ২৬ জুন ১৯৩৮ কালিম্পঙ থেকে রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি বিবৃতি পাঠান : 'বন্ধুবর্গ ও জনসাধারণের সহিত পত্রব্যবহার ও তাঁহাদের অন্যান্য অনুরোধ রক্ষা আমার জীর্ণ শরীর মনের পক্ষে দুর্বহ হওয়াতে এই সমস্ত দায়িত্বভার হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দিবার জন্য সকলের নিকট আমি সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি। আমার বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আশা করি তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।' ২৮ জুন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'যুগান্তর'-এ তাঁর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়।

২ পুজোর ছুটিতে শান্তিনিকেতনেই অবস্থান করেন।

পত্র ২০৩।

পত্রটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি থেকে মুদ্রিত।

পত্র ২০৪।

পত্রটি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি থেকে মুদ্রিত।

১ ইঙ্গবঙ্গ যে ধনী সমাজে রাণুর বিবাহ হয়েছিল, সেখানে পার্টিতে গিয়ে নানাধরনের বিদেশি হল্লোড় খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথও তা জানতেন। 'বাঁশরি' (১৯৩৩) নাটকে তার একটি ছবিও তিনি এঁকেছেন। তবু পার্টিতে রাণুর আচরণ সম্পর্কে লোকমুখে কিছু বিরূপ কথা শুনে তিনি উত্তেজিত হয়ে চিঠিটি লেখেন।

পত্র ২০৫।

১ ২০৩-সংখ্যক চিঠির প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

২ রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে শ্রী রঙ্গমঞ্চে ৭ ফেব্রুয়ারি 'শ্যামা' ও ৯ ফেব্রুয়ারি 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যগুলি অভিনীত হয়। এরই কোনো একটি অনুষ্ঠানে রাণু অভিনয়ের মধ্যপথে উঠে যান বলে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়েছেন ভেবে তিনি একটি চিঠি লেখেন। সম্ভবত এই ঘটনা স্মরণ করেই রাণু 'ভানুসিংহ ঠাকুর : কিছু তথ্য'-শীর্ষক স্মৃতিকথায় লিখেছেন : 'তাঁর কোনো পরিচিত লোক যদি কাজের তাড়ায় অভিনয়ের মাঝখানে উঠে যেতেন দর্শকের আসন ছেড়ে, নিদারুণ ভর্ৎসনা জুটত তাঁর ভাগ্যেও। বিয়ের পর স্বামীর কাজের তাড়ায় উঠতে গিয়ে এ-ভর্ৎসনা ভোগ করতে হয়েছে

আমাকেও।' ('রবীন্দ্রবীক্ষা', ৩২শ সংকলন, পৌষ ১৪০৪, পৃ. ৬৬)

৩ সূর্যপাল সিং (? - ১২ জুন ১৯৭১), রবীন্দ্রভক্ত অযোধ্যার তালুকদার, বিশ্বভারতীর জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন।

পত্র ২০৭।

১ এই সময়ে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের জন্য রাণু একটি শীততাপ-নিয়ন্ত্রক যন্ত্র বা এয়ার-কন্ডিশনার উপহার দিয়েছিলেন।

পত্র ২০৮।

১ পত্রটির উপলক্ষ জানা যায় না। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সেবার জন্য তাঁর যে-সব ভক্ত অনুচর জোড়াসাঁকোয় ছিলেন, রাণু তাঁদের ভোজে নিমন্ত্রণ করেন।

২ রাণুর কনিষ্ঠা কন্যা নীতা।

ফণিভূষণ অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

পত্র ১।

১ ফণিভূষণ কলকাতায় চিকিৎসা ও মাসাধিককাল শান্তিনিকেতনে বিশ্রাম নিয়ে সপরিবারে ১০ জুলাই ১৯১৮ কাশীর পথে রওনা হন। রাণু ১০ ও ১১ জুলাই রেলপথে ভ্রমণের দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে কাশী পৌঁছনোর সংবাদ জানান। দ্র. রাণুর পত্র ১৪।

২ পশুপতি সম্ভবত কাশীর কোনো সংগীতশিক্ষক।

পত্র ২।

১ দক্ষিণভারত ভ্রমণের সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার যে-আক্রমণে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, কাশীতে গিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়ে সেই দুর্বলতা অনেক বেড়ে যায়। সেই কারণেই গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি প্রথমে শান্তিনিকেতনে ও পরে কলকাতাতেই ছিলেন, হাওয়া বদলের জন্যে কোনো শীতপ্রধান অঞ্চলে যান নি। অবশ্য এই সময়ে প্রতিমা দেবীর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রথীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে শিলং পাহাড়ে ছিলেন।

পত্র ৩।

১ বিহারীলাল গুপ্ত (১৮৪৮-১৯১৬) ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি যখন কটকে ডিস্ট্রিক্ট জজের কাজ করছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁর কন্যা ললিতা, স্নেহলতা (লটি) ও চারুলতা (সিরিন) রবীন্দ্রনাথেরও খুব স্নেহের পাত্রী ছিলেন। কুমুদনাথ সেনের সঙ্গে ১৮৮৯ সালে যখন স্নেহলতার (১৮৭৪-১৯৬৭) বিবাহ হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে 'সুখে থাকো আর সুখী করো সবে' গানটি লিখে দেন। স্নেহলতা বিদুষী ছিলেন, ইংরেজি ভাষায় তিনি কয়েকটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। ১৯০৭ সালে স্বামীর অকালমৃত্যুর পরে তিনি কলকাতার লন্ডন মিশন কলেজে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তিনি তাঁর পুত্রকন্যাদের অনেককেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। শেষে তিনি যখন নিজেই বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দিতে চাইলেন, ২৩ আশ্বিন ১৩২৮ (৯ অক্টোবর ১৯২১)-

এর পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাদর আহ্বান জানিয়েছেন।

২ ছাত্রীনিবাসের দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত একজন শিক্ষিতা মহিলার সন্ধান দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ ফণিভূষণকে অনুরোধ করেছিলেন। ফণিভূষণ সন্ধান দিয়েছিলেন, কিন্তু স্নেহলতাকে এই কাজে পেয়ে তাঁর প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

৩ অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি ২৩ কার্তিক ১৩২৮ (৯ নভেম্বর ১৯২১) শান্তিনিকেতনে এসে কর্মভার গ্রহণ করেন।

৪ ফণিভূষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা আশা সংস্কৃতের ছাত্রী ছিলেন, এই সময়ে তিনি বি. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন।

পত্র ৪।

১ দ্র. রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ৯৪, টীকা ১।

২ দ্র. উক্ত পত্র ৯৫, টীকা ২। রবীন্দ্রনাথের নেপাল যাওয়া হয় নি।

৩ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্র ৫।

১ উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন।

২ অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪), লখ্‌নৌ-প্রবাসী ব্যারিস্টার, কবি ও গীতিকার।

৩ দ্র. রাণুকে লেখা পত্র ৯৯, টীকা ১।

৪ অগাস্ট ১৯২২-এ 'লিপিকা' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের রচনাগুলি ১৩২৪-২৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হয়েছিল।

পত্র ৬।

১ দ্র. রাণুকে লেখা পত্র ১০৭।

২ দ্র. উক্ত পত্র ১০৬, টীকা ১০।

৩ প্রাচ্যবিদ্‌ Moriz Winternitz, দ্র. উক্ত পত্র ১১৮, টীকা ২।

৪ বিশ্বভারতীর পার্শি অধ্যাপক হিডজিভাই পেস্তনজি মরিস, দ্র. উক্ত পত্র ১২৪, টীকা ৪।

পত্র ৭।

১ দেরাদুনে যাওয়া হয় নি, পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ রাণুকে নিয়ে সপরিবারে এপ্রিলের শেষে শিলঙে গিয়ে প্রায় দু'মাস সেখানে অবস্থান করেন।

২ ফণিভূষণের শ্যালক কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।

পত্র ৮। পত্রাংশটি শ্রীসমর ভৌমিকের 'রাণু মুখোপাধ্যায়ের জীবনালেখ্য' (১৪০৪) গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃত। মূল পত্র দেখার সুযোগ পাওয়া যায় নি। ১৩, ১৪, ১৫, ও ১৬-সংখ্যক পত্রাংশগুলিও উক্ত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১ রাণুর একাধিক প্রণয়প্রার্থী যে-গোলমাল পাকিয়ে তুলেছিলেন, সেই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফণিভূষণ রাণুর বিবাহ দিতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথের মত জিজ্ঞাসা করেন।

২ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সুসঙ্গের রাজপরিবারের সুহৃদচন্দ্র সিংহ।

পত্র ৯।

১ দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ শেষে ইটালি হয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ তারিখে বোম্বাই পৌঁছন।

২ এই তারিখে ইটালি যাত্রা সম্ভব হয় নি, ১৫ মে ১৯২৬ রবীন্দ্রনাথ সদলবলে ইটালি রওনা হন।

৩ ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি বোম্বাই থেকে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে রওনা হন।

৪ এই নিষেধ সত্ত্বেও রাণু ও আশা কাশী থেকে মোগলসরাই স্টেশনে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন, দ্র. পত্র ১০।

পত্র ১০।

১ রবীন্দ্রনাথ ২৬ চৈত্র ১৩৩১ (৯ এপ্রিল ১৯২৫) তারিখে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আসেন, হিসাবের খাতার এই তথ্য থেকে পত্রটির তারিখ অনুমান করা হয়েছে।

পত্র ১২।

১ জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' বাড়িতে রাণুর বিবাহ হয় নি; বালিগঞ্জে একটি বড়ো বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিবাহটি হয়। অবশ্য ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ২৩ অগাস্ট ১৯২৫ তাঁর 'রোজনামচা বা দৈনিক লিপি'তে লিখেছেন: 'রাণুর বিয়েতে নিমন্ত্রিত, অতিথি, সহকারী, কর্মকর্তা, সবই বলতে গেলে জোড়াসাঁকো। সুবীর ক'দিনই দৌড়োদৌড়ি ক'রে খুব খেটেছে; পরিবেশন করেছে, সাজিয়েছে, ইত্যাদি। ...সবিতা ও প্রতিমা পিঁড়ে-আলপনা থেকে

ক'নে সাজানো প্রভৃতি সবই করেছে; ...বিয়ের আগে পরে আমাদের মেয়েরাই গান করলে।' ('স্মৃতিসম্পুট', ২য় খণ্ড, ১৯৯৯, পৃ. ২২-২৩)

পত্র ১৩।

১ আশা অধিকারী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেখানেই তাঁর কর্মসংস্থান হয়।

পত্র ১৪।

১ রাণুর স্বামী বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

২ ফণিভূষণের একমাত্র পুত্র অশোক অধিকারী।

পত্র ১৬।

১ য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ তারিখে।

২ এই সময়ে আশা বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী ভক্তিও বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হন। ভ্রাতা অশোক তখন শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করছিলেন।

পত্র ১৭।

১ বিশিষ্ট শিল্পী ও স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ কর (১৮৯২-১৯৭০), বিশ্বভারতীর বহুবিধ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

২ রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা, অকালপ্রয়াতা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী (১৯০৩-৩৫)।

৩ সুরেন্দ্রনাথ ও রমা (নুটু) পরস্পরকে ভালোবেসে বিবাহ করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ তাতে সানন্দ সম্মতি দেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কায়স্থ ও নুটু বৈদ্য বলে তাঁর মা যুগলমোহিনী বিবাহের পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে আপত্তি করলে ২১ বৈশাখ ১৩৩৮ রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন: 'একটা সামাজিক সঙ্কটে তোমার শরণাপন্ন হলুম। ইতিহাসটি এই:— সুরেন এবং নুটু কোনো এক গ্রহচক্রে পরস্পরকে পছন্দ করেচে। নুটু বৈদ্য ঘরের মেয়ে সুরেন কায়স্থ ঘরের ছেলে। নুটুর মা হিন্দুসমাজের সনাতন বিধিবিধানে অবিচলিত নিষ্ঠাবতী। তাঁর মন শান্ত করবার জন্য

প্রমথনাথ তর্কভূষণ মশায়ের কাছ থেকে এক পত্রী সংগ্রহ করেচি। তিনি বলেচেন এরকম বিবাহ শাস্ত্রমতে এবং লোকাচারমতে বৈধ। এখন ঠেকেচে পুরোহিত নিয়ে। যদি সুরেন হিন্দুসমাজ থেকে তিরস্কৃত হবার মতো কোনো অপরাধ না করে থাকেন তাঁকে সে দণ্ড থেকে অব্যহৃতি দেওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য হবে। যদি তোমরা আনুকূল্য না করো তবে অগত্যা অশাস্ত্রীয়ভাবে কার্য্যসমাধা করা ছাড়া উপায় থাকবে না। কিন্তু হিন্দুসমাজে এমন করে ছিদ্র খনন করলে সমাজ কতদিন টিকবে? ...তুমি স্বয়ং যদি বন্ধুর প্রতি অনুকম্পা করে এই কাজটি সম্পন্ন করে দাও তো সব চেয়ে ভালো হয়। যদি কোনো অনিবার্য্য বিঘ্ন থাকে তবে তোমার কোনো সুহৃদকে এই কাজে নিয়োগ করে দিয়ো।' সুনীতিকুমার এই পত্রের কি উত্তর দিয়েছিলেন, জানা নেই— রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থাপনায় সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় পুরোহিতের কাজ করেন। আশ্রমে মূর্তি বা প্রতীক পূজা নিষিদ্ধ বলে আশ্রম-সীমানার বাইরে একটি খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়িতে বিশুদ্ধ হিন্দুমতে বিবাহ দেওয়া হয়।

৪ দ্র. রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৮৬, টীকা ২।

পত্র ১৮। পত্রটি মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯-সংখ্যা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (পৃ. ১০৮-০৯) মুদ্রিত হয়।

১ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০১-৮৬), বিশিষ্ট কবি ও অধ্যাপক, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসচিব।

পত্র ১৯। পত্রটি মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯-সংখ্যা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (পৃ. ১০৯-১০) মুদ্রিত হয়।

১ Dr. Albert Schweitzer-রচিত *Indian Thought and Its Development* গ্রন্থটির সমালোচনা করে ফণিভূষণ যে প্রবন্ধ লেখেন, সেটি *The Visva-Bharati Quarterly*-র Nov-Jan 1936-37 (pp. 81-90) সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

২ রবীন্দ্রনাথ পরের দিন ৮ অক্টোবরেই কলকাতায় যান। ১০ ও ১১ অক্টোবর ১৯৩৬ আশুতোষ কলেজ হলে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা 'পরিশোধ' অভিনয় করেন। অনুষ্ঠানের পূর্বার্ধে ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যাদি

পরিবেশন করেন, রবীন্দ্রনাথও চারটি কবিতা পাঠ করেছিলেন।

পত্র ২০।

১ ফণিভূষণ দ্বিধা করেন নি, July 1938-সংখ্যা *The Visva-Bharati News*-এ জানানো হয়: 'Phanibhusan Adhikari, M. A., till recently the Head of the Department of Indian Philosophy, Benares Hindu University, has joined our Vidya-Bhavana as Adhyapaka of Indian Philosophy.'

সরযূবালা অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

পত্র ১।

১ এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জন' অভিনীত হয় ২৫, ২৭ ২৮ অগাস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ তারিখগুলিতে। প্রথম দিন অসুস্থতার জন্য রাণু অপর্ণার ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন নি; মঞ্জুশ্রী ঠাকুর অভিনয় করেন—পরবর্তী তিনটি অভিনয়ে রাণু উক্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

২ রবীন্দ্রনাথ ১৬ ভাদ্র ১৩৩০ (২ সেপ্টেম্বর) কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন।

পত্র ২।

১ উক্ত অভিনয় উপলক্ষে রাণু যখন অনেকদিন জোড়াসাঁকোয় ছিলেন, তখন তাঁর সৌন্দর্যে ও খোলামেলা ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে অনেক যুবক তাঁর প্রণয়প্রার্থী হন। রাণুও তাঁদের কাউকে-কাউকে কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় দেন। সকলের কথা জানা নেই, কিন্তু পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরপরিবারের প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পুত্র পূর্ণেন্দুনাথ (ডাক নাম বুড়ো) ও রাণুর মধ্যে বেশ-কিছু চিঠিপত্র আদানপ্রদান হতে থাকে। কেউ-কেউ কাশীতে বা শান্তিনিকেতনে গিয়ে রাণুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবারও চেষ্টা করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে এইসব প্রণয়প্রার্থীদের কৌতুকের দৃষ্টিতেই দেখছিলেন, কিছুটা তাঁদের নিয়ে মজাও করেছেন। কিন্তু ঘটনা ক্রমেই বাড়াবাড়ির দিকে যাচ্ছে দেখে তিনি তাঁর প্রযত্নে রাণুকে পাঠানো ও পূর্ণেন্দুকে পাঠানো রাণুর লেখা কয়েকটি চিঠি খুলে পড়েন এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের আলিপুরের বাসায় থাকার সময়ে পূর্ণেন্দুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভর্ৎসনা করেন। পূর্ণেন্দুনাথ রাণুকে বিয়ে করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেন, কারণ সগোত্রে বিবাহ তাঁর পিতা প্রফুল্লনাথ কিছুতেই মেনে নেবেন না। পূর্ণেন্দুনাথের সঙ্গে তাঁর কোনো গুরুজন-স্থানীয় আত্মীয়ও ছিলেন, তিনি ভরসা দেন প্রফুল্লনাথকে রাজি করানো কঠিন হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই আশ্বাস মেনে নিতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথকে লেখা পূর্ণেন্দুর চারখানি ইংরেজি চিঠি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে, যাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের অমর্যাদাকর উক্তিসমূহের তীব্র প্রতিবাদ করে চিঠিগুলি

ফেরৎ চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কোনো চিঠিরই উত্তর দেন নি, রথীন্দ্রনাথের একটি চিঠির খসড়া থেকে জানা যায়, অসুস্থ পিতাকে বিব্রত না করার জন্য তিনি চিঠিগুলি তাঁকে দেখান নি। অতঃপর তিনি পূর্ণেন্দুর লেখা চিঠিগুলির প্রতিলিপি তাঁর বাবার কাছে পাঠিয়ে দিলে তিনি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'তোমার পত্র ও তৎসহ প্রেরিত বুড়োর তিনখানি পত্র পাইয়াছি। বুড়োর পত্র কয়খানি পড়িয়া আমি বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছি এবং বুড়োকে বিশেষ ভর্ৎসনা করিয়াছি।' এই চিঠিগুলি সবই ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে লেখা, তখন রাণুর বিবাহ স্থির হয়ে যাওয়ার মুখে। সম্ভবত এই সময়েই রথীন্দ্রনাথকে সরযূবালা লেখেন:

'গুরুদেব রাণুর নামে যে চিঠিখানা তাঁর কেয়ারে এসেছিল আমায় পাঠিয়েছেন সেটা পড়ে কয়েকটা কথা আপনাকে জানানো আবশ্যক বলে মনে করলুম। তারা রাণুকে অনেক রকম ভয় দেখিয়ে শেষে লিখেছে বিরেনের [য] সঙ্গে যাতে তার বিবাহ না হয় সে জন্য তারা এমন অনেক ভীষণ ২ চিঠি আবার লিখছে বিরেন ও রাজেন্দ্রবাবুকে যা থেকে তার ভানুদাদা তাকে কিছুতে বাঁচাতে পারবেন না। বসুমতীর সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে তারা গুরুদেবের সমন্ধে [য] এমন এক চিঠি দিয়ে এসেছে যা পেয়ে সে খুব খুসী হয়েছে এবং সময়ে সেটা কাজে লাগাবে বলেছে।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ চিঠি বুড়ো এবং কিরণ বাবু [এঁর পরিচয় উদ্ধার করা যায় নি] মিলে লিখেছে এবং আগাগোড়া সমস্ত চিঠিই এদের লেখা। আমার বোধ হয় প্রসাদ দাস বাবুকে [এঁর পরিচয়ও উদ্ধার করা যায় নি] এ বিষয় জানান উচিত যাতে উনি এর কোন বিহিত করতে পারেন। কিরণ ও বুড়োকে শাসন করা তাঁর নিতান্ত কর্ত্তব্য।

'গুরুদেব এই অসুস্থ শরীরে আমাদের জন্য এত কষ্ট পাচ্ছেন এই দুঃখই আমাদের সব চেয়ে বড় দুঃখ। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য যদি শীঘ্র য়ুরোপ যাওয়া আপনি উচিত জ্ঞান করেন ত সেই ব্যবস্থাই করবেন আমাদের জন্য ভাববেন না তাঁর মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল। তাঁর জীবনের চেয়ে আমাদের কাছে আর কিছু বেশী নয়।...'

২ সুহৃদচন্দ্র সিংহ।

৩ পত্রের তারিখ ৩০ ফাল্গুন ১৩৩০ বৃহস্পতিবার ছিল, সেইজন্য মনে হয় চিঠিটি শনিবার ২ চৈত্র তারিখে লেখা।

পত্র ৩।

১ বীরেন্দ্রনাথের মাতা লেডি যাদুমতী মুখোপাধ্যায়। তাঁকে লেখা চিঠিটি এই পত্রের পরেই মুদ্রিত হয়েছে।

২ স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পত্র ৪।

১ দ্র. সরযূবালাকে লেখা পত্র ২, টীকা ১।

পত্র ৫।

১ দ্র. ফণিভূষণ অধিকারীকে লেখা পত্র ১০।

লেডি যাদুমতী মুখোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

১ দ্র. পত্র ২, টীকা ১-এ উদ্ধৃত রথীন্দ্রনাথকে লিখিত সরযূবালার পত্র।

২ দ্র. ফণিভূষণ অধিকারীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১০-সংখ্যক পত্র।

৩ রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ (১৮৯৬-১৯০৭)।

৪ এঁরা এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন বলে জানা যায় না।

আশা অধিকারী (আর্যনায়কম্)-কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

পত্র ১।

পত্রটি 'রাশিয়ার শিক্ষাবিধি' নামে চৈত্র ১৩৩৭-সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে মুদ্রিত ও পরে 'রাশিয়ার চিঠি' (২৫ বৈশাখ ১৩৩৮) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এখানে মূল পত্র অবলম্বনে মুদ্রিত হল। পাঠকেরা দুটি পাঠ মিলিয়ে দেখলে সম্বোধন ও স্বাক্ষর ছাড়াও কিছু পার্থক্য দেখতে পাবেন।

১ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

২ *The Visva-Bharati Quarterly,* কিন্তু এই চিঠি লেখার সময়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত না। প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ সেই সময়ে কোনো

পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। ডাঃ শশধর সিংহ সম্পূর্ণ গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, কিন্তু ১৯৬০ সালের আগে সেটি ছাপা হয় নি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, '১৯৩৬-৩৭ সালে আমেরিকার Unity নামক পত্রিকায় বসন্ত রায়-কর্তৃক রাশিয়ার চিঠি Russian Impressions নামে প্রকাশিত হয়।' (রবীন্দ্রজীবনী, ৩য়, ১৩৯৭, পৃ. ৪২২)

৩ এই অংশটি স্বাভাবিকভাবেই উল্লিখিত পত্রিকায় ও গ্রন্থে ছাপা হয় নি।

পত্র ২। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি থেকে মুদ্রিত।

১ আশা ও আরিয়ামের বিবাহ হয় ১ বৈশাখ ১৩৪০ (১৪ এপ্রিল ১৯৩৩) তারিখে। এর কিছুকাল পরে উভয়ে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে মাদ্রাজের আডিয়ারে অ্যানি বেসান্টের ন্যাশানাল য়ুনিভার্সিটিতে যোগ দেন। পত্রটির রচনাকাল নির্ণয় করা শক্ত। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দ হতে পারে। অক্টোবর ১৯৩৪-এ আডিয়ারে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আশা, আরিয়াম্‌ ও তাঁদের প্রথমা কন্যাকে (উষণা) দেখে এসেছিলেন।

পত্র ৩। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি থেকে মুদ্রিত।

১ আশার যে-চিঠিটির উত্তরে এই পত্রটি লিখিত, সেটি পাওয়া না যাওয়ায় প্রসঙ্গটি বোঝা যায় না।

২ গ্রীষ্মের সময়টি কাটানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙে আসেন ২৫ এপ্রিল ১৯৩৮ তারিখে। মৈত্রেয়ী দেবীর আহ্বানে তিনি ২১ মে মংপুতে আসেন। পত্রটি সেখান থেকে লেখা।

পত্র ৪। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি থেকে মুদ্রিত।

১ আরিয়াম ১৭ নভেম্বর ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখে জানান, তাঁর কন্যা উষণা কানের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ ২৪ নভেম্বর পত্রে তাঁর আরোগ্য কামনা করেন। সম্ভবত এই রোগেই মেয়েটির জীবনাবসান হয়। পত্রটি সেই শোকসংবাদ পেয়ে লেখা।

ভক্তি অধিকারীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

পত্র ১।

১ ২ মার্চ ১৯৩০ রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কিছুদিন পরে ভক্তি অধিকারী বিশ্বভারতীর বিদ্যালয় বিভাগের কাজে যোগ দেন।

২ ভক্তির দিদি রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র-সংকলন 'ভানু-সিংহের পত্রাবলী' চৈত্র ১৩৩৬-এ প্রকাশিত হয়।

পত্র ২। পত্রটি মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯-সংখ্যা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (পৃ. ১১০) মুদ্রিত হয়েছিল।

১ বিদেশ ভ্রমণের পরে ১৯ মাঘ ১৩৩৭ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১) তারিখে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।

পরিশিষ্ট ১

রবীন্দ্রনাথকে লেখা রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়)-র পত্র

পত্র ১।

১ রবীন্দ্রনাথ চিঠিটি পাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে ৩ ভাদ্র ১৩২৪ তারিখে এর উত্তর দেন, সেইজন্য রাণুর পত্রের রচনাকাল শ্রাবণ ১৩২৪ (জুলাই ১৯১৭) অনুমান করা হয়েছে।

২ গল্পটি আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয়েছিল। পরে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-কর্তৃক প্রকাশিত 'গল্পগুচ্ছ' ৫ম ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পত্র ২।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১ (৩ ভাদ্র ১৩২৪)

২ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ১৯ শ্রাবণ (৪ অগাস্ট ১৯১৭) রামমোহন লাইব্রেরিতে ও ১০ অগাস্ট অ্যালফ্রেড থিয়েটারে পাঠ করেন; ভাদ্র ১৩২৪-সংখ্যা 'প্রবাসী' ও 'ভারতী'-তে মুদ্রিত হয়।

পত্র ৩।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২ (২১ ভাদ্র ১৩২৪)।

২ অ্যানি বেসান্ট-প্রতিষ্ঠিত Central Hindu Collegiate Girls' School।

পত্র ৪।

১ সোমবার (২৯ আশ্বিন ১৩২৪ : ১৫ অক্টোবর ১৯১৭) ছিল মহালয়া, এইদিন থেকে রাণুর স্কুলে পুজোর ছুটি শুরু হয়, এই তথ্য থেকে পত্রের তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে।

২ Annie Besant (1847-1933), মাদাম ব্লাভাটস্কির (১৮৩১-৯১) প্রভাবে থিয়োসফিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভারতে আসেন ও এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁর সহযোগীগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৭ খৃস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভানেত্রী নির্বাচিত হন। মাদ্রাজের আডিয়ারে তিনি ন্যাশানাল য়ুনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার চান্সেলার।

৩ B. P. Wadia, অ্যানি বেসান্টের থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি ও অল-ইণ্ডিয়া হোমরুল লীগের সহযোগী।

৪ George S. Arundale (1878-1945), ইনিও অ্যানি বেসান্টের সহযোগী ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি হন। বেনারস সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষতাও করেন।

পত্র ৫।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪ (৬ কার্তিক ১৩২৪)

২ রবীন্দ্রনাথ ৫-সংখ্যক পত্রে (২ অগ্রহায়ণ ১৩২৪) তাঁর কাজের ২৭ দফা ফর্দ দিয়েছেন।

৩ পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংস্কৃত ও সংগীত শিক্ষা দিতেন।

পত্র ৬।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫।

২ গ্রন্থটির নাম 'গল্পসপ্তক' (১৩২৩), 'সবুজ পত্র'-তে মুদ্রিত সাতটি গল্পের সংকলন : 'হালদার-গোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', 'ভাইফোঁটা', 'শেষের রাত্রি' এবং 'অপরিচিতা'।

পত্র ৭।

১ এমন কোনো সংবাদ আমাদের জানা নেই। পত্রটির সঠিক রচনাকাল অনুমান করা শক্ত।

পত্র ৮।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৬ (৮ ফাল্গুন ১৩২৪)।

পত্র ৯।

১ দোলপূর্ণিমা ছিল ১৩ চৈত্র ১৩২৪ (২৭ মার্চ ১৯১৮), উত্তর ভারতে হোলি হয় তার পরের দিন, এই হিসাবে পত্রটির তারিখ অনুমিত হয়েছে।

২ 'তোতাকাহিনী' মাঘ ১৩২৪-সংখ্যা 'সবুজ পত্র'-তে মুদ্রিত হয়।

পত্র ১০।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৭ (২ বৈশাখ ১৩২৫)।

পত্র ১১।

১ রবিবার ছিল ২৯ বৈশাখ ১৩২৫ (১২ মে ১৯১৮)।

২ কন্যার অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলবার রাণুদের ভবানীপুরের বাসায় যেতে পারেন নি, ফণিভূষণ রাণুকে নিয়ে পরদিন ১৫ মে সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোয় আসেন। রথীন্দ্রনাথ এইদিন ডায়ারিতে লেখেন: 'Ranu, the little girl of eleven, with whom father has had such an interesting correspondence, came this evening with her family. She is such a bright girl. But she felt shy before such a company here. She asked father to go to see her tomorrow or the day after.' রবীন্দ্রনাথ পরের দিনই রাণুদের বাসায় যান।

পত্র ১২।

১ মাধুরীলতার অকালমৃত্যুতে ও আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোয় হিন্দু-ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যায়ভাবে তাঁর নাম যুক্ত করায় রবীন্দ্রনাথ যে মানসিক কষ্ট পাচ্ছিলেন, স্থান পরিবর্তনে তার উপশম হতে পারে ভেবে রথীন্দ্রনাথ তাঁকে দার্জিলিং জেলার তিনধরিয়ায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন—কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করে তিনি ২৮ মে শান্তিনিকেতনে চলে যান। তাঁরই আমন্ত্রণে ফণিভূষণ সপরিবারে সেখানে যান ৪ জুন (২১ জ্যৈষ্ঠ) তারিখে।

পত্র ১৩।

১ আশ্রমে গ্রীষ্মের ছুটি থাকলেও রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে তাঁকে ঘিরে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেহলি বাড়ির ছাদে কবিতাপাঠ ইত্যাদি সভা জমে উঠত। রাণু এইরকমই একটি সভার কথা লিখেছেন।

২ শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে রাণু রবীন্দ্রনাথের চুল আঁচড়িয়ে দিয়ে সুন্দর করে সাজাবার চেষ্টা করতেন। পরবর্তী বহু পত্রে প্রসঙ্গটি আছে।

পত্র ১৪।

১ মাসাধিককাল শান্তিনিকেতনে থেকে ফণিভূষণ ২৬ আষাঢ় ১৩২৫ (১০ জুলাই ১৯১৮) দুপুরের ট্রেনে সপরিবারে কাশীর উদ্দেশে রওনা হন। রবীন্দ্রনাথ স্টেশনে গিয়ে তাঁদের বিদায় জানান। রাণু ট্রেনে বসে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে পরদিন সকালে চিঠিটি মোগলসরাই স্টেশনে ডাকে দেন।

পত্র ১৫।

১ দ্র. রাণুর ১৩-সংখ্যক পত্র।

২ রাণুদের কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। অনেকগুলি চিঠিতে এঁর উল্লেখ আছে।

৩ রাণুর অবাঙালি বান্ধবী লীলাবতী, ইনি ১৯২২ সালে পৌষ-মেলায় শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে এসেছিলেন, তাঁর ভালো লাগে নি, দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১১০ ও ১১১।

৪ পুজোর ছুটিতে রাণুর আবার শান্তিনিকেতনে আসার কথা ছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি।

৫ রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে রাণু তাঁর দেখাদেখি 'বৌমা' বলেই সম্বোধন করতেন, অন্যাদেরও তিনি নাম ধরেই সম্বোধন করতেন, নিজের দিদিদেরও। প্রতিমা দেবীকে লেখা রাণুর একটিমাত্র চিঠি রক্ষিত হয়েছে, সেটি এখানে উদ্ধৃত হল:

প্রিয় বৌমা,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। আপনি আমায় বেশ্ বড় চিঠি দিয়েছেন। এবার আমায় শান্তির চাইতে বড় চিঠি দেবেন। আর খামে আমার নাম লিখ্বেন। আপনারা বুঝি এখনো শান্তিনিকেতনে আছেন? বেশ্ মজা লালী [য] জামা আপনি কি শেলাই করেন? জামাটা ননীবালাকে কর্‌তে দেবেন না। নিজে খুব সুন্দর করে কর্‌বেন। যেদিন আমি আস্‌ব সে দিন আপনি চুল আঁচড়ে পাউডার মাখিয়ে খুব সুন্দর সাজিয়ে দেবেন যাতে আগের মতনই দেখায়। আর আপনি শিম্রির ফুলকাটা রঙীন কাগজ খুব বড় ২ কিনে দেবেন। আপনি আজকাল আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে কেন যান্। আপনি রবিবাবু আর রথীবাবু বুঝি বেড়াতে যান। আপনি চিঠিতেও কেন রথীবাবুকে উনি লিখেছেন? আপনি কি আজকালও ছেলেদের ড্রয়িং

শেখান। আমি আজকাল আপনার মতন ছবি আঁকি আর পেন্ট করি। এবার হারিয়ে গেছিটা ছাপাতে দেবেন। ভারতবর্ষতে দেবেন না। আমাদের ভারতী প্রবাসী নতুন এসেছে। আমার সব পড়া হয়ে গেছে। আপনার হয়েছে? কাশীতে আজকাল খুব গরম কিন্তু এখন মেঘলা। এ মেঘেতে বিষ্টি হয়না। আমাদের আজকাল morning ইস্কুল তাই অনেক পড়তে হয়। আপনার ছবি আর রবিবাবুর ছবি আর উনির ছবি রেখে দিয়েছি। আপনি যে লিখেছিলেন আজকাল রবিবাবু কিচ্ছু খাননা তাই আমি ওঁকে একটা বকে চিঠি দিয়েছি। আজকালও বুঝি দুষ্টুমি করেন। আপনি কি কোনও নতুন ছবি এঁকেছেন? ওখানে একটা বাজ পড়েছিল না? আজকাল ওখানে কি বিষ্টি হয়? আর শুনুন আপনি এন্ড্রুজ্ সাহেবকে রবিবাবুকে ঘরে বাইরে করাচ্চেন দেখলেই খাতা কেড়ে নেবেন। আপনার জন্যে মন কেমন করে।

রাণু॥

৬ রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি ইংরেজিতে অনুবাদ করছিলেন ও অ্যান্ড্রুজ তা লিখে নিতেন। রাণুর ধারণা হয়েছিল, অ্যান্ড্রুজ তাঁকে এইভাবে কষ্ট দিতেন।

৭ এই চিঠিতেই রাণু রবীন্দ্রনাথের বয়স সাতাশ বছরে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

৮ রাণুর পুতুলদের নাম।

পত্র ১৬।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৩ (৩১ আষাঢ় ১৩২৫)।

পত্র ১৭।

পত্রটি অত্যন্ত জীর্ণ, সেই কারণে অনেক অংশ পড়া যায় নি, সেই অংশগুলি তিনটি বিন্দু চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে; অনুমিত অংশগুলি তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৯ (৩০ আষাঢ় ১৩২৫)।

পত্র ১৮।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৯ (৩০ আষাঢ় ১৩২৫)।

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৮ (২৬ আষাঢ় ১৩২৫)।

৩ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১১ (১ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ১৯।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১০ (৩১ আষাঢ় ১৩২৫)।

পত্র ২০।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১১ (১ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ২১।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১২ (৫ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ২২।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৩ (৭ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ২৩।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৪ (৯ শ্রাবণ ১৩২৫)।

২ 'ছিন্ন পত্র' (কর্ম যখন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী') কবিতাটি 'প্রবাসী'-তে নয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫-সংখ্যা 'সবুজ পত্র'-তে মুদ্রিত হয়, দ্র. 'পলাতকা'।

পত্র ২৪।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৩ (৭ শ্রাবণ ১৩২৫)।

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৪ (৯ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ২৫।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১১ (১ শ্রাবণ ১৩২৫)।

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৭ (১৫ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ২৬।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৮ (১৮ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ২৭।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৯ (২১ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ২৮।

চিঠিটির মাত্র শেষ পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে।

১ রাণু এখানে 'সবার সাথে চলতেছিল অজানা এই পথের অন্ধকারে'

গানটির কথা উল্লেখ করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গানটি শুনেছিলেন—সেক্ষেত্রে অনুমান করা যায়, গানটি অন্তত ২৬ আষাঢ় ১৩২৫-এর আগে লেখা। গানটি 'গীতপঞ্চাশিকা' (আশ্বিন ১৩২৫) গ্রন্থে স্বরলিপি-সহ মুদ্রিত হয়।

পত্র ২৯।

১ রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গটি নিয়ে লেখেন তাঁর ২০ ভাদ্র ১৩২৫ তারিখের পত্রে (২৮-সংখ্যক)।

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২১ (২৪ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ৩০।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২২ (২৭ শ্রাবণ ১৩২৫)।

২ এই ফুলের কথা আছে রবীন্দ্রনাথের ২৬-সংখ্যক (১১ ভাদ্র ১৩২৫) পত্রে।

পত্র ৩১।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৩ (? ২৯ শ্রাবণ ১৩২৫)।

পত্র ৩২।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৪ (১ ভাদ্র ১৩২৫)।

পত্র ৩৩।

১ জন্মাষ্টমীর তারিখ ছিল ১২ ভাদ্র ১৩২৫ (২৯ অগাস্ট ১৯১৮)। এই তথ্য থেকে পত্রটির তারিখ অনুমান করা হয়েছে।

পত্র ৩৪।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৭ (১৬ ভাদ্র ১৩২৫)।

পত্র ৩৫।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৭ (১৬ ভাদ্র ১৩২৫)।

২ 'ক্ষণিকা' কাব্যের অন্তর্গত 'ভীরুতা' কবিতা ('গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে তোরে')।

পত্র ৩৬।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৮ (২০ ভাদ্র ১৩২৫)।

পত্র ৩৭।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৮ (২০ ভাদ্র ১৩২৫)।

পত্র ৩৮।

১ ৭ আশ্বিন ১৩২৫ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৮) মঙ্গলবারে রাণুরা মুক্তেশ্বরে যান।

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৩১ (৪ আশ্বিন পূর্ণিমা ১৩২৫)।

পত্র ৩৯।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৩২ (৬ আশ্বিন ১৩২৫)। রাণু এই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম 'ভানুদাদা' সম্বোধন করেছেন।

২ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী' (১৩০৩), বড়ো আকারের বই বলে এটি টালি-সংস্করণ নামে অভিহিত হয়।

৩ বিজয়া (২৮ আশ্বিন ১৩২৫ : ১৫ অক্টোবর ১৯১৮) রাণুরা মুক্তেশ্বর ত্যাগ করে কাশী রওনা হন।

পত্র ৪০।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৮ (২০ ভাদ্র ১৩২৫)।

২ সীতা দেবী 'পুণ্যস্মৃতি'-তে লিখেছেন, পুজোর ছুটির আগের দিন ১৬ আশ্বিন ১৩২৫ : ৩ অক্টোবর ১৯১৮ 'শারদোৎসব অভিনয় করার কথা ছিল কিন্তু দিনুবাবুর জ্বর হওয়ায় তাহা পণ্ড হইল, তাহার পরিবর্তে ছোট একটি সংস্কৃত নাটক এবং শারদোৎসবের ইংরেজি অনুবাদটি অভিনীত হইল।'

পত্র ৪১।

১ ৩৫-সংখ্যক পত্রে (২২ আশ্বিন ১৩২৫) রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির উত্তর দিয়েছেন।

পত্র ৪২।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৩৪ (১৬ আশ্বিন ১৩২৫)।

পত্র ৪৩।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৩৬ (৩ কার্তিক ১৩২৫)। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ পিঠাপুরম যাওয়ার পথে এঞ্জিন বিভ্রাটের কাহিনী সরস করে বর্ণনা করেছিলেন।

পত্র ৪৪।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৩৮ (১৯ কার্তিক ১৩২৫)।

২ ১৭ কার্তিক ১৩২৫ (৩ নভেম্বর ১৯১৮) কার্তিকী অমাবস্যা বা কালীপূজা ছিল। এইদিন রাণু বারো বৎসর পূর্ণ করেন। কিন্তু তাঁর চিঠিতে কোনো তারিখ না থাকায় রবীন্দ্রনাথ ৩৯-সংখ্যক পত্রে (২২ কার্তিক ১৩২৫) লেখেন, 'কবে তোমার জন্মদিন তোমার চিঠির মধ্যে তার তারিখের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।'

৩ দ্র. রাণুর পত্র ২৮।

পত্র ৪৫।

১ রবীন্দ্রনাথের পত্রে এই বিষয়ে কোনো উল্লেখ না থাকাতে রাণুর এই চিঠিটির রচনাকাল নির্ণয় করা গেল না। 'পলাতকা' ১৩২৫ সালে (১৯১৮) প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্র ৪৬।

১ এই খবরে ঝগড়ার উপলক্ষ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ তারিখে (পত্র ৪৩) লেখেন, 'আমার গান শোন্‌বার জন্যে রাণুর বাবজা কাশী কলকাতা প্রভৃতি বহু দূর দেশ ঘুরে এই শান্তিনিকেতনে এলেন আর তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী রাণু এলেন না কেন?' রাণু ঝগড়া বাড়াবার সুযোগ তাঁকে দেন নি, কয়েকদিন পরেই তিনি স্কুল পালিয়ে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হন।

২ কালীপুজো উপলক্ষে (১৭ কার্তিক) দীপাবলির আলো জ্বালানো হয়েছিল, এই সূত্র অবলম্বনে পত্রটির তারিখ নির্ণয় করা হয়েছে।

পত্র ৪৭।

১ রাণু ২ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ (২৮ নভেম্বর ১৯১৮) শান্তিনিকেতন থেকে রওনা হয়ে পরের দিন কাশী পৌঁছন, পত্রের তারিখ এই সূত্রে অনুমান করা হয়েছে।

২ দ্র. রাণুর পত্র ১৫, টীকা ৩।

পত্র ৪৮।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪০ (২ অগ্রহায়ণ ১৩২৫)।

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪২ (৯ অগ্রহায়ণ ১৩২৫), টীকা ২।

পত্র ৪৯।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪৫ (২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৫) ও রাণুর

পত্র ৫০।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪৫।

পত্র ৫১।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪৬ [পৌষ ১৩২৫]।

পত্র ৫২।

১ রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির উত্তর দেন ১৯ পৌষ ১৩২৫ (পত্র ৪৭)।

পত্র ৫৩।

১ মদনাপল্লী থেকে 'শিবরাত্রি ১৩২৫' ১৬ ফাল্গুন ১৩২৫-এ লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র।

২ এই স্কলারশিপের টাকা সম্পর্কে শ্রাবণ ১৩২৬-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় লিখিত হয় : 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রীতিদেবী তাঁহার ছাত্রবৃত্তির ৩০ টাকা আমাদের আশ্রমে দান করিয়াছেন, সেই টাকা হইতে একটি ঘণ্টাপীঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ঘণ্টার দোল-স্তম্ভটী সারনাথের প্রবেশদ্বারের আদর্শে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুত হইয়াছে।'

পত্র ৫৪।

১ কাশীর মহারাজের আমন্ত্রণে কাশীতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেখান থেকে ২৫ চৈত্র ১৩২৫ (৮ এপ্রিল ১৯১৯) বোলপুরের উদ্দেশে রওনা হন। রাণু তাঁর পিতার সঙ্গে মোগলসরাই স্টেশনে এসে তাঁকে মেল ট্রেনে উঠিয়ে দেন। পত্রের তারিখটি এই সূত্রে অনুমিত।

২ দ্র. রাণুর পত্র ৫৩, টীকা ২।

পত্র ৫৫।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫০ (২৬ চৈত্র ১৩২৫)।

২ রবীন্দ্রনাথের ৫১-সংখ্যক পত্র (৩ বৈশাখ ১৩২৬) থেকে এই তারিখটি পাওয়া যায়।

পত্র ৫৬।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫২ (২৪ বৈশাখ ১৩২৬)।

২ স্বরলিপি-সহ রবীন্দ্রনাথের গানের বই 'বৈতালিক' চৈত্র ১৩২৫-এ প্রকাশিত হয়।

পত্র ৫৭।

১ বৈশাখ ১৩২৬-সংখ্যায় মুদ্রিত কৃষ্ণদয়াল বসুর 'রেণু' কবিতা।

২ ১৯১২-১৩ খৃস্টাব্দে ইংল্যান্ড-আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে লেখা প্রবন্ধের সংকলন 'সঞ্চয়' ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয়।

পত্র ৫৮।

১ কাশী থেকে শৈলশহর সোলনের উদ্দেশে রওনা হয়ে আলিগড় অভিমুখে যাওয়ার পথে লেখা রাণুর এই দীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্তের উত্তর পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের ৫৩-সংখ্যক পত্রে (৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬)।

২ স্বরলিপি-সহ রবীন্দ্রগীতির এই সংকলনটি বৈশাখ ১৩২৬-এ প্রকাশিত হয়।

পত্র ৫৯।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫৪ (৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬)।

পত্র ৬০।

১ দ্র. 'জীবনস্মৃতি', 'পিতৃদেব' অধ্যায়।

পত্র ৬১।

১ এইখানে রাণু উর্দু ও আরবি ভাষাতে কয়েকটি শব্দ লিখেছেন।

২ John Ruskin (1819-1900) ইংরেজ শিল্প সমালোচক।

৩ শব্দটি পড়া যায় নি।

৪ Lord Alfred Tennyson (1809-92), বিখ্যাত ইংরেজ কবি।

৫ *In Memoriam* (1850), প্রিয় বন্ধু Arthur Hallam-এর উদ্দেশে লিখিত স্মরণগাথা।

৬ 'Tears Idle Tears'।

৭ 'নববর্ষ' ভাষণটি বৈশাখ ১৩২৬-সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন'-এ প্রকাশিত হওয়ার পরে জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'প্রবাসী'-র 'কষ্টিপাথর' বিভাগে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৮ 'গান' শিরোনামে এই গানটি উক্ত দুটি পত্রিকার উল্লিখিত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। রাণুর চিঠির ভাবে মনে হয়, তিনি গানটি তাঁর উদ্দেশে লেখা বলে মনে করেছেন। এইরকম কষ্টকল্পনা তিনি পরিণত বয়সে আরও কয়েকটি গানের ক্ষেত্রে করেছিলেন।

পত্র ৬২।

১ এই প্রসঙ্গ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ১৪ আষাঢ় ১৩২৬-এর পত্রে (৫৭-সংখ্যক)।

২ আষাঢ় ১৩২৬-সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে (পৃ. ২২১-৩৫) মুদ্রিত।

৩ উক্ত সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে অনেক কবিতা নয়, দুটি গান মুদ্রিত হয়েছিল— 'কাল-বৈশাখী' ('ঐ বুঝি কাল-বৈশাখী') ও 'গান' ('ঐ বুঝি মোর ভোরের পাখী')

পত্র ৬৩।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫৭ (১৪ আষাঢ় ১৩২৬)।

পত্র ৬৪।

১ বর্তমান চিঠিতে রাণু বরোগ বেড়াতে যাওয়ার যে 'বিপজ্জনক ভ্রমণবৃত্তান্ত' লিখেছেন, সেটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করেছেন ২৬ আষাঢ় ১৩২৬-এর পত্রে (৫৮-সংখ্যক)।

পত্র ৬৫।

পত্রটি এল্‌ম্‌হার্স্ট প্রতিষ্ঠিত ডার্টিংটন হলের অভিলেখাগারে রক্ষিত আছে। সেখান থেকে লন্ডনের শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত চিঠিটির একটি ফোটোকপি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। পেরু যাওয়ার লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যখন আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস আইরিসে অবস্থান করছেন, রাণুর পত্রটি সেই সময়ে লেখা। চিঠির শেষে, রবারস্ট্যাম্পে '23 DIC 1924' তারিখটি আছে— মনে হয়, এটি পত্রপ্রাপ্তির তারিখ। এল্‌ম্‌হার্স্ট এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ও সচিব ছিলেন। রাণুর সঙ্গে তাঁর হার্দ্য সম্পর্ক ছিল, হয়তো সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ চিঠিটি তাঁকে উপহার দেন।

১ ১০ ডিসেম্বর ১৯২৪ পেরুর স্বাধীনতার শতবার্ষিকী পালনের জন্য সেখানকার সরকার বিশ্বের বহু মনীষীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে

আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

২ সুধীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩ এই ধরনের উক্তি রবীন্দ্রনাথের কৌতুকের নিদর্শন, কিন্তু বালিকাস্বভাবা রাণু তাকে সত্য বলে ভুল করেছেন।

৪ পূর্ণেন্দুনাথ ঠাকুর।

৫ দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০), সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র। সংগীতজ্ঞ গীতিকার, ভ্রমণবিলাসী সাহিত্যিক।

৬ সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ব্রতীন্দ্রনাথ।

পত্র ৬৬।

১ *The Visva-Bharati News.*

২ উক্ত পত্রিকায় June 1937-সংখ্যায় সপরিজন রবীন্দ্রনাথের আলমোরা যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়।

৩ রাণুর পুত্র-কন্যা রমেন্দ্রনাথ ও গীতা।

পত্র ৬৭।

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২০৭ (১৯ জুলাই ১৯৪০)।

২ পত্রের উপরে কেউ লিখে রাখেন: 'Regd. Bookpost পাঠানো হোলো 26/7/40'।

পত্র ৬৮।

১ ৭ অগাস্ট ১৯৪০ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি Sir Maurice Gwyer (1878-1952) রবীন্দ্রনাথকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি হয় শান্তিনিকেতনের সিংহসদনে।

২ সম্ভবত অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্ট্‌স্-এর জন্য অর্থসংগ্রহ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত বইটি নীলাম করা হয়েছিল।

পরিশিষ্ট ২

রবীন্দ্রনাথকে লেখা আশা অধিকারী (আর্যনায়কম্)-র পত্র

পত্র ১।

এই পত্রের সঙ্গে রাণুর আঁকা দুটি রঙিন ছবি আছে, একটিতে লেখা 'চাঁদ বিবি— এই সেই ছবিটা', অপরটিতে কিছু লেখা নেই, জলের মধ্যে পদ্মফুলের উপর হাত ও পা-রাখা লক্ষ্মীর ছবি।

১ ২৭ আষাঢ় ১৩২৫ (১১ জুলাই ১৯১৮) ফণিভূষণ সপরিবারে কাশীতে ফিরে আসেন। তার পরের মঙ্গলবার ৩২ আষাঢ়— এই হিসাবে পত্রটির তারিখ অনুমান করা হয়েছে।

পত্র ২।

১ ২৫ ভাদ্র ১৩৪৪ (১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭) তারিখে রবীন্দ্রনাথ ইরিসিপ্লাস রোগে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়ে দুদিন সেই অবস্থায় ছিলেন।

অনিলকুমার চন্দকে লিখিত পত্র

১ এই অনুরোধের উত্তর চিঠির উপরে অন্যের হস্তাক্ষরে লেখা আছে: 'Replied (1) কিশোরকল্যাণ (2) নারী হিতব্রতিকা 2/12/36'।

২ অনিলকুমারের স্ত্রী রানী চন্দ (১৯১২-৯৭)।